সূচী — ১৩০৫

।দেশ· ার্থিকা নিগের কার্যা কিন্তু াকলে

বিষয়	নাম	পৃষ্ঠা
...র ব্রহ্মচর্য্য ও পতিসেবা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি. এ.	৬৫
রুই মাছের কাটলেট (খাদ্যপাক)	শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী	৮২
রামপ্রসাদের নূতন গান (সাংখ্যস্বরলিপি)	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬৯
রণক্ষেত্রে পৃথ্বিরাজ (কবিতা সচিত্র)	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪১২
লক্ষটাকার এক কথা (গল্প)	শোভনাসুন্দরী দেবী	৪৩১
লেডিকেনি (খাদ্য)	শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী	১৩২
ললিতা (গল্প)		২২৬
শরৎকাল (কবিতা)	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
শান্তি (কবিতা	ঐ	৬৫
শিবের প্রতি (কবিতা)	ঐ	৯৬
শাস্ত্রে রমণীর সম্মান ও আত্মরক্ষা	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি. এ.	১১৬
শাস্ত্রে রমণীর উচ্চশিক্ষার বিধি	ঐ	৩৩৯
সাংখ্যস্বরলিপির চুম্বক	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৮
সেনরাজগণের ইতিহাস	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা সম্পাদক	৮৯।১৫৭
সান্ধ্যস্বপ্ন (কবিতা)	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩
স্বামী দয়ানন্দ ও রাজা রামমোহন রায়	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি. এ.	১৮
সমালোচনা		১৭২।২১
নবান্ন দেশ (ভাষাতত্ত্ব)	শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০
নদা ... শিক্ষা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি. এ.	২৭০
...টালেজির পিকল (খাদ্য)	শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী	৪১৮
...হিন্দুস্থানী কোপ্তা (খাদ্য)	শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী	১৩০
... স্থানী শিব সঙ্গীত (... সাংখ্যস্বরলিপি)	শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৩
প্রাচীন ... স্থানী চতুরঙ্গ		
প্রকৃতির প্রেরণা ...	শ্রীপ্রতিভা সুন্দরী দেবী	৪.৫

পুণ্য।

১ম বর্ষ; ১৩০৪-০৫।

সূচনা।

সিদ্ধিদাতা বিধাতাকে নমস্কার করিয়া, আমরা শরতের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই "পুণ্য" নামক এই মাসিক পত্রখানি প্রকাশিত করিলাম। বর্ষার আগমনে শরতের প্রভাত যেরূপ বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রকৃতির মাঝে এবং মানবহৃদয়ে কত বিচিত্র ভাব জাগ্রত করিয়া তুলে, আশা করি, এই ক্ষুদ্র পত্রখানিও নানাবিধ প্রবন্ধে স্বীয় কলেবর সুসজ্জিত করিয়া জনসমাজের হিতসাধন ও মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে।

আমাদের সংসারে দুইটী বিষয় আছে; পাপ ও পুণ্য। ভগবানের ইচ্ছা যে আমরা তাঁহার এই জগৎরূপ বিচিত্র কার্য্যালয়ে পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুণ্যকর্ম্মে নিযুক্ত হই। তিনি "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং", আমরা তাঁহার সন্তান; আমাদের কর্ত্তব্য যে সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ বিশ্বকর্ম্মার অধীনে থাকিয়া এই বিশ্বের বিচিত্রকর্ম্মে আমরা যেন পুণ্যকেই জীবনের লক্ষ্য করি—পুণ্য উপার্জ্জনে সচেষ্ট থাকি।

পুনাতীতি পুণ্যং। পবিত্র করে যাহা তাহাই পুণ্য। ঈশ্বর আমাদের অন্তরে যে শুভবুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন তাহার দ্বারা পুণ্য ও পাপের পার্থক্য আমরা বেশ বুঝিতে পারি। সংসারের নানাবিধ কর্ত্তব্যকর্ম্মে পুণ্য আমাদিগের মলিনতা দূর করতঃ প্রাণ পোষণ করে।

সৎকার্য্য যত্নপূর্ব্বক সাধন করিলেও কখনও তাহাতে আমরা কৃতকার্য্য কখনও বা অকৃতকার্য্য হই এবং তজ্জন্য আমরা সুখী বা দুঃখী হই; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে আমরা আমাদের সাধ্যমত কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত থাকিলে

কৃতকার্য্যতা ও অকৃতকার্য্যতার মধ্য হইতেও পুণ্যলাভ করিব—সেই পুণ্য হইতে আমাদিগকে কেহ বঞ্চিত করিতে সমর্থ হইবে না।

"ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যা নোচেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ।
প্রাপ্তো ভবতি তৎ পুণ্যমত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ॥"

বাল্যকালে পিতামাতা আমাদিগকে পরমপিতার পদানুসরণ করিয়া তাঁহারই ভাবের ছায়ায় আমাদের ক্ষুদ্রগৃহকে বিচিত্র কর্ম্মগৃহ করিয়া আমাদিগকে সুশিক্ষা দিতেন; নানা বিদ্যার আলোচনার দ্বারা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া পিতামাতা আমাদিগকে সেই ঈশ্বরের পবিত্র একত্বের রসাস্বাদন করাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেন।—বৈচিত্র্যের মধ্যে থাকিয়া বিশুদ্ধ আনন্দের সহিত বেশ সহজে পরিশ্রম করিতে পারা যায়। সংসারে নানাবিধ কর্ম্মের মধ্যে পুণ্যই প্রাণদ হইয়া বিরাজ করে; 'পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে'। এই পবিত্র নামেই আমাদের এই পত্রের নামকরণ হইয়াছে। এই পত্রখানি এক্ষণে আমরা জনসমাজে প্রকাশ করিলাম সত্য, কিন্তু ইহা বহুপূর্ব্বাবধিই অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় আমাদের ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে প্রবাহিত হইয়া গৃহকেই পরিষিক্ত রাখিয়াছিল।

পূর্ব্বাবধি এই নামেই ইহা আমাদের গৃহে পরিচালিত হইত এবং হস্তযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া আমাদের আপনাদের মধ্যেই প্রকাশিত হইত। এখন তাহা লোকহিতার্থে জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হইল; বাল্যাবস্থা হইতে যেন নবযৌবনে পদার্পণ করিল।

এই পত্রে জনসমাজের উপযোগী সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিষয়ক প্রবন্ধই স্থান লাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে গৃহস্থের এবং মানবমাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন আহারের বিষয় প্রতিমাসেই থাকিবে। ইহাতে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুকূল শিল্পবিদ্যা প্রভৃতিরও অভাব দূর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করা যাইবে। এক্ষণে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট আমাদের এই বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা যেন আমাদের এই পুণ্যকর্ম্মে সহায়তা করেন।

শরতকাল।

১

গিয়াছে বরষা, আকাশ ফরসা,
এসেছে শরতকাল,
জলাশয় যত, আরসীর মত,
ঝলমলে বিল খাল।

২

রৌদ্র খট্ খট্, শূন্য অকপট
যেন আকাশ পাতাল;
শুভ্র প্রৌঢ় হাস্য, কি এক ঔদাস্য,
আনে গীত ছন্দ তাল।

৩

ক্ষেত ভরা ধান, বিধির বিধান,
এখন এ বঙ্গদেশে;
ষোড়শোপচারে, পূজা চারিধারে,
আত্মীয় স্বজন এসে
হাসে খেলে মেলেমেশে।

৪

ঔদাস্যে মাধুর্য্যে, বেণু ভেরী তূর্য্যে,
অপরূপ কলরব;
এবে প্রাণখোলা, এবে মন ভোলা,
কোলাকুলি অভিনব,
কি আনন্দ অনুভব!

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তর্পণতত্ত্ব।

—— ০০০ ——

চন্দ্র ও পিতৃলোক।

"ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ।" রত্ন কাহারও অন্বেষণ করে না রত্নই সকলের অন্বেষণের বস্তু। সত্যের পক্ষেও এই কথা খাটে; সত্য সহজে আপনাকে প্রকাশ করে না, অনেক যত্ন ও অনুসন্ধানের ফলে সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কিন্তু সত্যের জন্য মানবের আগ্রহ এমনি যে, এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া আপনার যত্ন ও চেষ্টায় যুগে যুগে যে মানব কত গুপ্ত রত্নের উদ্ধার করিয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে! কালের স্রোতে কত আবিষ্কৃত সত্য অন্তর্হিত হইয়াছে এবং কত নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে; পুরাকালে যাহা জানিত, হয়ত একালে আমরা তাহা হারাইয়াছি, আবার একালে আমরা যাহা জানি হইতে পারে, তাহার অনেক সেকালে অবিদিত ছিল। অনেকের ধারণা এই যে বর্ত্তমান কালেই বুঝি বিজ্ঞান নূতন সত্যসমূহ আবিষ্কৃত করিয়া তাহার আলোকে জগৎকে উদ্ভাসিত করিতেছেন এবং প্রাচীনকাল বুঝি কেবলই কুসংস্কার ও অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল। ইহা অমূলক। প্রাচীনকালে মিশরবাসীরা যে বিজ্ঞানবলে পিরামিডের বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরগুলি যে ভাবে বসাইয়া গিয়াছে আধুনিক বিজ্ঞান তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত। মৃতদেহ চির-রক্ষিত করিবার উপায়ও মিশরবাসীরা না জানি কি বিজ্ঞানের বলে আবিষ্কার করিয়া থাকিবে। ভারতের যোগবিদ্যা এক মহাবিজ্ঞান। মিশরে মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য যে বিজ্ঞানচর্চ্চা হইয়া গিয়াছে, জীবিতের জীবন সম্বর্দ্ধনের জন্য ভারতে বিজ্ঞানের ততোধিক সাধনা হইয়া গিয়াছে। ভারতের যোগের কথা কাহারও অবিদিত নাই; প্রসিদ্ধ হরিদাস সাধু, ভূকৈলাসের যোগী ভারতের এই অবসান কালেও যোগ বিজ্ঞানের কথঞ্চিৎ সাক্ষ্য দিতেছেন।

আমরা এক্ষণে দেখি যে পাশ্চাত্যেরা আমাদিগের কতটুকু যশোগান করিতেছে এবং সেই টুকুর উপরেই আমাদের মতামত প্রধানতঃ নির্ভর করে। আমাদিগের শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি আচার প্রথা এবং ক্রিয়াকর্ম্মের বিষয় যতক্ষণ না পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একটা সুমীমাংসায় আসেন, ততক্ষণ আমরা তাহা কুসংস্কার বলিয়া অবহেলার চক্ষে দেখি; পরে যেই কোন জর্ম্মনপ্রমুখ য়ুরোপীয় পণ্ডিত ঐ সকলের উপকারিতা বা উহাদের মধ্য হইতে কোন নিগূঢ় অর্থ প্রদর্শন করেন, অমনি আমরা তাঁহাদিগের পথানুসারী হইয়া দেশভক্ত হইয়া পড়ি। কোন দ্রব্য চক্ষের অতি নিকটে ধরিলে তাহা ভালরূপ দেখা যায় না; আমরাও এই কারণে স্বদেশের ভাল জিনিষ ভালরূপ দেখিতে পাই না, তাই প্রাচীনকালের আবিষ্কৃত অনেক সত্য এক্ষণে লুপ্তপ্রায়;—পুরাকালের অনেক উপকারী আচার প্রথা এক্ষণে তিরোহিত হইতে চলিয়াছে; কিন্তু কত যুগ যুগান্তরের অভিজ্ঞতার ফলে যে সকল দেশাচার প্রভৃতি আমাদের মধ্যে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, সে সকল পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে উহাদিগের মধ্যে কোন সত্য আছে কি না, তাহা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

হিন্দুদিগের তর্পণপ্রথা অতি প্রাচীনকালাবধি প্রচলিত, কিন্তু ইহা শীঘ্রই অন্যান্য প্রাচীন প্রথার ন্যায়, শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইবার চেষ্টা দেখিতেছে। তর্পণের প্রকৃত অর্থ আমাদিগের নিকট প্রচ্ছন্ন। তর্পণ প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি কেন যে করিতে হয়, উহার অর্থ এবং উদ্দেশ্য কি, উহা ধর্ম্মকর্ম্মরূপে কেনইবা দেশাচারে প্রবেশ করিয়াছে, এ সকল জানিতে না পারিলে জ্ঞানীসমাজে চিরকাল কুসংস্কারমূলক বলিয়া অনাদৃত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে।

প্রায় সকল জাতিরই মধ্যে মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার কোন না কোনরূপ রীতি আছে দেখা যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতি যে মৃতদেহ প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শোক ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য। মিশরবাসীদিগের মধ্যে এইরূপ রীতিই ছিল, যে যদি কোন ব্যক্তি অশ্রদ্ধেয় বা নিন্দনীয় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হইতেন তাহা হইলে তাঁহার মৃতদেহ গোর দেওয়া

হইত না এবং মৃতদেহ গোর না দেওয়া আত্মীয় স্বজনের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার ও দুঃখের বিষয় ছিল। বেদেও আমরা মৃতদেহ মৃত্তিকা প্রোথিত করিবার প্রথার উল্লেখ দেখিতে পাই। সমাধি দিবার প্রথা যে শোক ও শ্রদ্ধামূলক, তাহা বেদসূক্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। ঋগ্বেদের সংকুসুক ঋষি মৃতদেহ প্রোথিত করিবার কালে শোকার্দ্র চিত্তে বলিতেছেন;—

"হে মৃত! এই জননী স্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকটে গমন কর, ইনি স্ত্রীর ন্যায় তোমার পক্ষে যেন রাশীকৃত মেষ লোমের মত কোমল স্পর্শা হয়েন।

"হে পৃথিবী! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ, ইহাকে পীড়া দিও না * * * যেরূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, তদ্রূপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর।

"পৃথিবী উপরে স্তূপাকার হইয়া উত্তমরূপে অবস্থিতি করুন। সহস্র ধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি করুক। তাহারা ইহার পক্ষে ঘৃতপূর্ণ গৃহ স্বরূপ হউক; প্রতিদিন এইস্থানে তাহারা ইহার আশ্রয় স্থান স্বরূপ হউক।

"তোমার উপর পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিতেছি; তোমার উপরে এই একটী লোষ্ট্র অর্পণ করিতেছি তাহাতে মৃত্তিকা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। এই স্থূণা অর্থাৎ খুঁটি পিতৃলোকগণ ধারণ করুন। যম এইস্থানে তোমার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিন।

"* * * যেরূপ ঘোটককে রশ্মি দ্বারা রুদ্ধ করে তদ্রূপ আমি দুঃখের বাক্য রোধ করিয়া রাখিলাম।"

বৈদিক যুগে যেরূপ মৃতদেহ প্রোথিত করিবার প্রথা ছিল, সেইরূপ অগ্নিদাহও প্রচলিত ছিল; এই অগ্নিদাহই অপেক্ষাকৃত অধিক প্রচলিত ছিল। ভারতে কবর দিবার প্রথা ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া অগ্নিদাহই তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। সম্ভবতঃ কবর বা সমাধি প্রথার উৎপত্তি ভারতে হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় একরূপ উহা স্বদেশ হইতে চিরনির্ব্বাসিত হইয়াছে। হিন্দুর শ্রদ্ধা প্রদর্শনে দেহের অপেক্ষা আত্মারই প্রাধান্য লক্ষিত

হয়, তাই বোধ হয় মরণান্তে দেহ সংরক্ষণে আস্থা প্রদর্শন হিন্দুদিগের মধ্য হইতে প্রকৃত পক্ষে লোপ পাইয়াছে; কিন্তু মৃত আত্মার শান্তি ও মঙ্গলের জন্য অন্তরের নানা প্রার্থনা ও তদনুযায়ী আচরণ গুলি আজও পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।

শ্রাদ্ধাদি বিশেষ ক্রিয়া কর্ম্ম যেরূপ পিতৃলোকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিশেষ অবসর, সেইরূপ প্রাত্যাহিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অবসর তর্পণ। দৈনিক পালনীয় পঞ্চ মহাযজ্ঞের একাঙ্গমাত্র পিতৃযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞেরই আর এক নাম তর্পণ;—'পিতৃ যজ্ঞস্তু তর্পণম্।' পিতৃ পিতামহ প্রভৃতির প্রতি নিত্য শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যই তর্পণের আবির্ভাব। তর্পণের ধাত্বর্থ তৃপ্তি; সংসারের যাবতীয় প্রাণীর তৃপ্তিই ইহার পরিধির অন্তর্ভুক্ত কিন্তু পিতৃগণের তৃপ্তিই ইহার মূল ও কেন্দ্রস্থল।

পিতৃগণের কথা মনে উদয় হইলেই, পিতৃগণ কোথায়, এই স্বভাবিক প্রশ্ন আমাদের মনে উত্থিত হয়। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে চন্দ্রলোকের কথা আসিয়া পড়ে, কারণ পিতৃলোকের প্রথম সম্বন্ধ চন্দ্রের সহিত;—সাধারণতঃ হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস যে চন্দ্রলোক পিতৃদিগের বাসস্থান। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত হিন্দু মাত্রেরই বিশ্বাস যে পিতৃপুরুষগণ মরণান্তর চন্দ্রলোকে প্রস্থান করেন। পণ্ডিতবর কালীবর বেদান্ত বাগীশ মহাশয়ের ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিও এ বিশ্বাসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। তিনি বলেন, "পৃথিবী যেরূপ মনুষ্যের বাসস্থান চন্দ্রমণ্ডলও সেইরূপ পিতৃলোকের বাসস্থান সেই জন্যই চন্দ্রমণ্ডলের অন্য নাম চন্দ্রলোক ও চন্দ্রভুবন। সেই জন্যই ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন;—

'চন্দ্রলোকে মহীয়তে চন্দ্রলোকং স গচ্ছতি'।" *

সম্ভবতঃ সংস্কৃতে চন্দ্র পিতৃলোক নামে অভিহিত হয় বলিয়া উক্তরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে, অথবা হইতে পারে বেদসূক্তই এই বিশ্বাসের

---

* "চন্দ্রলোকে মহীয়তে চন্দ্রলোকং স গচ্ছতি।" ইত্যাদি শ্লোকের স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে। বেদান্তবাগীশ মহাশয় যে অর্থে ইহার মর্ম্মগ্রাহী হইয়াছেন তাহা আমাদের বিবেচনায় সঙ্গত নহে; ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আমরা ক্রমশঃ পাঠক দিগের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া দিব।

কারণরূপে বিদ্যমান। শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতার "সোমায় পিতৃমতে স্বাহা" "পিতৃগণের অধিষ্ঠান সোমের উদ্দেশে প্রদত্ত এই আহুতি স্বাহুতি হউক।" ইত্যাদি মন্ত্রই ঐরূপ বিশ্বাসের মূল হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু বেদ মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মের মধ্যে প্রবিষ্ট না হওয়াতেই এই বিষম ভ্রমের উৎপত্তি। প্রাচীন ঋষিরা চন্দ্রসম্বন্ধে কিরূপ বিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া অনেকটা বুঝিতে পারি। আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া একবাক্যে স্বীকার করেন, যে চন্দ্রলোকে জীবের বসতি নাই—চন্দ্র মৃত গ্রহ, এমন কি চন্দ্রে একটী প্রাণী কি তৃণ পর্য্যন্তও নাই, কেবল মৃত আগ্নেয়গিরি প্রভৃতির দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক 'পুষে'র উক্তি হইতে নিম্নে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। "The rocky and shattered soil of our satellite is perfectly bare not a blade of grass grows there, not a flower opens. Totally deprived of water and air, life is an impossibility. A three-fold death would overtake the least animal that happened to alight there. In these cold and horrid realms of the moon everything is plunged in torpor and silence; the echoes are mute, nothing alters the dull monotony of the heavens." "আমাদের এই চন্দ্রলোকের বিভগ্ন ও পার্ব্বত্যভূমিতে একটী পুষ্প এমন কি একটা তৃণের শীষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। জল এবং বায়ুর সম্পর্কমাত্র না থাকায়, জীবের প্রাণ ধারণ সেখানে অসম্ভব। একটী সামান্য প্রাণীও যদি সেখানে দৈবক্রমে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে অনিবার্য্য মৃত্যু আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবে। চন্দ্রলোকের এই প্রাণহীন ভীষণ রাজ্যে সকলি মৃতবৎ নিস্তব্ধ।" এই জীবশূন্য আগ্নেয়পর্ব্বতাকীর্ণ ভীষণ মৃতগ্রহে পিতৃগণ দেহ পরিগ্রহ করিয়া বাস করেন, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? বস্তুতঃও চন্দ্রলোকে পিতৃনামক জীবদিগের বাস নাই। প্রকৃত কথা এই যে শাস্ত্রে যে চন্দ্র পিতৃলোক নামে অভিহিত হইয়াছে তাহার অর্থ ইহা নয়, যে চন্দ্র পিতৃনামক জীবদিগের বাসভূমি; বস্তুতঃ চন্দ্র মৃতগ্রহ বলিয়াই হিন্দুরা উহাকে পিতৃলোক নাম দিয়াছেন। শাস্ত্রে

যে অর্থে পিতৃলোক বলা হইয়াছে, সে অর্থ না বুঝিয়া লোকে উহার সহজ স্থূলার্থ 'পিতৃদিগের আলয়' বলিয়া ভাবে। সংস্কৃতে পিতৃগেহ, পিতৃকানন ইত্যাদি যোগরূঢ় শব্দে শ্মশান বা প্রেতভূমি বুঝায়। পিতৃগেহ প্রভৃতি শব্দের শ্মশান অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যদি বিশ্লিষ্টভাবে মূল শব্দার্থ ধরা যায়, তাহা হইলে 'পিতৃদিগের আলয়' ইহাই বুঝায়। আর একটু বুঝাইয়া বলি;— পিতৃগেহ অর্থে শ্মশান হইল কেন? শ্মশানভূমিতে পিতৃপুরুষগণ মরণানন্তর সশরীরে বিচরণ করেন, এই অর্থে অবশ্য শ্মশানভূমির নাম পিতৃগেহ হয় নাই; মৃতপিতৃগণ শ্মশানে আনীত হইতেন বলিয়াই রূপকচ্ছলে জনশূন্য শ্মশানভূমির অন্যতর নাম পিতৃগেহ হইয়াছে। চন্দ্রও সেইরূপ জীবের আবাসশূন্য দগ্ধ শ্মশানলোকে বলিয়াই রূপকচ্ছলে পিতৃলোক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। পিতৃলোক, পিতৃগেহ, পিতৃকানন ইত্যাদি শব্দগুলি শ্মশানার্থবাচক।

এক পক্ষে শ্মশানলোক হিসাবে যেমন চন্দ্র পিতৃলোক পূর্ব্বে দেখা গেল, সেইরূপ আরেক পক্ষে অন্নদাতা হিসাবেও চন্দ্র পিতৃলোক শব্দবাচ্য। সংস্কৃত ভাষার একটী বিশেষত্ব এই যে ইহার একটী শব্দ কেন্দ্র স্থানে থাকিয়া পরিধিস্বরূপে নানাদিকে নানা অর্থ প্রসারিত করে। পিতা অর্থে পাতা বা পালনকর্ত্তা; এই অর্থে চন্দ্র ওষধিপতি হিসাবে পৃথিবীর পিতৃলোক। পিতা যেরূপ পুত্রাদিকে অন্নাদিদ্বারা পালন করে, চন্দ্রও সেইরূপ ব্রীহ্যাদি ওষধিদ্বারা পৃথিবীকে পালন করিতেছে। যে পুরাকালে চন্দ্রলোকের পিতৃলোক বলিয়া নামকরণ হইয়াছে, সেকালের ইহা ধারণা ছিল যে চন্দ্রই ধান্যাদি ওষধিসমূহের জীবনস্বরূপ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন;—

"পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।"

"আমি রসাত্মক চন্দ্র হইয়া ব্রীহ্যাদি ওষধি সকল পরিপুষ্ট করিতেছি।" এই কারণে সংস্কৃত ভাষায় চন্দ্রের ওষধিপতি ওষধিনাথ ইত্যাদি নামের বাহুল্য দেখা যায়। চন্দ্র যে ওষধিপতি নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক নহে। পৃথিবীর যে রস বা জলীয়াংশ দ্বারা ওষধি প্রভৃতি জীবিত আছে এবং বর্দ্ধিত হইতেছে, সেই জলীয়াংশের উপরে চন্দ্রের যথেষ্ট আধিপত্য আছে, তাই পূর্ব্বোক্ত গীতার শ্লোকটীতে চন্দ্রকে 'রসাত্মক' বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে। জলীয়াংশের উপরে চন্দ্রের আধিপত্য থাকায়

সমুদ্রের স্ফীতি এবং নদীর জোয়ার, চন্দ্রের উপরেই বেশী পরিমাণ নির্ভর করে। শুদ্ধ পৃথিবীর জলীয়াংশ নহে আমাদের শরীরের জলীয়াংশ বা রসধাতুও চন্দ্রের আধিপত্য স্বীকার করে, এই জন্য কোন কোন তিথি বিশেষে চন্দ্রের কারনে। শরীরস্থ রসের ন্যূনাধিক্য হইয়া নানা রোগোৎপাদনের কারণ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে চন্দ্র মৃত বা শ্মশানগ্রহ বলিয়া যেমন পিতৃলোক, সেইরূপ পৃথিবীর অন্নপতি হিসাবেও পিতৃলোক নামের যোগ্য।

বাস্তবিক কিন্তু চন্দ্রের সহিত শ্মশানের ও অন্নের কি জানি কেন একটা গভীর রহস্যময় সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বোধ হয়। পৌরাণিক ইতিহাসেও ইহার ছায়া দেখিতে পাই।—দেখ ভারতের রাজত্ব যখন চন্দ্রবংশীয় কুরুকুলের হস্তে তখন ভারতমাতা একদিকে যেমন অন্নপূর্ণা, অন্যদিকে সেইরূপ শ্মশানভাবাপন্না। যে সময়ে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত এবং মণিপুর হইতে কাবুল ও গান্ধার পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত সুসভ্য চন্দ্রকুলের সুশাসন উপভোগ করিয়া শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছিল, সে সময়ে অন্যদিকে কুরুক্ষেত্রের গৃহবিবাদরূপ করালাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া সত্য সত্যই ভারতকে রাজমুণ্ডপরিপূর্ণ শ্মশানভূমিতে পরিণত করিয়াছিল। পূর্ব্ব যুগে পরশুরাম একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ভারতের যে শোচনীয় অবস্থা করিতে পারেন নাই চন্দ্রবংশীয় গৃহবিবাদে অতি সহজেই তাহা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই অবধি অন্নক্ষেত্র ভারত ধ্বংসাবশেষ শ্মশানে পরিণত। জানিনা ভারতের রাজকুল কৌরবগণের চন্দ্র হইতে উৎপত্তি বলিবার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি, কিন্তু ফলে যাহা দেখিতেছি তাহাতে এইটুকু মনে হয় যে চন্দ্রের প্রভাব যাহার উপর পড়িয়াছে তাহার পরিণাম যেন শুভ নয়। চন্দ্রের সহিত শ্মশানের সম্বন্ধ ও অন্নের সম্বন্ধ আমরা আরেকটী আখ্যানে দেখিতে পাই। শিব শ্মশানবাসী বলিয়া নিত্যই তাঁহার কপালে চন্দ্র বিরাজ করে। এক দিকে শশিমৌলী শিব যেমন শ্মশানবাসী অন্যদিকে সেইরূপ শিবভার্য্যা পার্ব্বতী অন্নপূর্ণা। অতএই পাঠক দেখিতেছেন যে যেখানে চন্দ্র সেই খানেই অন্ন ও শ্মশানের ঘনিষ্ঠ যোগ।

শিবের কপালে চন্দ্রের আখ্যান হইতে আমরা শিবের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অনেকটা আভাস প্রাপ্ত হই। পাঠক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবেন

কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্র অধিকাংশ সময় ঈশানকোণে অবস্থান করে। ভারতের উত্তর পূর্ব্বকোণে ভূটানের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে শিবের অধিষ্ঠান ছিল বলিয়াই উত্তর পূর্ব্বকোণের নাম শিবের নামেই ঈশানকোণ হইয়া থাকিবে। ভূটান নামটী 'ভূতস্থান' হইতে খুব সম্ভবতঃ আসিয়াছে। শিবের অনুচর ভূতগণ ভুটিয়াগণ ভিন্ন আর কেহই নহে, শিবের কৈলাসপুরী তির্ব্বতের আধুনিক লাসাপুরী বলিয়াই মনে হয়। লাসা নামটী কৈলাস শব্দ হইতে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। ঈশানকোণের শ্মশানবৎ নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশে শিব ভূতগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া অধিষ্ঠান করিতেন এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্র সেই ঈশানকোণেই অবস্থান করে বলিয়া রূপকচ্ছলে শিবের কপালে চন্দ্র কল্পিত হওয়া অসম্ভব নহে। মৃতব্যক্তির নামের পূর্ব্বে যে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা যায় তাহারও কারণ চন্দ্রের সহিত শ্মশানের সম্বন্ধ।

আমরা এপর্য্যন্ত দেখাইলাম যে চন্দ্র সম্বন্ধীয় প্রাচীন আখ্যানগুলি সত্যমূলক। কোনটী বা বৈজ্ঞানিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত কোনটী বা ঐতিহাসিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত। চন্দ্র অন্নপতি এবং শ্মশানলোক এই দুই কারণেই পিতৃলোক নামের যোগ্য; প্রাচীনকালে এই দুই কারণেই চন্দ্র পিতৃলোক নামে অভিহিত হইত। আগামীবারে দক্ষিণ দিক ও চন্দ্র সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের কথা স্ফুটতররূপে প্রমাণিত হইবে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জয়পুর পত্র।

রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে জয়পুর একটী 'Oasis'। কথিত আছে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। নৈসর্গিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের মিলনও অতি দুর্লভ। কিন্তু জয়পুরে নৈসর্গিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্য হরগৌরীর ন্যায় একত্র বিরাজ করিতেছে। জয়পুর প্রাকৃতিক শোভার আবাস-ভূমি। রাশি রাশি বালুকাস্তূপ ও পর্ব্বতাবলী নীলিমা চুম্বন করিতেছে। অসংখ্য প্রস্তর বিনির্ম্মিত প্রাসাদ ও মন্দিরাবলী নগরীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে।

হেথায় বহেনা গঙ্গা বহেনা যমুনা,
উন্মাদিতে কলস্বরে কবির কল্পনা;
হেথায় নাচে না কুঞ্জ মলয়হিল্লোলে,
জাগাতে প্রেমের স্বপ্ন প্রণয়ী যুগলে।

তথাপি অনন্ত-যৌবনা প্রকৃতি চারিদিকে অনন্ত সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছে। জয়পুরের উপত্যকা নির্ঝরিণী উদ্যান ও পর্ব্বতাবলী প্রবাসী বাঙ্গালীদিগকে অধিকতর নির্জ্জনপ্রিয় করিয়া তুলে। বর্ষাকালে প্রকৃতি অতি মনোরম দৃশ্য ধারণ করে। কখন নীল আকাশে শুভ্রমেঘখণ্ড চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। কখন বর্ষাস্নাত নব পল্লবের উপর সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতেছে; জলদের সঘন গর্জ্জনে অসংখ্য ময়ূর-ময়ূরীরা প্যাখন ধরিয়া চারি দিকে নৃত্য ও কেকারবে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রতিধ্বনিত করিতেছে; অসংখ্য বন্য কপোতেরা কাল মেঘের ন্যায় মাথার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতেছে। মেঘের গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে অতি বৃদ্ধ পিতামহেরাও বিকট চিৎকার করিয়া লাফালাফি করিতেছে। নিদাঘের প্রচণ্ডোত্তাপোৎপীড়িতা প্রকৃতিও সবুজ সাড়ি পরিয়া পর্ব্বতাবলী আলিঙ্গন করিতেছে।

জ্যোৎস্না-বিভাসিত রাত্রিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হয়। তখন শত শত নরনারীর কণ্ঠধ্বনিতে নগরী প্রতিধ্বনিত হয়। এখানে "গলতা" নামে একটী পবিত্র নির্ঝরিণী আছে। প্রত্যহ শত শত রমণীদিগকে এক এক ঘটি ইহার পবিত্র জল মস্তকে লইয়া দলবদ্ধ হইয়া গান করিতে করিতে যাইতে দেখা যায়। বাঙ্গালী রমণীর মত এখানকারী রমণীরা পিঞ্জরাবদ্ধ থাকে না। এখানকার রমণীরা সদা স্বাধীন বিহগের মত "মুক্ত পক্ষে শূন্য বক্ষে" রাস্তা ঘাটে অকুণ্ঠিতভাবে গান গাইয়া বেড়ায়। সকল সময়েই রাজপুত রমণীদিগের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যায়। এখানকার নরনারীদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন ইহাদের জীবন একটি 'Prolonged idyll' বা দীর্ঘ সুখ-স্বপ্ন। "ঘাট" নামে একটা উপত্যকা আছে। এখানে অনেকগুলি বালুকাস্তূপ ও নির্ঝরিণী আছে। এ জায়গাটা এখানকার পুরুষদিগের আমোদ-প্রমোদের স্থান। "আমের" বা অম্বর জয়পুরের প্রাচীনতম রাজধানী। এখনও ইহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান

আছে। মহারাজ মানসিংহের সময় এই অম্বর নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। অম্বর নগর একটি পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। অম্বর প্রাসাদ বাদসা আকবরের প্রাসাদের অনুকরণে নির্ম্মিত। অম্বর প্রাসাদের সহিত একটা কিম্বদন্তী আজিও জড়িত আছে। এইরূপ কথিত আছে যখন সম্রাট আকবর শুনিলেন যে মহারাজ মানসিংহ তাঁহার প্রাসাদের অনুকরণে অম্বর নগরে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তখন তিনি উহা দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এক রাত্রির মধ্যে মহারাজা মানসিংহ ঐ শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত হর্ম্ম্যাবলীর উপর Plaster বা চূর্ণ লেপ করাইয়া দিলেন। এখনও ঐ সুধাধবলিত হর্ম্ম্যাবলী বর্ত্তমান আছে। বিগত খৃঃ শতাব্দীতে মহারাজা জয়সিংহ, দেওয়ান বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক পূর্ব্ব বঙ্গবাসীর সাহায্যে স্বীয় নামে জয়পুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

"জয়সিংহ পুরী জয়পুর চারুদেশ।
যার শোভা মনোলোভা বৈকুণ্ঠবিশেষ॥"

মহারাজা জয়সিংহ একজন জগৎবিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা ছিলেন। কাশী, দিল্লী ও জয়পুরে তাঁহার মানমন্দির সকল আজিও বিদ্যমান আছে। এইরূপ কথিত আছে, মহারাজা মানসিংহ যশোহর হইতে "শীলাদেবী" নামে একটী কালীমূর্ত্তি আনিয়া অম্বরে প্রতিষ্ঠিত করেন। শীলাদেবীর সেবার্থে কতকগুলি পূর্ব্ব-বঙ্গীয় ব্রাহ্মণও আনিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিরা আজও বঙ্গদেশীয় বলিয়া অহঙ্কার করেন। কিন্তু এক্ষণে ভাষা ও পরিচ্ছদে তাঁহাদের ও এদেশীয় লোকদের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। ইহাঁদের অনেকেরি মন্দির আছে সুপ্রসিদ্ধ "গোবিন্দজি'র মন্দিরও ইহাঁদের হাতে; গোবিন্দজির মন্দিরের জন্য জয়পুর হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান। কথিত আছে মহারাজা জয়সিংহ জয়পুর প্রতিষ্ঠা করিয়া গোবিন্দজির নামে উৎসর্গ করেন। জয়পুরের রাজবংশ কুশের বংশ হইতে উৎপন্ন। ইহারা সূর্য্যবংশোদ্ভব, সুতরাং ইহারা সূর্য্যোপাসক। "গলতা" পর্ব্বতে সস্ত্রীক সূর্য্যদেবের মন্দির আছে।

এখনও পাশ্চাত্য সভ্যতা রাজপুতদিগের জাতীয় ভাব সকল বিনষ্ট করিতে পারে নাই। কথিত আছে একদা জনৈক সম্ভ্রান্ত রাজপুতকে "ভিত্তিস্থাপনের"

জন্য আহ্বান করা হয়। অনেক নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত লোকও "ভিত্তি-স্থাপন" দেখিতে উপস্থিত হন। যথাসময়ে তাঁহাকে পাশ্চাত্য-প্রথানুসারে 'কর্ণিক' দিয়া ভিত্তির প্রথমে ইষ্টক সন্নিবেশ করিতে বলা হয়। তিনি মহাক্রোধে তরয়াল খুলিয়া বলিলেন, "আমি কি রাজমিস্ত্রী ?"

জয়পুরের অন্তর্ভুক্ত রিন্তাম্বর নামক একটি ঐতিহাসিক দুর্গ আছে। একটি লোমহর্ষণ ও শোচনীয় স্মৃতি আজিও এই দুর্গের সহিত জড়িত আছে। দিল্লীশ্বর বাদশা আলাউদ্দিনের সময় রাজপুত রাজা হাম্বীর রিন্তাম্বর দুর্গে বাস করিতেন। সেই সময়ে মহীমসা নামক জনৈক রাজ-বিদ্রোহী রাজা হাম্বীরের আশ্রয় গ্রহণ করে। বাদশা মহীমসাকে তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে হাম্বীরের প্রতি আদেশ করেন। কিন্তু হাম্বীর এইরূপ রাজপুত রীতি-গর্হিত কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। সুতরাং বাদশা আলাউদ্দিন তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। রিন্তাম্বরের কেল্লার নীচে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়। রাজা হাম্বীর যুদ্ধে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার রাণীদিগকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, "নীল নিশান নত হইলে জানিবে আমরা পরাজিত হইয়াছি।" ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজা হাম্বীর বিজয়ী হইলেন। কিন্তু হায় জয়োল্লাসের মধ্যে ঘটনাক্রমে নীল নিশান মুহূর্ত্তের জন্য নত হইল। হাম্বীরের রাণী ও কন্যারা তাঁহার পরাজয় ভাবিয়া অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। হাম্বীর জয়োল্লাসে স্ফীত হইয়া রিন্তাম্বরে প্রবেশ করিলেন, আর—তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাগণকে চিতানলে প্রজ্বলিত দেখিয়া আপনিও প্রাণত্যাগ করিলেন।

চন্দ্রকণা বা চন্দ্রকান্ত মেঠাই।

উপকরণ।—দোবারা চিনি তিন সের, জল ছয় পোয়া আড়াই ছটাক, দুগ্ধ আধপোয়া, এই কয়টী রসের উপকরণ।

মেওয়া আধসের, শফেদা এক পোয়া, জল আধ পোয়া, এই গুলি দিয়া খামির প্রস্তুত হইবে।

ঘি দুই সের, জাফরান সিকি ভরি, ছোট এলাচ চারিটী, বড় এলাচ দশটী, খোলাসুদ্ধ বাদাম আধ পোয়া, পেস্তা এক ছটাক, কিসমিস্ আধপোয়া, ভাল গোলাপ জল আধ ছটাক, গোলাপী আতর ফোঁটা দুই, এই উপকরণ গুলি মেঠাইদানার জন্য আবশ্যক হইবে।

মেওয়া এক ছটাক, খাসাসন্দেশ এক পোয়া, ছোট এলাচ তিন আনি ভর, গোলাপ জল এক কাঁচ্চা, গোলাপী আতর দুই ফোঁটা, এই কয়টী পুরের উপকরণ।

প্রণালী—ছয় সাত সের জিনিষ ধরিতে পারে এমন একটি কড়াতে তিন সের দোবারা চিনি ঢালিয়া দাও। দেড় সেরটাক জল ক্রমে ক্রমে চিনিতে ঢাল আর হাত দিয়া মিশাও। কড়া উনানে চড়াইয়া দাও। মিনিট দশ পনের পরে রস ফুটিয়া উঠিলে পর, আধপোয়া দুধে আড়াই ছটাক জল মিশাইয়া প্রায় সমস্তটাই রসে ঢালিয়া দিবে, কেবল আধ ছটাকটাক আন্দাজ বাটীতে বাকী রাখিয়া দিবে। এই আধ ছটাক দুধে জাফরান ভিজাতে দাও।

উনানের ধারে ঠিক হাতের কাছে একটি বাটি রাখিয়া দাও; দুধ দিয়া নাড়িয়া দিবার মিনিট পাঁচ ছয় পরে গাদ উঠিলে, ঝাঁঝরি করিয়া গাদটা উঠাইয়া ঐ বাটীতে রাখিয়া দাও; মাঝে মাঝে ঝাঁঝরি করিয়া নাড়িয়া দাও; দু তিন বারে সমস্ত গাদটা উঠিয়া যাইবে। গাদ উঠাইবার পরে প্রায় মিনিট কুড়ি আরো ফুটিলে ক্র · রস নামাইবে। মেঠাইয়ের জন্য

দুইতারবন্দ রস প্রস্তুত করিতে হইবে। এই রস প্রস্তুত করিতে আধ ঘণ্টা হইতে তিন কোয়ার্টার পর্য্যন্ত সময় লাগিতে পারে।

একটি কাঠের বারকোস পাত; আধসের মেওয়া এই বারকোসের উপরে রাখিয়া প্রথমে আধভাঙ্গা করিয়া লও, তৎপরে হাতের তেলো দিয়া মাড়িয়া মাড়িয়া মোলায়েম কর; বেশ মোলায়েম হইয়া গেলে দু তিন বার জলের ছিটা দিয়া ক্ষীর অল্প অল্প মাথ। এখন ইহাতে শফেদা মিশাও। আবার পাঁচ ছয়বার জলের ছিটা মারিয়া কাদা কাদা করিয়া মাথ। এই রকম জলের ছিটা মারিয়া মারিয়া প্রায় ছয় সাত কাঁচ্চা জল ইহাতে থাওয়াইতে হইবে।—ইহাই থামির।

একথানি বড় কড়ায় একেবারে দুসের ঘি চড়াইয়া দাও। তিন থানি ঝাঁঝরি আর একটি তাড়ু আনিয়া রাথ। প্রায় মিনিট আট দশ পরে ঘিয়ের কাঁচাটে ভাব একেবারে চলিয়া গিয়া ধোঁয়া উঠিতে থাকিলে, বাম হাতে একটা বড় ঝাঁঝরি লইয়া ঘিয়ের কড়ার উপরে চিত করিয়া ধর, তারপরে ডান হাতে থানিকটা করিয়া থামির লইয়া এই ঝাঁঝরির উপরে ছাঁকিবার মত করিয়া রগড়াইয়া দাও,—দেখিবে ঝাঁঝরির নীচে হইতে ঘিয়ে শাদা লম্বা লম্বা দানা পড়িতেছে। এ দিকে ঘিয়ে দানা পড়িবামাত্র আর একজন ঘিয়ের ভিতরে তাড়ু দিয়া ঠিক কড়ার মধ্যস্থলে ঘষড়াইয়া দিবে; তাহা হইলে তলায় যে দানা গুলা পড়িবে সে গুলাও ভাসিয়া উঠিবে। দানার রং যেই ফিকে বাদামী (যাহাকে ইংরাজীতে ক্রিম্ রং বলে) রং হইলেই, অন্য একটা ঝাঁঝরি করিয়া দানা গুলি ছাঁকিয়া লইয়া রসে ফেল। এ দিকে আবার আর একটা ঝাঁঝরির উল্টাপিঠ দিয়া দানাগুলি ভাল করিয়া রসে ডুবাইয়া দাও। তৎপরে যেই আর এক খোলা ঘিয়ে ভাজিতে চড়ান হইবে অমনি এই রসের দানাগুলি ঝাঁঝরি করিয়া উঠাইয়া একটি বড় বারকোসে বা থালায় রাথিয়া দিবে। ঘিয়ের উপরে এক এক খোলা দানা ভাজিতে এক মিনিট করিয়া লাগিবে। ঘি হইতে দানা উঠাইয়া লইলে পর, আবার এক মিনিট করিয়া ঘি গরম হইতে দিবে, তারপরে আবার দানা ছাড়িবে। এইরূপে সমস্ত থামিরের দানা ভাজিতে প্রায় পনর মিনিট হইতে কুড়ি মিনিট পর্য্যন্ত সময় লাগিবে।

যদি দানা রসে ফেলিতে ফেলিতে ক্রমে রসটা গাঢ় হইয়া আসিতেছে দেখ, তাহা হইলে দু তিন 'নোট' * জল ছিটাইয়া রসটা পাতলা করিয়া লইবে। এখন যে বারকোসে রসের দানা রাখা হইয়াছে, সেই বারকোসটা একটু কাত করিয়া দাও, তাহা হইলে রসটা ঝরিয়া আসিবে। প্রায় মিনিট পনের থালা এই কাত ভাবে রাখিয়া তারপরে আর কাত করিয়া রাখিবে না। খানিকটা রস এই উপায়ে বাহির না করিলে মেঠাই নরম থ্যাস্‌থ্যাসে হইয়া যাইবে।

চারিটী ছোট এলাচের আর দশটী বড় এলাচের দানা বাহির করিয়া রাখ। বাদামের খোলা ভাঙ্গিয়া পেস্তার সহিত ভিজাইতে দাও; ইহা পূর্ব্ব হইতেই ভিজাইতে হইবে। বাদামের খোসা ছাড়াইয়া আড়ে মোটা-চাকা করিয়া কাট। কিসমিস্ বাছিয়া ধুইয়া রাখ।

এইবারে মেঠাইয়ের পুর মাখ।

আধ ছটাক মেওয়া লও; আগের খামিরের মত করিয়া বারকোসের উপরে রাখিয়া মাড়িয়া লও; সন্দেশ গুলিও ইহার সহিত মাড়িয়া লও। আধ কাঁচ্চা শকেদা মিশাও। ছোট এলাচের দানা ছাড়াইয়া আধ-কুটা করিয়া সন্দেশে মিশাও এবং দুই ফোঁটা আতর এক কাঁচ্চা গোলাপ জলের সহিত মিশাইয়া ইহার উপরে ছড়াইয়া দাও। এইবারে সবটা ভাল করিয়া একবার মাখা হইয়া গেলে বাইশটী গোল্লা করিয়া রাখ।

আবার মেঠাই দানার থালা লইয়া আইস। দানার সহিত বাদাম, পেস্তা, কিসমিস্, বড় এলাচের দানা মিশাও। ভিজান জাফরান গুলিয়া তাহার জলটা মেঠাই দানার উপরে ছিটাইয়া দাও। আতর ও গোলাপ জল একত্র মিশাইয়া ছিটাও। এইবারে সব দানাগুলি আলগা ভাবে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া মিশাও।

মেঠাই বাঁধ—মেঠাইদানার ভিতরে সন্দেশের গোল্লার পুর দিয়া মেঠাই বাঁধ। এক একটা মেঠাই ওজনে প্রায় আধ পোয়া করিয়া হইবে।

আধসের মেওয়াতে প্রায় আড়াই সের ওজনের মেঠাই হইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

---

* অর্দ্ধ অঞ্জলিকে এক নোট বলা যায়।

বাগ্দা চিংড়ীর কাটলেট।

উপকরণ।—বাগ্দা চিংড়ী সাত ছটাক, আদা এক তোলা, পেঁয়াজ পাঁচ কাঁচ্চা, দই তিন কাঁচ্চা, দুইটা ডিম, গোলমরিচ গুঁড়া দুয়ানি ভর, শুক্নলঙ্কার গুঁড়া তিন আনি ভর, দালচিনি দুয়ানি ভর, ছোট এলাচ একটি, লঙ্গ পাঁচ ছয়টী, বাগানেমশলা * দুআনি ভর, কাঁচা লঙ্কা তিনটি, বিস্কুট এক পোয়া, নুন প্রায় তিন আনি ভর, ঘি আধ পোয়া।

প্রণালী।—বাগ্দা চিংড়ী যতটা পার বড় বড় দেখিয়া বাছিয়া আনিবে। চিংড়ীগুলার প্রথমে মুড়াগুলি কাটিয়া ফেল; মুড়া কাটিতে গিয়া যেন একটুও মাছ কাটিয়া না যায়। হাত দিয়া মাছের সমস্ত খোলা ছাড়াইয়া ফেল। ইহার ছোট ছোট যে পা আছে সেই পায়ের দিক হইতে খোলা খুলিতে আরম্ভ কর, সহজে খুলিয়া যাইবে, অথচ মাছটিও নষ্ট হইবে না। সব শেষের দিকে যে লেজের খোলা থাকিবে তাহা আর খুলিতে হইবে না, খোলা সমেত লেজগুলি রাখিতে হইবে। দেখিবার বাহারের জন্য এইরূপ করা হইয়া থাকে। মাছগুলি ধুইয়া লও।

এখন চিংড়ীর পিঠের উপরে ঠিক মেরুদণ্ডেতে চিরিতে হইবে। নীচের দিকে যে লেজের খোলা রাখিয়াছ ঠিক সেই খোলা হইতে আরম্ভ করিয়া একটি ছুরি দিয়া উপর দিক পর্য্যন্ত চিরিয়া আইস, কিন্তু একেবারে দুই খণ্ড করিয়া চিরিয়া ফেলিবে না। এইরূপে চিরিলে মাছটী প্রস্থে যতটা ছিল তাহার দ্বিগুণ হইবে। প্রত্যেক মাছ চিরিবার পর, ইহার মেরুদণ্ডে একটি লম্বা কাল শির বা রগ দেখিতে পাইবে সেটা ফেলিয়া দিবে।

একটি মোটা কাঠ বা পিড়া পাত। মাছ যেমন চিরিয়া চেপ্টা করিয়াছ সেই চেপ্টাভাবে এই কাঠের উপরে বিছাইয়া দাও। এইবারে একটি 'চাপড়ি' (টপার) বা ছুরি দিয়া আস্তে আস্তে থোড়; একপিঠ থোড়া হইলে আর

* পার্স্লি ও সেলেরির পাতা। এইগুলি সৌগন্ধের জন্য ব্যবহার করে, ইহা না দিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। টেরিটিরি বা হকসাহেবের বাজারে বাগানে মসলা পাওয়া যায়।

এক পিঠ উল্টাইয়া থুড়িতে বইবে। ইহা মাছ, মাংস নয়, কাজেই অধিক জোরে থুড়িতে গেলে তাহা একেবারে কাটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে; এই জন্য অতি সাবধানে থুড়িতে হইবে। থুড়িবার পর এক একটি মাছের কাটলেট প্রায় চার পাঁচ অঙ্গুলি চওড়া হইবে। এইরূপে সব মাছগুলি থুড়িয়া রাখিয়া দাও।

একটি গাঢ় বা গভীর বাসন আনিয়া রাখ, এক ছটাক পেঁয়াজ এবং এক তোলা আদা ছেঁচিয়া নিংড়াইয়া তাহার রস ঐ পাত্রে রাখ। এক কাঁচ্চা পেঁয়াজ, তিনটী কাঁচা লঙ্কা ও দুয়ানি ভর বাগানেমশলা কিমা অর্থাৎ খুব কুচি কুচি করিয়া এই পেঁয়াজের রসের উপরে রাখ। দুইটী ডিম ভাঙ্গিয়া দাও, দালচিনি, ছোট এলাচ, লঙ্গ ও একটি শুষ্ক লঙ্কা মিহি করিয়া কুটিয়া ইহাতে মিশাও এবং ইহাতে গোলমরিচ গুঁড়া, নুন এবং দই সব একত্রে রাখিয়া ফেটাও।—ইহাই গোলা।

বিস্কুট গুঁড়াইয়া থালার ন্যায় একটি চেপ্টা পাত্রে অথবা একটা কুলায় রাখিয়া দাও। প্রথমে চিংড়ীর কাটলেটগুলা বিস্কুট গুঁড়ায় একদফা মাখিয়া, ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া গোলার উপরে ফেলিয়া দাও; আবার গোলা হইতে উঠাইয়া বিস্কুট গুঁড়ার উপরে ফেলিয়া মাখাও। কাটলেটের দুপিঠে চাপড়াইয়া চাপড়াইয়া যতটা বিস্কুট গুঁড়া খাওয়াইতে পার খাওয়াও। তারপরে ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া শুষ্ক পাত্রে উঠাও।

একটি তৈযে বা কড়ায় আধ পোয়া ঘি চড়াও; ঘি প্রায় তিন চার মিনিট গরম হইলে, চার পাঁচ খানা করিয়া একেবারে কাটলেট ছাড়। এক পিঠ খানিকটা লাল হইয়া আসিলে, আবার অন্য পিঠ উলটাইয়া দিবে। ক্রমে বেশ দুই পিঠ লাল হইয়া আসিলে, নামাইয়া উঠাইবে। এক এক খোলা ভাজিতে প্রায় মিনিট পাঁচ করিয়া সময় লাগিবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

মেটের দোপেঁয়াজা।

উপকরণ।—পাঁটার বা ভেঁড়ার মেটে দেড় পোয়া, জিরা তিন আনি ভর, আস্ত গোলমরিচ সিকি তোলা, ধনে তিন আনি ভর, শুষ্ক লঙ্কা তিন চারিটী, হলুদ দুই গিরা, পেঁয়াজ দেড় ছটাক, আদা এক তোলা, ঘি দেড় ছটাক, তেজপাতা দুইখানা, নুন প্রায় আধ তোলা, দই তিন কাঁচ্চা, তেঁতুল এক কাঁচ্চা, জল আধপোয়া।

প্রণালী।—দেড় পোয়া মেটে ধুইয়া আগে ভাপাইতে দাও; প্রায় মিনিট কুড়ি পরে সিদ্ধ হইয়া গেলে, হাঁড়ি নামাইয়া ঢাকনা খুলিয়া দাও, হাঁড়ির ভাপ বাহির হইয়া যাক। মিনিট সাত আট পরে, মেটে উঠাইয়া ঠাণ্ডা জলে ফেলিয়া ধুইয়া রাখ। মেটেগুলা ছোট ডুমা ডুমা করিয়া কাট। তিন কাঁচ্চা পেঁয়াজ স্লাইস বা কুঁচা করিয়া কাট। জিরা, গোলমরিচ, ধনে এবং একটি শুষ্ক লঙ্কা কাঠ খোলায় চমকাইয়া বা আধ-ভাজা করিয়া, গুঁড়াইয়া রাখ। হলুদ, আর তিন কাঁচ্চা পেঁয়াজ, এক তোলা আদা ও দুটি তিনটী শুষ্ক লঙ্কা পিষিয়া রাখ।

হাঁড়িতে ঘি চড়াও। ঘিয়ে স্লাইস-কাটা পেঁয়াজগুলি ছাড়। পাঁচ ছয় মিনিট আধ-ভাজা করিয়া, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা ও লঙ্কা এই মসলা গুলির বাটনা ছাড়। হাঁড়ি ঢাকিয়া রাখ। শোঁ শোঁ করিয়া হাঁড়ির ভিতর হইতে আওয়াজ হইতে থাকিলে, ঢাকনা খুলিয়া নাড়িয়া কসিতে থাক। দু তিন মিনিট পরে মশলার জল মরিয়া গেলে, খণ্ডমেটেগুলি ছাড়িয়া দাও এবং নুন দাও। প্রায় মিনিট চার ধরিয়া নাড়িয়া, আধ ছটাক আন্দাজ জল দাও, হাঁড়ি ঢাকা দাও। যেই ফুটিয়া উঠিবে দই দিবে। মিনিট চারের মধ্যে ক্রমে দইয়ের জল মরিয়া আসিলে, খুন্তি দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া চমকান মশলাগুঁড়া দাও। লাল করিয়া কস। চার মিনিট কসিয়া আবার আধ ছটাক জল দাও; মিনিট পাঁচ পরে সে জলটুকু মরিয়া হাঁড়ির গায়ে মশলা লাগিতে থাকিলে আবার এক ছটাক জল দাও। আবার পাঁচ মিনিট পরে এ জলটুকু মরিয়া আসিলে, এক কাঁচ্চা তেঁতুল আধ ছটাক জলে গুলিয়া ঢালিয়া দাও। দু এক মিনিট পরেই নামাও। শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

দেবী-প্রতিমা।

১

তুমি রূপে নিরুপমা, মোহিয়া মোহিনী
মনের মন্দিরে এস হেরিব তোমায়,
পর তুমি ফুলমালা,
ফুলে ফুল্ল হও বালা,
তোমার আকার শোভে স্বর্গীয় প্রভায়।

২

মন্দারের মধুরিমা বয়ানে তোমার
নন্দনের সুধা তব আঁখির পাতায়,
এস উপবনে আজি,
বসিবে দেবতা সাজি—
পূজিব তোমায় পুষ্পে লতায় পাতায়।

৩

কুঞ্জবনে গুঞ্জরিছে শত মধুকর
ফল ফুলে ভরা তরু ডাকে পাখী কত
ক্ষুদ্র নদী ব'হে যায়,
মধুর নীরব তায়,—
মনোমাঝে ব'স বনদেবীটীর মত।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রমণীর মাতৃত্ব।

মার্কিণ কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান নূতন জগতের নূতন আকাশে এক নবতর সঙ্গীত উদার হৃদয়ে ও মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া তথায় এক নূতনতর ভাবের ভাগিরথী আনয়ন করিয়াছেন;—

I am the poet of the woman the same as the man,

And I say it is as great to be a woman as to be a man,

And I say there is nothing greater than the mother of men.

আমার ক্ষুদ্র লেখনী এই তিনটী পংক্তির অনুবাদ করিতে অক্ষম; দরিদ্র বঙ্গভাষায় ইহার অনুবাদ করিতে গেলে, ইহার তেজঃপূর্ণ সৌন্দর্য্য একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। একমাত্র দেবভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় কোন কবি মাতৃত্বের তেজঃপূর্ণ মহত্ব এমন তেজের ভাষায় সুব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন কিনা, জানি না। হুইটম্যানও স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সহিত সমান করিয়া দেখিয়াছেন এবং ব্যতিরেক ভাবে বলিয়াছেন যে, মানবজননী অপেক্ষা অন্য কিছুই মহত্তর নাই। কিন্তু কেবল এই পুণ্যশ্লোক ভারতভূমির পুরাতন ঋষিরাই স্ত্রীজাতির মহত্ব প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীজাতিকে মানবজননীর জাতি বুঝিয়া শুধু ব্যতিরেক ভাবে (Negative) কোন কথা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু অন্বয়ভাবে (Positive) বলিলেন যে, সন্তানের জননী বলিয়াই স্ত্রীসকল বহুকল্যাণ-পাত্রী এবং আদরণীয়া; ইহাঁরা গৃহকে উজ্জ্বল করেন; স্ত্রীরা গৃহের শ্রীস্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই।

"প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।

স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥"

এমন দীপ্তিমান অথচ কোমলতাময় কথা ভারতের ঋষি ভিন্ন আর কাহার মুখে উচ্চারিত হইতে পারে? হুইটম্যান স্ত্রীজাতিকে মানবজননী বলিয়া দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই; আর্য্য

ঋষিগণ স্ত্রীজাতিকে মানবজননীর জাতি এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদিগকে দেবীচক্ষে—সংসার গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীচক্ষে দেখিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। স্ত্রীজাতি যে মানবজননীর জাতি ইহা ঋষিরা নিজে বুঝিয়াছিলেন, এবং পরস্ত্রীকে মাতৃবৎদর্শনের উপদেশ দিয়া আপামর সর্ব্বসাধারণকে সেই আদর্শভাব অনুসরণ করিবার সহজ উপায় শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৃপাতে এই ভাব হিন্দুজাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল; দুঃখের বিষয় এই ভাবটী শীঘ্র শীঘ্র অন্তর্ধানের উপায় অন্বেষণ করিতেছে। অপরদিকে পাশ্চাত্য জাতিগণ এই ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে—তাহারা এখনও ইহার উচ্চতা পরিমাণ করিতে পারিতেছে না।

বর্ত্তমানে হিন্দুজাতির অন্তর হইতে সাধুভাব গুলি যে বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে, ইহা কেবলই বর্ত্তমান কুশিক্ষার ফলে; পূর্ব্বে যে হিন্দুজাতি সাধুভাবের ভাণ্ডার সঞ্চিত করিতে পারিয়াছিল, তাহা ঋষিদিগের শিক্ষার সুপ্রণালীর গুণে। এখন একটা ধূয়া (Fashion) উঠিয়াছে যে ধর্ম্মকে ছাড়িয়া দিয়াও সকল কার্য্যই চলিতে পারে; কেবল তাহাই নহে—ইহাও বলা হইয়া থাকে ধর্ম্মকে ছাড়িয়া দিলেই বরঞ্চ ভাল হয়। ইহা অপেক্ষা হীন শিক্ষা আর কি হইতে পারে? যে আর্য্যজাতি ধর্ম্মকে শিরোধার্য্য করিয়া প্রতি পদক্ষেপ করিতেন এবং যে কারণে এই ভারতভূমি গভীর শান্তির আস্পদ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে, আজ সেই ভারতের কি পরিবর্ত্তন, মন্দের অভিমুখে কি দ্রুতগতি দেখিতেছি;—সেই ভারতের সেই আর্য্য জাতির বংশোৎপন্ন আমরা ধর্ম্মকে সকল কার্য্য হইতে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

ঋষিরা সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার মূলে ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে ভগবানের উপর যিনি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন, সকল বিদ্যাই তাঁহার হস্তগত; তাই তাঁহারা বলিয়াছেন "ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা।" তাঁহাদের বীজমন্ত্র ছিল "ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ" ধর্ম্মকে যিনি নষ্ট করেন, ধর্ম্মও তাঁহাকে নষ্ট করেন এবং ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্মও তাঁহাকে রক্ষা করেন। এই বীজমন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহারা আহারে বিহারে, শয়নে জাগরণে, সকল কর্ম্মে ধর্ম্মকে

রক্ষা করিবার, ভগবানকে ডাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এখন আমরা যদি তাঁহাদের সেই মঙ্গল অনুশাসন না মানিয়া, গর্ব্বভরে অবহেলা করিয়া গৃহে, সমাজে অমঙ্গলরাশি আনয়ন করি, আমাদের পিতৃপুরুষ ঋষিগণ তাহার জন্য দায়ী হইতে পারেন না। ঋষিরা আমাদিগকে এমন এক অমৃত পান করাইয়াছেন যে আমরা, এই দুর্ভাগ্য হিন্দুজাতি, শত কঠোর আঘাতেও একবারে মৃত হইতে পারি না, মরিতে মরিতেও এই অমৃতের সঞ্জীবনীগুণে আবার নববল প্রাপ্ত হইয়া জগতে নবভাবের নবযুগ আনয়ন করিবার চেষ্টা করি। তাঁহাদিগের এই অমৃতপানের ফলেই আমরা এখনও শৈশবকাল হইতেই স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দর্শন করিবার উপদেশ পাইয়া থাকি। ঋষিরা ধর্ম্মের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া ঈশ্বরের মাতৃভাবের এবং জগতে তাঁহারই হস্তাক্ষর স্ত্রীলোকেরও মাতৃত্বের গাম্ভীর্য্য অনুভব করিয়া জগতকে উপদেশ দিলেন যে স্ত্রীলোককে বিশেষতঃ পরস্ত্রী মাত্রকেই মাতৃদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে; কেবল দেখিলে হইবে না, লোকশিক্ষার্থ এবং আপনারও শিক্ষার নিমিত্ত মাতৃসম্বোধনে আহ্বান করিতে হইবে। * কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ফলে শিক্ষিতাভিমানী আমরা ধর্ম্মবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে সাধুভাবের অতীত হইয়া দুর্ব্বিনীত হৃদয়ের উড়নচণ্ডী যুক্তিতর্কের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোক বলিয়াই দেখিতে পারি এবং চাহি, পিতৃপুরুষদিগের স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দৃষ্টি করিবার চসমা হারাইয়া ফেলিয়াছি অথবা থাকিলেও তাহার ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক।

পদে পদে ধর্ম্মের কথা, প্রত্যেক কার্য্যে ধর্ম্মের বন্ধন অনেকের ভাল লাগে

---

* স্ত্রীলোককে কন্যা বা ভগ্নী দৃষ্টিতেও দেখিতে পারিবে; এই দৃষ্টি করা মাতৃভাবে দৃষ্টি করিবারই রূপান্তর মাত্র। "অসংস্তুতাপি পরপত্নী ভগিনীতি বাচ্যা পুত্রীতি মাতেতি বা।" বিষ্ণুসং ৩২শ অঃ।

"পরপত্নীতু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধা চ যোনিতঃ।
তাং ব্রূয়াদ্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ॥

মনু, ২অ, ১২৯।

না—না লাগিবারই কথা। যাঁহারা পদে পদে আত্মসুখ অন্বেষণ করিবেন; যে সকল লঘুচিত্ত শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি দৈহিক সৌন্দর্য্যের পশ্চাতে Artistic beauty বলিয়া পাগলপ্রায় হইবেন; রসিকতা (যাহার ইংরাজী নাম Flirtation) করিয়া আপনাদের রসনাকণ্ডূতি এবং মানসিক উদ্বেজনা বৃথাই বর্দ্ধিত করত যাঁহারা স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন না; যে সকল অদূরদর্শী স্বদেশীয় ব্যক্তি এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য স্ত্রীপুরুষের উন্মাদ নৃত্য (Ball dance) প্রবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্মের ও সুনীতিরও দুর্ভিক্ষ আনয়ন করিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের যে সকল কার্য্য ধর্ম্মানুকূল করিবার কথা ভাল লাগিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহাদের বীজমন্ত্র "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" অথবা "খাও দাও হেসে খেলে লওরে ভাই।" তাঁহাদের কু-দৃষ্টান্তে দেশের কি পরিণাম হইবে তাহা তাঁহাদের অধিকাংশেরই ভাবিবার অবকাশ থাকে না; তাঁহারা দিবানিশি আমোদের স্বপ্নেই উড়িতে থাকেন।

তবে ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিয়া থাকেন যে, কথায় কথায় ধর্ম্মের বন্ধন পড়িলে বালকদিগের অকালপক্কতা কপটতা প্রভৃতি নানা গুরুতর দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহারা এই ভ্রমে পড়িয়া ঋষিদিগের ভাবে প্রবেশ করিতে অক্ষম হইয়া আপাতরমণীয় পাশ্চাত্য গুরুদিগের অভ্রান্ত বেদবাক্য (!) সকল অনায়াসেই গলগ্রহ করিয়া থাকেন। ঋষিরা যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার ফলে আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, ধীরতা আসিতে পারে, কিন্তু অকালপক্কতা আসিতে পারে না; অধর্ম্ম করিলে গভীর অনুতাপ আসিতে পারে, কিন্তু কপটতা আসিতে পারে না। তাঁহারা নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করিতে নিষেধ করেন নাই; তাঁহারা শরীর মন নষ্ট করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে উপদেশ দেন নাই। তাঁহারা বলেন ধর্ম্মানুগত সকল বিষয় সেবা করিলে এবং ধর্ম্মকে প্রধান অবলম্বন করিলে ভালই হইবে, কখনই মন্দ হইতে পারে না। জগতের ইতিহাসেও কি আমরা ইহার পরিচয় পাই না? রোম সম্রাট নীরো তাঁহার বীভৎস আমোদ, বিলাসিতা ও নৃশংসতা দ্বারা জগতের ঘোরতর অপকার

করিয়াছে, না উপকার করিয়াছে? যে সকল মহাত্মা ব্যক্তি ধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন আহুতি দিয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা আর কাহারা জগতের অধিকতর উপকার সাধন করিয়াছেন? গ্রীসের সক্রেটিস মানবজাতির জীবনে, চিন্তায় যে বিপ্লব আনয়ন করিয়াছেন, কয়জন আলসিবিয়াডিস (Alcibiades) তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছে? ইংলণ্ডে ধর্ম্মান্ধ পিউরিটান সম্প্রদায় দ্বারা অধিকতর উপকার হইয়াছে, অথবা ইংলণ্ডরাজ চতুর্থ জর্জের ন্যায় বিলাসী জনগণদ্বারা অধিক উপকার হইয়াছে? কয়জন লোকে পিউরিটান কবি মিল্টনের অমর কাব্য পড়িয়া স্বীয় জীবনকে উন্নত করিতে পারিয়াছিল এবং কয়জনই বা fashionএর নেতা জর্জ ব্রুমেলের উপদেশে উন্নত জীবন যাপন করিয়াছিল? যে ফ্রান্সদেশ কথায় কথায় Social science এর দোহাই দিয়া কৃতার্থ হন, সেই ফ্রান্সের যে বর্ত্তমানে কি ভীষণ আভ্যন্তরীণ অবস্থা চলিতেছে, তাহা বিলাতী মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশ পায়। তথায় মধ্যবিৎ গৃহস্থের ঘরেও বালকদিগের ব্যভিচার ক্রমে ক্রমে অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। * নেপোলিয়ন যখন স্বদেশ ফ্রান্সের উদ্ধারের জন্য কর্ত্তব্যবোধে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পরাজয় হইয়াছিল, অথবা যখন তিনি আপনার গর্ব্বিত স্বপ্ন সফল করিবার জন্য অকারণে আশ্রিতগণকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তখন তাঁহার সমূলে পতন হইল। বিলাসপরায়ণ চতুর্থ জর্জের প্রভাব ইংলণ্ডের সামাজিক জীবনে উপকার অপেক্ষা কি অপকারের বীজই নিক্ষেপ করে নাই? কিন্তু বর্ত্তমান ধর্ম্মপরায়ণা মহারাণীর আদর্শ-চরিত্র ইংলণ্ডীয় সমাজকে কত না উন্নত ও বিশুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের রাজা ইংরাজজাতি যদি ধর্ম্মপরায়ণ না হইতেন,

---

* "It would be difficult to point to another country where there is more juvenile depravity than in France."

এই বিষয়ে স্বদেশভক্ত ফরাসি দেশীয় Max O'rell ও তাঁহার Frenchman in America" গ্রন্থে আভাস দিয়া বলিয়াছেন যে ইহা অতিরিক্ত শাসনের ফলে ঘটিয়াছে, আমরা কিন্তু বুঝিতে পারি যে প্রকৃত ধর্ম্মশাসনের অভাবেই ইহা ঘটে।

তাহা হইলে আমাদের যে কি দুর্দ্দশা হইত, তাহার ইয়ত্তা হয় না। এক ধর্ম্মের বলেই মুসলমানদিগের ভিতরে কি একতা বিরাজ করিতেছে। হিন্দু রাজগণ যদি ধর্ম্মের পথে থাকিয়া, স্বদেশদ্রোহ এবং গৃহবিবাদ না করিতেন, তাহা হইলে আজ ভারতের ইতিহাস পরিবর্ত্তিত দেখিতাম। তখন ভারতের মুক্ত গগনে সৌভাগ্যের সূর্য্য নিয়তই সমুদিত দেখিতাম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতগুলি দৃষ্টান্তের দ্বারাও যদি কেহ ধর্ম্মের সুফল অনুভব করিতে না পারেন, তবে যে আর কি প্রকারে বুঝাইব তাহা জানি না। আর যদি ইহা স্থির হয়, যে ধর্ম্মের পথেই মঙ্গল, তাহা হইলে ধর্ম্মানুগত সকল বিষয় সেবা করিতে অথবা প্রত্যেক কার্য্যকে ধর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে বলাই কি কর্ত্তব্য নহে? ধর্ম্ম এমনই পদার্থ যে ইহাকে প্রতিমুহূর্ত্তে ধারণ করিতে অভ্যাস না করিলে সহজে আয়ত্ত হয় না। তাই শাস্ত্রকারগণ প্রত্যেককে মৃত্যুকর্ত্তৃক গৃহীতকেশ-বোধে ধর্ম্মাচরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বালক তানসেন।

শরীরের সন্ধিস্থানসমূহে গ্রন্থিসকল আছে বলিয়া এবং তাহার সহিত এক প্রকার স্নেহ পদার্থ বিদ্যমান থাকায়, আমরা শরীরকে যেমন সহজে দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারি, এবং নানারূপে সঞ্চালনাদির দ্বারা তাহাকে কর্ম্মণ্য রাখিতে সক্ষম হই, সেইরূপ আর্য্যসঙ্গীতের সন্ধিস্থানসমূহে, সঙ্গীতজ্ঞ মহাত্মারা গ্রন্থিস্বরূপ হইয়া আছেন বলিয়া এবং তৌর্য্যত্রিক প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত বিদ্যার প্রতি তাঁহাদিগের সুগভীর আন্তরিক স্নেহ প্রযুক্ত, আর্য্যসঙ্গীত এখনও পর্য্যন্ত মূর্ত্তিমান হইয়া ভারতে বিরাজ করিতেছে, আমরা নানাপ্রকারে তাহার আলোচনা ও আন্দোলনাদি করিতে সমর্থ হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

এই সঙ্গীতমেধাসম্পন্ন মহাত্মাদিগের মধ্যে তানসেনও অন্যতম। ইনিও ভারতে সঙ্গীতের এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই যুগান্তর আনয়ন করিতে গিয়া অনেকে নির্দ্দয়হস্তে প্রাচীন কীর্ত্তি সকল বিধ্বস্ত করিয়া দেন, এরূপ দেখা যায়, কিন্তু তানসেন সেরূপ করেন নাই; তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না; তিনি সঙ্গীতরাজ্যে স্বেচ্ছাচারী হয়েন নাই। তানসেন প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব নায়কদিগের সহগামী হইয়াই, জগৎকে গীতিসুধাবিতরণে তৃপ্ত করিয়াছেন।—পূর্ব্ব সূত্র না ছিন্ন করিয়া, তাহাতেই স্বীয় গীতিকাব্যময় নূতন প্রসূন সকল গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বসঙ্গীতাচার্য্যদিগের তানে তিনিও যেন তানযোগ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। তাঁহার এই সহগত বিনীতভাবের আভাস তাঁহার গীতালোচনায় বুঝিতে পারা যায়;—'তানসেন' নামের "সেন" উপাধিটীতেও এই ভাবের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। এই "সেন" অর্থে নায়কের সহগামীর ভাব একরূপ স্পষ্ট বিদ্যমান। * বাস্তবিকই তানসেন পূর্ব্বসঙ্গীতাচার্য্যদিগের মার্গ সুন্দররূপে অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই "সেন" উপাধি খুব সম্ভবতঃ তিনি রাজসভায় পাইয়া থাকিবেন।—ইহা রাজদরবারেরই উপযুক্ত উপাধি। এই উপাধিতে ভূষিত হইয়াই তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়েন। কিন্তু এতদ্ব্যতীত তানসেনের আরেকটী উপাধিও ছিল; সেটী "মিশ্র।" লোকে তাঁহাকে 'তানমিশ্র' নামেও আখ্যাত হইতে শুনিয়াছি। কিন্তু তানসেন নামটী এরূপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার প্রভাবে তানমিশ্র নামটী ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। তানসেন নামেই তিনি সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ।

তানমিশ্র নামটী বোধ হয় তানসেনের আদি নাম।—তিনি বোধ হয় মিশ্র উপাধিধারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার মিশ্র উপাধিটী সম্ভবতঃ পৈতৃক উপাধি ছিল। সেন উপাধি পরে, হয় রাজা রামচন্দ্রের সভায় অথবা সম্রাট

---

* "সেন" শব্দটী স+ইন হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে। স অর্থে সহ এবং ইন অর্থে নায়ক, নেতা।

আকবর সাহ্‌র দরবারে লাভ হইয়া থাকিবে। জীবনে, তাঁহার উপাধির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বটে, কিন্তু 'তান' এই নামটীর বস্তুতঃ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই; কেবল তানসেনের পিতা তানসেনকে ডাকিবার সময়, তান নামটী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া, তাহার অপভ্রষ্ট আকারে 'তন্নুয়া' নামে সম্বোধন করিতেন। ইহা কিছু অস্বাভাবিক নহে; সকল দেশে, সকল কালে গুরুজনেরা স্নেহ সম্বোধনের বেলায়, শুদ্ধ কথার অনেক সময়ে এইরূপ অপভ্রংশ করিয়া থাকেন।

তানসেনের পিতাও একজন গুণী ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। সঙ্গীত চর্চ্চা তানসেনের গোষ্ঠিতে নূতন নহে। তাঁহার পিতৃপিতামহ সকলেই প্রায় পুরুষানুক্রমে বরাবর সঙ্গীত সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। তানসেন তাঁহাদিগেরই সঙ্গীত সাধনার ফল। প্রধানতঃ তাঁহাদের সাধনার দরুনই, আমরা তানসেনকে ভারতের 'গুণী' রত্নরূপে লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি।

তানসেনের গোষ্ঠীতে গুরুজনেরা যেমন নিজে যত্ন ও শ্রমসহকারে সঙ্গীত বিদ্যা অর্জ্জনে প্রবৃত্ত থাকিতেন, সেইরূপ তাহা বালকদিগকেও শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন; তাহাদিগকে না শিখাইয়া যেন তাঁহাদের মন, সম্যকরূপে তৃপ্তি লাভ করিত না। তাঁহারা বেশ বুঝিতেন, যে বাল্যকাল হইতে অন্তরের মধ্যে বিদ্যা প্রবেশ করাইলে, সহজে বিদ্যালাভ হয়।

সকল বিদ্যাই প্রথম হইতে অভ্যাস করিলে, তাহা সহজে আয়ত্তাধীন হয়। বিদ্যা শিখিতে গেলে, শৈশবকালই প্রশস্ত আরম্ভকাল। শৈশবে যাহা শিক্ষা করা যায় তাহা মনে বসিয়া যায় ও অত্যন্ত ফলদায়ক হয়; কবি কালিদাসের 'শৈশবেহভ্যস্ত বিদ্যানাং' কথাটী ঠিক; সকল বিদ্যাই বালককাল হইতেই শিক্ষা করা উচিত। যেমন নরম জমীতে বীজ সহজে ফলে, তেমনি বালকদিগের মৃদু মনে বিদ্যাবীজ সহজে অঙ্কুরিত হয়। সঙ্গীতবিদ্যার তো কথাই নাই। সঙ্গীত তাহারা অন্য বিদ্যার অপেক্ষা অতি সহজে ও শীঘ্র শিক্ষা করিতে পারে। ইংরাজ কবি পোপ্ বলিয়াছেন;— "বালকেরা গানের অপেক্ষা অন্য কোন্ বিষয় বেশী শীঘ্র শিখিতে পারে?"*

"What can a boy learn sooner than a song?"—POPE.

বালকে গান শীঘ্র শিখিতে পারে, তাহার কারণ ইহাতে তেমন বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না, প্রধানতঃ শুধু স্বর ও কাণের আবশ্যক। ইটালী সঙ্গীত বিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা বলেন, ভাল গাইয়ে হইতে গেলে, দুইটী বিষয় আবশ্যক, ভাল স্বর ও ভাল কাণ। যাহাদিগের ভাল স্বর আছে তাহাদের গানের একশ জিনিষের মধ্যে নিরেনব্বই জিনিষ আয়ত্ত। ভাল কাণও সঙ্গীতে একটী অত্যাবশ্যক্রীয় বিষয়। *

বালকেরা প্রথম হইতে নানা স্বরে গাহিতে গাহিতে এবং স্বর শুনিতে শুনিতে অনায়াসে তাহাদের স্বরবোধ জন্মে এবং কাণ দুরস্ত হইয়া যায়। ইউরোপের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা 'হানডেল' শৈশবকাল হইতেই গীতরসে আকৃষ্ট ও পুষ্ট হওয়াতে, শৈশবেই তাঁহার মধুর স্বরবোধ জন্মিয়া ছিল। তাহার বলে, তিনি অনেক বাধাসত্ত্বেও স্বীয় চেষ্টায় সঙ্গীতের উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 21,976

তানসেনের পিতা তানসেনকে ছেলেবেলা হইতেই, সঙ্গীত বিদ্যায় ক্ষমতাবান করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ চেষ্টা তাঁহার ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার যত্নবীজ কালে মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল।—তানসেন কালে ভারতে একজন প্রসিদ্ধ গুণী গায়কের খ্যাতি লাভ করিলেন। বালক 'তন্নুয়া' প্রসিদ্ধ তানসেন হইলেন।

বালক 'তন্নুয়া'কে শিখাইতে গিয়া পিতার অনেক দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। তানসেনের পিতা যখন তানসেনকে গান শিখাইবার জন্য সাতিশয় যত্ন করিতেন তখন তিনি গান অবহিত চিত্তে শিখিতেন না, তাই তিনি অত্যন্ত মনোদুঃখে তানসেনকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন—বলিলেন "যাও গো চরাও গে।" গায়কের গোষ্ঠীতে তানসেনের সঙ্গীতে অমনোযোগ—উপেক্ষা সহ্য করিতে পারিলেন না।

এই পিতৃদণ্ডে তানসেনের শুভ ফল ফলিল, তিনি নিতান্ত দুঃখিত ও

---

* "That of the hundred requisites, which constitute a good singer, whoever has a fine voice has ninety-nine of them: a fine ear, however is an important reqnisite."

অনুতপ্ত অন্তঃকরণে সঙ্গীতসাধনদণ্ডে দণ্ডী হইয়া উদাসীনবেশে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

বালক তানসেনের কতকটা অনুরূপ চিত্র আমরা ইউরোপীয় সঙ্গীত রাজ্যেও দেখিতে পাই; প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ সঙ্গীতকার বিথোভনও বাল্যবয়সে সঙ্গীতে সেরূপ মনোযোগ দিতেন না; এবং তাহার জন্য তাঁহাকে দণ্ড পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু পরে তিনিও ভারি সঙ্গীতপ্রিয় হইয়া উঠেন।

এইরূপে দেখা যায়, বাল্যকালে গুরুজনের তাড়নায় অনেক সময়ে শুভ ফল উৎপন্ন হয়; বালক 'তন্নুয়া' পিতৃদণ্ডের ফলেই জগদ্বিখ্যাত 'তানসেন' হইলেন।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গপ্রাকৃত। *

মাখন।—কলিকাতা নগরে মাখন বলে, পল্লীগ্রামে প্রায় সকল স্থানেই ননী বলে। সংস্কৃত 'নবনী'র অপভ্রংশ ননী হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। মাখন কোথা হইতে উৎপন্ন, ঠিক করা কঠিন। বোধ হয় মন্থন শব্দ হইতে প্রথম মাথন হইয়াছিল, তার পরে 'থ'র স্থানে খ, হইয়া মাখন হইয়াছে। কলিকাতায় মাখন, মাখম দুইই বলে;—ন অনুস্বার হইয়া মাখম উচ্চারণ হয়।

---

* পূজনীয় পিতৃদেব বহুপূর্ব্বে—প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি বিজ্ঞান গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে এই প্রবন্ধটীও তাঁহার বিজ্ঞানের খাতায় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার খাতার অত্যল্প অংশমাত্র পাইয়াছি।—দেখিয়া মনে হয় যেন তিনি এ সম্বন্ধে আরও কোনগ্রও লিখিয়া থাকিবেন, অথবা লিখিবার ইচ্ছা ছিল, ঘটনাক্রমে হইয়া উঠে নাই।

মাঠোদই।—যে দধিকে মন্থন করিয়া মাখম্ তুলিয়া লয়, তাহাকে মাঠো বা মাঠা দই বলে। মন্থন হইতে মাখন পরে 'থ'র স্থানে 'খ' না হইয়া 'ঠ' হইয়াছে। বিশেষণ শব্দের 'ন' লোপ হইয়া বিকল্পে আকার হইয়া যায়। এই নিয়মে মাঠন শব্দ হইতে মাঠা হইল; যেবারে আকার না হয়, সেবার মাঠি (মাঠো) হইল।

মাঠ।—মাঠ যাহার অর্থ ময়দান তাহা বোধ হয় রোমন্থন হইতে হইয়াছে। রো কোনোরূপে লোপ পাইয়াছিল, পরে মন্থনস্থানে মাঠ হইয়াছে, অর্থাৎ গরুদিগের রোমন্থের স্থান।

দই।—দধি দহি হইয়াছিল। বাঙ্গলা প্রাকৃতের নিয়ম এই যে, যে সকল শব্দ প্রাকৃত হইয়া যায় তাহাদের অন্তে ও মধ্যে প্রায় হকারের লোপ হয়। 'দহি'র হ লোপ হইয়া দই হইল।

পনা।—পনা, যেমন দুষ্টুপনা; পনা'র উৎপত্তি বোধ হয় প্রবণ থেকে। প্রবণ হইতে পন হইল। তারপরে, তৎগুণবিশিষ্ট অর্থে বঙ্গসংস্কৃতে যেমন ত্ব বা তা হয়, বঙ্গপ্রাকৃতে সেইরূপ আকার হয়। পন শব্দে আকার যোগ হইল, পনা হইল। 'দুষ্টপনা'র অর্থ দুষ্টুমি বা দুষ্ট প্রবণতা।

ষড় করা।—'ষড়যন্ত্র করা' থেকে 'ষড় করা'; 'ষড় করা' থেকে 'ষাট্ করা' হইয়াছে।

পিদিম।—প্রদীপ থেকে পদীপ হইয়াছে, পরে দ্বিতীয় অক্ষরের ইকারের যোগে প্রথম অক্ষরে ইকার বসিল,—'পিদিপ' হইল। কেহ কেহ পদিম, কেহ বা পিদ্দিম বলে; এস্থলে অন্ত পকারের উচ্চারণ কঠিন বলিয়া পঞ্চমবর্ণ প্রাপ্ত হই[illegible]।

(ক্রমশঃ)

৺শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুণ্য।

বিক্রম।

কার ভাল লাগে আর রঘুর বিক্রম,
প্রশান্ত করুণ বলে বলীয়ান লোকে
তারো কি বিক্রম নাই? তবুও তাহার
প্রস্ফুটিত সুবিমল আঁখির আলোকে
অনুরাগে করে সবে প্রচুর আহার।
চিরশুভ্র সুকরুণ মাতৃস্নেহসম
মহাবল কোথা আছে এই বিশ্বলোকে?
জগতে উন্নত বীর সেই জন, যার
বাহুবল ফুটে উঠে প্রেম আলিঙ্গনে;
উদার বিক্রম শোভে স্বার্থ বিসর্জ্জনে।
হৃদয়ের সিংহাসনে প্রচ্ছন্ন যে বল
সে বল বিদ্যুৎবেগে করে চলাচল।
অমর করুণবলে দেখ রাম সীতা।
করুণায় পূর্ণশক্তি জগতের পিতা।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মনুসংহিতা ও মাতৃভাব।

শাস্ত্রকার ঋষিরা অধর্ম্মকে মানবের অবনতির এবং ধর্ম্মকে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির একমাত্র কারণ জানিয়া, তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে অধর্ম্মসংশ্লিষ্ট আমোদ ও বিলাসিতাকে অল্পমাত্রও স্থান দেন নাই; তাঁহারা ধর্ম্মকে মূল অবলম্বন করিয়া স্ত্রীলোককে মাতৃচক্ষে দেখিয়াছেন,

এবং সেই প্রকারে দেখিতে উপদেশও দিয়াছেন। তাই আমরা ঋষিশ্রেষ্ঠ মনুকে মাতৃত্বের মহান্ বিজয়সঙ্গীত গাহিতে দেখি—

প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥

মনু স্ত্রীলোককে "সন্তাননিমিত্ত পূজার্হ" প্রভৃতি বলিয়াছেন বলিয়াই যেন কেহ ভাবেন না যে তিনি স্ত্রীলোককে সন্তানপ্রসবকারী পশু (breeding animal) বলিয়া দেখিয়াছেন। * তিনি স্ত্রীলোককে সম্মানের যোগ্য বলিয়াই সম্মান অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কল্যাণকামী আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে গৃহে স্ত্রীলোক সম্মানিত হয়, সেই গৃহে দেবতারা আনন্দিত হয়েন এবং যে গৃহে স্ত্রীলোকেরা অসম্মানিত হইয়া অশ্রুজল পরিত্যাগ করে, সে গৃহ শ্মশানসমান হইয়া উঠে। † ভাবিলেও কেমন এক আনন্দ-কম্প উপস্থিত হয় যে, রমণীর সম্মানরক্ষা বিষয়ে হিন্দুজাতি অপেক্ষা আর কোন জাতিই অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

মনু বলিয়াছেন বটে যে, স্ত্রীলোকেরা বহুকল্যাণপাত্রী এবং সম্মানার্হ; কিন্তু ইহার সঙ্গে যদি তিনি তাঁহার এপ্রকার বলিবার হেতু প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে এই কঠোর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, যখন আবালবৃদ্ধবনিতা যুক্তিতর্ক অতিক্রম করিয়া এক পদও নিক্ষেপ করিতে চাহেন না, এমন কঠোর সময়ে সেই বৃদ্ধ মনুর কথা কে না হাসিয়া উড়াইয়া দিত? ভাগ্যবশতঃ মনু আমাদের ন্যায় "শৈশবের দল" অপেক্ষা

---

* পাশ্চাত্যশিক্ষিত দুএকটী বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে এইরূপ কথা শুনিয়াছি।

† পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥ ৩অ, ৫৫-৮

অনেক দূরদর্শী ছিলেন, তাই তাঁহার অধিকাংশ উক্তিরই হেতু প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের পরিহাসের পথ অনেকটা রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলেন যে সন্তান প্রসব করা পশুদিগের সহিত মানবের সাধারণ ধর্ম্ম, তাহা যেন স্বীকার করা গেল; কিন্তু তিনিই বা ইহাতে করিবেন কি, আর আমরাই বা করিব কি? -বিধাতার সৃষ্টিই যে এইরূপ। বিধাতা পুরুষদিগকে গর্ভাধানের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার তিনিই স্ত্রীলোকদিগকে গর্ভধারণের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। * বিধাতা পশুদেরও মধ্যে স্ত্রীপুরুষ-ভেদ করিয়াছেন এবং মানবদিগেরও মধ্যে স্ত্রীপুরুষ-ভেদ রাখিয়াছেন। কিন্তু বিধাতার কৃপায় মানবজাতির এই পশু-সাধারণ স্ত্রীপুরুষ-ভেদ থাকাতেও যে স্ত্রীলোকের হৃদয়ে এক বিশ্বগ্রাহী অথচ কোমলতম মাতৃভাব জাগ্রত রহিয়াছে, তাহাই অনুভব করা এবং জগতের সমক্ষে তাহাই প্রদর্শন করা— ইহাতেই ঋষিশ্রেষ্ঠ মনুর মাহাত্ম্য। মনু এই প্রচার করিলেন যে সন্তান-প্রসবরূপ স্ত্রীলোকের পশুসাধারণ ধর্ম্ম থাকিলেও সন্তাননিমিত্তই স্ত্রীলোকেরা কল্যাণপাত্রী ও পূজার্হ এবং ইহার হেতু প্রদর্শন করিলেন যে "অপত্যের উৎপাদন, জাত অপত্যের পরিপালন এবং প্রত্যহ সংসারযাত্রার অর্থাৎ গৃহস্থের কর্ত্তব্যকার্য্যসমূহের স্ত্রীরাই প্রত্যক্ষ কারণ।" † এক কথায়, মনুর মতে যে সকল কার্য্য রমণীকে জননী ও মাতা করিয়া তুলে, সেই সকল কার্য্যের নিমিত্তই, অথবা আরও সংক্ষেপে বলিতে গেলে, একমাত্র মাতৃত্বের কারণেই নারীজাতি পূজার্হ এবং রমণী-হৃদয়ে এই মাতৃত্ব আনয়ন করিবার একটা প্রধান সহায় সন্তানলাভ। তাই মনু অপত্যোৎপাদনের কথা বলিয়া স্ত্রীলোককে পূজার্হ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া দৈবক্রমে যে সকল স্ত্রীলোকের সন্তান লাভ হইল না, তাঁহারা যে পূজার অযোগ্য হইবেন, একথা মনু বলেন না। প্রত্যুত তিনি সন্তানবিহীনা সাধ্বী স্ত্রীদিগকে নিরাশার গভীর অন্ধকার হইতে উদ্ধৃত করিয়া আশার আলোক

---

* প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ। ৯অ, ৯৬,

† উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনং॥ ৯ম, ২৭।

দেখাইয়া বলিয়াছেন—"আশৈশব ব্রহ্মচারী ঋষিদিগের ন্যায় ভর্ত্তায় মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী স্ত্রীলোকেরা অপুত্রা হইলেও স্বর্গলাভ করেন।" *

মনুর এই সকল উক্তি হইতে আমরা সুন্দররূপেই বুঝিতেছি যে তাঁহার মতে সন্তান হউক বা না হউক একমাত্র মাতৃত্বের কারণেই নারীজাতি পূজার্হ। মনুসংহিতায় যে যে স্থানে নারীজাতি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, সেই সেই অংশ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব যাহাতে পরিস্ফুট হয়, মহর্ষি মনু তাহার উপায় বিধান করিতে চেষ্টা বিশেষরূপেই করিয়াছেন। মনুর মতে স্ত্রীলোকের সকল কর্ম্ম, সকল ধর্ম্ম মাতৃত্ব প্রস্ফুটিত করিবার সহায় হওয়া আবশ্যক, তাই তিনি স্ত্রীলোকের বিবাহ একটী সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া বিধি প্রদান করিলেন এবং বিবাহকে ধর্ম্মমূলক করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। মানবজাতি যত অসভ্য অবস্থায় থাকে, ততই তাহারা পশুভাব অবলম্বন করিয়া থাকে; তখন তাহারা উচ্চভাব ধারণ করিতে পারে না। পশুদিগের ন্যায় তাহারাও আপনাদিগের মধ্যে বিবসন হইয়া থাকা দোষাবহ মনে করে না। তাহাদিগের স্বাভাবিক প্রকৃতির অনুযায়ী যথাসময়ে প্রবৃত্তি জাগ্রত হইলে তাহা চরিতার্থ না করা পর্য্যন্ত শান্তিলাভ করে না। অনেক অসভ্য জাতির মধ্যেই দেখা যায় যে, এ বৎসর যাহারা স্ত্রীপুরুষের ন্যায় বসবাস করিল, পর বৎসর তাহাদিগের কোনই বাধ্যবাধকতা রহিল না। এইরূপ অসভ্য জাতিগণের মধ্যে পশুভাবই সর্ব্বাপেক্ষা জাগ্রত। ইহাদিগের প্রবৃত্তির উপরে প্রাকৃতিক বাধা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বাধাই কার্য্য করিতে চায় না। কিন্তু মানবজাতি যতই সভ্যতার উচ্চ সোপানে পদার্পণ করিতে থাকে, ততই তাহারা প্রবৃত্তি দমন, বিশেষত কামপ্রবৃত্তির দমন মঙ্গলজনক বলিয়া বুঝিতে পারে। তখন তাহাদিগের হৃদয় হইতে স্ত্রীলোককে কামভাবে দৃষ্টি করা, স্ত্রীলোকের সহিত কেবল পশুর ন্যায় ব্যবহার করা, এই সকল ভাব অল্পে অল্পে চলিয়া যাইতে থাকে। তাহারা স্ত্রীলোকের বিশেষত্ব

* মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বীস্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ ৫অ, ১৬০।

অথবা মাতৃত্ব অল্পে অল্পে বুঝিতে থাকে এবং তাহারা ধীরে ধীরে ইহাও বুঝে যে সুনীতিসঙ্গত বিবাহই এই মাতৃত্ব পরিস্ফুট করিবার প্রধান সহায় এবং সুতরাং এই বিবাহকে ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ করা অত্যন্ত আবশ্যক। এইরূপে দেখা যায় যে মানবজাতি যতই সভ্যভব্য হইতে থাকে, ততই পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সম্বন্ধকে ধর্ম্মমূলক করিবার অথবা মাতৃত্বের স্পৃহায় করিবার প্রয়াস পায়। কোন পাশ্চাত্য জ্ঞানী ব্যক্তি যথার্থই বলিয়াছেন যে "স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহারই দেশের উন্নতি বা অবনতির পরিচয় প্রদান করে।" যে দেশের লোকেরা স্ত্রীলোককে পশুবৎ ব্যবহার করে, সেই দেশ অত্যন্ত অবনত, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না; যে দেশের লোকেরা romantic love প্রভৃতি কামাভাস-বশীভূত হইয়া স্ত্রীমাত্র চক্ষে দৃষ্টি করে, সেই দেশ মধ্যম; এবং যে দেশ কামপ্রবৃত্তিকে দমন করিয়া স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দর্শন করিতে শিক্ষা দিতে পারে, সেই দেশই উত্তম। স্ত্রীলোককে মাতৃভাবে দৃষ্টি করিতে একমাত্র ভারতবর্ষই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা দিয়াছে এবং সেই এই পবিত্র ভারতের মহর্ষি মনুই এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান পথপ্রদর্শক—মনুকেই আমরা এই ভাবের pioneer বলিতে পারি।

ভাবিয়া দেখিতে গেলে, স্ত্রীলোকের দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণের আধার ও আকর মাতৃত্বই যদি বিকশিত না হইল, তবে তাহার জীবনের সার্থক্য কোথায়? মাতৃস্তনে দুগ্ধ আবির্ভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মাতার দেহ মন দয়া স্নেহ প্রেমে একেবারে ভরিয়া যায়। মাতার সন্তানজনিত সুখের সঙ্গে কি অন্য কোন সুখের তুলনা হইতে পারে? আবার এই সুখের উৎপত্তি কি বিবাহের পবিত্রতা নহে? কোন পাশ্চাত্য কবি গাহিয়াছেন,—

"Wedded love, mysterious law, the true source of human offspring."

আমাদের ঋষিরাও ইহা আরও পূর্ণরূপে অনুভব করিয়া বিধাতার বিধির অনুসরণে কামজ স্ত্রীগ্রহণ এবং অকামজ বিবাহ, এই উভয় প্রকার ঘটনাকেই বিবাহের পবিত্রতার মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিয়া এই উপদেশ দিলেন যে "ধর্ম্মও অকামজ বিবাহই কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতেই সুসন্তানের উৎপত্তি

হয়।" * এইরূপে দেখি যে, ঋষিরা রমণীর মাতৃভাব যে গভীররূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহারই ছায়ামাত্র স্পর্শ করিয়া নব্যজগতের কবি ওয়াল্ট হুইটমান গাহিলেন যে "মানব-জননীর অপেক্ষা মহত্তর আর কিছুই নাই।"

নারীপ্রকৃতির এই মাতৃভাবের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত ও কিরূপ পবিত্রতা সঞ্চার করে তাহার একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালেও ইংলণ্ড নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং বর্ত্তমান ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালেও ইংরাজজাতির প্রভূত উন্নতি লাভ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। রাণী এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ড জলযুদ্ধ প্রভৃতি নানা কার্য্যে জয়লাভ করিয়াছিল এবং সাহিত্যক্ষেত্রে সেক্ষপীয়রের ন্যায় মহাকবির জন্মদান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এলিজাবেথ স্বয়ং সমগ্র ইংরাজজাতির অন্তরে আদর্শচরিত্র ও সৌম্যমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এক ভীষণ অশান্তি ও দুর্নীতির মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। কে নিশ্চয় পূর্ব্বক বলিতে সাহস করিবে যে তাঁহার মন্দপ্রভাব এখন একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াছে? তখনকার ইংরাজসমাজের গঠনফলে এলিজাবেথের হৃদয় নানা কারণে দূষিত হইয়া অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল উৎপাদন করিয়াছিল। তদানীন্তন সমাজের দুর্নীতি তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল; তিনি স্বীয় মানসিক দুর্ব্বলতাবশতঃ তাহার অতীত হইয়া সমাজকে সুগঠিত করিতে পারেন নাই। অপরদিকে বর্ত্তমান ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়েও ইংলণ্ড নানা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে; কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি শিল্প, বিদ্যার সকল বিভাগেই মহারাণীর এই ষষ্টি বৎসর সুশাসনকালের মধ্যেই ইংলণ্ড কত মহারথীর জন্মদান করিয়া জগতের পূজ্য হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতেই বা ইংলণ্ডের এমন অনন্য-সাধারণ গৌরব কি? যাঁহার দিগন্তব্যাপী রাজ্যে সূর্য্যের অস্তাচলগমন দৃষ্ট হয় না, এবং যিনি ইংলণ্ডের ও তদধীন রাজ্যসমূহের অধীশ্বরী দেবী হইয়া স্বীয় সৌম্যমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন; যিনি ইচ্ছা করিলে এলিজাবেথের ন্যায় দুর্নীতির পঙ্কিলস্রোত অনায়াসেই আনয়ন

* অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥ মনু, ৩অ, ৪২।

করিতে পারিতেন, তাঁহার পবিত্র গার্হস্থ্য জীবন এবং পবিত্র মাতৃভাবই ইংরাজজাতির— কেবল ইংরাজজাতির কেন, তাঁহার প্রজামাত্রেরই গৌরবের সামগ্রী। ভারতের ঋষিরা স্ত্রীলোকের যে আদর্শচিত্র আমাদের নয়নের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন, ভারতের অধীশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়াও সেই আদর্শপথে চলিতে সক্ষম হইয়াছেন, একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না, বিশ্বাস করি। মহারাণী ভারতেশ্বরী ভারতের সাম্রাজ্ঞী এবং হিন্দুসন্তানের মাতা হইবার উপযুক্ত পাত্রী, তাই ন্যায়দর্শী ভগবানের কৃপায় তাহাই হইয়াছেন। তাঁহার এই পবিত্র মাতৃভাবের প্রভাব যে বিশেষভাবে ইংরাজজাতির এবং পরোক্ষভাবে অন্যান্য জাতিসমূহের কতটা মঙ্গল সাধন করিতেছে, তাহার কি ইয়ত্তা করা যায়? ভারতবাসীদিগকে একটীমাত্র উদাহরণ দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে। তাঁহারা জানুন যে তাঁহার মাতার উপযুক্ত দয়াস্নেহই কঠোর স্বার্থপর ইংরাজজাতিকে সমদর্শী হইতে শিখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে কতকটা বলপূর্ব্বক ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রধান অধিকারপত্র, আমাদের সকল অধিকারের মূল সেই Royal proclamation বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইংরাজদিগের উপর ইহাঁর প্রভাবের কথা অধিক আর কি বলিব? এক সময়ে যুবরাজপত্নীকে বাধ্য হইয়া খঞ্জভাবে চলিতে হইয়াছিল, অমনি সমাজনেত্রীবোধে আত্মগর্ব্বিতা স্ত্রীলোকমাত্রেই খঞ্জভাবে চলিতে সুরু করিলেন। এই অবস্থায় সঙ্কোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত রমণীশ্রেষ্ঠ ভিক্টোরিয়ার মাতার উপযুক্ত পবিত্র চরিত্রের প্রভাব যে সমাজনেত্রীগণেরও উপর, যাঁহাদিগের অধিকাংশ রঙ্গপরিহাস, পরচর্চ্চা প্রভৃতি লইয়াই থাকেন, তাঁহাদিগেরও উপর বিস্তৃত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? অপর প্রত্যেক অবিকৃতচিত্ত সাধারণ স্ত্রীলোক যে তাঁহার পবিত্রভাবের অনুসরণ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। একবার তাঁহার কোন উচ্চপদস্থ স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী কাহারও সহিত হাস্যপরিহাস (flirtation) করিয়াছিলেন, তিনি সেই স্ত্রীলোককে বিশেষ শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। কোন পাশ্চাত্য জ্ঞানী ব্যক্তি এই আদর্শ রমণীর মাতৃত্বের প্রভাবের বিষয়ে বলিয়াছেন যে "যুদ্ধের তুমুল নিনাদ যখন শান্ত হইয়া যাইবে, তাহার বহুকাল পরে এবং যখন রাজনৈতিক সঙ্কটগুলি ঐতিহাসিক

দিগের গবেষণার বিষয় হইবে, সেই সুদূর ভবিষ্যতেও বিক্টোরিয়ার মাতৃত্বের গাথা গীত হইয়া কত অগণ্য পরিবারকে নির্ভর প্রদান করিবে।”

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রামকমল।

জীবনদের বাড়ীতে আজ সরস্বতী পূজা। লোকে লোকারণ্য; মহা ধূমধাম, আজ রাত্রে যাত্রা হইবে; জীবন তাহার বন্ধু ও বাল্যসহপাঠীদ্বয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। পরেশ আসিয়াছে, রামকমল এখনও আসিল না, দেখিয়া ব্যস্ত হইয়াছেন। কার্য্যসূত্রে পরেশের সঙ্গে নানাস্থানে অনেকবার দেখা হয়, কিন্তু রামকমলকে জীবন অনেকদিন দেখে নাই, রামকমলের অনেকদিন কোনও সংবাদ পায় নাই; আজ পূজার দিন, সহসা তাহার হৃদয়ে রামকমলের স্মৃতি বসন্তের কুসুমের ন্যায় জাগিয়া উঠিয়াছে; রামকমল বিদ্যালয়ে থাকিতে তাহাকে কত সহায়তা করিত, তাহার সঙ্গে কত আমোদ প্রমোদ করিত; স্মরণ করিয়া জীবনের জীবন আকুল হইয়া উঠিল, সত্বর একটী প্রীতিপরিপূর্ণপত্র বেহারার হাত দিয়া রামকমলের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল।

রামকমলের বাড়ীতে জীবনের পত্র আসিয়া পৌছিল। এক্ষণে নিশাপগমে প্রত্যুষে, যেমন বৃক্ষের পত্রসমূহ শিশিরসিক্ত হয়, সেইরূপ

---

* “And long after all the thunder peal of noisy war has died away and the fierce agitation of political crises has become but an object of antiquarian interest, the memory of Victoria the Wife, the Mother and the Widow will continue to sustain and inspire innumerable families that are and that are yet to be.”—*Rev. of Rev.*, May 1897.

বাল্যসখা জীবনের পত্র পাইয়া রামকমলের চোখের পাতা অশ্রুসিক্ত হইল, রামকমল অনুভব করিল, সংসারে বন্ধু বলিয়া জিনিষ আছে। বহুদিন হইল রাম পিতৃমাতৃহীন হইয়াছে; এখন সংসারে তাহার কেহই নাই, শুধু এক খুড়ো আছেন। তা' খুড়ো থাকিয়াই বা কি আর না থাকিয়াই বা কি, তিনি একজন প্রসিদ্ধ মাতাল, মদই তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব; মদের জন্য তিনি সকলই খোয়াইয়াছেন এবং পরের সর্ব্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। সুরার স্পর্শে তিনি একজন দৈত্য অসুর হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এরূপ পিতৃব্যের কাছে রামকমলের শুভ কিরূপে আশা করা যায়? পিতৃব্যের নাম নীলকান্ত। সুরাপানে ইনি নিজেরই দায়িত্ব হারাইতে বসিয়াছেন, পরের দায়িত্ব কি প্রকারে বুঝিবেন? রামকমলের পিতা যখন বর্ত্তমান ছিলেন, তখন নীলকান্ত এতটা সুরাসক্ত ছিলেন না।

রামকমলের মাতা আগে লোকান্তর যান, পরে তাঁহার পিতা রামজীবনেরও কাল হইল; এখন সকল ভার নীলকান্তের উপর পড়িল। প্রথম প্রথম তাঁহার উপর তাঁহার পিতৃব্যের যত্ন ছিল; ক্রমে যখন হইতে তিনি অতিশয় সুরাসক্ত হইয়া উঠিলেন, তখন হইতে আর সেরূপ যত্ন রহিল না। যাহারা মদের বশীভূত হয়, এবং তৎসঙ্গে যাহাদের চরিত্রহীনতা জাগে, তাহাদের স্বাভাবিক সদ্‌গুণ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাদিগের আর মনুষ্যত্ব থাকে না। তাহাদের নিজের প্রতিই মায়া থাকে না, আত্মীয় স্বজনের কথা তো দূরে। রামকমলের উপরে নীলকান্তের এখন মোটেই মায়া নাই। এখন তাঁহার, রামকমলের বিষয়ের অংশটা আত্মসাৎ করিয়া মদে উড়াইবার ইচ্ছা।—অনাথ রামকমল কিরূপে তাহার এইরূপ পিতৃব্যের হাতে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবে?

৩

জীবনদের বাড়ীতে রামকমল আসিল; জীবন প্রাণ ভরিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল, কিন্তু তাহার চেহারা দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে জীবন বলিল, "ভাই রাম তোমার এরূপ বেশ কেন?" রামকমল উত্তরে কহিল "কি আর খারাপ বেশ।"

জীবন। "ভাই রাম তোমার মনে কিছু গূঢ় কষ্ট আছে, মুখ দেখে মনে হয়।

রাম। "কষ্ট আর কি?

জী। আমার কাছে কেন লুকোচ্ছো? মুখ দেখে সকলই বোঝা যায়। তোমার মুখে বিষাদের ছায়া কেন?

রা। সকল সময় কি মানুষের এক রকম যায়?

জী। তা' সত্যি।—কত দিন তোমার সঙ্গে আমার খুব চিঠি পত্র চলিত; তারপরে আমার পিতা পশ্চিমে তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রে যাবার সময় আমাকেও কাজ শেখাবার জন্য তাঁর সঙ্গে নিয়ে গেলেন; আমাকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমে ঘুরতে হ'ত। কতবার পূজার সময় বাড়ীতে আসতে পারিনি, এবার এসেছি। এসেই তোমার জন্য মন কেমন করলো। পূজার পরে তোমার বাড়ীতে একদিন যাওয়া যাবে।

রা। ভাই আর সে বাড়ী কি আছে? বাড়ীটা এখন শ্রীহীন মলিন। আমার বাপ মা সব মারা গেছেন, এক খুড়ো আছেন; তিনি মদ নিয়ে প'ড়ে আছেন; তাঁর হাতে আমার যে কি কষ্ট তা বলে কাজ নেই; তাঁর হাতে আধমরা হয়ে রয়েছি।

জী। ভাই সংসার এই রকমই। আমার মা যাবার পরে আমি কষ্ট কি তা টের পেয়েছি, তোমার যে কি কষ্ট তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

এই বলিয়া জীবন একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। কিছুক্ষণ পরে রামকে বলিল "ভাই রাম কাজের গতিকে নানা মুস্কিলে পড়িয়া তোমার সঙ্গে কতদিন আমার খবরাখবর বন্ধ হইয়া গিয়েছিল, তাহার জন্য ক্ষমা কোরো। কিছু মনে কোরো না।

"রামু চল ভাই গান [illegible] হচ্ছে শুনবে।" বলিয়া তাহাকে জীবন পাশের ঘরে লইয়া গেল।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, রামধন নিমন্ত্রণ খাইয়া গৃহে ফিরিতেছে। পথে যাইতে যাইতে দেখিল, একটী বালিকা পুষ্পচন্দন হাতে লইয়া শিবমন্দিরের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার সঙ্গে একজন শুক্লবসনা বৃদ্ধা, দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাকে বালিকাটি "ঠাম্মা ঠাম্মা" বলিয়া সম্বোধন করিতেছে ও কি বলিতেছে। বালিকাটী অপূর্ব্বসুন্দরী, ললিতলাবণ্যে

মধুর কান্তিতে মুখটী তাহার কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বে উষার যেরূপ স্নিগ্ধ শোভা প্রতিভাত হয়, ইহাঁরও মুখে সেইরূপ একটী স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছে।

এই স্নিগ্ধ অরুণ রাগরঞ্জিত তরুণ প্রতিমূর্ত্তির দিকে রামকমল অনেকক্ষণ নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া রহিল। পদদ্বয় সরিল না, পলক পড়িল না, সেই কান্তির তরঙ্গে তাহার অন্তঃকরণ দোলায়মান হইতেছিল। মধুরিমাটুকু অনুধ্যান করিতে করিতে রামকমল গৃহে ফিরিল।

৫

পূজার পরে বাড়ীতে জীবন আসিবে বলিয়াছে। রামকমল তাই ঘরটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইতেছে। ঘরে একটা পুরাণো আলমারি ছিল, তাহার তলায় একটা আধভাঙ্গা টিনের বাক্স ছিল; সব পরিষ্কার করিবার সময় যখন টিনের বাক্সটা আলমারির তলা হইতে টানিয়া বাহির করিতেছিল, তখন বাক্সটার ভাঙ্গা ঢাক্‌নিটা খুলিয়া গেল। খুলিয়া যাইবামাত্র, রামকমল তাহার মধ্যে একটা ফোটো দেখিতে পাইল, দেখিল তাহাতে মন্দিরের সেই বালিকার ছবি! এবং ধূলা মলিনতা ঝাড়িয়া ও-পিঠে দেখিল "কমলা" লেখা আছে। ভাবিতে লাগিল সেই বালিকার ছবি এখানে কিরূপে আসিল? ভাবিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না, 'কে আনিল, পিতামাতা কি এই বালিকার কথা পূর্ব্বে জানিতেন? তাহা না হইলে ফোটো তাহাদের বাক্স হইতে পাওয়া যাইবে কেমন করিয়া।' এই সকল চিন্তা করিতে করিতে রাত্রে শয্যায় শুইয়া পড়িল, কিন্তু শরতের মেঘের ন্যায় তাহার অন্তরাকাশে মাঝে মাঝে চিন্তামেঘরাশি ঘনঘটা করিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, আবার নিদ্রার প্রভাবে কাটিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ হইতে হইতে মধ্য রাত্রিতে সহসা নিদ্রিত হইয়া পড়িল। নিদ্রাদেবী আসিয়া তাহাকে স্বীয় করুণ ক্রোড়ে স্থাপন করিল।

৬

রাত কাটিয়া গেল, কাক ডাকিতে লাগিল, চারিদিক পাখীরা কলরব করিতে লাগিল, রামকমলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; ঘুম থেকে উঠিবামাত্র বালিকাটীর দিকে তাহার মন প্রধাবিত হইল,—বালিকাটী কে? তাহা

জানিবার জন্য তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি ফোটোটী পকেটের মধ্যে লইয়া সেই মন্দিরের দিকে গমন করিল; মন্দিরের কাছে গিয়া দেখিল প্রাতঃকালেও বালিকাটী তাহার পিতামহীর সঙ্গে আসিয়া শিবপূজা করিতেছে।—দেখিয়া রামকমলের ইচ্ছা হইল কন্যাটীর সম্বন্ধে বৃদ্ধা পিতামহীকে কিছু জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু কি মনে হইল, একটু লজ্জা বোধ হইল, তাহাকে সহসা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। পরে মনে মনে এক উপায় ঠাওরাইল, ভাবিল যখন তাহারা বাড়ী যাইবে সেই সময় দূরে দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিবে, দেখিবে কোথায় তাহাদের বাড়ী। এবং পরদিন তাহাদিগের বাড়ীতে ভিক্ষুকের বেশে ভিক্ষা করিতে যাইবে ও তখন কৌশলে যদি কিছু জানিতে পারে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেখানে ঘুরিতেছে, দেখিল তাহাদের পূজা সাঙ্গ হইল; অমনি একটু দূরে গাছের আড়ালে সরিয়া পড়িল। তাহারা নিজ গৃহের পানে যখন চলিতে আরম্ভ করিল, রামকমলও তখন কিঞ্চিৎ অন্তরে অন্তরে থাকিয়া তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল। কতকটা পথ গিয়া দেখিল, তাহারা একটী একতালা বাড়ীতে প্রবেশ করিল। দেখিয়া রামকমল স্বগৃহে প্রত্যাগত হইল।

৭

ঘরে বালিকা ও তাহার ঠাকুরমা গল্প করিতেছেন। প্রদীপ মিট্‌মিটি জ্বলিতেছে;—বালিকার মুখে ক্ষীণালোক পুলকে নৃত্য করিতেছে।—ঠাকুরমার গল্প বালিকার মনে ছায়ালোকের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে।—একটা গল্প সাঙ্গ হইয়া গেল, বালিকা ব্যগ্রচিত্তে তাহার ঠাকুরমাকে বলিল "আরেকটী গল্প বল," ঠাকুরমা বলিলেন "আর কিসের গল্প বল্‌বো," "সওদাগরের গল্প বল্‌বো শুন্‌বি?" কমলা বলিল "না, ভূতের গল্প বল।" ঠাকুরমা "আচ্ছা শোন্ তবে বলি" বলিয়া ভূতের গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। কমললোচনা কমলা বিস্ফারিতনেত্রে সেই গল্প সুধা পান করিতে লাগিল।—পূবে মেঘ করিয়াছে, গাছপালা নড়িতেছে, শব্দ হইতেছে,—গল্প শুনিতে শুনিতে কমলার মনে ভূতের ভয় জাগিয়া উঠিতে লাগিল, কমলা এদিক ওদিক ত্রস্তভাবে চাহিয়া বলিয়া উঠিল "ঐ, ঠাকুরমা বেলগাছে শব্দ হ'চ্চে!"—বলিতে বলিতে, পুনরায়

নারিকেল গাছ হইতে একটী নারিকেল ধপ্ করিয়া পড়িয়া গেল,—বালিকা বলিল "ঠান্মা থাক্ ভূতের গল্প থাক।" বৃদ্ধা হাসিয়া উঠিলেন বলিলেন "আরেকটু শোন্," কমলা বলিল "না ঠান্মা আমার তাহ'লে রাত্রে ঘুম হবে না, কেবল ভূতের স্বপ্ন দেখ্‌বো। বৃদ্ধা বলিলেন "ভূতের গল্প শুন্‌লেই কি মানুষে ভূতের স্বপ্ন দেখে।" কমলা বলিল "হ্যাঁ ঠাকুরমা, এই তুমি সেদিন বিয়ের গল্প ব'লেছিলে, আমি অমনি সেই রাত্রে বিয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেম্।" ঠাকুরমা কৌতূহলপূর্ণনেত্রে বলিলেন "কি স্বপ্ন দেখেছিলি?" বালিকা বলিল "ঠান্মা সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম যে আমার এক ভিক্ষুকের সঙ্গে বিয়ে হবে।" ঠাকুরমা ঈষদহাস্যমুখে বলিলেন "শেষে এই স্বপ্ন!—ভিক্ষুকের সঙ্গে বিয়ে! ত্রস্তচিত্তে ও চকিতনেত্রে বালিকা বলিল "কি হবে ঠান্মা!" ঠাকুরমা একটু হাসিয়া বলিলেন "তাহ'লেই বা দোষ কি?" বালিকা ব্যাকুল হইয়া বলিল "হ্যাঁ ঠান্মা তা বটে।" ঠাকুরমা বলিলেন "জানিস্‌নেতো সব বিধেতার কাণ্ড, বিধেতা কিসে কার ভাল করেন, কেউ তা বল্‌তে পারে না। তোর 'শাপে বর' হবে কোনো ভয় নেই চ, চ, গল্প স্বল্প থাক্ এখন খাবি আয়, খাইগে রাত হ'য়ে গেছে।"

ক্রমশঃ

রামমোহন পোলাও। *

(নিরামিষ)

উপকরণ।—চিনি শর্কর বা অন্য কোন পোলাওয়ের চাল এক পোয়া, ঘি এক ছটাক, দুই আনি ভর দারচিনি, লঙ্গ তিন আনি ভর, ছোট এলাচ তিন আনি ভর। এই গুলি চাল ভাজিবার উপকরণ।

---

* এই উৎকৃষ্ট পোলাওটী আমাদিগের নিজের উদ্ভাবিত। ইহা আমরা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নামে উৎসর্গ করিয়া ইহার নাম "রামমোহন পোলাও" রাখিলাম।

দুইটী ঝুনা নারিকেল (আন্দাজ তিন পোয়া ওজনের), জল তিন পোয়া, এক আনি ভর জাফরান। এই গুলি আঁখনির উপকরণ।

পাকা আনারস একটি (তিন পোয়া ওজনের), পটল দেড় পোয়া (সংখ্যায় পনর যোলটা), মোরব্বা * তিন ছটাক (কমলা নেবুর শুষ্ক মোরব্বা ও আদার শুষ্ক মোরব্বা মিশাইয়া এক ছটাক এবং কুমড়ার মিঠাই আধপোয়া সব মিশাইয়া তিন ছটাক কমলানেবুর ও আদার মোরব্বার অভাবে কেবল কুমড়ার মিঠাই দিলেও চলিবে।), চিনি পাঁচ ছটাক, পাতি বা কাগজিনেবু দুইটী, দারচিনি দুই আনি ভর, লঙ্গ ছয় সাতটা, ছোট এলাচ দুটি, জাফরান আধ আনি ভর, বাদাম আধ ছটাক, পেস্তা আধ ছটাক, কিস্‌মিস্ এক ছটাক, জল আধ সের। এই গুলি 'সিরা' (Syrup) বা রসের উপকরণ।

রূপার পাতা আটখানা, বড় গোলাপ ফুল দুইটী। এই গুলি পোলাও সাজাইবার উপকরণ। গোলাপ জল এক ছটাক।

প্রণালী।—প্রথমে নিম্নলিখিত উপায়ে আনারস কাট। বাঁ হাত দিয়া আনারসের ডাঁটটা ধরিয়া খাড়া করিয়া বসাও এবং ডান হাতে ছুরি লইয়া উপর হইতে আরম্ভ করিয়া খোসা কাটিয়া যাও। তারপরে ইহার চোখগুলি যেমন বাঁকা ভাবে ঘুরিয়া গিয়াছে, সেইরূপ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কাটিয়া ফেল। চোখগুলি কাটা হইয়া গেলে, আনারসটী অনেকটা স্ক্রুর ন্যায় দেখিতে হইবে। বঁটি দ্বারায়ও আনারস কাটা যাইতে পারে। এখন ইহার ডাঁটিটাও কাটিয়া ফেল। আনারসে এক চুটকি † নুন মাখিয়া জলে আলগা ভাবে রগড়াইয়া ধুইয়া লও। ইহাতে এই নুনটুকু মাখালে ইহার আটা আটা ভাব অনেকটা চলিয়া যাইবে। আনারসের দুই দিকের মুখ কাটিয়া আলাগা রাখ, এই মুখগুলি ফেলিয়া দিও না; পরে কাজে লাগিবে। মধ্যের আনারসে দশখানি চাকা কাট; এই চাকা কাটিয়া পরে যে

---

* এই মোরব্বা কলিকাতার টেরিটি বাজারে, হগ সাহেবের বাজারে এবং বড়বাজারেও পাওয়া যায়।

† তিন আঙ্গুলে যত খানি নুন ধরা যায় তাহাই এক চিমটি বা চুটকি।

আনারস টুকু বাকী থাকিবে তাহা ও পূর্ব্বের কাটা 'মুখো' দুইটী একত্র কর। এই গুলির আবার অর্দ্ধেকটা ডুমা করিয়া কাট, আর অপরার্দ্ধ কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া রাখ।

পেট মোটা পুরু পুরু দেখিয়া পটোল আন; ইহাদের পরিষ্কার করিয়া খোসা ছাড়াও। প্রত্যেক পটোলটা দু হাতে করিয়া এক একবার দলিয়া লও, তাহা হইলে পটোল গুলা অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া যাইবে, এবং খানিকটা বিচি বাহির করিবার সুবিধাও হইবে। বিচি বাহির করিবার জন্য প্রত্যেক পটোলের পেটে লম্বা দিকে প্রায় দেড় ইঞ্চি করিয়া 'চির' দাও, অথচ পটোলটী যেন আস্ত থাকে। চিরের দৈর্ঘ্য পটোলের দৈর্ঘ্যের অনুযায়ী হইবে। এই চিরের ফাঁক দিয়া একটি চা চামচের পশ্চাদ্ভাগ কি একটা চেয়ারি দিয়া বিচিগুলি বাহির করিয়া ফেল; আঙ্গুল দিয়াও করিতে পারা যায়। দেড় পোয়া পটোলের আধ পোয়াটাক মাত্র পটোলপুরের জন্য কুচি কুচি করিতে হইবে, এবং এক পোয়া পটোল আস্তই রাখিতে হইবে, কারণ এই গুলির ভিতর পুর পুরিতে হইবে।

মোরব্বাগুলি কুচি কুচি করিয়া কাট। বাদাম, পেস্তা ভিজাইয়া তাহার খোসা উঠাইয়া লম্বা লম্বা কুচি কুচি কর। কিস্‌মিস্‌গুলি বাছিয়া ধুইয়া রাখ।

নারিকেল দুইটি আধখানা করিয়া ভাঙ্গ। প্রত্যেক মালা নারিকেল কুরুনি দিয়া কোর। কোরা নারিকেলের একেবারে দুধ বাহির করিতে না গিয়া দু তিনবারে দুধ বাহির করিতে হইবে। একটি পরিষ্কার কাপড়ে কোরা নারিকেল নিংড়াইয়া খাটি দুধটা আলাদা পাত্রে রাখিয়া দাও। এই ছিবড়া গুলাতে প্রায় তিন পোয়াটাক গরম জল মিশাইয়া আবার কাপড়ে করিয়া খুব মতে ছাঁকিয়া লও। নারিকেলের এই জলীয় দুধটাও স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিয়া দাও।

প্রায় আধসের জলে আস্ত পটোলগুলি এবং কুচি পটোলগুলিও ভাপাইতে অর্থাৎ সিদ্ধ করিতে দাও। হাঁড়ির মুখে ঢাকা দাও। মিনিট দশ পনেরর মধ্যে ভাপিয়া বেশ নরম হইলে হাঁড়ি নামাইয়া জল হইতে পটোলগুলি উঠাইয়া একটি পাত্রে রাখিয়া দাও। পটোলের এই

জলেতেই সব আনারসগুলি, পাঁচ ছটাক চিনি, দুয়ানি ভর দারচিনি, ছয় সাতটা লঙ্গ, দুটি ছোট এলাচ ছাড়। হাঁড়ি আবার উনানে চড়াও। মিনিট দশ ফুটিয়া আনারসগুলি রসে খানিকটা পাকিলে পর, ভাপান পটোল, কাটা মোরব্বাগুলি এবং বাদাম, কিস্‌মিস্, পেস্তা ইহাতে ঢালিয়া দাও। পটোল দিবার পর আরও মিনিট দশ পাকিলে, তবে হাঁড়ি নামাইবে।" রস হইতে আনারস ও পটোল প্রভৃতি বাহির করিয়া আর একটি পাত্রে রাখিয়া দাও এবং ঐ রসশুদ্ধ হাঁড়ি আবার উনানে চড়াও। এই রস আরও গাঢ় করা আবশ্যক। এই রসে আধ আনি ভর জাফরান ফেলিয়া দাও, বেশ রং হইবে। রসটা পাকিতে থাকুক, এদিকে ঐ আনারস ইত্যাদির উপরে দুইটা পাতি বা কাগজি নেবুর রস নিংড়াইয়া দাও। হাঁড়িতে চিনির রস মিনিট চার পাঁচ ফুটিয়া অনেকটা গাঢ় হইয়া আসিলে পর, আবার আনারস ও পটোল প্রভৃতি রসে ঢালিয়া দাও। কেবল দশখানি চাকা আনারস আলাদা করিয়া রাখিয়া দাও। এই গুলি পুনর্ব্বার আর রসে পাক করিবার কোন আবশ্যক নাই। আনারস আদি রসে ঢালিয়া দিবার পর আরও মিনিট পাঁচ ফুটাইয়া তবে নামাইবে।

এইবারে পটোলের ভিতরে পুর পুরিতে হইবে। রসপক্ব আস্ত পটোলের ভিতরে রসে পাক করা পটোলকুচি, মোরব্বা, বাদাম, কিস্‌মিস্, পেস্তা ও দু চারিটা আনারস কুচি সব মিশাইয়া যতটা করিয়া পুর ভরিতে পার পোর। পুর পুরিয়া যাহা বাকী থাকিবে তাহা পোলাওয়ের ভাতে ছড়াইয়া দিবার জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। পটোলগুলি সুতা দিয়া বাঁধ এবং স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিয়া দাও। এই পুর সহিত পটোলগুলিকে পটোলের মিঠা দোল্মা বলা যাইতে পারে।

চালগুলি বাছিয়া ধুইয়া একটি থালাতে বিছাইয়া দাও। এখন পোলাওয়ের চাল ভাজিতে হইবে। একটি কলাই করা তামার ডেকচি কিম্বা একটা কলাই করা বিলাতি সসপ্যান চড়াও, হাঁড়িতে এক ছটাক ঘি দাও। দারচিনি, লঙ্গ, পাঁচটা আস্ত ছোট এলাচ, আর বাকী আটটা ছোট এলাচ খোলাশুদ্ধ থেঁতো করিয়া, ঘিয়ে ছাড়িয়া দাগ দাও। মিনিট পাঁচ ধরিয়া মন্দা আঁচে ঘিয়ের দাগ দেওয়া হইলে চাল ছাড়; ঘন ঘন খুন্তি দিয়া চালগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া

দাও, তাহা না হইলে হাঁড়ির তলায় চাল লাগিয়া যাইবে। চাল প্রায় মিনিট পাঁচ ভাজা হইলে যখন দেখিবে চালগুলি কেবল ফট্‌ফট্‌ করিয়া ছিটকাইয়া চুণের ন্যায় শাদা হইয়া যাইতেছে, তখন নারিকেলের জলীয় দুধ ইহাতে ঢালিয়া হাঁড়ির মুখ ঢাকা দিবে।

ভাত প্রায় মিনিট দশ ফুটিলে খুন্তি করিয়া একবার তলা পর্য্যন্ত নাড়িয়া দাও এবং এক আনি ভর জাফরান ইহাতে ফেলিয়া দাও। আবার মিনিট দশ ফুটিবার পর, হাতা দিয়া নাড়িয়া হাতায় করিয়া দু একটা ভাত উঠাইবে এবং আঙ্গুলে টিপিয়া দেখিবে,—যখন বুঝিবে যে ভাতের কেবল মাজটা মাত্র আছে তখন খাঁটি নারিকেলের দুধ ঢালিয়া দিবে। দু একবার নাড়িয়া আবার হাঁড়ি ঢাকিয়া রাখিবে। এইবারে একেবারে নরম আঁচ করিয়া দমে বসাও। মিনিট দুই পরে, আনারস প্রভৃতির শুধু রসটা যাহাকে 'সিরা' বলে, ঢালিয়া দাও, আর পুরের বাকী বাদাম, আনারস, পেস্তা ও কিস্‌মিস্‌গুলি ছাড়, দোল্মাগুলিও ছাড়। মিনিট পনের প্রায় আস্তে আস্তে পাকিলে যখন দেখিবে, সব জল মরিয়া গিয়া ভাতগুলি ঘিয়ে ও রসে মাখা মাখা হইয়া রহিয়াছে, আর হাঁড়ির ভিতর হইতে চুড়বুড় শব্দ হইতেছে, তখন খুন্তি বা চামচ দিয়া ভাত মিশাইয়া দাও। এই পনের মিনিটের মধ্যে দু তিনবার ভাত নাড়িয়া দিতে হইবে; কিন্তু অতি সাবধানে নাড়িও, যেন দোল্মাগুলি ভাঙ্গিয়া না যায়।

এবারে গোলাপ জল লইয়া আইস। হাঁড়ির মুখে যে ঢাকনা রহিয়াছে, সেই ঢাকনাতে একখানি পরিষ্কার কাপড় বাঁধিয়া দাও। হাতে গোলাপ-জল লইয়া আগে ভাতের উপরে একটু ছিটা দাও, তারপরে অবশিষ্ট সব গোলাপজলটুকু এই কাপড়ের উপরে ছিটা মার। এইবারের ঢাকনা হাঁড়ির মুখে ভাল করিয়া ঢাকিয়া দাও, যেন ভাপ না বাহির হইতে পারে। মিনিট তিন পরে হাঁড়ি নামাইয়া ফেল।

এইবারে পোলাও সাজাইতে হইবে। ভাতের ভিতর হইতে দোল্মাগুলি বাছিয়া ফেল। প্রত্যেক দোল্মার সুতা খুলিয়া ফেল। একটি সুপ-প্লেট বা ডিশের ন্যায় 'গাঢ়া' বা গভীর বাসন অথবা একটী গভীর থালা আন। পাত্রের মধ্যস্থলে অর্দ্ধেক গুলি দোল্মা সাজাইয়া, তাহার উপরে অর্দ্ধেক গুলি

ভাত ঢাল; আবার অবশিষ্ট পটোলের দোল্মা, ভাতের উপরে সাজাইয়া, বাকী ভাতগুলি দোল্মার উপরে ঢালিয়া দাও। ইহার উপরে চাকা আনারসগুলি সাজাইয়া দাও। আনারসের উপরে আবার রূপার পাত বসাইয়া সাজাও। রূপার পাত হাতে করিয়া না সাজাইয়া, যে কাগজে রূপার পাত থাকে সেই কাগজ ধরিয়া উল্টাইয়া দিবে, তাহা হইলেই ঠিক রূপার পাত বসিয়া যাইবে। হাতে করিয়া রূপার পাত লাগাইতে গেলে, ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া যাইবে। এইবারে পোলাওয়ের মধ্যস্থানে কতকগুলি টাট্‌কা বড় গোলাপ পাতা লইয়া সাজাও, অথবা চারিদিকে গোলাপ পাতা বসাইয়াও সাজাইতে পার। ডিনার টেবিলে এই পোলাও পুডিংএর পরিবর্ত্তে দিলেও সুন্দর হয়।

সময়।—প্রায় ঘণ্টা দুই সময় লাগিবে।

পোলাওয়ের ব্যয়।—চিনিশর্করা চাল এক পোয়া পাঁচ পয়সা, একটি আনারস চার পয়সা (অবশ্য মাঘ্যির সময় আট আনা বার আনা পর্য্যন্ত দাম হয়), পটোল দেড় পোয়া ছয় পয়সা, নারিকেল ছয় পয়সা, ঘি চার পয়সা, মোরব্বা (আদা, কমলালেবু এবং কুমড়ার মেঠাই মিশাইয়া) এক পোয়া দু আনা, চিনি পাঁচ ছটাক পাঁচ পয়সা, কাগজিলেবু এক পয়সা, দারচিনি ও লঙ্গ এক পয়সা, ছোট এলাচ দুই পয়সা, জাফরান ছয় পয়সা, বাদাম তিন পয়সা, পেস্তা তিন পয়সা, কিসমিস দুই পয়সা, ভাল গোলাপ জল দুই আনা, রূপার পাত দুই আনা। সর্ব্বশুদ্ধ এক টাকার কিছু অধিক খরচ হইবে। এক পোয়া চালের এই রকম পোলাও রাঁধিতে হইলে হাতে পাঁচ [illegible] হইবে, [illegible] না লাগে।

শ্রী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।
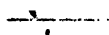
ডিমের আমলেট।

উপকরণ।—ডিম দুইটা, ছোট পেঁয়াজ তিন চারিটা, কাঁচা লঙ্কা দু তিনটি, গোলমরিচ গুঁড়া দু তিন চুটকি, নুন দুই চুটকি, জল এক কাচ্চা, ঘি দেড় কাচ্চা, ময়দা দুই চুটকি। *

প্রণালী।—পেঁয়াজ ও কাঁচা লঙ্কা মিহি করিয়া কুচি কুচি কর।

ডিম দুইটির মুখের কাছে ঠুকিয়া উপরের খানিকটা খোলা ছাড়াইয়া ফেল। দুইটি গাড় বা গভীর পাত্র আন। তারপরে একটি পাত্রে শফেদিটা† ঢাল আর একটি পাত্রে কুসুম ‡ ঢাল। শফেদিতে দুই চুটকি ময়দা দিয়া একটি কাঁটা করিয়া ক্রমাগত ফেটাও। দু একবার ইহাতে একটু জলের ছিটা মারিবে। খুব ফেটাও। যখন দেখিবে বেশ ফেনার মত হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, তখন আর ফেটাইবে না। প্রায় মিনিট পাঁচ ধরিয়া ফেটাইতে হইবে। ডিমের শাদাটা খুব ফেটালে আমলেট ফুলিয়া ওঠে। এখন ইহাতে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা কুচি, গোলমরিচ গুঁড়া এবং নুন মিশাও।

এবারে কুসুম ফেটাও; দুই মিনিট ফেটাইয়া ইহাতে ফেটান শফেদিটা ঢালিয়া মিশাইয়া ফেল। এই সময়ে এক কাচ্চা জলও মিশাইয়া লও। এই জলটুকু দিলে পেঁয়াজগুলি সিদ্ধ হইয়া নরম হইয়া যাইবে।

একটি তাওয়া বা তৈয়ে অথবা বিলাতী ফ্রাইংপ্যানে (ফ্রাইপ্যানে ভাল রকম ভাজিবার সুবিধা হয়।) দেড় কাচ্চা ঘি চড়াও, প্রায় মিনিট দেড় কি দুই ঘি পাকিলে তবে ডিমের গোলা সবটা একেবারে ঢালিয়া দিবে। ভাজিবার পাত্র হেলাইয়া গোলাটা চারিদিকে সমান করিয়া গড়াইয়া দাও। গোলা ঢালিবার এক মিনিট পরে যখন বেশ জমিয়া আসিতেছে দেখিবে, তখন খুন্তি

---

* বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী ও মধ্যমা এই তিন অঙ্গুলিতে যতটুকু ধরে তাহাকে এক চুটকি বলা গেল।

† ডিমের শাদাকে শফেদি বলে।

‡ ডিমের হলদেটাকে কুসুম বা জর্দি বলে।

বা ছুরি দিয়া চারিদিক ছাড়াইয়া দিবে, কারণ ইহা পাত্রের গায়ে লাগিয়া লাগিয়া যাইবে কি না। এইবারে এক দিক হইতে ইহা আস্তে আস্তে গুড়াইয়া মুড়িয়া লইয়া যাও। তারপরে আস্তে আস্তে সমস্তটা একবার উল্টাইয়া দিবে। বাদামী রং হইলেই বুঝিবে আমলেট হইয়া গিয়াছে; নামাইয়া ফেলিবে। আমলেট ভাজা হইতে প্রায় মিনিট তিন সময় লাগে। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় মিনিট দশের মধ্যে এই আমলেট প্রস্তুত হইয়া যাইবে।

লোকজন আসিলে এই রকম আমলেট করিয়া রুটী, মাখম, ইত্যাদির সহিত চা পান করান যাইতে পারে। ইহাতে খরচ অধিক লাগে না। অতি অল্প ব্যয়ে এবং অতি শীঘ্র প্রস্তুত করা যায়। আমলেট লুচির সঙ্গেও খাইতে বেশ লাগে।

একটী ডিমের দাম এক পয়সা কি জোর দু পয়সা। পেঁয়াজ, লঙ্কা প্রভৃতি গৃহস্থের ঘরে থাকেই, কেবল ডিম কিনিতে যাহা একটু খরচ লাগে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

মন্দর পর্ব্বত।

পৌরাণিক মন্দর,—সমুদ্রমন্থনের মন্থনদণ্ড; অমৃত ও কালকূটের, লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর, ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবার, কৌস্তুভ ও কল্পতরুর, চন্দ্র ও ধন্বন্তরীর উৎপাদক, মন্দর কোথায় কে জানে? পুরাণ খুঁজিলে ঠিক সন্ধান জানা যায় না, দু খানা পুরাণে এক কথা বলে না। কেহ বলে মন্দর ও সুমেরু এক, কেহ বলে তাহা না।

ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিহারদেশে মন্দার পর্ব্বত নামে একটী পর্ব্বত আছে। ইহা পৌরাণিক পর্ব্বত কি না, তাহা সঠিক বলিবার প্রমাণাদি এখন হাতে সংগৃহীত নাই, তবে যে দেশে ইহা অবস্থিত সে দেশের লোকের বিশ্বাস যে উহাই পৌরাণিক মন্দর। কেবল সেই দেশের লোকেরা কেন, এখন ভারতের অনেক দেশের লোকেরই বিশ্বাস ঐরূপ। এ যুগের লোকে ঐ

বিশ্বাস-বলে এই মন্দর পর্ব্বতকে এক তীর্থস্থান করিয়া তুলিয়াছে। প্রতি বৎসর এখানে পৌষ মাসে সংক্রান্তির দিন এক মেলা হইয়া থাকে। মেলার সময় এই স্থানের জঙ্গলাদি পরিষ্কার করান হইয়া থাকে। বহু যাত্রী সমাগম হয়। সম্ভ্রান্ত গৃহের কুলবধূরা রাত্রি থাকিতেই আসিয়া থাকে।

এই মন্দর বিহারের ভাগলপুর জেলার বাঁকা বিভাগে বাউসী নামক স্থানে অবস্থিত। বাউসী চন্দন নদীর পূর্ব্বতীরে, ভাগলপুর নগরের ৩১ $\frac{১}{২}$ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই বাউসী গ্রাম পূর্ব্বে বাঁকা বিভাগের প্রধান সহর ছিল। ইহার ২ $\frac{১}{২}$ মাইল উত্তরে ২৪·৫০ $\frac{১}{২}$ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৭·৬ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় মন্দর পর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বত প্রায় বৃক্ষলতাশূন্য, কেবল শিখরদেশে বিরল বন আছে। ইহা উচ্চে ৭০০ ফুট, তন্মধ্যে প্রায় ৫০০ ফুট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত উঠিবার সিঁড়ি আছে। ইহার কটিদেশে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বৃহৎকায় সর্পের দেহ খোদিত আছে। তীর্থযাত্রীরা বলিয়া থাকে, ইহাই মন্থন-দণ্ড-বন্ধন মন্থনরজ্জুরূপী বাসুকীর দেহচিহ্ন।

এই পর্ব্বতের, তীর্থরূপে প্রয়োজনীয়তা ছাড়িয়া দিলেও, প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী-দিগের নিকট ইহার যথেষ্ট আদর আছে। ইহার চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত স্বাভাবিক ও মানবনির্ম্মিত দৃশ্যাবলী ভগ্ন ও অভগ্ন অবস্থায় বর্ত্তমান আছে, তাহা হইতে অনেক প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধৃত হইয়া থাকে। এই পর্ব্বতের তলদেশে প্রায় এক ক্রোশ পরিমিত স্থানে অসংখ্য পুষ্করিণী, কতিপয় পুরাতন অট্টালিকা, কতকগুলি প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি এবং কয়েকটি বৃহৎ কূপ দেখিয়া বোধ হয় যে এক সময়ে এই স্থানে এক সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। নিকটস্থ লোকের মুখে শুনা যায় যে, বাস্তবিকই সেখানে এক বৃহৎ নগর ছিল, সে নগরে বাহান্নটি বাজার, তিপ্পান্নটি বড় রাস্তা এবং বিরাশীটি পুষ্করিণী ছিল। পর্ব্বতের তলদেশে একটি ভগ্ন অট্টালিকা দেখা যায়, উহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌকা গর্ত্ত আছে। অনুমান হয়, এই সকল গহ্বরে দীপ দান করা হইত। নিকটস্থ লোকেরা বলে, দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রিতে (দেওয়ালীর রাত্রিতে) উক্ত বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসীরা দীপ দান করিত। প্রত্যেক গৃহস্থ একটি গহ্বরে একটিমাত্র দীপ দিতে পারিত। অট্টালিকা গাত্রে লক্ষ দীপ গহ্বর ছিল এবং তাহা ঐ দিন প্রজ্জ্বলিত দীপে পূর্ণ হইয়া

যাইত। দূর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপশিখাবিশিষ্ট অট্টালিকাটি যেন তারকা খচিত বলিয়া বোধ হইত। এই দীপান্বিতা অট্টালিকা হইতে প্রায় ৮০ হাত দূরে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। সাধারণতঃ শুনা যায় রাজা চোল উহার নির্ম্মাতা। চোল-রাজ এখন হইতে বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং এই প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা অতি পুরাতন বলিতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার গাঁথনীর জন্য কোন রূপ তাগাড়* ব্যবহৃত হয় নাই। প্রাচীরগুলি গাঁথিতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড কেবল কৌশল সহকারে কাটিয়া খাঁজে খাঁজে জোড় মিলাইয়া নানাবিধ ভাবে কেবল সাজাইয়া গিয়াছে। আঠার ইঞ্চি পুরু ও পনর ইঞ্চি চওড়া পাথরের কড়ির উপর চওড়া পাথরের বড় বড় টালি ছাইয়া ছাদ প্রস্তুত করিয়াছে; বারাণ্ডার থামগুলি এক একখানি পাথরে নির্ম্মিত। অট্টালিকার মধ্যস্থলে একটি প্রশস্ত গৃহ, তাহার পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছয়টি ঘর। এই ঘর গুলিতে আলো ভাল প্রবেশ করিতে পায় না বলিয়া অনেকটা অন্ধকার। পাথরের নানা কৌশলে জালি কাটিয়া জানালা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা অতি অল্প আলোকই আসে।

দীপান্বিতা অট্টালিকা হইতে কিছু দূরে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত জয়তোরণ দেখা যায়। এই তোরণের উপর প্রাচীন দ্বিতীয় বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় একটি লিপি খোদিত আছে। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র উহার এইরূপ অর্থ করিয়া গিয়াছেন,—"The well disposed and auspicious CHHATRAPATI, son of the auspicious VASUDEVA, dedicated this pure and noble place of victory on earth for SHRI MADHUSUDAN in the Shaka year 1521, when the noble Brahmana DUHSHASANA was the officiating priest."—অর্থাৎ বাসুদেবের পুত্র ছত্রপতি এই পবিত্র ও মহিমাময় স্থানে শ্রীমধুসূদনের উদ্দেশে ১৫২১ শকাব্দে এই জয়তোরণ উৎসর্গ করেন। পবিত্রাত্মা ব্রাহ্মণ দুঃশাসন এই সময়ে

* তাগাড়—অট্টালিকাদি গাঁথিবার জন্য চূণ সুরকী ও জল পরিমাণ মত মিশাইয়া মশলা প্রস্তুত করে, মিস্ত্রীরা ইহাকে তাগাড় বলে। তাগাড়—mortar.

শ্রীমধুসূদনের পূজক ছিলেন। ১৫২১ শকাব্দে ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দ হয়, সুতরাং তখন দিল্লীর সিংহাসনে মোগলসম্রাট আকবর উপবিষ্ট ইহা জানা যাইতেছে। ইহা হইতে আরও জানা যাইতেছে যে এখন হইতে ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগর বর্ত্তমান ছিল। নিকটস্থ লোকেরা বলে মন্দর পর্ব্বতের উপর ঐ সময়ে মধুসূদনের সুবৃহৎ ও সুদর্শন মন্দির ছিল, উহা কালে কালাপাহাড় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। যে সময়ে ছত্রপতি জয়তোরণ নির্ম্মাণ করেন, সে সময়ে মধুসূদনের প্রাচীন মন্দির বর্ত্তমান ছিল। ছত্রপতি কোন্ যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া এই জয়তোরণ নির্ম্মাণ করেন, তাহা জানা যায় না, তবে অনুমান হয় যে, সে সময় নগরের সমৃদ্ধিলোভে মুসলমানগণ মধ্যে মধ্যে এই নগর আক্রমণ করিত এবং ছত্রপতি তাহাদিগকেই সম্পূর্ণরূপে এক যুদ্ধে দমন করিতে সক্ষম হইয়া এই তোরণ নির্ম্মাণ করান। এই তোরণে মধুসূদনের ঝুলন ও দোলযাত্রার সিংহাসন ঝুলান হইত। কালাপাহাড় কর্ত্তৃক বাস্তবিক মধুসূদনের প্রাচীন মন্দির বিধ্বস্ত হইয়াছিল কি না তাহার এতদ্দেশীয় প্রবাদ ভিন্ন অন্য কোন বিশ্বাস্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যাহা হউক, মধুসূদনের প্রাচীন মন্দির বিনষ্ট হইলে পর, মধুসূদনের বিগ্রহ বাউসী গ্রামের বর্ত্তমান মন্দিরে আনিয়া রাখা হইয়াছে। বাউসী গ্রামের নিকটবর্ত্তী সুবলপুর গ্রামের বর্ত্তমান জমাদারেরা উক্ত ছত্রপতির বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়া থাকেন। ইঁহারা এখনও সেই সেকালের প্রথা প্রচলিত রাখিয়াছেন। পৌষসংক্রান্তির দিন মেলার সময় এখনও পাণ্ডারা বাউসীর মন্দির হইতে বিগ্রহ লইয়া এই ছত্রপতি-তোরণে উপস্থিত হন ও দোল-সিংহাসন ঝুলাইয়া তাহাতে বিগ্রহ স্থাপন করেন। কবে কাহাকর্ত্তৃক বাউসীর মন্দির নির্ম্মিত ও তন্মধ্যে বিগ্রহ স্থাপিত হয়, তাহা জানা যায় না। বিগ্রহ স্থানান্তরিত হওয়া অবধি মন্দর পর্ব্বতের পবিত্রতা যেন পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু মেলার সময় এখনও ত্রিশ চল্লিশ হাজার যাত্রীসমাগম হয়। মেলা পনর দিন থাকে, দেশের নানাস্থান হইতে ঐ দিন পর্ব্বত তলস্থ একটি বৃহৎ পুষ্করিণীতে স্নান করিতে আসিয়া থাকে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফি।

গঙ্গাবক্ষে।

—o—

(হেমন্তে)

১

বসিয়া আছি নৌকায়
ওপারে গঙ্গাতীরে জ্বলে চিতা ঘোর,
ওপারে গ্রামের মাঝে ডাকে শিবাদল ;—
চেয়ে দেখি তারকায়
ঔদাস্য বহিয়া যায় মনোমাঝে মোর—
বিস্তৃত পড়িয়া আছে জাহ্নবীর জল।

২

প'ড়েছে হেমন্ত মাস
কি এক কুয়াসাময় হ'য়েছে আকাশ,
এপারে বালির চর ওপারে কাছাড়
ভাঙা, উচ্চ চারিপাশ,
দূরে তরণীতে দীপ পাইছে প্রকাশ,
কাছে দু একটী তরী ব'য়ে যায় দাঁড়।

৩

গেল চ'লে কত দূর
মাঝি ছেড়ে দিল তান, আসে মৃদুস্বর
তাহাই মাধুরী হ'য়ে ছাইল হৃদয়
জোয়ারেতে ভরপূর
কল কল ঊর্ম্মিরাশি খেলিছে মধুর,—
পূরবে পূর্ণিমাচাঁদ হ'য়েছে উদয়।

৪

আকাশে কি এক বাণী
শুনি শান্ত অনাহত গভীর কেমন,
অতীতের শূন্যপানে ছুটে চায় মন,
সুপ্ত চৌদিকের প্রাণী;
গ্রামগুলি অন্ধকার গাছে গাছে বন
জোছনায় হইয়াছে স্বপন-কানন।

৫

গভীর গঙ্গার জল
বাতাস বহিয়া যায় এপারে ওপারে,
প্রাণ তার হিমময় ও গ্রাম্য কেমন,
নিদ্রিত বিহগদল
ঝাঁকে ঝাঁকে করে খেলা সৈকতের ধারে,
প্রকাণ্ড পড়ে'ছে চরা কি শুভ্র নির্জন।

৬

দেখে দেখে সাধ যায়
আরো দেখি চারি ধারে নউকায় ব'সে,
জোয়ারে ভেটেলে থেকে তরী যায় ভেসে,
কে কোথায়! কে কোথায়!
এ শূন্যে—উল্কারাশি কোথা প'ড়ে খ'সে,
কোথা কোথা এই শুধু পরিণাম শেষে,
হারা হ'য়ে যায় প্রাণ এ অনন্ত-দেশে।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাংখ্য স্বরলিপির চুম্বক।

সংজ্ঞা।
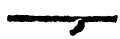
সাংখ্যস্বরলিপিতে সা রে গা মা পা ধা নি প্রায় সকল সময়েই অপরিবর্ত্তিত আকারে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার সপ্তক ও মাত্রা-পরিমাণ প্রভৃতি প্রধানতঃ সংখ্যা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। এই কারণে 'এই' স্বরলিপি সাংখ্যস্বরলিপি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

প্রথম বা মধ্য সপ্তকের চিহ্ন।

মধ্য বা প্রথম সপ্তকের বেলায় সুরের মাথায় বা নিম্নে ১ চিহ্ন। এই ১ চিহ্ন দিলেও চলে বা না দিলেও চলে। না দিলেও ১ চিহ্ন উহ্য থাকে।

তার বা দ্বিতীয় উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন।

দ্বিতীয় উচ্চ সপ্তকের চিহ্নঃ সপ্তকের সুরের মাথায় ২ চিহ্ন। যথা—

২	২	২	২	২	২	২
সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি।

মন্দ্র বা দ্বিতীয় নিম্ন সপ্তকের চিহ্ন।

দ্বিতীয় নিম্ন সপ্তকের চিহ্নঃ—সুরের তলায় ২ সংখ্যা চিহ্ন। যথা

সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি।
২	২	২	২	২	২	২

এইরূপে উচ্চ ও নিম্নবিভাগের তৃতীয়, চতুর্থ সপ্তক প্রভৃতির চিহ্ন বুঝিতে হইবে।

---

* এই সাংখ্যস্বরলিপি তত্ত্ববোধিনী, সাহিত্য, সমীরণ প্রভৃতি মাসিক পত্রে বিস্তৃত আকারে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। এখানে তাহার চুম্বক দেওয়া হইল।

এক সপ্তকের কতকগুলি স্বর পরে পরে থাকিলে তাহাদের একটী স্বরে সেই সপ্তকের সংখ্যা চিহ্ন দিয়া অন্য স্বরগুলিতে ফুট্‌কির বা ছোট কসির জের টানিয়া যাইতে হইবে। যথা

২...				
সা	গা	মা	রে	।
দে	ব	দে	ব	।

কড়ি ও কোমলের চিহ্ন।

কোমলের চিহ্নঃ—প্রধানতঃ, স্বরের মাথায় বা বামপার্শ্বে চন্দ্রবিন্দু। যথা গাঁ বা ঁগা। কড়ির চিহ্নঃ—উল্টা চন্দ্রবিন্দু। ইহাকেও কোমল চিহ্নের ন্যায় বসাইতে হইবে। যথা মা বা মাঁ।

মাত্রার চিহ্ন।

মাত্রার চিহ্নঃ—স্বরের পার্শ্বে সংখ্যাচিহ্ন। স্বরের যেরূপ মাত্রা হইবে সেইরূপ সংখ্যাচিহ্নও হইবে। যথা এক মাত্রিক সা=১ সা। এক মাত্রিক সা লিখিতে ১ চিহ্ন দিলেও চলে বা না দিলেও চলে। না দিলেও ১ চিহ্ন উহ্য থাকে। যথা সা=১ সা দ্বিমাত্রিক সা=২সা। অর্দ্ধমাত্রিক সা= ১/২ সা; সিকিমাত্রিক সা= ১/৪ সা। এইরূপ অন্যান্য মাত্রিক স্বরের বেলায়ও বুঝিতে হইবে।

খণ্ডমাত্রা বা হসন্তমাত্রা।

যে কোন স্বর প্রাধান্যহীন হইয়া নিমেষের মধ্যে অপর স্বরের সহিত যুক্ত হয়, অর্থাৎ যে স্বরকে অতিদ্রুত স্পর্শ করিয়া স্বরান্তরে যাইতে হয়, তাহার মাত্রাকাল খণ্ডমাত্রা বা হসন্তমাত্রা নামে অভিহিত হইল। বঙ্গভাষায় যেমন অস্ফুট উচ্চারণ হসন্ত তকে খণ্ড ত বলা যায়, সেই নিয়ম অনুসরণ করিয়া আমরাও হসন্ত মাত্রাকে খণ্ডমাত্রা বলিলাম। এই খণ্ডমাত্রিক স্বরকে মুখ্যস্বরের পার্শ্বে হসন্তচিহ্নযুক্ত ও স্বরবর্ণলুপ্ত করিয়া লিখিতে হইবে। যথা, প্‌ধা; ম্‌প্‌ধা; গ্‌ম্‌প্‌ধা। এখানে ধা স্বরেরই প্রাধান্য, ধা স্বরই মুখ্যভাবে বিদ্যমান; অন্য স্বরগুলি ছুঁইয়াই চলিয়া যাইতে হয়। ইচ্ছা করিলে খণ্ডমাত্রিক স্বরকে হসন্তচিহ্নযুক্ত করিয়া ক্ষুদ্র অক্ষরেও লিখিতে পারা যায়। যথা গ্‌ম্‌প্‌ধা। মুখ্যস্বরের পার্শ্বে হসন্তমাত্রিক স্বর থাকিলে

যেখানে সেই দুটী স্বরবর্ণ যুক্ত করিয়া লিখিবার সুবিধা হইবে, তাহা লিখিলেও চলিবে। যথা গ্‌মা না লিখিয়া যুক্তাক্ষরে গ্মা লিখিতেও পারা যাইবে। হসন্তবর্ণের স্বরবর্ণ থাকে না বলিয়া আমরা হসন্তমাত্রিক সুরেরও স্বরবর্ণ লোপ করিয়া দিলাম।

আমাদের সিকিমাত্রিক স্বর অনেকটা হসন্তমাত্রিক স্বরের মত শোনায় বলিয়া আমরা ভিন্নরূপে লিখিতে গেলে $\frac{১}{৪}$ (সিকিমাত্রার চিহ্ন) পদকেও হসন্তচিহ্নও দিতে পারি এবং হসন্তমাত্রিক স্বর অপেক্ষা তাহার কিঞ্চিৎ প্রাধান্য থাকাতে হসন্তমাত্রিক স্বর হইতে সিকিমাত্রিক স্বরের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য সিকিমাত্রিক স্বরের স্বরবর্ণ রক্ষা করিব। যথা $\frac{১}{৪}$ পা = প্‌া। এই পা সুরটী যদি হসন্তমাত্রিক স্বর হইত তাহা হইলে প্‌ এইরূপ লিখিতাম।

বিরাম চিহ্ন।

বিরাম চিহ্ন = স্বরহীন মাত্রাচিহ্ন। অর্থাৎ সুরটি না লিখিয়া থামাইয়া কেবল তাহার মাত্রা চিহ্নটা লিখিতে হইবে। যথা; সা রে গা মা। এখানে যদি গা সুর না বাজাইতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে শুধু গাসুরের মাত্রা (অর্থাৎ যে ১ মাত্রা) তাহাই লিখিতে হইবে; সুর লিখিতে হইবে না। যথা—সা রে ১ মা।

সুরের পর সুর পর-পর গাহিতে বা বাজাইতে গেলেই তাহাদের ব্যবধান, অথবা কমা চিহ্ন রাখিতে হইবে। সাধারণতঃ ব্যবধান রাখিলেই চলিবে।

একটী সুরকে এক টানে যত মাত্রা গাহিতে হইবে, সেই সুরটী তত্মাত্রিক অর্থাৎ তত মাত্রা গুণিত করিয়া লিখিতে হইবে। যথা সা সুর এক টানে দুই মাত্রা কাল গাহিতে হইলে তাহাকে ২সা লিখিতে হইবে, এই ২ সা প্রকৃত এক সুরের দুই বার যোগ সেই কারণে আমরা ইহাকে সা+সা এরূপ ভাবেও লিখিতে পারি।

দ্রুতকম্পন বা গিট্‌কিরির চিহ্ন = সুরের উপরে বা নিম্নে ~ ফলা চিহ্ন। যত দূর এই গিট্‌কিরি যাইবে ততদূর পর্য্যন্ত ~ চিহ্ন না দিয়া উক্ত চিহ্নের পরে ফুটকি দিয়া গেলেই চলিবে।

আস্থাইর সংক্ষেপ = স্থা। অন্তরার সংক্ষেপ = স্ত। আভোগের সংক্ষেপ = ভো। সঞ্চায়ীর সংক্ষেপ = ঞ্চ।

তালিবিভাগ সঙ্কেত।

দুই তালির মধ্যস্থিত এক একটী ভাগকে এক একটী তালিবিভাগ বলে। প্রত্যেক তালিবিভাগ কতকগুলি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে, যেমন কাওয়ালি তালের প্রত্যেক তালিবিভাগ চারিটী করিয়া মাত্রা অধিকার করে। গানে যে যে মাত্রায় তালি পড়িবে, সেই সেই মাত্রার পূর্ব্বে এক একটী করিয়া দাঁড়ি দিতে হইবে।

তালি ও মাত্রাবিভাগ সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য তালিবিভাগের নিম্নে মাত্রা বিভাগ লিখিতে হইবে; প্রথম তালির নিম্নে প্রথম তালির মাত্রা সংখ্যা, দ্বিতীয় তালির নিম্নে দ্বিতীয় তালির মাত্রা সংখ্যা এইরূপ ক্রমান্বয়ে লিখিতে হইবে; যথা কাওয়ালি তালের সঙ্কেত ঃ—

তালি ।১।২।৩।০॥
মাত্রা ।৪।৪।৪।৪॥

তালিবিভাগ সঙ্কেত স্বরলিপির পূর্ব্বেই দেওয়া হইবে।

তালিবিভাগ-সঙ্কেতের মধ্যে আস্থাই অন্তরা প্রভৃতির আরম্ভ সঙ্কেত লিখিতে গেলে, আস্থাই অন্তরা প্রভৃতি যে তালি কিম্বা তদন্তর্গত যে মাত্রাতে আরম্ভ হইবে, সেই তালি বা তদন্তর্গত মাত্রার ডান পার্শ্বে আস্থায়ী, অন্তরা প্রভৃতি কথা অথবা তাহাদের সংক্ষেপ, বন্ধনীদ্বারা বেষ্টিত করিয়া লিখিতে হইবে। এবং ইচ্ছা করিলে তাহাদের সহিত 'আরম্ভ' কথাটীও যোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যথা,

তালি। ১ (স্থা, স্ত, ভো)। ২।৩।
মাত্রা। ৪ ।৪।৪।

বা

তালি। ১ (স্থা, স্ত, ভো আরম্ভ) ।২।৩।
মাত্রা। ৪ ।৪।৪।

এখানে বুঝিতে হইবে যে আস্থায়ী, অন্তরা এবং আভোগ প্রথম তালিতে আরম্ভ হইবে।

সমের চিহ্ন = ঃ। সমে গানটী রীতিমত বিসর্জ্জন করা হয় বলিয়া বিসর্গ চিহ্ন সম বুঝাইবার বিশেষ উপযোগী চিহ্ন।

পুনরাবৃত্তি চিহ্ন।

পুনরাবৃত্তি চিহ্ন = I I ; গানে যে অংশটুকু পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে, সেই অংশের দুই পার্শ্বে যুগল 'আই' চিহ্ন (II) বসিবে।

আশের চিহ্ন = সমতলভাবে স্থাপিত আকারকসি। ইহা স্বর সকলের মধ্যে মধ্যে বসিবে। কিন্তু গানের বেলায় গানের সঙ্গে সঙ্গে কথা থাকিলে কথার অক্ষর ও তাহার মাত্রাসমূহ দ্বারাই বস্তুতঃ আশের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং সেস্থলে স্বরের মধ্যে মধ্যে আশের চিহ্ন না দিলেও চলে।

গীতের সমাপ্তিতে যুগলদাঁড়ি বসিবে।

রাজা রামমোহন রায়ের গান।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,
তোমার রচনামধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।

তালি। ২ ঃ। ৩। ০ । ১ ॥

মাত্রা ৮ ৪ । ৪। ৩, ১ (স্থা, স্ত আরম্ভ) । ৪ ॥

টিপ্পনী :— এখানে অর্থ এই যে ফাঁকের শেষ মাত্রায় আস্থায়ী এবং অন্তরা আরম্ভ হইবে :

স্থা :· —II মা। মা মা১ গা২ গ্পা মা। ম্নি ধ্নি পা ২।
স্থা :· —II কি। স্ব দে — শে। কি — বি।

মা ম্গা১ রে। রমা গাঁ২ মা। মা পা২ পা।
· —— দে। শে — য। থা য় ত।

। প্‌নিঁ ধ্‌নিঁ পা মা। ম্‌গাঁ২ গঁ্‌মা
। থা — য় —। — থা

রে। সা৩ সা১/২ নিঁ১/২ । সা স্‌রে৩/২ সা১/২
—। কি তো — । মা র —

স্‌নিঁ১/২ । নঁরে২ সা৩। সা নিঁ২
র । চ না। — —

ন্‌রে২ সা১/২ ধা১/২ । ধ্‌নিঁ পা২ মা। পা প্‌সা নিঁ২
ম ধ্যে — । — — তো। মা রে —

সা। রে রে র্‌গাঁ৩/৪ সা১/৪ রে। র্‌পা মা১/২ গাঁ১/২ গঁ্‌মা
দে। থি য়ে — — —। — — — ডা

রে১/২ সা১/২ । স্‌রে৩/৪ "নিঁ১/৪" বা "নি১/৪" সা II
— — । কি — — II

(স্থ): —মা। মা ম্‌নিঁ৩/৪ ধা১/৪ ধ্‌সা সা। সা৩ নি।
(স্থ): —দে। শ ভে — — দে। কা —।

সা সা সা৩/২ নি১/২। সা৩ সা১/২ নি১/২। সা স্‌রে২
-ন্‌ ভে দে —। — র —। চ না

সা। স্‌নিঁ১/২ সা১/২ রে সা নিঁ। ধা পা১/২ ধা১/২
অ। সী — — মা —। — — —

নিঁ সা২। নিঁ ধা ধা ধ্‌নিঁ। ধ্‌নিঁ গা মা ম্না।
— —। — — — প্র। তি ক্ষ — ণে।

ম্‌নিঁ পা২ মা। + মা ম্‌গাঁ গঁ্‌মা গাঁ। গাঁ৩ গাঁ।
সা ক্ষ্য —। — — দে —। — তো।

গাঁ গঁ্পা মা ম্নিঁ। পা২ মা৩/২ গাঁ১/২। গঁ্মা
মা র — ম। হি — —। —

রে৫/২ সা১/২। সা৩ "স্নি" বা "স্নিঁ"। "নি
— —। মা তো তো। মা

নি নি নি"। অথবা। "নিঁ নিঁ নিঁ নিঁ"। "নি
র — প্র। অথবা। মা র — প্র। ভা

নি" বা "নিঁ নিঁ" সা২। ন্সা১/২ নি১/২ সা
— বা ভা — —। — — ব

স্রে৩/২ সা১/২। সা৩ সা১/২ নি১/২। সা স্রে৩/২
দে —। থি না —। থা কে

নিঁ১/২ ন্রেঁ। সা২ নিঁ ধা। ধ্পা১/২ ধা১/২
— এ। কা — —। কি —

পা১/২ ধা১/২ নিঁ সা। নিঁ ধা ধা (স্থা পু) ধ্নিঁ।
— — — —। — — (স্থা পু) কি।

ধ্নিঁ১/২ ধা১/২ নিঁ১/২ পা১/২ মা মা"।
স্ব — — — দে শে"।

অথবা। "নিঁ ধা (স্থা পু) ধ্নিঁ নিঁ১/২ ধা১/২।
অথবা। — — (স্থা পু) কি স্ব —।

নিঁ পা মা মা"। ধ্নিঁঃ ॥
— — দে শে"। কি ॥

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুণ্য।

শান্তি।

কেন আছি লয়ে এই ঈর্ষায় হিংসায়—
বিশ্ব চরাচরে একি মোর ব্যবসায়!
বসে বসে জীবনের দীনহীন কক্ষে
কি সুখ আঘাত করি' অপরের বক্ষে?
হইয়াছে ইচ্ছা যার আঘাত সে দি'ক্,
অনুসরি নাহি যেন আমিগো সে দিক;
সুগন্ধ পুষ্পের মত, অহিংসা সুরভি
জগতে বিস্তারি' যেন প্রাণে শান্তি লভি;
এখন বুঝেছি বেশ কি পদার্থ শান্তি,
কি সহজে জাগে এতে জীবনের কান্তি;
মিত্রতা করুণা-সাধ্য যে শান্তির প্রাণ,
তাহায় করিয়া হেলা কোথা পরিত্রাণ;
কলহ বিবাদ করি' কেন মাতি রণে
ভুলে গিয়ে সুধাময় সে শান্তি শরণে।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রমণীর ব্রহ্মচর্য্য ও পতিসেবা।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধ-নির্দ্দিষ্ট মাতৃত্বের অঙ্গে যাহাতে লেশমাত্র কলঙ্ক, স্পর্শ না করে তজ্জন্য মনুপ্রমুখ ঋষিরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন; পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্বেরই অপর নাম সতীত্ব। ঋষিদিগের কৃপাতেই [illegible]াসীরা সতীত্বের

এতদূর মর্য্যাদা বুঝিয়াছে। এই সতীত্ব রক্ষার জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনু স্ত্রী-জাতিকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে বিশেষরূপে অনুশাসন করিয়াছেন। স্ত্রী-জাতির সতীত্বরক্ষার জন্য এই একটী ব্যবস্থা ছাড়া ঋষিরা আরও [illegible]কগুলি ব্যবস্থা [illegible]য়াছেন। পাছে মাতা, ভগিনী [illegible] কন্যা প্রভৃতির মনেতেও তাহাদের মাতৃত্ব বিন্দুমাত্র কলঙ্কস্পৃষ্ট হয়, অথবা পুরুষের অন্তরে বিন্দুমাত্রও কামভাব জাগরূক হইয়া তাঁহাদের মাতৃত্ববিষয়ে এতটুকুও অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়ে, এই কারণে ঋষিরা উপদেশ দিয়াছেন যে, পরস্ত্রী ত দূরের কথা, মাতা, ভগিনী ও কন্যার সহিত পর্য্যন্ত নির্জ্জনে একত্র অবস্থিতি করিবে না * কারণ ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও বিপথগামী করে। তাঁহাদের ভাব এই যে, ইন্দ্রিয়দমন বড় সহজ কার্য্য নহে, তখন ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনামাত্র রাখিয়া কাজ কি? ঋষিদিগের এই কথাতে অনেকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারেন; ঋষিরা মানবপ্রকৃতি ভালরূপে বুঝিয়াছেন কি না, অনেকের সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যদি তুরস্কের পূর্ব্বতন কোন প্রধান প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা আলি পাশার অথবা রোমের পূর্ব্বতন পোপবংশ বর্জ্জিয়াদিগের জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারা এই কথার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। ঋষিরা একদিকে যেমন মানবপ্রকৃতির দেবত্ব দেখিয়াছিলেন, তেমনি তাহার পশুত্বও দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের এই লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন যে, যাহাতে দেবপ্রকৃতি মানবেরা পশুপ্রকৃতি লাভ না করে এবং পশুপ্রকৃতি মানবেরা যাহাতে দেবপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নিদান ব্রহ্মচর্য্যের পথে এতটুকুও বিঘ্ন উপস্থিত না হয়। এই কারণেই [illegible] সম্বোধনে আহ্বান করিতে আদিষ্ট হইয়াও, [illegible] তৈলাভ্যঙ্গ প্র[illegible]দরে থাক্ [illegible] রূপে নিষেধ করিয়াছেন। ঋষিদিগের মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে এত গভীর

---

* মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ মনু ২অ, ২১৫।

জ্ঞান দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইতেছি এবং তাঁহাদিগকে শতবার নমস্কার করিতেছি। বুড়া Pessimist ঋষিরা এ কথা বলিয়াছেন, সুতরাং তোমরা বলিবে—ও কথা অগ্রাহ্য অর্থাৎ যুবতী গুরুপত্নীর পাদস্পর্শ পূর্ব্বক অভিবাদন করিলে কোনই হানি নাই; অনেকে এ কথাও কানাকানি করিতে ছাড়িবেন না যে বুড়া ঋষিদিগের মন দুর্ব্বল ছিল, তাই তাঁহারা আত্মবৎ জগৎ দৃষ্টি করিয়া বিধি নিষেধ করিয়াছেন। যাঁহারা এরূপ বলিতে সাহস করেন, তাঁহাদের সম্মুখে ঋষিদিগের কথার সমর্থকরূপে পাশ্চাত্য কোন ব্যক্তির উক্তি Hall mark ধারণ করিলে তাঁহারা লুকাইবার জন্য গহ্বর অন্বেষণ করিবেন। মানবচরিত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ সুবিখ্যাত Max O'rellএর সমর্থনে ঋষিদিগের কথা যখন সত্য বলিয়া বুঝিতেছি তখন বোধ হয় এই সকল জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি আর অধিক তর্ক করিতে সাহস করিবেন না। Max O'rell বেশ একটু রসিকতার সহিত বলিতেছেন—"The co-respondent is not unfrequently a young groom, as one may see by the newspapers. This sample of co-respondent begins at the spur. it is not very far to the garter; the path is very attractive, *que voulez vous?* * আরও, স্ত্রীলোক মাত্রের, এমন কি মাতারও সহিত যুবাপুরুষের সর্ব্বদা আদর আবদার চলিতে থাকিলে যে যুবকদিগের নির্বীর্য্য হইয়া পড়িবার বিশেষ আশঙ্কা আছে, তাহা আমরা স্বাধীনচেতা ও স্বদেশভক্ত Max O'rell-এর স্বজাতি সম্বন্ধীয় উক্তিতেই প্রমাণ পাইতেছি। তিনি বলেন,—"In France, our mother is the recipient of our tenderest caresses." কিন্তু এই কারণে ফরাশি জাতি যে কিছু নির্বীর্য্য তাহাও তিনি স্বীকার করেন,—"he is also more effeminate." * আমরা স্বীকার করিতেছি যে, স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধে মনু প্রভৃতির উপদেশ অনুসরণ করিলে ভারতের ত্রিসীমানায় পাশ্চাত্য স্ত্রীপুরুষের উন্মাদনৃত্য প্রবেশ করিতে পারিবে না; আর বিদ্যালয়ে পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকেও একত্র অধ্যয়ন অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না, কিন্তু ইহাও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, ভারতের কি বীর্য্য, কি ধর্ম্ম, কোন বিষয়েই উন্নতির আর সীমা থাকিবে না।

* * John Bull and his island

এই নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্ব বা সতীত্বের মধ্যবিন্দু যে পতিসেবা, তাহা এই ভারতভূমিতেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এইখানেই তাহা সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষিত হইয়া সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাই মনুপ্রমুখ ঋষিরা বলিয়াছেন যে, সাধ্বী স্ত্রীলোকের পতি যে প্রকারই হউক না কেন, তিনি দেববৎ সেবনীয় এবং স্ত্রীলোকের পতিসেবার অধিক কোন যজ্ঞাদিও নাই। * স্বামী যে প্রকারই হউক না কেন, তাঁহাকে স্ত্রীর দেববৎ সেবা করা কর্ত্তব্য, মনুর এই উক্তি শুনিয়া হয়তো অনেকেই মনুসংহিতাকে কর্ম্মনাশার গভীর স্রোতে চিরজন্মের মত বিদায় দিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কিন্তু এই বিষয় একটু ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। মনু একদিকে স্ত্রীলোকের উপর কঠোর অনুশাসন করিলেন বটে যে অতি নিন্দিত স্বামী তাঁহার স্ত্রীর পক্ষে দেবতাস্বরূপ, কিন্তু অন্যদিকে অনুশাসন করিলেন যে কন্যা ঋতুমতী হইয়াও যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে, তাহাও ভাল কিন্তু কদাপি বিদ্যাদিগুণরহিত পুরুষকে কন্যাদান করিবে না। † মনু এইরূপে সকল দিকে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে হিন্দুজাতির আবাসভূমিকে গভীর শান্তির আস্পদ হইবার যোগ্য করিয়াছেন।

মনুপ্রমুখ ঋষিরা এই পতিসেবারূপ মধ্যবিন্দুর উপর দাঁড়াইয়া যেমন পতি বর্ত্তমানে স্ত্রীজাতিকে পতিসেবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ম্মে মনোযোগী হইতে আদেশ করিয়াছেন; সেইরূপ পতি প্রবাসে যাইলে স্ত্রীজাতিকে অধিকতর সংযত হইয়া থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। স্বামী বিদেশে যাইলে, ক্রীড়া, শরীরসংস্কার (অর্থাৎ শরীর সজ্জাবিষয়ে অধিকতর মনোযোগ প্রদান), সভাদর্শন, উৎসবদর্শন, হাস্যপরিহাস, এবং পরগৃহে গমন, এই সকল স্ত্রীর

---

* বিশীলঃ কামবৃত্তো বা গুণৈর্বা পরিবর্জ্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥ মনু

† কামমামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ মনু

পক্ষে নিষিদ্ধ। * এই সকল শ্রবণ করিয়া অনেক নব্য বঙ্গবধূদিগের ওষ্ঠ-প্রান্তে উপহাসের ঈষদ্ধাস্য আসিবে, তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। তাঁহাদিগের মতে স্বামীর বিদেশগমনই ঐ সকল কার্য্য করিবার একমাত্র অবসর, কারণ স্বামী নিকটে থাকিলে গৃহকর্ম্মেই অনেকটা সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। কিন্তু আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির কথা, আমারই বা বলি কেন, সকলেই একবার অনুধাবন পূর্ব্বক দেখুন না যে স্বামীর প্রবাসকালে ঐরূপ শাস্ত্রমতে না চলিলে স্ত্রীদিগের অন্ততঃ মানসিক সতীত্বে, মাতৃত্বের নিষ্কলঙ্ক মূর্ত্তিতে, সতীত্বের প্রাণে এতটুকুও কলঙ্কের ছায়া পড়ে কি না। স্বামী বিদেশে গমন করিলে সাধ্বী স্ত্রীর যেরূপ মনের ভাব হইতে পারে এবং তদনুসারে তাঁহার যে সকল কার্য্য করা সম্ভব, শাস্ত্রকারেরা তাহাই পর্য্যালোচনা করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাঁহাদের হয়তো ইহাও এক উদ্দেশ্য ছিল যে, সাধ্বী স্ত্রীর বহিরঙ্গও সাধন করিতে থাকিলেও সকল স্ত্রীলোকেরই অন্ততঃ কতকটাও মানসিক সুপরিবর্ত্তন ঘটিবেই।

স্বামীর প্রবাসকালে সতীর যে সকল কর্ত্তব্য, ঋষিরা তাহার যেমন ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ বিধবা হইলেও যে তাঁহাদের আমরণ ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান কর্ত্তব্য তাহাও বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সঙ্গে স্ত্রীলোকের সতীত্ব যাহাতে নির্ব্বিরোধে রক্ষিত হয়, তাহার জন্য ঋষিরা স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্যও নিষেধ করিয়াছেন। পাছে স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ সূক্ষ্ম দুষ্প্রসঙ্গের দ্বারা কলুষিত হয়, এই কারণে ঋষিরা বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের বাল্যাবস্থায় পিতা রক্ষক, যৌবনকালে স্বামী রক্ষক এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা রক্ষক; স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নহে। † বর্ত্তমানকালের নব্য স্ত্রীলোকদিগের এই কথা একটুও ভাল লাগিবে না, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নহে। স্বাতন্ত্র্য

---

* ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনং।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ১অ, ৮৪

† পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥ মনু, ৯অ,

দিয়া তাহাদিগকে নির্ভরশূন্য করিয়া সংসারের কঠোর সংগ্রামক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলে কি আর তাহাদিগের সেই কোমলতা, সেই শীলতা রক্ষা পাইতে পারে? তখন তাহারাও যেমন পুরুষদিগকে কর্ম্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ মনুষ্য চক্ষে দেখিবে, তেমনি পুরুষেরাও তাহাদিগকে কেবলমাত্র মনুষ্য চক্ষেই দেখিবে সুতরাং প্রকৃত সম্মান দিতে সঙ্কুচিত হইবে। যদি যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন একটী দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হয়, তাহা হইলে ইহা কি অনেকটা নিশ্চয় নহে যে, এই জীবন-সংগ্রামে পড়িয়া হয় স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণ এবং সুতরাং ক্রমশ তাহাদের শারীরিক গঠনও পুরুষোচিত চোয়াড়ে হইয়া উঠিবে অথবা তাঁহাদের ক্রমশ ধ্বংসসাধন হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি যে আমাদিগের মধ্যে এমন কেহ কি আছেন যিনি এই দুইটীর মধ্যে একটীও প্রার্থনা করেন? আশা করি না। যেমন আমরা ভিড়ের মধ্যে গিয়া যদি দেখি যে তথায় দৈবাৎ এক স্ত্রীলোক রহিয়াছে, তাহা হইলে আমরা কত সতর্ক হই যাহাতে তাহার শরীরে ও শ্রীলতায় এতটুকু আঘাত না লাগে এবং তাহাকে তথা হইতে উদ্ধার করিবার কত না বিশেষ চেষ্টা পাই। কিন্তু যদি দেখা যায় যে কোন স্বাধীনতাপ্রিয় স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিয়া সেই ভিড়ের মধ্যে যাইতেছে, তাহা হইলে তাহার শরীরে ও শ্রীলতায় আঘাত করিতে অতি অল্প পুরুষেই কুণ্ঠিত হইবে। এইরূপে ক্রমে তাহাদের মাতৃত্বে অথবা সতীত্বে আঘাত পড়িবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। ঋষিরা যে নারীজাতির জন্য এত অবরোধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে রমণীর সতীত্বের পথ যেমন অতি সুফলপ্রসূ; কিন্তু এই প্রলোভন প্রভৃতির কণ্টকময় সংসারে সেই পথ বড়ই দুর্গম। তাই তাঁহারা সাধ্যমত রমণীদিগকে কণ্টকবিহীন পথে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ নিষ্কণ্টক পথে চালাইয়াও তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে ইহাতেও যদি পথের দুএকটী কণ্টক তাঁহাদিগের গাত্রে বিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাঁহাদের চরিত্রই একমাত্র তাহার রক্ষক; * এ অবস্থায় আপনাকেই আপনার রক্ষা করিতে হইবে। যে সকল কঠিন কণ্টক সংসারের পথে সতীত্বে বড়ই আঘাত প্রদান করে, মনু তাহার

---

* অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥ ৯অ, ১২

উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহা ছয় প্রকার,—(১) পানদোষ, (২) দুর্জ্জন সংসর্গ, (৩) পতিবিরহ, (৪) অটন অর্থাৎ shopping ইত্যাদি বৃথা কারণে নানা স্থানে ভ্রমণ, (৫) অকাল নিদ্রা এবং (৬) পরগৃহে বাস।

ঋষিদিগের আদেশ ও অনুশাসন মানিয়া চলিলে যে গৃহ কি শান্তিময় ও সুধার আকর হইয়া উঠে, তাহা মহারাণী বিক্টোরিয়ার জীবনী আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। মানবের মানবত্ব প্রায় সর্ব্বত্রই সমানরূপে বিকশিত হইতে দেখা যায়। স্থানভেদে ও অবস্থাভেদে কিছু বিভিন্ন হইতে পারে। আমাদের দেশের দস্যু এবং বিলাতের দস্যু প্রায়ই সমান, অল্পই বিভিন্ন; আমাদের দেশের সাধু ও বিলাতের সাধু ভাবে ও চরিত্রে প্রায়ই এক হইবে, হয়তো সামান্যমাত্র বিভিন্নতা থাকিয়া যায়। আমাদের দেশের ঋষিরা সতীত্ব রক্ষার জন্য পুরুষের সহিত স্ত্রীর যে প্রকার সম্বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, এবং হিন্দুমাত্রেই যে ব্যবস্থার উপকার বুঝিয়া সাদরে স্বীকার করিয়াছেন, অষ্টদিকপালসম্ভূতা মহারাণী ভারতেশ্বরীও ঈশ্বরের কৃপায় স্বীয় প্রতিভাবলে সেই সকল ব্যবস্থা অনুভব করিয়াই যেন তদনুসারে চলিয়াছেন এবং তাহার ফলে তাঁহার গৃহে এক অপরাজিত শান্তি বিরাজ করিতেছে। তাঁহার জীবনীলেখক বলেন যে, "মহারাণীর ন্যায় এত গার্হস্থ্য সুখ অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই (অবশ্য তাঁহার পাশ্চাত্য প্রজাদিগের) অদৃষ্টে ঘটিয়াছে" এবং তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন যে মহারাণীর আদর্শে চলিয়া তাঁহার প্রত্যেক প্রজার গৃহ সুখশান্তিময় স্বর্গধাম হইয়া উঠুক।† আমরাও সেই প্রার্থনা করি। জীবনী লেখক মহারাণীর অর্থজনিত সুখের কথা এখানে বলেন নাই; বিবা-

* ভাষ্যে আছে দেবালয় অথবা জ্ঞাতিকুলে বাস; কোন নবীন ভাষ্যে লেখা কর্ত্তব্য হোটেল প্রভৃতি স্থানে অথবা cousinদিগের সহিত বাস।

† "Not to many, only to the rare few, is given to realise such perfect blessedness as the Queen found in her marriage." * * * "What has been once may be again. The height which one wedded pair attained marks the level which the whole race may yet attain, and when that goal is gained mankind will indeed stand near to the portals of Paradise."—Rev. of Rev. May 1897.

হিত জীবনের প্রকৃত গার্হস্থ্য সুখের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"In that perfect union of two in one (মহারাণী ও তাঁহার স্বামীর) we see 'the bright consummate flower' of the race." ভাল, জিজ্ঞাসা করি যে যখন আমাদের বিবাহে বলিতে হয় "তোমার যে হৃদয়, তাহা আমার হউক" এবং "আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক"—এই প্রকৃতির মন্ত্রগুলি কি ঐ আদর্শ পরিবার স্থাপন করিবার অথবা এই মর্ত্ত্যধামে স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত হয় না, আর বাস্তবিকও কি এই সকল মন্ত্রগুলি হিন্দুজাতিকে অতি উন্নত সামাজিক জাতি করিবার হেতু নহে? আশ্চর্য্য এই যে ভারতের এই অবনতির কালে এমন সুন্দর মন্ত্রগুলিও কতকগুলি জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তির নিকটে উপহাসের বিষয় হইয়া উঠে।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে ভারতে অবরোধপ্রথা ছিল এবং মনুপ্রমুখ ঋষিরা তাহা সমর্থন করিয়াছেন; তাঁহারা যে কি উদ্দেশ্যে তাহা করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। স্বামীর সহিত পত্নীর অথবা পিতার সহিত কন্যা প্রভৃতির ধর্ম্মকার্য্যের উদ্দেশে নানা স্থানে গমন ইত্যাদি বিষয়ে ঋষিদিগের কোনই নিষেধ নাই—বরঞ্চ তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মকার্য্যের জন্য নানা প্রকারে উৎসাহ দিয়াছেন। উৎসাহ দিবারই কথা—এ সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের অধিকার সমান এবং সমান থাকাই উচিত; বিশেষতঃ যদি স্ত্রীলোকের মাতৃত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার হয় এবং যদি সেই মাতৃত্ব ধর্ম্মমূলক হয়, তবে ধর্ম্মকার্য্যের স্ত্রীলোকদিগেরও বিশেষ অধিকার আছে। যাত্রা স্থানে গমন, নৃত্য গীতাদিতে গমন অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে মনোযোগ দিলে মানসিক সংযম থাকে না, প্রবৃত্তি সকল বহির্মুখী হইয়া উঠে, সেই সকল বিষয়ের জন্য ইতস্ততঃ গমন রমণীর অন্তর্মুখী গার্হস্থ্যভাবের প্রতিকূল এবং সেই কারণেই ঋষিরা এই প্রকার অযথাভ্রমণকে স্ত্রীজাতির পক্ষে দোষাবহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য আদর্শরমণী বিক্টোরিয়াতেও আমরা এই কথারই সম্পূর্ণ সায় পাই। তিনি একে পাশ্চাত্য রমণী, স্বাধীনতার মধ্যে লালিতপালিত; তাহার পরে যখন তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, তখন যে তাঁহাকে সমাজের খাতিরে, আমোদের তাড়নায় কত নৃত্য গীত করিতে হইয়াছিল তাহার কি ইয়ত্তা আছে? তাঁহার

জীবনী-লেখক বলেন যে বিবাহ স্থির হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "the Queen had been leading a life of dazzling and continuous excitement." কিন্তু যখন তাঁহার সমস্ত হৃদয় একজন অধিকার করিলেন, যখন তাঁহার প্রবৃত্তি সকল অন্তর্মুখী হইল, তখন তিনি বুঝিলেন যে রাশীকৃত আমোদ প্রমোদ, নৃত্যগীত হৃদয়ের স্বাস্থ্যের হানিকারক। তিনি নিজে বলিয়াছেন যে এইরূপ আমোদের স্রোতে ভাসমান হওয়া "detrimental to all natural feelings and affections."

মহারাণী ভারতেশ্বরীর আর একটী বিষয় উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে তিনি কেবল মাত্র ভারতেশ্বরী এবং হিন্দুসন্তানগণের রাজমাতা নহেন, তাঁহাকে আদর্শ হিন্দুরমণী বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না —তাহাঐ স্বামীভক্তি। তাঁহার মতে "স্বামীর সম্পূর্ণ অধীন না হইলে গৃহস্থের প্রকৃত সুখ ও শান্তি আসিতে পারে না।" * মহারাণী কি গার্হস্থ্য, কি রাজনৈতিক, সকল বিষয়েই তাঁহার স্বামীর সম্মতি লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন। আমাদের মহারাণী ইচ্ছা করিলে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর অনায়াসেই বিবাহ শৃঙ্খলে পুনরায় আবদ্ধ হইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি পুণ্যশ্লোক ভারতের পুণ্যবতী অধীশ্বরী, তাই ভারতরমণীর আদর্শ দেখাইবার জন্যই যেন তিনি পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়া এই ৩৬ বৎসর যাবৎ তাঁহার স্বামী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এই ভাবে পুণ্যজীবন যাপন করিতেছেন। †

তাঁহার স্বামী পুণ্যবান্ প্রিন্স এলবার্ট জীবিত থাকিতে যেরূপ ন্যায়পরতা ও

* "Without the authority which belongs to the husband," she says, "there cannot be true comfort or happiness in domestic life."

† "First and foremost she has been a true widow, loyal to the memory of her husband. Rejecting with loathing all thought of a second marriage, she has never ceased to regard herself as Prince Albert's wife, because for thirty-six years he awaits her, disembodied, but not unconscious of her presence and her love.—Rev. of Rev. May 1897.

দয়ার উপরে রাজ্যশাসন করিতেন, মহারাণীও তাঁহারই প্রদর্শিত পথে চলিয়া, সেই ভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। মহারাণী লিখিয়াছেন যে, "তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত ইহলোকের পরপারে মিলনজনিত যে আনন্দ লাভ হইবে, তাহারই আশা করিয়া যাহা কিছু শান্তি পাইতেছেন এবং বর্ত্তমানের শোককে শোক বলিয়াই গণনা করিতেছেন না।" * মহারাণী বাল্যাবস্থা হইতেই তাঁহার মাতার নিকটে কঠোর সংযম শিক্ষা করাতেই শেষ বয়সে এতদূর ধৈর্য্য ও সংযম দেখাইতে পারিয়াছেন।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গপ্রাকৃত।

সতীন।—সপত্নী = সত্নী। যদি দুই হলন্ত বর্ণের যোগে যুক্তাক্ষর হয় তাহা হইলে প্রথম হলন্ত অক্ষরে শেষের স্বর যুক্ত হয়, যেমন চন্দ্র = চন্দর ; এই নিয়মানুসারে সত্নী সতীন হইল।

পিরতি ও পিতি।—'প্রতি'র দ্বিতীয় বর্ণের ইকারের যোগে প্রথম বর্ণে ইকার যুক্ত হইল—প্রিতি হইল। প্রি এই যুক্তাক্ষরের প্রথমবর্ণে স্বর যুক্ত হইল যুক্তাক্ষরের শেষ অক্ষর স্বতন্ত্র হইল—প্রি = পির ; প্রতি = প্রিতি = পিরতি। বিকল্পে মধ্যস্থিত রকারের লোপ হয়। পিরতি = পিতি।

সন্তুষ্টু।—সন্তুষ্ট = সন্তুষ্টু। যেমন শেষবর্ণে অকার ভিন্ন স্বর থাকিলে তাহার পূর্ব্ববর্ণে সেইরূপ স্বর যুক্ত হয় তেমনি পূর্ব্ববর্ণে যে স্বর থাকে পরবর্ণেও সেইরূপ স্বর যুক্ত হয়। 'সন্তু'তে যে উকার আছে তাহা আবার ষ্ট'তে যুক্ত হইল। সন্তুষ্টু হইল।

---

* "The only sort of consolation she experiences is in the constant sense of his unseen presence, and the blessed thought of the eternal union hereafter which will make the anguish of the present appear as naught."—Quoted in the Rev. of Rev. April 1897.

অসন্তুষ্ট্। —অসন্তুষ্ট, অসোন্তুষ্টু, অসুন্তুষ্টু।

পেরকার ও পোকার। —আদিতে রফলা যুক্ত অকারান্ত অক্ষর থাকিলে যুক্তাক্ষরের প্রথম অক্ষরে একার যুক্ত হইয়া পৃথক হয়। প্রকার = পের্কার। যেবার একার যোগ না হয় সেবার রকারের লোপ হয় এবং প্রথম অক্ষরের অকারের ওকার উচ্চারণ হয় যথা, পোকার।

ছেরম ও ছিরি। —আদিতে তালব্য শয়ে রফলাযুক্ত থাকিলে শ বিকল্পে ছ হয়। যেমন শ্রম = শেরম, ছেরম; শোম। অকারান্ত রফলাযুক্ত অক্ষর না হইলে প্রথম অক্ষরে একার হয় না। যথা শ্রী = শিরি = ছিরি।

পূব্। —রেফের কঠিন উচ্চারণ বশতঃ লোপ হয়। পূর্ব্ব = পূব্ব = পূব্ব্ = পূব্।

পেচন ও পিচন। —বাক্য মধ্যস্থিত চবর্গের আদিতে উষ্মবর্ণ যুক্ত থাকিলে শয়ের স্থানে চ হয়। পশ্চিম = পচ্চিম। হ্রস্বস্বরান্ত বর্ণের পর যুক্তাক্ষর থাকিলে প্রাকৃতের অনুরোধে যদি সেই যুক্তাক্ষর হয় তবে সেই যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণের হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়। পচ্চিম = পাচিম। উপান্তস্বর অনেক সময় লোপ হয়, যথা পাচিম = পাচম; অকারের ওকার উচ্চারণ হয়, পাচম = পাচোম; অকারকে মুখব্যাদান করিয়া উচ্চারণ কঠোরসাধ্য বলিয়া অকারকে সঙ্কীর্ণ করিয়া একাররূপে উচ্চারণ করে, পাচম = পেচম। ঙ ণ ন ম পরস্পর পরিবর্ত্তসহ। পেচম = পেচন। একারও সঙ্কীর্ণ হইয়া ইকার উচ্চারণ হয়। পেচন = পিচন।

আর একরূপে পিচন সাধা যায়। পশ্চিম = পচ্চিম। দ্বিতীয় অক্ষরের ইকারের যোগে প্রথম অক্ষরে ইকার যুক্ত হইলে পিচ্চিম হয়; যুক্ত চ'য়ের লোপ হইলে পিচিম হইল। উপধা ইকারের লোপে পিচম। ইকারের গুণ একার হইলে পেচম। ম স্থানে ন হইয়া পেচন হইল।

ডেশ্লাই। —দীপ = দিয়া; শলাকা = শলায়া। দিয়া = দিয়ে = দে = ডে। শলায়া = শলায় = শলাই; ডেশলাই = ডেশ্লাই।

৬হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মন্দরে পাপহরণী।

পূর্ব্বসংখ্যায় "মন্দর পর্ব্বত" প্রবন্ধের শেষাংশে যে বৃহৎ পুষ্করিণীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই পুষ্করিণীর নাম "পাপহরণী"। এই পাপহরণী সরোবর এবং তত্তীরবর্ত্তী মেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

কাঞ্চীপুরে চোল নামে এক নরপতি ছিলেন। এক সময় তিনি কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। হিন্দুবিশ্বাস মতে দৈবকোপ বা ব্রহ্মকোপ ব্যতীত ঐ রোগ জন্মে না বা দেবানুগ্রহ ব্যতীত উহা হইতে আরোগ্যও হয় না। রাজা চোলও আমাত্যবর্গের পরামর্শানুসারে নানা তীর্থে স্নান দান পূজাদি করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার মুক্তি হইল না। দৈবক্রমে তিনি মন্দরের পাদদেশে উপনীত হইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ক্লান্তি দূর করিবার জন্য পর্ব্বতের এক নির্ঝরের জলে হাতমুখ ধুইয়া বসিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, হাতমুখ ধুইবার সময় তাঁহার যে যে অঙ্গে ঐ নির্ঝরের জল লাগিয়াছিল, সেই সেই স্থানের ক্ষত দূর হইয়া গেল! তখন রাজা চোল বিস্মিতমনে সেই নির্ঝরের জলে স্নান করিয়া ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইলেন। যেদিন এই ব্যাপার ঘটে, সেইদিন পৌষসংক্রান্তি। তৎপরে রাজা চোল পৃথিবীর আপামর সাধারণের উপকারার্থ ঐ নির্ঝরের মুখ খুঁড়াইয়া এক কুণ্ড প্রস্তুত করাইলেন এবং প্রথমে এই সুদর্শন কুণ্ডের নাম "মনোহর কুণ্ড" রাখেন ও ঐ পৌষসংক্রান্তির দিন প্রতি বৎসর নিজে বহুযাত্রী লইয়া ঐ কুণ্ডে আসিয়া স্নানদানাদি করিতেন। শেষে ক্রমশঃ যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় রাজা চোল কুণ্ডকে প্রসারিত করিয়া এক দীর্ঘ সরোবর করাইলেন ও "পাপহরণী" নামে অভিহিত করিলেন ও পৌষসংক্রান্তি দিন এই সরোবর তীরে এক মেলার অনুষ্ঠান করিলেন। এইরূপে আজ বাইশ শত বৎসর এই মেলা হইয়া আসিতেছে। পাপহরণী কুণ্ডের এইরূপ পাপহরণ ক্ষমতার উৎপত্তি সম্বন্ধেও একটি গল্প শুনা যায়। এক সময়ে ব্রহ্মা মধুসূদনের দর্শনাশায়

মন্দর পর্ব্বতে আগমন করেন কিন্তু মধুসূদন তাঁহাকে দর্শন দেন নাই। ব্রহ্মা তাঁহার দর্শনাশায় বহুলক্ষ বৎসর মন্দর শিখরেই তপস্যা করেন, তপস্যান্তে তিনি অগ্নিকে একটি সুপারী আহুতি দেন। এই সুপারীটি অগ্নিকুণ্ড হইতে গড়াইয়া নিম্নে এক নির্ঝরের মুখে পড়িয়া অন্তর্হিত হয়। তদবধি সেই নির্ঝরের জলে পাপমোচন ক্ষমতা জন্মে এবং শেষে রাজা চোলের ব্যাধিমোচন হইতে সেই নির্ঝরের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়। পাপহারিণী দীর্ঘিকা শেষে এতই মহিমাময়ী হইয়া উঠিয়াছে যে এখন নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে হিন্দুরা শবদেহ লইয়া গিয়া ইহার তীরে দাহ করে, গঙ্গায় অস্থিক্ষেপের ন্যায় ইহারই জলে অস্থিক্ষেপ করে। সময়ে সময়ে অর্দ্ধদগ্ধ শবরাশিই টানিয়া ইহার জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। মেলার পূর্ব্বে ইহার জলে অসংখ্য পচা মৃতদেহাংশ ভাসিতে দেখা যায় এবং দুর্গন্ধে জলে নামা কষ্টকর হয়। মেলার পূর্ব্বে জঙ্গল পরিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই দীঘিকাও পরিষ্কার করান হইয়া থাকে। পৌষসংক্রান্তির দিনই মেলার মহাধুম হয়। অতি রাত্রিতে গৃহস্থ কুলবধূরা এই কুণ্ডে স্নানার্থ আগমন করেন। পুরুষেরা এখানে স্নানদান তর্পণ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করে। দীর্ঘিকায় অনেকগুলি ঘাট আছে, তন্মধ্যে রামঘাটে দাঁড়াইয়া তর্পণাদি করাই যাত্রীরা প্রশস্ত মনে করে। লোকের বিশ্বাস, রামচন্দ্র এইস্থানে স্বীয় পিতা দশরথের তর্পণাদি করিয়াছিলেন। আরও প্রবাদ আছে, রাজা চোল পাপহরণী দীর্ঘিকা ও মেলা স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি অবশেষে এইস্থানে নগরনির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন এবং পর্ব্বতের উপর নানা মন্দির, সরোবর, গভীর কুণ্ড এবং মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি সকল নির্ম্মাণ করাইয়া এই দেবস্থান সুসজ্জিত করেন। অনেকে বলেন যে তিনিই এই পর্ব্বতের কটিদেশস্থ সর্পরূপী কটিবন্ধ কাটাইয়া লোকের ইহাই সমুদ্রমন্থনের মন্থনদণ্ড মন্দর বলিয়া বিশ্বাস করিবার পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন।

মন্দরপর্ব্বতের দক্ষিণদিকে এই পাপহরণী দীর্ঘিকা অবস্থিত। এই দীর্ঘিকায় নামিবার জন্য রামঘাটে সাত ধাপ সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি পাথরে নির্ম্মিত; প্রত্যেক ধাপ ১৪ ফুট লম্বা ও দেড়ফুট চওড়া। এই ঘাটের নিকট এখন অনেকগুলি প্রস্তরস্তম্ভ ও প্রস্তর মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এতদ্ভিন্ন, অনেকগুলি অট্টালিকার কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। এই

সকল দেখিয়া বোধ হয় এক সময়ে এই ঘাটের উপর প্রস্তর নির্ম্মিত চাঁদনী ও মন্দির ছিল। পাপহরণীর তিন দিক বনজঙ্গলে আবৃত, অপরদিকে মন্দর পর্ব্বতের পূর্ব্বদক্ষিণ ভাগ ঢালু হইয়া উঠিয়া গিয়াছে। ঘাটের ঐ সকল ভগ্ন পুত্তলিকার মধ্যে মিঃ কানিংহাম একটি ভগ্ন গরুড়মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। উহার স্কন্ধে একটি বিষ্ণুপ্রতিমা ছিল, তাহা গরুড়ের স্কন্ধের উপর দিয়া বক্ষের উপর পর্য্যন্ত খোদিত বিষ্ণুমূর্ত্তির পদদ্বয়ের ভগ্নবিশেষ মাত্র বর্ত্তমান দেখিয়া তিনি অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। সরোবরের দক্ষিণপূর্ব্ব তীরে একটি বৃষমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মিঃ কানিংহাম অনুমান করিয়াছিলেন যে এস্থানে নিশ্চয়ই একটি শৈবমন্দির ছিল। কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ডগুলি দেখিয়া তাহার নক্সার বিরলতা ও অগভীরতা দেখিয়া মিঃ কানিংহাম বিবেচনা করিয়াছেন যে এই সরোবর তীরস্থ মন্দিরগুলি হিন্দু মন্দির হইলেও তাহা মুসলমান রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সরোবরের উত্তর-তীরে ঢালু পর্ব্বতগাত্রেও অনেক কারুকার্য্য খোদিত প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। এগুলি একাধিক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বলিয়াই বোধ হয়। এই মন্দিরগুলির মধ্যে একটি বৃহৎ ও অপরগুলি ক্ষুদ্র মন্দির ছিল। ইহার বৃহৎ মন্দিরটি সম্ভবতঃ মানভূমের ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীন মন্দিরগুলির প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে এবং মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বকালবর্ত্তী। মিঃ কানিংহাম এই মন্দিরের এক কোণের কার্ণিসের একাংশ দেখিতে পাইয়াছিলেন; উহার দুই পার্শ্বে দুইটি স্ত্রী মূর্ত্তি খোদিত ছিল এবং তাহাদের মাথার খোঁপা মাথার বামদিকে ছিল। এই প্রাচীন মন্দির ব্যতীত এখানে অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দিরের ভগ্নাবশেষও দেখা যায়। অযত্ন-খোদিত লিঙ্গমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বুঝা যায় এগুলিও শৈবমন্দিরই ছিল। দীর্ঘিকার পশ্চিম তীরেও মন্দিরগুচ্ছের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি মিঃ কানিংহামের মতে অপেক্ষাকৃত আরও প্রাচীনকালবর্ত্তী তবে উত্তর তীরের বৃহত্তর মন্দিরের সমকালবর্ত্তী হইতে পারে।

পাপহরণীর উত্তরপূর্ব্ব কোণে একটি শুষ্ক পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। এই শুষ্ক পুষ্করণীর পশ্চিম তীরেও উত্তর তীরস্থ বৃহৎ মন্দিরের সমকালবর্ত্তী এক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই মন্দিরে অসংখ্য পুত্তলিকা ইহার কারুকার্য্য সকলও অপেক্ষাকৃত গভীরভাবে খোদিত।

পাপহরণীর তীরভাগ ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতের পূর্ব্বতলে উপস্থিত হইলে আর একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুষ্করিণীর দক্ষিণকূলে একটি প্রস্তরের অট্টালিকা প্রায় অভগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। ইহার স্তম্ভগুলি অষ্টকোণী, স্তম্ভের গাত্রে কোন কারুকার্য্য নাই। এই স্তম্ভের উপরেই বারাণ্ডার ছাদ আছে। এই অট্টালিকার গৃহগুলিতে পাথরের জালিকাটা জানালা ব্যতীত আর কোন দ্বার দিয়া আলো আসিতে পারে না, সুতরাং এক একটীকে অন্ধকূপ বলিলেই হয়। ইহার বেষ্টন প্রাচীর ইষ্টকও প্রস্তর মিশাইয়া নির্ম্মিত। অট্টালিকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে বোধ হয় ইহা জৈন শ্রাবকদিগের দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার একটি গৃহে একটি বেদীর উপর একখানি পাথরে পদচিহ্ন আছে। হিন্দুরা ইহাকে বিষ্ণুপদ ও জৈনেরা ইহাকে জিন-পদ বলিয়া অভিহিত করে। পর্ব্বতের পূর্ব্বতলে কতকগুলি সমাধিস্তম্ভ বা ছত্র আছে। ইহার কতকগুলি ইষ্টকে ও কতকগুলি প্রস্তরে গঠিত। কতকগুলিতে মৃতের মৃতাহ খোদিত আছে তন্মধ্যে একটি স্থানীয় রাজার সমাধিস্তম্ভে ১৬২১ শকাব্দ দেখা গিয়াছে। ইহা অপেক্ষা এখানে প্রাচীন সমাধিস্তম্ভের অবস্থিতি থাকিলেও তারিখ না থাকায় জানিবার উপায় নাই।

পর্ব্বতের পূর্ব্বগাত্রে ভূমি হইতে কিছু উচ্চে বাদামের মত আকারবিশিষ্ট একখানি অতি বৃহৎ মসৃণ পাথর আছে, ইহার গাত্রে একটিও তৃণ জন্মে না। দেখিলেই বোধ হয় যেন কেহ যত্নে পরিষ্কার করাইয়াছে। এই মসৃণ প্রস্তর ভূমি হইতে ঊর্দ্ধে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তৎপরেই তৃণাদি জন্মিয়াছে।

পর্ব্বতের দক্ষিণপূর্ব্ব গাত্রে একটি খাদ আছে। এই খাদ স্বভাবখোদিত। এই খাদটি দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে উত্তরপশ্চিমমুখে বিস্তৃত। খাদের দুইপার্শ্ব অতি উচ্চ। এখানকার প্রস্তর অতি দৃঢ় কৃষ্ণবর্ণ; দেখিতে যেন পাথুরে কয়লা বলিয়া বোধ হয়। খাদটিকে হঠাৎ কোন আগ্নেয় পর্ব্বতের গহ্বরের ন্যায় অনুমান হয় কিন্তু তাহা নহে। তবে এ পর্ব্বতে এক সময়ে উষ্ণপ্রস্রবণ ছিল। যখন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ ফ্রাঙ্কলীন এই পর্ব্বত দেখিতে গিয়াছিলেন, তখন এই খাদ দিয়া একটি বেগবান্ জলস্রোত আসিয়া পাপহরণীতে পড়িত কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন বাঁকাবিভাগের ডেপুটী কালেক্টর বাবু রাসবিহারী বসু ইহা দেখিতে গিয়াছিলেন, তখন খাদে জল বহিতে দেখিতে পান

নাই। এই খাদের নাম পাতালকন্দর। রাজমহলের মতি ঝরণার সহিত এইরূপ একটি পাতালকন্দরের সংশ্রবের কথা মিঃ উইলফোর্ড বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

এই পর্ব্বত দর্শনার্থীরা সর্ব্বপ্রথমে পর্ব্বতের দক্ষিণপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হন। মন্দরপর্ব্বতমালা ক্রমোচ্চ পাঁচটি স্বতন্ত্র পর্ব্বতশ্রেণীতে বিভক্ত। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম মন্দর। ইহা ডিম্বাকৃতি। মন্দরপর্ব্বত সামান্যতঃ অনুর্ব্বর ও বন্ধুর, কিন্তু স্থানে স্থানে গভীর জঙ্গল ও স্থানে স্থানে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্রের অভাব নাই।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

নবান্ন।

অগ্রহায়ণ মাসে নবান্নের দিন। নবান্ন হিন্দু গৃহস্থের একটি আনন্দের পর্ব্ব। অগ্রহায়ণ মাসে নূতন চালের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন তরী তরকারী, ফল, মূল প্রভৃতি উঠে। ধর্ম্মপ্রবণ হিন্দুরা নিজের ইষ্টদেবতাকে প্রথমেই এই নূতন নৈবেদ্য অর্পণ না করিয়া ভক্ষণ করে না। সেই জন্য প্রতি গৃহস্থ অগ্রহায়ণ মাসে ভাল দিন দেখিয়া নবান্ন উৎসব করিয়া থাকেন, এবং আপন আপন সাধ্য অনুসারে দীন দুঃখী, বন্ধু বান্ধবকে আহার করাইয়া পরিতৃপ্ত হন। নবান্ন ভালরূপে কি করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, নিম্নে আমরা তাহা বলিতেছি।

উপকরণ।—কাঁচা দুধ দেড় সের, নূতন খেজুর গুড় তিন পোয়া, নূতন কামিনী আতপ চাল তিন পোয়া, ছোট এক গাছা আক, খোপানী এক ছটাক, কলসা খেজুর আধ পোয়া, পাকা পেঁপে আধখানা, কমলানেবু দুইটী, বেদানা একটি, একটী বড় শাঁক আলু, রাঙা আলু দুইখানি, মূলা একটি, কলাই শুটি এক ছটাক, পানফল এক ছটাক, কেশুর এক ছটাক, আদা এক তোলা, আপেল একটা, চাটিম কলা পাঁচটা, চাঁপা কলা পাঁচটা, নারিকেল দেড়টা, কচি শসা একটি।

প্রণালী।—দেড় সের কাঁচা দুধ কাপড়ে ছাঁকিয়া একটা বড় পাত্রে রাখ ইহা হইতে আধসেরটাক কাঁচা দুধ লইয়া তাহাতে ধোয়া বাছা চালগুলি ভিজাইতে দাও। কাঁচা দুধের বদলে আধসেরটাক টাটকা খেজুর রসে চাল ভিজাইয়া দিতে পার। বাকী একসের কাঁচা দুধে গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া রাখ। তা না হইলে গুড়ের অনেক কাটিকুটি থাকিয়া যায়।

এইবারে ফলমূলাদি বানিয়ে ফেল। খোলা-ছাড়ান আক ছোট ছোট কাটিয়া গুড়-গোলা দুধে ফেল। পেঁপের খোসা ছাড়াইয়া বিচি বাহির করিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বানিয়ে রাখ। কমলানেবু দুইটীর খোলা ছাড়াইয়া কোয়া-গুলি বাহির কর, তারপরে প্রত্যেক কোয়ার বিচি বাহির করিয়া কোয়া-গুলিও টুক্‌রা টুক্‌রা কর এবং শাঁক আলু, রাঙ্গা আলু, মূলা, শসা, পানফল, কেশুর ও আপেলের খোসা ছাড়াইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বানিয়ে ফেল। আদার খোসা ছাড়াইয়া কুচি কুচি কর, কলার খোলা ছাড়াইয়া চাকা চাকা কাট। কলসী খেজুরের বোঁটা খুলিয়া অপর দিকে টিপিয়া দিলেই বিচি বাহির হইয়া যাইবে, তারপরে দুই ভাগ কি চারি ভাগ করিয়া কাটিবে। কলাই শুটির মটরগুলি ছাড়াইয়া রাখ। আধখানা নারিকেল কুরিয়া দুধে দাও, আর একটি নারিকেল টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বানাও, এইবারে বানান ফলমূল ধুইয়া গুড়-গোলা দুধে ফেল। নারিকেল কোরা প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য ধুইবার নয়, তাহাও দুধে ফেল। অবশেষে বেদানা দানাগুলি ছাড়াইয়া দুধে দাও, এবং পূর্ব্ব হইতে দুধে বা খেজুর রসে ভিজান চাল দুধ বা খেজুর রস সমেত তাহাতে ঢালিয়া দাও। একবার একটি কাঠের হাতা করিয়া সবগুলি নাড়িয়া মিশাইয়া দাও।

আপেল, বেদানা, কলসী খেজুর এবং খোপানী না দিলেও হয়। তবে দিলেও বেশ খাইতে লাগে। সবশেষে বেদানা দানা ছড়াইয়া দিলে বেশ দেখিতে হয়। কমলানেবুর দানাগুলিতে নবান্ন দেখিতে সুন্দর হয়।

লোককে খাইতে দিবার সময় দুধের সঙ্গে সঙ্গে চাল কলাদি ফল মূল উঠাইয়া দিবে। ইহা যেমন সুখাদ্য দেখিতেও তেমনি সুন্দর।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

রুই মাছের ঘণ্ট।

উপকরণ।—পাকা রুই মাছ আধসের, ছাড়ান বাদাম আধ ছটাক, পেস্তা আধ ছটাক, কিসমিস্ আধ ছটাক, আলু এক ছটাক, দই এক ছটাক, বাঁটা ধনে পোন তোলা, বাঁটা হলুদ পোন তোলা, আদা এক তোলা, পেঁয়াজ এক ছটাক, শুক্না লঙ্কা তিনটী, কাঁচা লঙ্কা তিনটী, জায়ফল আধখানা, ছোট এলাচ চারিটী, দারচিনি সিকি তোলা, লঙ্গ আটটা, তেজপাতা একখানি, নুন পোন তোলা, ঘি আধ পোয়া, জল আধ পোয়া।

প্রণালী।—টাট্‌কা পাকা রুই মাছের আঁশ ছাড়াইয়া, ভালরূপ ধুইয়া তাহাকে দশ টুক্‌রায় কাট। তারপরে দুয়ানিভর নুন মাখিয়া রাখ।

বাদাম ও পেস্তা জলে ভিজাইতে দাও। এগুলি কিছুক্ষণ ভিজিলে পর, খোসা উঠাইয়া কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া রাখ। কিসমিস বাছিয়া ধুইয়া রাখ। আলুর খোসা ছাড়াইয়া কুচি কুচি কর। আদা, পেঁয়াজ এবং কাঁচা লঙ্কা আলাদা আলাদা কুচাইয়া রাখ। শুক্না লঙ্কা তিনটী বাটিয়া রাখ।

জায়ফল টুকু সবটা, দুটি ছোট এলাচ, চারিটী লঙ্গ, এবং দুয়ানিভর দারচিনি এই গরম মসলাগুলি মিহি করিয়া পিশিয়া কুটিয়া রাখ।

এবারে হাঁড়ি চড়াও। হাঁড়িতে এক কাঁচ্চাটাক ঘি দিয়া মাছ ছাড়। মাছ শাদাটে করিয়া কসিয়া অন্য পাত্রে উঠাইয়া রাখ। এখন সব ঘিটা চড়াইয়া দাও। দু তিন মিনিটের মধ্যে ঘিয়ের ধোঁয়া বাহির হইলে, কিসমিস্ গুলি ছাড়িয়া ভাজ। মিঠাই দানার ন্যায় কিসমিস্ শাদা হইয়া ফুলিয়া উঠিলেই ছাঁকিয়া উঠাইবে। ইহা এক মিনিটের মধ্যে ভাজা হইয়া যাইবে। তারপরে আলু মিনিট পাঁচ কিম্বা সাত কসিয়া উঠাও। এবারে পেঁয়াজ কুচি ভাজ। প্রায় আট দশ মিনিটের মধ্যে পেঁয়াজ লাল হইয়া ভাজা হইলে উঠাইবে।

এইবারে এই ঘিয়ে একখানি তেজপাতা, দুয়ানিভর দারচিনি, চারিটী লঙ্গ, এবং দুইটী ছোট এলাচ ছাড়। গরম মশলার বেশ গন্ধ বাহির হইলে দইয়ে, ধনে বাঁটা, হলুদ বাঁটা, এবং লঙ্কা বাঁটা গুলিয়া ঘিয়ে ঢালিয়া দাও। মিনিট পাঁচ ধরিয়া মশলাটা কস; তারপরে দেখিবে দইয়ের জল মরিয়া

গিয়াছে এবং মশলা ঘিয়ের উপরে বুড় বুড় করিতেছে, তখন মাছ এবং অন্যান্য উপকরণ (বাদাম, পেস্তা, ভাজা কিস্‌মিস, কসা আলু, ভাজা পেঁয়াজ এবং আদা ও লঙ্কা কুচি) সমস্ত ঢালিয়া দাও। দু তিনবার নাড়িয়া সবটা ভাল করিয়া মিশাইয়া ফেল। তারপরে আধ পোয়াটাক জল এবং প্রায় পোন তোলা নুন দাও। হাঁড়ি নরম আঁচে দমে বসাইয়া দাও। পনর, কুড়ি মিনিট পরে যখন জল মরিয়া ঘিয়ের উপরে থাকিবে, তখন হাঁড়ি নামাইয়া গরম মশলার গুঁড়া টুকু ছড়াইয়া দাও, এবং নাড়িয়া দিয়া ঢাকিয়া রাখ। যখন দমে বসান থাকিবে তাহার মধ্যে দু তিনবার যেন নাড়িয়া দেওয়া হয়।

ইহা ভাত এবং লুচি দুয়েরই সঙ্গে খাওয়া চলে। ইহা করিতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিবে।

ব্যয়।—আধসের পাকা রুইমাছ তিন বা চারআনা, আধছটাক বাদাম দু পয়সা, আধছটাক পেস্তা চার পয়সা, আধছটাক কিসমিস্ দু পয়সা, আলু এক পয়সা, দই এক পয়সা, ধনে, হলুদ, শুক্‌ লঙ্কা, জায়ফল, ছোট এলাচ, দারচিনি, লঙ্গ, তেজপাতা এই সব মশলার জন্য আন্দাজ চার পয়সা ধরা গেল, ঘি দুই আনা। সর্ব্বশুদ্ধ ইহার জন্য কমবেশ আনা নয় খরচ লাগিবে। তবে সব সময়ে জিনিষের দরদাম এক থাকে না।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

রামকমল।

৮

প্রভাত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকস্থ আকাশ কনক রক্তিমায় রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, সমীপস্থ সরোবরে হাঁসগুলি সন্তরণ করিবার জন্য ছুটিয়াছে, এই সময়ে রামকমল সত্বর যাইয়া সেই বৃদ্ধার বাড়িতে উপস্থিত হইল, বাড়ির দ্বারে আসিয়া "জয় হোক মাঠাকরুণদের জয় হোক, কিছু ভিক্ষা দাও" বলিয়া দাঁড়াইল।

দ্বার বন্ধ ছিল; শব্দ শুনিয়া কমলা দ্বার খুলিল এবং ভিক্ষুককে বলিল "ব'স চাল এনে দিই ;—কমলার মৃদু কথা পরিমলের ন্যায় রামকমলের হৃদয়কে স্পর্শ করিল, রামকমল মুগ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কমলা তাঁহার ঠাকুরমাকে গিয়া বলিল "ঠাকুরমা একজন ভিখেরী এসেছে, ভিক্ষে চায়, বল চাল কোথায়, চাল দিয়ে আসি"। বৃদ্ধা হাসিয়া বলিল "ভিখেরী কিরে, তোর বর বুঝি"! কমলা স্মিত-মুখে বলিল, "কি চালাকি কর"। বৃদ্ধার মনে একটু আহ্লাদ হইয়াছে; তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে শিবপূজার ফলে বর জুটিবেই, স্বপ্ন ফলিয়াছে,—ভিক্ষুকের ছলে বর পাঠাইয়াছেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা জিজ্ঞেস ক'রে আয় দিকি যে ভিখেরী, বামুনের ছেলে কিনা? আর কি রকম দেখতে তাও এসে বলিস্।" কমলার তাহাতে মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল,—ক্ষণকালের জন্য সরমসলিলে তাহার মরমখানি দুলিতে লাগিল।—পরে সহসা কি ভাবিয়া দ্রুত ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি গা বামুনের ছেলে"? ভিখেরী বলিল "হ্যাগো আমি বামুনের ছেলে, দুটি ভিক্ষে দাও"। শুনিয়া কমলা যেন বিচলিত হইল, তাহার কোমল অন্তরে কনককান্ত রামকমলের মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া গেল।—মনে মনে কহিল "কত ভিখেরী দেখেছি এমন ভিখেরী জন্মে দেখিনি।" ঠাকুরমাকে গিয়া বলিল "ভিখেরী, বামুনের ছেলে, দেখতে খুব ভাল"। ঠাকুরমা বলিলেন "তোর চেয়ে ভাল"? কমলা অপ্রতিভ হইয়া পলাইবার ভান করিল, খানিকদূর যাইয়া ফের ফিরিয়া বলিল "বল চাল কোথায় আছে চাল দিয়ে আসি"। বৃদ্ধা বলিলেন "হাঁড়ির চাল ফুরিয়ে গেছে, সেই বস্তাটার মধ্যে চাল আছে, নিয়ে আয়"।

কমলা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া বস্তা হইতে চাউল বাহির করিয়া আনিয়া তাহার ঠাকুরমার নিকটে আনিল। ঠাকুরমা বলিলেন "যা এইবার ভিখেরীকে একবার এই উঠানে ডেকে নিয়ে আয় দিকি"। কমলা তাহাকে ডাকিয়া আনিল, কিন্তু এইবার ডাকিয়া আনিবার সময় কমলার একটু বাধো বাধো ঠেকিয়াছিল।

ভিখেরী উঠানে প্রবেশ করিল, বৃদ্ধা তাহাকে ভিক্ষা দিলেন। ভিক্ষা দিবার সময় ভিক্ষুকের চেহারা দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন, ভাবিলেন নিশ্চয় কোন বড় লোকের ছেলে, তাহাকে বলিলেন "বাবা তুমি কা'দের ছেলে? তোমার কোথায় বাড়ী, তোমার এমন শরীর তুমি এই বয়সে কেন ভিক্ষা কোরচো? তোমার নাম কি বাবা"? রামকমল বলিল "আমার নাম রাম

কমল বাঁড়ুয্যে, আমার বাপের নাম ৺রামজীবন বাঁড়ুয্যে; তিনি অনেক দিন হ'ল মারা গেছেন"। বৃদ্ধা চমকিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন "হ্যাঁ গা তুমি রামজীবন বাঁড়ুয্যের ছেলে! তুমি ভিক্ষে কোর্ত্তে এসেছো! আহা আমার ছেলের সঙ্গে তোমার বাপের কত না ভাব ছিল; তাঁরা যেন হরিহরাত্মা ছিলেন। অত বড় লোকের ছেলে হ'য়ে বাবা কেন ভিক্ষে কর্‌চো। আমার তোমাকে ভিক্ষে দিতেই লজ্জা কোরচে"। রামকমল তাহাতে উত্তর দিল "মাঠাকরুণ চিরদিন কি মানুষের এক রকম যায়"? বৃদ্ধা বলিলেন "আমার ছেলে অন্নদা আমার কাছে রামজীবন বাঁড়ুয্যের কত প্রশংসা কোত্তো এসে, বোলতো তাঁর ছেলেটি এরপরে অতুল বিষয়ের অধিকারী হবে। আর বোলতো তার মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে দিবেন এই রামজীবনের ইচ্ছে।"

কমলা দূরে একটা তক্তায় বসিয়া সব শুনিতেছিল।—শুনিয়া সহসা একটু লজ্জিত, মুগ্ধ ও উৎফুল্ল ভাবে তথা হইতে পলাইয়া গেল; পলাইবার সময় রামকমল একবার তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না, কমলার সেই সুললিত সরমচপলতা নিরীক্ষণ করিয়া চকিতে, যেন কমলস্থিত ভৃঙ্গের ন্যায় মধুপানে মগ্ন হইয়া গেলেন।

কমলা পলাইয়া গেল, কিন্তু তাহার মন সেথায় পড়িয়া রহিল। পুনরায় সাধ হইল তথায় যাইয়া শোনে, কিন্তু এক্ষণে যাইতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকিল, সেখানে যাইতে পারিল না, অপর এক প্রকোষ্ঠে গিয়া তাহার ঠাকুরমা ও ভিক্ষুকের কথাবার্ত্তা প্রাণ ভরিয়া শুনিতে লাগিল।—বৃদ্ধা কহিয়া যাইতেছেন "আমার ছেলেরও তাতে খুব ইচ্ছে ছিল। আহা সে থাক্‌লে কমলার কি এদশা হ'ত? এ মেয়েটির এ দুঃখের দশা হ'ত না"। এই সময়ে মুহূর্ত্তের তরে একবার রামকমল তাহার ফোটোগ্রাফের কথা ভাবিল, সঙ্গে কমলার রূপ তাহার মনে জাগ্রত ভাব ধারণ করিল, মনে মনে বলিল "কমলা বাস্তবিকই কমলা।"

ভাবিতে ভাবিতে রামকমলের মনে অনুরাগ বিকশিত হইয়া উঠিল, তাহার অন্তরে কমলা, সরোবরে কমলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।—এই সময়ে রামকমলের মুখের ভাবে তাহার মনের ভাব সম্ভবতঃ বৃদ্ধা কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে পুনরায় কহিলেন

"আমার ছেলে যদি থাক্‌তো আর রামজীবন যদি বেঁচে থাক্‌তেন, তা হ'লে আর আমার এ দুর্দ্দশা হ'ত না।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পুনরায় চক্ষু মুছিয়া বলিলেন "হ্যাঁগা তুমি রামজীবনের ছেলে হ'য়ে তোমাকেও ভিখেরী হ'তে হ'য়েছে? হায় অদৃষ্ট!" রামকমল বলিল "কি কর্‌বো মাঠাক্‌রুণ বাপ যে আমার জন্যে কিছু রেখে যান নি"। বৃদ্ধা বলিলেন "কে বল্লে গো? রাম-কমল বলিলেন "বাড়িতে কাকার আমলা গমস্তরা বলে শুনেছি।" বৃদ্ধা বলিলেন "নিশ্চয় সে বেটারা তাহ'ল ঘুষখোর জুয়াচোর। তোমার বাপের একটা উইল আমার ছেলের কাছে ছিল সেটা আমার কাছে এখনও আছে। সেটা আমার ছেলে আমাকে প'ড়িয়ে শোনাতো তাতে তো তোমাকে অতুল বিষয়ের অধিকারী ক'রে গেছেন"! শুনিয়া, রামকমলের প্রাণে দুঃখ ক্রোধ বিমিশ্রিত এক অস্থিরতা জাগিয়া উঠিল, পিতৃব্য ও তাহার কর্ম্মচারীগণের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন, অন্তরে বলিলেন "ভগবন! তুমি সাক্ষী আছ"; এক ভট্টা-চার্য্যের কাছে একটি শ্লোকের আদ্ধেকটা শিখিয়া ছিলেন সেইটি মনে মনে আওড়াতে লাগিলেন;—"ত্বয়া হৃশিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"। এবং পরক্ষণেই কহিলেন "মাঠাক্‌রুণ বেলা হ'য়েছে আজ আসি"। বৃদ্ধা কহিলেন "এস বাবা এস তোমাকে আমার ভিক্ষা দিতেই লজ্জা করে; বাবা কাল আমাদের এখানে তোমার নেমন্তন্ন রৈল, বাবা ভুলনা, এস, কাল তোমার বাপের সেই উইলটা তোমাকে দেখাবো"। রামকমল কহিল "যা আজ্ঞে মাঠাক্‌রুণ কাল আনবো বলিয়া চলিয়া গেল"।

৯

পথে যাইতে যাইতে রামকমল ভাবিতে লাগিল, বলিতে লাগিল "বৃদ্ধা যা বল্লেন, ঠিকই। আমলা গমস্তরা সব জুয়াচোর। তারা নিশ্চয় আমার বাপের বিষয় নষ্ট ক'রে আমাকে ফাঁকি দেবে এই ইচ্ছে করেছে। আমার বাপের বিষয়ের কথা আমাকে কিছু বলে না। এবার আচ্ছা আমি তাদের দেখবো; কাকাত কিছু দেখবেন না, কেবল বিষয়টি মদে ওড়াবার ইচ্ছে। গমস্তারাও দিব্যি লুট কচ্চে'।

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে, বিরক্ত চিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

আজকাল রামকমল ভারি গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার দুঃখের ছায়ায় গাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িয়া তাঁহার অন্তর ঘনত্ব লাভ করিয়াছে। এইরূপ বিষাদবিমিশ্রিত স্তব্ধ অন্তরে একদিন রামকমল সমীপস্থ একটি কাননে একা বসিয়া আছেন, এক কর্ম্মচারী তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া তাঁহার নিকট তামাসা করিয়া কথা কহিবার উপক্রমে ছিল, রামকমল সে উদ্যোগ ব্যর্থ করিলেন; এখন হইতে গোপনে গোপনে আমলা গমস্তাদিগের কার্য্যের সন্ধান রাখিবার চেষ্টা করেন; আর বাড়ীতে বড় একটা না থাকিয়া পাড়াপড়শীর কাছে যাইয়া বিষয় সংক্রান্ত গল্প করেন ও তাঁহার বাপের দানপত্রের কথা, যাহাকে সুবিধা পান তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন এবং তৎসম্বন্ধে নানারূপ পরামর্শ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন। পাড়াপ্রতিবেশীরা রামকমলের দুঃখে দুঃখী হইয়া তাঁহাকে সমর্থন পূর্ব্বক, তাহার বিষয় অধিকারের জন্য কোর্টে নালিশ করিবার পরামর্শ দেয়, একজন প্রতিবেশী তাঁহাকে বলিয়া দিল "তুমি আদালতে নালিস কর, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে কোনও ভয় নেই। আমি তোমার হ'য়ে কাজ ক'রবো, এর পরে কর্ত্তা হ'লে আমাকে কিছু দিও"। এ বিষয়ে জীবনের দাদাও সাহায্য করিবে বলিয়াছিল।—জীবনের দাদা প্রাণকৃষ্ণও একজন মস্ত এটর্ণি।—একদিন রামকমল জীবনদের বৈঠকখানায় বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, সেখানে একজন টোলের পণ্ডিত তামাক সেবন করিতেছিল, মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল "বাপু তোমার কোনও ভয় নেই, ধর্ম্ম স্বয়ং তোমার এটর্ণি তোমার উকিল তোমার সব। সেই ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করবে। তোমার খুড়ো যদি অধর্ম্ম করে, তোমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে তো তোমার ভয় কি? কিছু ভয় নেই, তোমার কিছু ভয় নেই, আমি এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি।—দেখ প্রাণকৃষ্ণ, রামজীবন থাকতে আমি বরাবর বিদেয় পেতেম, আহাহা অমন লোক হবে না। তিনি যাওয়ার পর থেকে বাড়ীটার আর শ্রী নেই"।

১১

রামকমলের সঙ্গে আজকাল লোকজনের খুব আলাপ পরিচয়, প্রায় সকলেই তাহাকে ভালবাসে, সকলেই পিতৃহীন রামকমলের দুঃখে দুঃখী।

এই সকল ব্যাপার ক্রমশঃ নীলকান্তের কাণে গিয়া পৌঁছিল। কর্ম্ম-

চারীরা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সব বলিয়া দিল। হরীশ নামে একজন আমলা তাঁহাকে বলিল 'হুজুর আমি আমাদের পাড়ায় ব'সে আমাদের খোকাবাবু মশায়ের সব কথা শুনলেম, তিনি আজকাল ভারি তয়ের হ'য়ে উঠেছেন, তাকে নানালোকে মকদ্দমার জন্যে পরামর্শ দিচ্চে, তাঁর অনেক বন্ধুবান্ধব জুটেছে, তিনি ঘোষপাড়ার অন্নদা বাবুর বাড়ীতে কি জানি কোথায় তাঁর পিতার উইলের কথা শুনেছেন।' শ্রবণ মাত্র নীলকান্তের মুখ সহসা একবার বিবর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন, "মিথ্যে কথা! কে বলিল তিনি তো উইল ক'রে যান নি। উইল কোল্লে আমি জান্‌তে পার্‌তেম না; তিনিতো উইল না করে মারা গেছেন"। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন কি জানি অন্নদা যদি তাঁকে গোপনে কোন ক্রমে উইল ক'রিয়ে থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। "অন্নদাটা ঐ রকম ক'রে ক'রেই উচ্ছন্ন গেল"! —বলিবাই নিজের অবস্থার কথা স্মরণ হইল। অন্যায় কর্ম্মের ফলে তিনি বিভিষীকা দেখিতে লাগিলেন। কর্ম্মচারীদের বলিলেন "তোমাদের মধ্যে যে কেহ গিয়ে খোঁজ ক'রে এস অন্নদা চাটুয্যের বাড়ীতে উইল বাস্তবিক আছে কি না, যে কেহ সেটা এনে দিতে পারবে, তাকে আমি রীতিমত পুরস্কার দেবো"। কর্ম্মচারিগণের সকলেই বলিল "হুজুর দু তিন দিন সময় চাই এ কার্য্যে"। রাধানাথ নামে এক কর্ম্মচারী পুরস্কারের লোভে অতি মাত্রায় উৎফুল্ল হইয়া বলিল "হুজুর আমি কালকের মধ্যেই এ কাজ নির্ব্বাহ কোরবো।" নীলকান্ত এই কার্য্যে তাই রাধানাথকেই পাঠাইতে অভিলাষী হইলেন। বলিলেন "রাধানাথ তুমিই যাও তাহ'লে। আজই একবার চেষ্টা করগে"। সে আজ্ঞে বলিয়া রাধানাথ চলিয়া গেল।

রাধানাথ এ কার্য্যে সক্ষমতা আশা করিল, তাহার কারণ সে একবার পূর্ব্বে অন্নদা চাটুয্যের বাড়ীতে কর্ম্ম করিয়াছিল।

সকলে প্রস্থান করিলে নীলকান্ত ধীরে ধীরে ভাবিতে লাগিলেন "সত্যি কি দাদা উইল ক'রে গেছেন"!

ক্রমশঃ।

অনন্ত মিলন।

হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে
অনন্ত প্রেমের এই ধারা ;—
কার তরে র'য়েছে সঞ্চিত
বুঝিতে নারিয়া হই সারা।
বিধির নিয়ম অনুসারে
প্রেম যে মিলিতে ভালবাসে
স্বার্থপর সংসারেতে গিয়ে
মলিন হইয়া ফিরে আসে
এযে গো অনন্ত প্রেমধারা,
আছে এর অনন্ত পিপাসা।
দীনহীন দুর্ব্বল সংসার
কেমনে মিটাবে এর আশা।
তাই সদা খুঁজিয়া বেড়ায়
কোথা এর মিলনের স্থান ;
যেথা গিয়া মিলিতে পারিলে
মিলন না হবে অবসান।

শ্রীভূপেন্দ্রবালা দেবী।

সেন-রাজগণের ইতিহাস।

বাঙ্গালার ইতিহাসে সেন-রাজগণের ইতিহাস অতি প্রয়োজনীয় বিষয় এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত স্বদেশী বিদেশী পণ্ডিতগণ বিস্তর অনুসন্ধান এবং আলোচনা করিয়া যথেষ্ট বিষয় সংগ্রহ করিয়া যথার্থ ইতিহাস আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। বহুবিধ খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া এ বিষয়ে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলেও এখনও অনেক বিষয় অনুসন্ধান-সাপেক্ষ হইয়া রহিয়াছে।

ফরিদপুর-মদনপাড়ায় আমি সম্প্রতি এ সম্বন্ধে একখানি নূতন খোদিত লিপি পাইয়াছি, ইহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। * এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ঐতিহাসিকতত্ত্ব-সম্বলিত ব্রাহ্মণ-বংশাবলীর ঘটকগ্রন্থ ও কতকগুলি হস্তলিখিত অন্যান্য কাগজপত্র পাইয়াছি। সেনরাজগণ সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের আলোচনায় যে সমস্ত বিষয় নিরূপিত ও মীমাংসিত হইয়াছে; আমার এই সকল নূতন প্রাপ্ত উপকরণ হইতে তাহার অনেক ভ্রম বিদূরিত হইবে। সহজে বুঝিবার জন্য আমার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের মীমাংসা নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

(ক) সেন-রাজগণ সম্বন্ধে অনুসন্ধাতৃগণের মধ্যে জেম্‌স্ প্রিন্সেপ সাহেবই সর্ব্বপ্রথম। তিনি অনুসন্ধান, আলোচনা ও মীমাংসা করিয়া সেন-রাজগণের রাজত্বকাল ও বংশতালিকা নিম্নলিখিত মত স্থির করিয়াছেন;—

খৃষ্টাব্দ			নাম।
১০৬৩	...	...	বিজয় সেন (সুখসেন)
১০৬৬	...	...	বল্লালসেন
১১১৬	...	...	লক্ষ্মণ সেন
১১২৩	...	...	মাধব সেন
১১৩৭	...	.	কেশব সেন
১১৫১	...	...	সদাসেন বা সুরসেন
১১৫৪	...	...	নৌজেব বা নারায়ণ
১২০০	...	...	লক্ষ্মণ্য। (ইনিই শেষ রাজা) (†)

(খ) তৎপরে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আরও অনেক অনুসন্ধানের পর প্রিন্সেপ সাহেবের মতই কতক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি বিজয়সেন, লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন ও গয়াস্থ অশোক সেনের খোদিত লিপি পাইয়া

---

* সম্প্রতি ইহা বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার ৫৬ সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছি (J.A.S.B, Lxv. p. 1 No 1.)

† দেখ। J.A.S.B. 1838, pt. 1. p. 41; এবং Prinsep's Indian Antiquities (Ed. Thomas) vol. 11, p. 272.

পূর্ব্ববঙ্গে এবং সমগ্র বঙ্গে সেন-রাজগণের রাজত্বকাল ও তালিকা নিম্নলিখিত মত স্থির করিয়া গিয়াছেন ;—

পূর্ব্ববঙ্গে বা প্রকৃতবঙ্গে,—

খৃষ্টাব্দ			নাম।
৯৮৬	...	...	বীরসেন
১০০৬	...	...	সামন্তসেন
১০২৬	...	...	হেমন্তসেন

সমগ্র বঙ্গে ;—

খৃষ্টাব্দ			নাম।
১০৪৬	...	...	বিজয় বা সুখসেন
১০৫৬	...	...	বল্লালসেন
১১০৬	...	...	লক্ষ্মণসেন
১১৩৬	...	...	মাধবসেন
১১৩৮	...	...	অশোকসেন

বিক্রমপুরে,—

বল্লালসেন

সুসেন

সুরসেন (ইত্যাদি) *

(গ) তৎপরে স্যার আলেকজ্যাণ্ডার কানিংহাম দেবপাড়া, তর্পণদীঘি, বাকেরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধান করিয়া ও আইন-ই-আকবরী দেখিয়া আলোচনা করিয়া সেনরাজবংশের রাজত্বকাল ও তালিকা নিম্নলিখিত মতে শোধন করিয়া গিয়াছেন ;—

খৃষ্টাব্দ			নাম।
৬৫০	...	...	বীরসেন (আদি পুরুষ)
৯৭৫	...	...	সামন্তসেন
১৫০০	...	...	হেমন্তসেন

* দেখ J.A.S.B., vol. xxxiv. pt. 1 p. 128, xxvii, pt. 1 p. 396; এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃত *Indo-Aryans* vol. II, p. 262.

খৃষ্টাব্দ			নাম।
১০২৫	...	...	বিজয়সেন বা সুখসেন
১০৫০	...	...	বল্লালসেন
১০৭৬	...	...	লক্ষ্মণসেন
১১০৬	...	...	মাধবসেন
১১০৮	...	...	কেশবসেন
১১১৮	...	...	লাক্ষ্মণেয় (রাজত্বকাল ৮০ বৎসর, তবকত-ই-নানিবি মতে)
১১৯৮	...	...	ব্যক্তিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক বাঙ্গালা জয়।

স্যার্ আলেক্‌জাণ্ডার এই বংশের কয়েকজন রাজা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

"এইমাত্র আমরা যেমন পালরাজগণের আদিপুরুষ গোপাল সম্বন্ধে দেখিয়া আসিলাম যে, তিনি ভূ-পাল এবং লোকপাল নামেও কথিত হইতেন, সেইরূপ আমার বিশ্বাস যে, বীরসেনই সুরসেন নামে কথিত হইতেন। যে রাজাকে আমি সুরসেন বলিয়া পরিচিত করিলাম, তিনি নেপালের রাজা অংশুবর্ম্মার ভগ্নী ভোগদেবীকে বিবাহ করেন, এই অংশুবর্ম্মা হিয়োন সিয়াং-এর সমকালবর্ত্তী এবং পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী এই অংশুবর্ম্মা প্রদত্ত ৬৪৫ ও ৬৫১ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত খোদিত লিপি মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। নেপালের ঐতিহাসিক উপকরণগুলির মধ্যে ১৪ সংখ্যক খোদিত লিপিতে সুরসেন ও ভোগদেবীর পুত্রের নাম ভোগবর্ম্মা লিখিত আছে এবং ১৫ সংখ্যক খোদিত লিপিতে তিনি প্রসিদ্ধ মগধরাজ আদিত্যসেনের পুত্র বলিয়া উক্ত

---

* Rep. Arch. Sur. xv. p. 158. এই সময় তিনি একস্থানে অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন 'As A.D. 1107 was the first year after the expiry of Laksmana's reign, his death must have taken place in A.D. 1106." অর্থাৎ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের পর ১১০৭ খৃষ্টাব্দই প্রথম বৎসর হইতেছে অতএব তাঁহার মৃত্যু অবশ্য ১১০৬ খৃষ্টাব্দেই হইয়াছে।

হইয়াছেন। ইহা হইতে ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে যে, বাঙ্গালার শেষ সেন-রাজগণ প্রসিদ্ধ মগধরাজ আদিত্যসেনদেবের প্রকৃত বংশধর।" *

ডাক্তার রাজেন্দ্রলালও এইরূপে বিজয়সেনের খোদিত লিপিতে উল্লিখিত বীরসেন সম্বন্ধে বলেন যে, ইনিই আদিশূর ব্যতীত আর কেহ নহেন, ইনিই কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনাইয়াছিলেন। †

(ঘ) ডাক্তার হুরণ্লি তাঁহার বাঙ্গালার সেন-রাজগণ সমালোচনায় বলিয়াছেন,—

"বিজয়সেনই গৌড়ের পালবংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গালার প্রথম রাজা হন। তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ সামন্ত ও হেমন্ত, বাঙ্গালার রাজা নারায়ণপালের সময়ে, ১০০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ শাসন করিতেন।"

তিনি আরও একস্থলে বলিয়াছেন যে 'বিজয়সেনের অপর এক নাম আদিশূর' ‡ এবং আরও বলেন,—

"সম্ভবতঃ শেষোক্ত রাজার (নারায়ণপালের) পরবর্ত্তী রাজাই বিজয়সেন (বা সুখসেন) কর্ত্তৃক বঙ্গরাজ্য হইতে উৎসাদিত হন (বংশতালিকায় অনন্তন চতুর্থ পুরুষ হইলেও) সেনবংশের প্রথম বঙ্গরাজের বর্ত্তমানকাল প্রায় ১০৩০ খৃষ্টাব্দ। §

(ঙ) "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক পুস্তক প্রণেতা বাবু মহিমাচন্দ্র মজুমদার এ সম্বন্ধে নিজ মতামত এইরূপ লিখিয়াছেন,—"আইন আকবরীতে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভকাল লিখিত আছে। জেম্‌স্ প্রিন্সেপ সাহেবও আইন আকবরীর মতানুসরণ করিয়া, ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের রাজত্বকাল কহিয়াছেন। গৌড়ীয় হিন্দুরাজগণের সময় নিরূপণ পক্ষে আইন-

* Rep. Arch. Sur. xv.

† *Indo-Aryans* vol. II. p. 211.

‡ Centennary Review of the Researches of the A.S.B. 1782-1884, pp. 209-210.

§ *Indian Antiqray* vol. xiv. p 165.

আকবরী প্রসিদ্ধ প্রমাণ নহে। * * * রহস্য-সন্দর্ভের প্রস্তাব-লেখক (সম্ভবতঃ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল) আপন উক্তির প্রমাণ জন্য 'সময় প্রকাশ' গ্রন্থের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ১০১৯ শক না হইয়া ১০৯ শক হয়। * * * ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের রাজত্ব আরম্ভ হইয়া ১২০৩ খৃষ্টাব্দে যদি তৎপুত্র লক্ষ্মণ রাজ্যচ্যুত হন, তাহা হইলে দুই পুরুষে ১৩৭ বৎসর রাজ্যভোগ করা অসম্ভব বলিয়াই বক্তিয়ারখিলিজী কর্ত্তৃক পরাজিত লক্ষ্মণকে প্রস্তাব-লেখক বল্লালসেনের প্রপৌত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। * * * মনে কর বল্লালসেন ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) 'দানসাগর' রচনা করিলেন। তাহার ২।৪ বৎসর পরে, তাঁহার অভাব হইল। তদন্তে অর্দ্ধপ্রাচীন লক্ষ্মণসেন রাজা হইয়া ২৫।৩০ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া ১২০৩ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইলেন। মিন্‌হাজুদ্দীনের উল্লিখিত অশীতিবর্ষ বয়স বৃদ্ধত্বের পরিচয় বলিতে হইবে। রাজ্যচ্যুতকালে লক্ষ্মণসেনের ঠিক ৮০ বৎসর বয়স না হইতে পারে। * * * লক্ষ্মণসেন ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্ম্মা ও কৃষ্ণধর দেবশর্ম্মাকে ভূমিদান করিয়া যে তাম্রশাসন লিখিয়াছেন, তাহার প্রথমোক্ত শাসনে "সং ৭ ভাদ্র দিনে ৩", শেষোক্ত শাসনে "সং ২ মাঘ দিনে ১০" লিখিত আছে। সং ৭ এবং সং ২ লক্ষ্মণাব্দ বলিয়াই বিবেচনা হয়। * * * জন্ম, যৌবরাজ্য অভিষেক, প্রকৃত রাজ্যপ্রাপ্তি অথবা অন্য কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার সময় হইতে অব্দ প্রচলন হইয়া থাকে। লক্ষ্মণাব্দ যে লক্ষ্মণসেনের জন্ম সময় হইতে আরম্ভ হয় নাই, তাহা সং ২ এবং সং ৭ অব্দের ভূমিদান দ্বারা প্রমাণ হইতেছে। লক্ষ্মণসেনের যৌবরাজ্যে অভিষেককাল অথবা গৌড়ে আসিয়া রাজ্যকরার সময় হইতে লক্ষ্মণাব্দ আরম্ভ হইয়া থাকিবে। *

(চ) লক্ষ্মণাব্দ সম্বন্ধে বহু গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধে মিঃ বিভারিজ বলেন,—

"আবুল ফজলের তালিকাধৃত বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজার নাম 'নোজা' লিখিত আছে, তিনি ৩ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন (সোসাইটীর ছাপা আইন আকবরী পৃঃ ৪১৩)। এই রাজাই গ্লড্‌উইনের লিখিত 'রাজা নো' বা 'নাজা' (তিনি দুইরূপে নামটি লিখিয়াছেন) এবং ল্যাসেনের লিখিত রাজা

---

* J.A.S.B., vol. Lvii. pt. 1 p. 5.

ভোজ হইবেন। আবুলফজল বলেন যে, যখন রাজা নোজা মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন রাজ্য লক্ষ্মণের হস্তে অর্পিত হয়। ইনি নদীয়ার রাজত্ব করিতেন এবং বক্তিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন (আইন আকবরী পৃ ৪১৪)। আমার সামান্য মতে বোধ হয় এই লক্ষ্মণ আকবর নামায় লছমন নামে উক্ত ও ইহা হইতেই লক্ষ্মণাব্দ প্রচলিত হয়।" *

(ছ) ডাক্তার কিলহরণ্ এপিগ্রফিকা ইণ্ডিকা নামক পত্রে বিজয়সেন প্রদত্ত দেবপাড়া-খোদিত লিপি সম্বন্ধে প্রস্তাবে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

"ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতানুসারে (সংস্কৃত পুঁথির বিবরণী প্রথম-ভাগ পৃ ১৫১) বল্লালসেন দানসাগর গ্রন্থে আপনাকে বিজয়সেনের পুত্র ও হেমন্তসেনের পৌত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং দানসাগর ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রণীত হইয়াছে। বিজয়সেন যে নান্য ও বীর নামক রাজদ্বয়কে পরাজিত করিয়া বন্দী করিয়াছিলেন বলিয়া যে কথিত হইয়া থাকে ইহা আমি মিলাইতে পারিলাম না। আর একস্থলে 'নান্য' নামটি আমরা দেখিতে পাই (ডাক্তার বর্গেস তাহা আমাদের প্রথম দেখাইয়া দেন। নেপালের কর্ণাটক-রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতার নাম নান্যদেব। শকাব্দ ১০১৯ (১০৯৭ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার বর্ত্তমান-তার কাল বলিয়া কথিত হয়। আমাদের সমালোচ্য খোদিত লিপিখানির রচনাকাল ঐ কালের অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয় এই রাজাকে ঐ নান্য বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে (৩১৩ পৃ)। লক্ষ্মণসেন একটি অব্দ স্থাপয়িতা এবং সে অব্দ তাঁহার রাজ্যারম্ভকাল হইতে প্রচলিত, ইহা নিঃসংশয়িতরূপে বলা যায় এবং অন্যত্র আমি প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি যে ঐ অব্দ ১১১৯ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত হয় (৩০৬-৩০৭ পৃ)"

এই সকল সংক্ষিপ্ত মতামত যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহার অধিকাংশ বিষয়ের সহিতই কি কি কারণে আমার মতের মিল নাই, তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।
(সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা সম্পাদক)

---

* গৌড়ে ব্রাহ্মণ—৯০-৯৬ পৃষ্ঠা।

শিবের প্রতি।

শোনো বলি ওহে শিব কিসের কারণে
অহর্নিশি থাক তুমি ভীষণ শ্মশানে
শরীর আবৃত করি ভস্ম আবরণে
বসিয়া কিসের লাগি এ অদ্রি পাষাণে ?
কি হেতু বিরাগ তব জাগিয়াছে মনে
সংসার ভুলিয়া হেথা ব'সে নিরজনে ;
কি জটিল জটাজুট মস্তকের পরে
তাহে চন্দ্রকলা শোভে সৌম্য সুধা ঝরে।
জটা হ'তে সে পীযূষ ব'হে যায় ত্বরা
করিতে উর্ব্বর বুঝি সিঞ্চিবারে ধরা ;
তোমায় আশ্চর্য্য হ'য়ে হেরে দিকপাল--
কি লাগি হেথায় শুধু কঙ্কাল কপাল ;
তরু মর মর করে লোক নাই কেহ
কি অমৃত কর ধ্যান যেথা মৃত দেহ।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কমলানেবু।

শীতকালে সকলেই কমলানেবু খাইয়া থাকেন, কমলানেবু হইতে আমাদের দেশে মোরব্বা, চাটনি প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত হয়, এতদ্ভিন্ন অরেঞ্জসিরপ, মার্মালেড, অরেঞ্জড প্রভৃতি নানাবিধ বিদেশী দ্রব্যও কমলানেবু হইতে প্রস্তুত হইয়া এক্ষণে আমাদিগের মনোরঞ্জন করিতেছে। এই সুন্দর স্বর্ণফল কমলানেবুর নামের বিষয় জানিতে অনেকেই উৎসুক হইবেন; কমলা ও অরেঞ্জ প্রভৃতি দেশীয় ও বিদেশীয় নামগুলি কোথা হইতে আসিল, কেনই বা আসিল, কোথায় বা তাহাদের জন্মস্থান, এসকল বিষয় জানিতে পারিলে বাস্তবিকই কমলানেবুর রসাস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরও আনন্দ উপভোগ করা যায়।

বোধ হয় অনেকেই জানেন যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সচরাচর—ভারতের উত্তরে মধ্য আসিয়ায় আদি আর্য্যগোষ্ঠীর প্রথম নিবাসভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদের মতে আদি আর্য্যগোষ্ঠী সেই মূল কেন্দ্রস্থান হইতে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর নানাস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। য়ুরোপীয় ভাষাসমূহে যে সংস্কৃত শব্দের সুসদৃশ অনেক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কারণ তাঁহারা বলেন মধ্য আসিয়ার আদি আর্য্যভাষা; তাঁহাদের মতে এই মূল আর্য্যভাষা হইতে সংস্কৃত, পারসী, গ্রীক, লাটিন, জর্ম্মন প্রভৃতি ভাষা সমূহ জন্ম লাভ করিয়াছে।

কিন্তু এই আর্য্য ভাষা আমাদিগের বোধ হয় ভারতেরই শিরোভাষা—ইহাই বৈদিকী ভাষা, ইহা পরিমার্জ্জিত হইয়াই সংস্কৃত ভাষায় পরিণত। এই দেবভাষার আশ্রয়ে পৃথিবীর নানাভাষা যে সুসভ্য আর্য্য ভাষায় পরিণত হইয়াছে, ইহার নিকটে অনেক ভাষাই যে বিশেষ রূপে ঋণী তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন বহুপূর্ব্বাবধি ভারত দেশ বিদেশের বাণিজ্য ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থান ছিল সেইরূপ ভারতের ভাষাও সকল ভাষার মধ্যবিন্দুস্বরূপ ছিল। সংস্কৃত ভাষা, যে সকল আর্য্য ভাষার শিরস্থানীয় তাহা ফলমূল সম্পর্কীয় আলোচনা দ্বারাও অনেকটা প্রতিপন্ন হইবে।

ভারতের অরণ্যবাসী ঋষিরা যখন একটী দুইটী করিয়া ফলমূল আবিষ্কার করিয়া তাহাদিগের উপযোগী নামগুলি একে একে উদ্ভাবন করতঃ ভাষার ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিলেন, তখন ভারতের অরণ্য হইতে আসিয়া ও য়ুরোপখণ্ডের নানা দেশে যে কিরূপে তাহা প্রচারিত হইল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। বুঝা যায় যে বনবাসী ঋষিদিগের সাধনার ফল শুদ্ধ যে তাঁহাদের স্বদেশবাসীগণ ভোগ করিতেছেন তাহা নয় কিন্তু দূরাগত পথিকের ন্যায় বহুদূরস্থ বিদেশীয়গণও তাহার ফললাভে বঞ্চিত নহে।

জগদ্বিখ্যাত কমলানেবু কিছু বস্তুতঃ মধ্যআসিয়া বা হিমালয়জাত ফল নহে, যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়া বলিবেন, যে কমলানেবুর নাম মধ্য আসিয়াবাসীদিগের আদি আর্য্যভাষায় প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়া উহা জগতের নানাস্থানে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। যতদূর জানা যায় তাহাতে মনে হয় কমলানেবুর জন্মস্থান প্রকৃতপক্ষে ভারতের মধ্যপ্রদেশ। মধ্যভারত কমলানেবুর জন্য বহু প্রাচীনকাল হইতেই বিশেষ প্রসিদ্ধ। যখন উত্তর প্রদেশ বাসী আর্য্যেরা হিমাচল হইতে অবতরণ করিয়া ভারতের নিম্নভূমিতে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন ভারতের মধ্যপ্রদেশ তাঁহাদিগের সমক্ষে যে সকল নূতন নূতন দ্রব্য সমূহ উপহার স্বরূপে আনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কমলানেবু সর্ব্বোৎকৃষ্ট না হউক একটি উৎকৃষ্ট সামগ্রী যে বটে তাহার আর সন্দেহ নাই।

সেই প্রাচীনকালে মধ্য-ভারত নাগলোক নামে খ্যাত ছিল। এখনও আমরা তাহারই চিহ্নস্বরূপ নাগপুর, ছোট নাগপুর প্রভৃতি নাম গুলি দেখিতে পাই। মধ্য-ভারতকে নাগলোক নামে অভিহিত করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। সংস্কৃত নাগ অর্থে পর্ব্বত, হস্তি, সর্প ও জাতি বিশেষের নাম বুঝায়। "অগি সঞ্চলনে" অগ ধাতুর অর্থ সঞ্চলন, 'ন' ও 'অগ' এই দুইটি শব্দের যোগে 'নাগ' শব্দের উৎপত্তি। যাহা সঞ্চলন করে না মূল শব্দার্থ হিসাবে তাহাই প্রথম নাগ নামের যোগ্য; পর্ব্বত সঞ্চলন করেনা তাই পর্ব্বতের আরেক নাম নাগ। হস্তি ও সর্প প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রধানতঃ বিচরণ করে বলিয়া উহারাও ক্রমে পর্ব্বতের নামে নাগ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে যে জাতি মধ্য-ভারতের অরণ্যসঙ্কুল পার্ব্বত্য প্রদেশে হস্তি ও সর্পের ন্যায় বিচরণ করিত

তাহারাও নাগ নামে খ্যাত না হইয়া যায় নাই। মধ্য-ভারত প্রধানতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশ বলিয়া নাগলোক, মধ্য-ভারত সর্পও হস্তির আবাসভূমি ছিল বলিয়া নাগলোক, আবার মধ্য-ভারত পার্ব্বত্য নাগ জাতির আবাস ভূমি ছিল বলিয়া প্রাচীন ঋষিদিগের নিকট নাগলোক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই নাগলোকে প্রচুর পরিমাণে কমলানেবু জন্মে বলিয়াই ঋষিরা কমলানেবুর নাম নাগরঙ্গ দিয়াছেন। নাগলোক রঞ্জিত করিয়া থাকে বলিয়াই নাগরঙ্গ নাম হইয়াছে। এক্ষণেও সেই পুরাকালের ন্যায় নাগপুর প্রভৃতি প্রদেশ নাগরঙ্গের স্বর্ণবর্ণে শোভান্বিত হইতে দেখা যায়। এই নাগরঙ্গ নাম বহু প্রাচীনকালাবধি প্রচলিত। সংস্কৃত প্রাচীনতম বৈদ্যকগ্রন্থ চরকে নাগরঙ্গের গুণাগুণ পর্য্যন্ত লিখিত আছে—

মধুরং কিঞ্চিদম্লঞ্চ হৃদ্যং ভক্তপ্ররোচনং।
দুর্জ্জরং বাতশমনং নাগরঙ্গ ফলং গুরু ॥

(চরক)

"নাগরঙ্গ ফল মধুর, কিঞ্চিদম্ল, অন্নেরুচিকর, দুর্জ্জর (সহজে জীর্ণ হয়না), বাত নাশক, ও গুরুপাক।"

আরো একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে ভারতের মধ্য প্রদেশের ন্যায় ভারতের পূর্ব্বাঞ্চল আসাম প্রদেশও কেবল যে কমলানেবুর জন্য সুপ্রসিদ্ধ তাহা নয়, আসামভূমি নাগপুর প্রদেশের ন্যায় পার্ব্বত্য প্রদেশ বলিয়া এবং হস্তি, সর্প ও নাগ জাতির নিবাসস্থান বলিয়াও সুপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন পৌরাণিক নাগজাতির অবশেষ আমাদিগের বিশ্বাস এখনো ভারতে নাগাজাতিরূপে বিদ্যমান। খুব সম্ভব জনমেজয়ের নাগযজ্ঞের পর অবশিষ্ট নাগকুল আসামের অরণ্যসঙ্কুল গিরি-গুহায় পলায়ন করিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। আশ্চর্য্য এই যে ভারতের যে যে অংশে নাগেরা প্রবেশ লাভ করিয়াছে সেই সেই অংশ নাগরঙ্গের রঙ্গক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। যেমন আমাদের দেশে ইংরাজ জাতির প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উদ্যানে বিলাতী তরু লতাও রোপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেইরূপ সম্ভবতঃ নাগেরা যে দেশে প্রবেশ করিয়াছিল সে দেশে তাহাদের সঙ্গে তাহাদের জন্ম ভূমির 'নাগরঙ্গ' রোপন করিতে ভুলে নাই। গ্রিসীয় পৌরাণিক আখ্যানের দ্বারায়ও আমাদের এ

কথা বিশেষরূপে সমর্থিত হইতেছে দেখা যায়, সুপণ্ডিত পামার সাহেব বলেন "The sanskrit naranga contracted from "naga-ranga" (naga a serpent or snake and ranga a bright colour), is suggestive of the Dragon guarded golden apples of the Hesperides, the kingdom of the nagas." অর্থাৎ গ্রিসীয় পুরাণে সর্পরক্ষিত স্বর্ণফলের যে আখ্যান আছে তাহা ইঙ্গিতে নাগরক্ষিত স্বর্ণফল নাগরঙ্গের প্রতিই সম্ভবতঃ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। বাঙ্গালায় নাগরঙ্গকে যে কমলানেবু বলিয়া থাকে তাহার কারণ সম্ভবতঃ আসামের কুমিল্লা প্রদেশ; কুমিল্লা সিলেট প্রভৃতি স্থান হইতেই কলিকাতা অঞ্চলে কমলানেবু অধিক পরিমাণে আনীত হয়। কুমিল্লা হইতে কমলা নাম আসা কিছু আশ্চর্য্য নহে। অথবা দেখিতে অতি সুন্দর বলিয়া অরুণ-বরণা লক্ষ্মীর নামে কমলা নাম হইতে পারে।

য়ুরোপ ও আসিয়ার অধিকাংশ ভাষায় কমলানেবুর নাম সংস্কৃত নাগরঙ্গ শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। য়ুরোপখণ্ডের সকল ভাষায়ই প্রায় কমলানেবুর নাম সংস্কৃত নাগরঙ্গ হইতে উৎপন্ন। স্প্যানিশ ভাষায় 'নারাঞ্জা' (Naranza), ভিনিশীয় ভাষায় 'নারাঞ্জা' (Naranza), গ্রীক ভাষায় 'নেরাঞ্জি' (Nerantzi) বলে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে এই শব্দগুলি সংস্কৃত নাগরঙ্গ শব্দেরই অপভ্রংশ ছাড়া আর কিছু নহে আমাদের স্বদেশেও 'নারঙ্গা', শব্দ বহু প্রচলিত আছে। এমন কি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থেও 'নাগরঙ্গ' শব্দ সংক্ষিপ্তাকার প্রাপ্ত হইয়া 'নারঙ্গ' রূপ ধারণ করিয়াছে দেখা যায়। পারস্য ভাষায় 'নাগরঙ্গ'কে 'নারাঞ্জ' (Naranj) এবং আরবি ভাষায় 'নেরাঞ্জ' বলিয়া থাকে। এক্ষণে পাঠক দেখুন এক সংস্কৃত নাগরঙ্গ শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া কেমন 'নারাঞ্জ' ইত্যাদি আকার প্রাপ্ত হইয়াছে. নাগরঙ্গ যে সকলের মূলে তাহা বোধ করি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

• ইংরাজী 'অরেঞ্জ' (Orange) শব্দটীও যে নাগরঙ্গকূলোদ্ভূত তাহা এক্ষণে দেখাইতেছি। ভাষাতত্ত্বের নিয়মালোচনায় জানা যায় যে নকারাদি শব্দ অনেক সময় ভাষান্তরে প্রবেশকালে আদ্যক্ষর নকার পরিত্যাগ করিয়া যায়, কেবল স্বরবর্ণটী বজায় থাকে মাত্র। এই নিয়মে ফরাসী 'নাপ্রি'

(Naperon) শব্দ ইংরাজীতে 'আপ্রন' (Apron) হইয়াছে, নকারের লোপ হইয়াছে। * ইংরাজী 'আমপয়র' (Umpire) শব্দও প্রাচীন ফরাসী 'নমপেয়র' (Nompair) শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। † এই যেমন দেখাইলাম 'নাপরঁ' ও 'নমপেয়র' শব্দদ্বয় হইতে 'আপ্রন' ও 'আমপায়র' শব্দদ্বয় হইয়াছে, এই নিয়মে 'নাগরঙ্গ' হইতেও 'নারঙ্গ' ও 'নারাঙ্গ' এবং পরে ন লোপ হইয়া 'অরেঞ্জ' (Orange) রূপে দাঁড়াইয়াছে। ফরাসী ভাষায় কমলানেবুকে ইংরাজীর অনুরূপ 'অরাঁজ' (Orange) ও লাটিনে 'অরাঞ্জিয়া' বলে।

জর্ম্মণ ভাষায় কমলানেবুর নাম 'পমারাঞ্জ' (Pomerantz)। 'পমারাঞ্জ' শব্দ একটী শব্দ নয়, দুইটী বিভিন্ন শব্দের যোগে 'পমারাঞ্জ' শব্দের সৃষ্টি, 'পমা' অর্থে ফল ও 'অরাঞ্জ' অর্থে কমলানেবু। ইংরাজী 'পমগ্রানেট' (দাড়িম) শব্দেও ফলার্থ বাচক 'পমা' শব্দের অস্তিত্ব দেখা যায়। ভারতীয় ভাষায় যে 'মেওয়া' বা 'ময়া' শব্দে পক্ক মধুর ফল বুঝায়, য়ুরোপীয় 'পমা' শব্দটীকে তাহারি জ্ঞাতিশব্দ বলিয়াই মনে হয়। 'মেওয়া' বা 'মওয়া' শব্দ ফলের সাধারণ নাম, এই কারণে বাদাম, পেস্তা কিস্মিস্ প্রভৃতি সুমিষ্টফল 'মেওয়া' নামে সচরাচর অভিহিত হয়। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় 'সবুরে মেওয়া ফলে' বলিয়া যে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, সেখানেও 'মেওয়া' অর্থে মিষ্ট পক্কফল। 'মেওয়া' শব্দটী সংস্কৃত 'মোদক' শব্দ হইতে উদ্ভূত। ‡ সংস্কৃত মোদক শব্দ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় 'মেওয়া' 'ময়া' (মোয়া) প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা মোদন করে তাহাই মোদক, এই অর্থে মিষ্ট ফলও মোদক, সুমিষ্ট নাড়ুও মোদক এমন কি সুমিষ্ট ঔষধের নামও সংস্কৃত ভাষায় মোদক হইয়াছে। এই মোদক শব্দেরই অনুবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃত মেওয়া বা ময়া (মওয়া) শব্দেও বাদাম পেস্তা প্রভৃতি ফলকেও বুঝায়, আবার সুমিষ্ট নাড়ু ও ডেলা-

---

* "Napron' if the form found in old English, from old French 'Naperon', a large cloth. Folk Etymology.

† Umpire, old English owmpere an incorrect form of a nowmpere or nompeyre, from old Fremeh 'nompair. Folk Etymology.

‡ বদন শব্দ হইতে যে নিয়মে 'বয়ান" হইয়াছে "পাদ" শব্দ হইতে যে নিয়মে 'পায়া" হইয়াছে সেই নিয়মে 'মোদক শব্দেরও "দ" "য়" তে পরিণত হইয়া "ময়া" রূপে প্রাপ্ত হইয়াছে।

ক্ষীর প্রভৃতিকে বুঝায়। পুরাকাল হইতেই বাণিজ্য প্রভৃতি নানাসূত্রে শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ কেন সংস্কৃত প্রসূত আমাদের দেশের অনেক প্রাকৃত শব্দও য়ুরোপের উপকূলে উপনীত হইয়াছে দেখা যায়। নারাঙ্গা শব্দের ন্যায় মোদ-কোৎপন্ন প্রাকৃত 'ময়া' শব্দটীরও এইরূপে ভারত হইতে য়ুরোপে গিয়া কিঞ্চিৎ বেশ পরিবর্ত্তিত করিয়া 'পমা' রূপ ধারণ করা কিছু অসম্ভব নহে। প, ফ, ব, ভ, ম ভাষাবিজ্ঞানে এই অক্ষরগুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত সখ্য আলি-ঙ্গনে বদ্ধ। ইহারা পরস্পর পরিবর্ত্তসহ, যেমন আমরা 'আম'এর ম কে ব করিয়া অনেক সময়ে আঁব' উচ্চারণ করি, যেমন সংস্কৃত 'আত্মন' শব্দের 'ম' স্থানে 'প' বা 'ব' আসিয়া বাঙ্গালায় 'আপনি' ও হিন্দিতে 'আব' বা 'আপ' গঠিত হইয়াছে। এই কারণে ময়া (মওয়া) যে "পমা" হইতে পারে ইহা সহজেই অনুমিত হয়। মওয়া=মবা=পঁবা=পমা।

আমরা এতক্ষণ দেখাইলাম যে কমলানেবু সম্পর্কীয় নামগুলি আমাদেরই দেশ হইতে গিয়া নানা দেশে উপনিবেশ করিয়াছে; এক্ষণে কমলানেবু সম্বন্ধে আরেকটী বিষয় আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কমলানেবু প্রভৃতি অনেকগুলি নেবুই য়ুরোপীয় উদ্ভিদশাস্ত্র মতে সাইট্রস (citrus) জাতির অর্ন্তভূক্ত। বিজ্ঞানে এই সাইট্রস শব্দের অনেক ব্যবহার আছে, ইহা হইতেই বৈজ্ঞানিকেরা সাইট্রিক (citric) * প্রভৃতি নানা শব্দ সংগঠন করিয়াছেন। এই সাইট্রস শব্দটি কোথা হইতে আসিল ইহার মূল কোথায় দেখা যাউক। সংস্কৃত ভাষায় নেবু প্রভৃতি অম্লদ্রব্যের নাম 'দন্তশঠ'। অম্ল-দ্রব্যের নাম 'দন্তশঠ' এইজন্য যে অম্লদ্রব্য দন্তের প্রতি শঠতা আচরণ করে। দাঁত টকিয়া যায় বলিয়া 'দন্তশঠ' নাম; এই কারণে নেবু, কপিত্থ, তেঁতুল প্রভৃতি প্রায় সকল অম্লদ্রব্যই দন্তশঠ নামে খ্যাত।

"দন্তশঠঃ জম্বীরঃ কপিত্থশ্চ
দন্তশঠা অম্লিকা চাঙ্গেরীচ।"

'দন্তশঠ' আবার সংক্ষিপ্ত হইয়া 'শঠ' রূপে পরিণত হইয়াছে। অম্লরসে দাঁত টকিয়া যায় বলিয়া অম্লরসেরও নাম এমন কি সংস্কৃতে 'শঠ'। এই

* সাইট্রিক প্রভৃতি শব্দের অনুবাদ আমার মনে হয় 'শঠ" শব্দ হইতে করাই সংগত।

সংস্কৃত 'শঠ' শব্দই কি 'সাইট্রস' প্রভৃতি শব্দের মূল নহে? হিন্দিতে টক্‌কে যে 'খটা' বলে তাহারও মূল এই 'শঠ' শব্দই। হিন্দিতে 'শ' বা 'ষ' 'খ'র ন্যায় উচ্চারণ হয়, তাই সংস্কৃত 'শঠ' হিন্দিতে 'খট্টা' রূপে পরিণত হইয়াছে। অম্ল খাইবার পর জিহ্বার দ্বারা আমরা যে 'টক' শব্দ করি, তাহাই বাঙ্গালায় অম্লের টক নাম হইবার কারণ। নাগরঙ্গ শব্দের ন্যায় 'শঠ' শব্দও অপভ্রষ্টাকারে ভারতের নানা ভাষায় কমলানেবুকে বুঝায়; যেমন দাক্ষিণাত্যে নারাঙ্গী শন্ত্রা বলে, পশ্চিমে 'শন্থর' আসামী ভাষায় 'শুন্থিরা' বলিয়া থাকে। ইহারা সকলেই এক শঠ শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইংরাজীতে বড় এক জাতীয় নেবুর নাম সাইট্রন (citron), জর্ম্মন ভাষায় (citrone) বলিতে নেবু মাত্রকেই বুঝায়। য়ুরোপীয় সাইট্রন প্রভৃতি শব্দের সহিত ভারতীয় 'সন্থর' প্রভৃতি শব্দের যে বিশেষ সাদৃশ্য তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—উহাদের আকৃতিতেই বুঝা যাইতেছে যে উহারা একই গোষ্ঠীর। উহাদের সকলের মূলে যে এক সংস্কৃত 'শঠ' শব্দ বিরাজ করিতেছে তাহাতেই উহাদের মধ্যে এতটা ঐক্য। শন্থর প্রভৃতি শব্দ যে শঠ শব্দেরই অপভ্রংশ ইহা আমরা নিশ্চিত রূপে বুঝিতে পারি যখন দেখি যে 'ধূর্ত্ত' অর্থবোধক শঠ শব্দ, হিন্দুস্থানীতে 'শণ্ঠ' এইরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। শঠ হইতে যদি শণ্ঠ হইতে পারিল ত শন্থর ইবা না হইবে কেন?

ভারতের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ য়ুরোপ প্রভৃতি দেশে চালিত হইয়া তাহাই আবার পরিবর্ত্তিত আকারে যেমন আমাদের নিকট চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রীত হয়, ভাষা সম্বন্ধেও কি তাহাই হয় নাই? ভারতের ভাণ্ডার হইতে শব্দ-সংগ্রহ করিয়া এক সময়ে বিদেশীয় ভাষাগুলি বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে সেই শব্দগুলিরই বিদেশীয় সংস্করণ আমরা চতুর্গুণ মূল্যে ফিরিয়া পাইতেছি। আমাদের সংস্কৃত নাগরঙ্গ, শঠ, প্রভৃতি শব্দের অস্তিত্বই হয়ত আমরা জানি না, কিন্তু অরেঞ্জেড, citric প্রভৃতি শব্দগুলি বহুমূল্য ভাবিয়া আমরা কতই না যত্নে কণ্ঠস্থ করিয়াছি।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহারাষ্ট্রীয়গণের ধর্ম্মোন্নতি ও জাতীয় অভ্যুদয়।

ভারতবর্ষে দিগ্বিজয়ী মোগলগণের সার্ব্বভৌম শাসনকালে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। রাজপুতানার ক্ষত্রিয়গণ, দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়গণ ও পাঞ্জাবে শিখ জাতি মোগলশাসনের উচ্ছেদসাধন পূর্ব্বক স্বাধীন হিন্দুসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেবল মহারাষ্ট্রীয় জাতির চেষ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সফলতা লাভ করিয়াছিল। শিখ ও রাজপুতগণ যেরূপ শৌর্য্য সহকারে স্বদেশের অধীনতা পাশ ছেদন করিয়াছিলেন, শাসন বিষয়ে যদি তাঁহারা সেইরূপ শৃঙ্খলা বিধান করিতে এবং ব্যবস্থা-কৌশল ও অন্যান্য রাজকীয় গুণের বিকাশ দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বিজয়লব্ধ স্বাধীনতা-বোধ হয় এখনই এত অল্পদিনের মধ্যে বিলুপ্ত হইত না। রাজপুত ও শিখ জাতির ন্যায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুত্থান ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় অথবা কেবল জাতীয় পৌরুষগুণে সংসাধিত হয় নাই। সমগ্র জাতির বহুদিনের শিক্ষা ও সাধনা, বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ক্রমিক আভ্যন্তরীণ উন্নতি এবং বহুসংখ্যক অসাধারণ পুরুষের বাহুবল ও অতুল বুদ্ধিবৈভব প্রভৃতির সমবায়ফলে তাঁহাদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের উন্নতি রাজপুত ও শিখজাতির ন্যায় একদেশীয় না হইয়া, কেবল কতিপয় পৌরুষসম্পন্ন ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির আবির্ভাবে পর্য্যবসিত না হইয়া, জগতের অপরাপর সুসভ্য জাতির ন্যায় উহা সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে সাধিত হইয়াছিল। সুরোপিত বৃক্ষ শৈশব পরিত্যাগ পূর্ব্বক যৌবনে পদার্পণ করিলে যেরূপ ক্রমে ক্রমে সর্ব্বতোভাবে পল্লবিত ও পুষ্পফলে সুশোভিত হইয়া দর্শকের চক্ষু বিনোদন করে, এবং কিছুদিন পরে ভিন্ন ঋতুর সমাগমে ফলপত্র শূন্য হইয়া নিস্তেজভাব ধারণ করে, সেইরূপ মহারাষ্ট্রীয়গণ মুসলমানগণের কবল হইতে উদ্ধার লাভের পর মহারাষ্ট্র দেশের ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, পরভু (কায়স্থ), ধন্গার (মেষপাল) ও শূদ্রাদি বিবিধ জাতি পর্য্যায়ক্রমে উন্নতির সোপানে আরোহণ পূর্ব্বক অতুল ঐশ্বর্য্যের ও বহুবিস্তৃত ভূভাগের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে

প্রায় সকল শ্রেণী হইতেই অসংখ্য সমরকুশল দিগ্বিজয়ী বীর, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রাজনীতিবিদ্, ধর্ম্মসংস্কারক ভগবদ্ভক্ত যোগী, স্বভাব-জাত কবি ও সমাজসংস্কারক মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সভ্যতার সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিসাধন ও স্থায়িত্ববিধান করিয়াছিলেন। এই বিশেষত্ব হেতু মহারাষ্ট্রীয়গণের সৌভাগ্য গৌরব রাজপুত ও শিখ জাতির অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মবশে পূর্ব্ব-বর্ণিত বৃক্ষের ন্যায় এক্ষণে উহা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে।

ধর্ম্ম ভিন্ন কখনও কোনও জাতির বা কোনও সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। যে সকল কারণের সমবায়ে মহারাষ্ট্রীয়গণের এরূপ সর্ব্বজাতীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, মহারাষ্ট্রদেশের ধর্ম্মসংস্কার তাহাদিগের মধ্যে প্রধানতম। মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাস তাঁহাদিগের দেশের ধর্ম্মপ্রচারক ভক্ত কবিগণের জীবনের কার্য্যাবলীর সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। মহারাজ শিবাজীর জীবনের সহিত ঐ সকল সাধুপুরুষের সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ট। এই কারণে মহারাষ্ট্র জাতির বিশেষতঃ মহাত্মা শিবাজীর ইতিহাস-লেখকের পক্ষে এ বিষয়ের আলোচনা অপরিহার্য্য। ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ হিন্দুদিগের ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন স্বপ্রণীত ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ের সমাবেশ করিতে পারেন নাই। যে দুই একজন দেশীয় লেখক মহারাষ্ট্রদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় আলোচনা করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় তাঁহারাও মহারাষ্ট্রীয়গণের রাষ্ট্রোন্নতির সহিত তাঁহাদিগের ধর্ম্মোন্নতির সম্বন্ধ প্রদর্শন বিষয়ে মনোযোগী হন নাই। অতএব আমরা এ বিষয়ের সংক্ষেপে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

জগতের অপরাপর দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও সময়ে সময়ে ধর্ম্মবিপ্লব ও ধর্ম্মসংস্কার ঘটিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে আমাদিগের দেশে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরই বিশেষ প্রাবল্য ছিল। কিন্তু কালক্রমে তৎপ্রতি লোকের শ্রদ্ধা হ্রাস হওয়ায় জ্ঞানমূলক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয়। প্রায় সহস্রবর্ষপর্য্যন্ত এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। তৎপরে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যাদির যত্নে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রচারকালে উহা পরিবর্ত্তিত ও সুসংস্কৃত হইয়া যে আকার ধারণ করে, তাহা মহারাষ্ট্র

দেশে “ভাগবত ধর্ম্ম” নামে পরিচিত। ভাগবত ধর্ম্মে প্রাচীনকালের বৈদিক যাগযজ্ঞাদির ও বৌদ্ধগণের জ্ঞানমার্গের মাহাত্ম্য হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ভক্তি-প্রধান হরিসঙ্কীর্ত্তন ও ভজনপূজনাদি কার্য্য ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে যে জাতিভেদের মূল শিথিল হইয়াছিল, এই সময়ে তাহাও দৃঢ়ীকৃত হইল। কিন্তু ঐ প্রথার কুফল নিবারণের জন্য এই নবধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ, বর্ত্তমানকালের সংস্কারকগণের ন্যায় কুত্রাপি ব্রাহ্মণ-গণের প্রাধান্য লোপের চেষ্টা না করিয়া, কৌশলে ব্রাহ্মণেতর জাতির মর্য্যাদা-বৃদ্ধির উপায় বিধান করিলেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণসেবাই শূদ্রগণের পক্ষে এক-মাত্র মুক্তির উপায়স্বরূপ ছিল। এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে এই ঐশ্বরিক তত্ত্বপূর্ণ ভক্তিময় সরস ধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণের ন্যায় শূদ্রদিগেরও অধিকার জন্মিল, এই ধর্ম্মের সেবায় ঔৎকর্ষ দেখাইয়া সমাজে সম্মানলাভের পথও তাহাদিগের জন্য পরিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। এবম্প্রকার নূতন ব্যবস্থার ফলে, মহারাষ্ট্র দেশে রামদাস স্বামী ও একনাথ স্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্মণসন্তানগণ যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসীপুত্র জ্ঞানেশ্বর, বৈশ্যপ্রবর তুকারাম, শূদ্র জাতীয় নামদেব ও বোধলে বাবা ও অন্ত্যজ চোখামেলা প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তগণ তদপেক্ষা কোনও অংশে অল্প সম্মানলাভ করেন নাই। পরন্তু আজন্মকুমারী ব্রাহ্মণতনয়া মুক্তাবাই এবং কর্ম্মাবাই, জনাবাই ও মীরাবাই প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতরজাতীয়া রমণীগণও ভক্তি-প্রভাবে আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। ভারতের অপর প্রদেশেও ধর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতীয় ধর্ম্মজগতের এই অভিনব পরিবর্ত্তনের ফল, অপরাপর দেশ অপেক্ষা মহারাষ্ট্র দেশে কিয়ৎপরিমাণে স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত এই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদমূলক ভক্তিপ্রধান অসাম্প্রদায়িক ভাগবত ধর্ম্ম সংস্কৃত গ্রন্থসমূহেই আবদ্ধ ছিল, ততদিন সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ইহার অমৃতময় ফললাভের সুযোগ ঘটে নাই। বৌদ্ধযুগের অবসানের পর, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষা ও মাহারাষ্ট্রী নামক প্রাচীন প্রাকৃত-ভাষা হইতে আধুনিক মারাঠীভাষার উৎপত্তি হয়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আদি কবি মুকুন্দরাজ, জ্ঞানেশ্বর ও নামদেব প্রভৃতি খ্যাত

নামা সাধুপুরুষগণ স্বদেশীয় আপামর জনসাধারণের মধ্যে উদার ভাগবত ধর্ম্মের বহুল প্রচার মানসে নবোদিত মারাঠী ভাষায় "বিবেকসিন্ধু" "অমৃতানুভব" ও "ভাবার্থ-দীপিকা" (গীতাব্যাখ্যা) প্রভৃতি অধ্যাত্মতত্ত্বমূলক বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে উত্তরদিক হইতে মুসলমানআক্রমণের প্রবল তরঙ্গমালা আসিয়া উপর্য্যুপরি মহারাষ্ট্র দেশে আপতিত হওয়ায় আদিকবিগণের সুমহান্ উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হইল। ইহার পর প্রায় সার্দ্ধদ্বিশতবর্ষপর্য্যন্ত মুসলমানগণের কঠোর শাসনচক্রের পেষণে জর্জ্জরিত হইয়া মহারাষ্ট্রদেশ হইতে আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্যবিদ্যা বিলুপ্তপ্রায় ও মহারাষ্ট্রীয়গণের জাতীয় জীবন নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল।

এই দুঃসময়ে একনাথ স্বামী, মুক্তেশ্বর, দাদোপন্ত, আনন্দতনয়, বামন স্বামী, রঘুনাথ স্বামী, গঙ্গাধর বাবা, কেশব স্বামী, রঙ্গনাথ স্বামী, মোরয়াদেব, জয়রাম স্বামী, তুকারাম ও রামদয়াল প্রভৃতি উদারচরিত মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া মহারাষ্ট্র সমাজের ও মারাঠী ভাষার যে অনন্ত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। তাঁহারা স্ব স্ব সুখদুঃখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণপূর্ব্বক কথকতাদির সাহায্যে অতি সরল প্রণালীতে ভাগবত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া জনসাধারণের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিলেন, স্বধর্ম্মালোচনাবিমুখ, পরধর্ম্মাবলম্বন-প্রয়াসী, বিপন্ন জাতিকে স্বধর্ম্মের সুগম-পন্থা প্রদর্শন করিয়া, প্রেমভক্তির শিক্ষা দিয়া তাহার শুষ্কপ্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিলেন। একদিকে বিধর্ম্মী শাসকসম্প্রদায়ের নির্য্যাতন ও অপরদিকে দেবভাষার পক্ষপাতী, কুসংস্কারপরায়ণ, শুষ্ককর্ম্ম-কাণ্ডের উপাসক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের বিরাগ ও সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিয়া তাঁহারা স্বদেশবাসীর মঙ্গলের জন্য বহুশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক বিবিধ অধ্যাত্মগ্রন্থের রচনা করিয়া জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টিবর্দ্ধন ও মহারাষ্ট্র জাতির অমরতালাভের উপায় বিধান করিয়াছিলেন। * প্রাচীন গ্রীক ও লাটীন ভাষা হইতে ইংরাজী

* A succession of Mar thi poets inspired with the love of letters, or

প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় বাইবেলাদি ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ হওয়ায় খৃষ্টীয় যোড়শ-শতাব্দীতে ইয়ুরোপে যেরূপ দেশব্যাপী ধর্ম্মান্দোলন আরম্ভ হইয়া ইয়ুরোপ-বাসীর মোহনিদ্রাভঙ্গ ও উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল, সেইরূপ মহারাষ্ট্র-দেশেও একনাথ ও মুক্তেশ্বর প্রভৃতির চেষ্টায় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত (একাদশ স্কন্ধ) ও গীতাদি গ্রন্থের সর্ব্বজনবোধগম্য ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ হওয়ায় তৎপাঠে মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বধর্ম্ম-প্রীতি বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইল, সাধুপুরুষগণের কথকতা, সংকীর্ত্তন ও ধর্ম্মোপদেশে তাঁহাদিগের নিস্তেজপ্রাণে অতুল বলের সঞ্চার হইল ও মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জ্জনের প্রবৃত্তি বলবতী হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে একতাসংস্থাপনের পক্ষেও এই সকল সাধুপুরুষের আবির্ভাব বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

রাজপুত জাতির মধ্যে যেরূপ সম্মিলনশক্তির অভাব দৃষ্ট হয়, মহারাষ্ট্রীয়-দিগের মধ্যে সেরূপ নহে। শৌর্য্য, সাহস, সহিষ্ণুতা, সরলতা, দূরদর্শিতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণের ন্যায় সম্মিলন-প্রবণতাও মহারাষ্ট্রীয় জাতির একটী স্বভাবসিদ্ধ গুণ। কিন্তু তাঁহাদিগের, বিশেষতঃ মারাঠা ক্ষত্রিয়গণের বিবাদ-প্রিয়তা বা ভ্রাতৃবিরোধপরায়ণতা এরূপ প্রবল যে, তজ্জন্য সময়ে সময়ে তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হইতে, প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। এই এক দোষেই তাঁহাদিগের সমস্ত গুণরাশি বিনষ্টপ্রায় ও সময় বিশেষে তাঁহা-দিগের জাতীয় সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালেও পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও বিভাগ লইয়া কলহ বিবাদ মারাঠা ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বিরল নহে। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ তাঁহাদিগের এই দোষ বা ছিদ্র

with the benevolent and disinterested object of placing the knowledge of God within the reach of the ignorance, cultivated, in spite of the Mohomedan bigotry and the sneers of Sanskrit Pundits, a literature which can well meet the ordinary wants of any people and which for its purity and high line of morality and devotion would do credit to any nation on the surface of the earth. ইন্দুপ্রকাশ ৩০।১।৬৫ সংখ্যায় প্রকাশিত রাওবাহাদুর মহাদেব রানডে মহোদয়ের বক্তৃতাংশ।

অবলম্বন করিয়া শৌর্য্যশালী উগ্রস্বভাব মারাঠাগণের মধ্যে বিবিধ কৌশলে অনবরত বিবাদাগ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়া তাঁহাদিগের উপর আপনাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর অবসানকালে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাষ্ট্রদেশে যে সকল ভক্ত কবি ও সাধুপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদিগের উপদেশ ও ধর্ম্মপ্রচারগুণে নিত্য বিবদমান মারাঠাগণের অন্তর্নিহিত একতার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া তাঁহাদিগের জাতীয় অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হইল।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণের ধর্ম্মপিপাসা এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, সাধুপুরুষগণের—মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভাষায় বলিতে গেলে, "মহাপুরুষগণের" কথকতা ও সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য পল্লিবাসীগণ কষ্ট স্বীকার করিয়াও দূর দূরান্তর হইতে দলে দলে আগমন করিতেন। তদ্ভিন্ন শিবরাত্রি; রামনবমী, জন্মাষ্টমী ও প্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে যখন এক একজন মহাপুরুষের আশ্রমে অপরাপর সাধুসন্ন্যাসীগণ শিষ্যমণ্ডলীসহ সমবেত হইয়া মধুর বীণা ও মৃদঙ্গাদি সহযোগে সপ্রেম ভজন. সংকীর্ত্তন ও ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখানুসম্বলিত কথকতার দ্বারা ভক্তিমাহাত্ম্য প্রচার করিতেন, তখন সেই সকল স্থানে বহু সহস্র লোকের সমাগম হইত; এবং ধর্ম্মানুরাগ-পরায়ণ শ্রোতৃবৃন্দ হরিগুণগান শ্রবণ করিতে করিতে প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া সাধুমণ্ডলীর সহিত সংকীর্ত্তনে ও সকলে একযোগে প্রাণ খুলিয়া হরিনাম ঘোষণায় যোগদান করিতেন। বৎসরের মধ্যে বহুবার বহুস্থানে এইরূপ একই মহান্ উদ্দেশ্যে বহুলোকের সম্মিলন সংঘটিত হওয়ায় ধর্ম্মোৎসাহপ্রমত্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ের সংকীর্ণতা বিদূরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সঞ্চারিত হইতে লাগিল এবং পরিশেষে পণ্ঢরপুরের সার্ব্বজনিক ধর্ম্মমহোৎসবে ঐ ভাব পরিপুষ্ট হইয়া, মহারাষ্ট্রীয়গণের স্বাভাবিক সম্মিলনশক্তির বিকাশ হইয়া তাঁহাদিগের রাষ্ট্রীয় মহাসম্মিলনের সূচনা হইল।

পণ্ঢরপুর মহারাষ্ট্রদেশের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ-ক্ষেত্র। আষাঢ়ীও কার্ত্তিকী একাদশী উপলক্ষে প্রতিবৎসর তথায় বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় দেশের যাবতীয় সাধুসন্ন্যাসীর এই প্রসিদ্ধ মহামেলা উপলক্ষে পণ্ঢরপুরে সমবেত হইতেন। এখনকার ধর্ম্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ

যেরূপ পার্লামেণ্ট অব রিলিজন বা ধর্ম্মমহাপরিষদের সাহায্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত জ্ঞাত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, সেইরূপ সে কালে মহারাষ্ট্রদেশের যাবতীয় সাধু সন্ন্যাসীগণ পণ্ঢরপুরের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বিঠোবার উৎসব উপলক্ষে তথায় সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের সহিত তর্ক বিতর্ক দ্বারা স্ব স্ব ধর্ম্ম মত মার্জ্জিত ও গঠিত করিবার চেষ্টা করিতেন। এই সকল একত্র সমাগত সাধুপুরুষগণের দর্শনলাভ ও বিঠোবাদেবের পূজা করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ মহারাষ্ট্রীয় নরনারী নবোদ্দীপিত ধর্ম্মানুরাগভরে পণ্ঢরপুরে গমন করিতেন। তথায় কয়েক দিবস অবস্থানপূর্ব্বক ভীমানদীর পবিত্র সলিলে অবগাহন, বিঠোবা (শ্রীকৃষ্ণ) ও রুক্মিণীদেবীর পূজা, সাধুসংসর্গে সদুপদেশ লাভ, কথকতা শ্রবণ ও হরিসংকীর্ত্তন প্রভৃতি সাত্ত্বিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যাত্রীগণ পরমানন্দ অনুভব করিতেন। মহারাষ্ট্রদেশে বিশেষতঃ পণ্ঢরপুরে ধর্ম্মোৎসবকালে জাতিভেদের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় না। তথায় আব্রাহ্মণচণ্ডাল সকলেরই একস্থানে সমবেত হইয়া সংকীর্ত্তনাদি করা রীতিবিরুদ্ধ নহে। এই কারণে সেকালের নবদীক্ষিত মহারাষ্ট্রীয়গণ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ভীমা নদীর সুবিস্তীর্ণ সিকতাতটে সম্মিলিত হইয়া নৃত্যগীত-সহকারে হরিসংকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতেন। ভক্ত হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাসে, "জয় জয় রাম কৃষ্ণ হরি" ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্লাবিত হইয়া যাইত। তখন সেই ভক্তিতরঙ্গে অবগাহনপূর্ব্বক প্রেমবিবশচিত্তে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া নামগান করিতে করিতে দেহাভিমান-শূন্য হইয়া পড়িতেন। এইরূপ সাত্ত্বিকভাব-প্রণোদিত একত্র নৃত্যগীত, সপ্রেম হরিকথালাপন, মহানুভব সাধুগণের অভেদতত্ত্বমূলক উদার উপদেশ ও সার্ব্বজনীন সম্মিলনে মহারাষ্ট্রবাসীর জাতীয় ভাব সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আজিকালিকার রাষ্ট্রীয় মহাসভার (Congress) ও প্রাদেশিক সমিতির (Provincial conference) বার্ষিক অধিবেশনফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষিতগণের মধ্যে যে সহানুভূতির সঞ্চার হইয়াছে, মহারাষ্ট্রদেশের তদানীন্তন সাধুপুরুষগণের যত্নে রামনবম্যাদি পর্ব্বোপলক্ষে ও পণ্ঢরপুরের ষান্মাসিক ধর্ম্মমহোৎসবে সার্ব্বজনিক সম্মিলনে শিক্ষিতাশিক্ষিত আচণ্ডাল সর্ব্বজাতির মধ্যে তদপেক্ষা সমধিক সহানুভূতি ও স্বধর্ম্মরক্ষার প্রবলাকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণের এই প্রবল

স্বধর্ম্মানুরাগ অবশেষে তাঁহাদিগকে স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য মুসলমানদিগের উচ্ছেদ-সাধনে উৎসাহিত করিয়াছিল। যাঁহারা এই কার্য্যসম্পাদনের জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের অধিনায়কের নাম মাহাত্মা শিবাজি।

মহারাষ্ট্রদেশের ন্যায় ভারতের অপরাপর প্রদেশেও এইরূপ ভক্তি-প্রধান উদারধর্ম্ম ও সার্ব্বজনিক মহোৎসবাদি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; কিন্তু অন্যত্র উহা মহারাষ্ট্রদেশের ন্যায় অভিনব সুফল প্রসব করে নাই। বলা আবশ্যক মহারাষ্ট্রীয়-গণের স্বাভাবিক স্বাধীনতানুরাগ ও সম্মিলনপ্রবণতাই এইরূপ ফলভেদের এক প্রধান কারণ।

শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর।

চক্রবাকের প্রেম

পদ্মার বালুকাময় পুলিনে পুলকে,
দেখিছ খেলিছে আহা রাশি চক্রবাক।
দলে দলে খেলে জলে প্রভাত আলোকে,
নিশীথে তাদের ভাব দেখিয়া অবাক—
দুটীতে দুটীর যাবে বিপরীত দিকে,
তখন তাহারা দোঁহে রহে কি গো সুখে!
কি জানি কেমন ক'রে রহে তারা টিকে;
বিরহ বেদনা ভুলে রহে ফুল্লমুখে!
প্রভাতে জাগেরে পুন মিলন মাধুরী,
একি রে কৌশল প্রেমে কি আছে চাতুরী;
বিধি এ বিহগে হেন কেন গো করহ,—
প্রভাতে মিলন খেলা নিশীথে বিরহ!
বিধি! নারিগো বুঝিতে একি তব রীত,
নিশীথে করিলে তুমি দোঁহে বিপরীত।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানব হৃদয়ে চিত্রের প্রভাব।

এই অনন্ত গগনতলে অগণন ভুবন, গিরি, নদী, বন, উপবন, লোকলোকান্তরের আবির্ভাব অন্তর্দ্ধানের বিষয় যখন ভাবি, তখন এই অন্তহীন চিত্রের প্রভাব হৃদয়ঙ্গম না করিয়া থাকা যায় না।

"কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি !"

বিশ্বজগতের প্রকৃতিই প্রকৃত চিত্র, ইহাতে বিধাতার প্রকৃষ্টরূপ কৃতি অর্থাৎ কারুকৌশল প্রকাশিত। ইহারই ক্ষীণছায়া-মাত্র লইয়া মানবের অন্তরে চিত্রের জন্ম হইয়াছে। 'চিত্র' চি ধাতু হইতে আসিয়াছে (চি চয়নে), অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাব সমূহ আমরা প্রকৃতিরূপ কল্পবৃক্ষ হইতে চয়ন করিয়া নানাবিধ কল্পনায় আলিখিত করিতে প্রয়াস পাই। অথবা (চিৎ+ত্রৈ) যাহা চিত্তকে বিস্মৃতি হইতে ত্রাণ করে তাহাই চিত্র। এই চিত্রের প্রতি মনুষ্য মাত্রেই স্বভাবতঃ আকৃষ্ট। যখন অক্ষরের প্রচলন হয় নাই, তখন মনুষ্যেরা চিত্রাক্ষরের দ্বারাই প্রায় সচরাচর নিজ মনোভাব সকল ব্যক্ত করিতে চেষ্টা পাইত। আদিকাল হইতেই মানবের চিত্রের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়। বর্ত্তমানকালে সভ্যজাতিরা তরুমূলে, পর্ব্বত-কন্দরে, গিরিগাত্রে, তাহার প্রচুর নিদর্শন পাইয়াছেন। খোদিত মূর্ত্তি, চিত্র প্রভৃতি পৃথিবীর নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মনুষ্য যেখানে সুযোগ পাইয়াছে, চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখা যায়, এমন কি নিজ দেহে পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তাই মানবের অন্তরে চিত্রের ভাব স্বভাবতঃ নিহিত আছে বলিয়াই বোধ হয়। তাহাকে জাগাইয়া তুলিলেই তুলিতে পারা যায়। সেই অঙ্কুর জাগাইয়া তুলিতে গেলে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের আবশ্যক প্রথমতঃ দর্শন, দ্বিতীয়তঃ রসানুভূতি এবং তৃতীয়তঃ অঙ্কন। এই বিষয়ত্রয়ের সাহায্যে বা সাধনায় তবে একজন যথার্থ

কারু * হওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঐ তিনটি বিষয় সম্ভব হইত না যদি না জগতে আলো ছায়া বলিয়া দুইটি জিনিষ থাকিত। এই দুয়ের বলেই ছবি ফুটিয়া ওঠে; না হইলে জগত চিত্রহীন হইয়া উঠিত। যদি শুদ্ধ আলো থাকিত, তাহা হইলে সমুদয় সাদা কাগজের ন্যায় প্রতীয়মান হইত, যদি শুদ্ধ কালো থাকিত তাহা হইলেও সকলই শূন্য দেখাইত। কিন্তু আলো কালো এই দুইটি যুগল মূর্ত্তির সহায়তায় চিত্রের কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই দুইটিরই প্রভাবে চিত্রকবি চিত্রকাব্য রচনায় সমর্থ হয়েন। এই আলো কালো যেন মিথুনভূত হইয়া স্থিতি করিতেছে। ইউরোপীয়েরা এইরূপ ভাববিন্যাসকে এক কথায় chiaro-scuro বলেন chiaro অর্থে দীপ্তি এবং scuro (obscure) অর্থে অন্ধকার। এই প্রকার ভাব বৈদিক ঋষিরাও অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই দুইভাব না থাকিলে জগতে নানাবিধ ছবি ফুটিতে পারে না। তাঁহারা দেবতাদিগের স্তব করিতে গিয়া গাহিয়া গিয়াছেন;—"নানা চক্রাতে যম্যাবপূংষি তারারণ্যদ্রোচিতে কৃষ্ণ মন্যং। শ্যাবী চ যদরুষীচ" * * মিথুনভূত অহোরাত্রি নানাবিধ রূপ ধারণ করে। তাঁহারা যেন শ্যাবীবর্ণা ও অরুষবর্ণা ভগিনীদ্বয়। তাঁহাদের একজন দীপ্তি পাইতেছে, অপরটী কৃষ্ণ। আরও এই মিথুনভূত ভাবটীর ছায়া আমাদের দেশের রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। কৃষ্ণের কালো-মূর্ত্তি ও রাধার আলোমূর্ত্তি।

জগতে এই আলোকালোর লীলা লইয়াই রাধাকৃষ্ণের লীলা। এই লীলায় কে না মোহিত হয়। এই আলোকালোর ভাবে মুগ্ধ হইয়া বঙ্গকবি গাহিয়াছেন—

"দুহার রূপের নাহিক উপমা প্রেমের নাহিক ওর
হিরণ কিরণ আধবরণ
আধনীলমণি জ্যোতি।"

* বৈদিক ঋষিরা এই কারু শব্দকে কলাকৌশলবিৎ কবি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যথা প্রহুব আপো মহিমান মুত্তমং কারুর্বোচাতি।" "হে জলগণ! তোমাদের উত্তম মহিমা কবি ব্যাখ্যা করিতেছেন।" কারু শব্দ চিত্রকবি "আর্টিষ্ট" অর্থে সাধারণতঃ প্রযুজ্য হইতে পারে।

এই আলোছায়া লইয়াই আমাদের সংসারে সকল প্রকার চিত্রাঙ্কণ সম্ভব হয়। ধর্ম্মপ্রবণ হিন্দু আর্য্যঋষিগণ চিত্রকার্য্যে এই আলোছায়ার মাহাত্ম্য রীতিমত বুঝিতেন, তাঁহাদের মত আলোকছায়ার মাহাত্ম্য কোন দেশের লোকে বুঝিয়াছিল কিনা সন্দেহ। তাঁহারা আধ্যাত্মিক প্রকৃতি পর্য্যন্তও এই আলোছায়াতে ফুটাইয়া গিয়াছেন। উপনিষৎকার ঋষি, ব্রহ্মবিৎ প্রকৃত ধার্ম্মিক হৃদয়ের চিত্র এইরূপ আলোছায়াতেই ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি ব্রহ্মবিৎ ধার্ম্মিকের স্বভাব আলো আঁধারে বিক্রীড়িত করিয়া তাহাকে অপূর্ব্ব রঙে রঞ্জিত করিয়াছেন, কি মধুর-মহান ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন!—

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥"

"আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে। 'আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে' এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমাদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।" ব্রহ্মবিৎ ধর্ম্মজ্ঞের যথার্থ ছবি কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রে এরূপ পাওয়া যায়।

এই আলোছায়ার ভাব হইতেই আমাদের অন্তরে আধভাবের সৌন্দর্য্য জাগ্রত হয়; আমরা স্বইচ্ছায় যেন কতকটা রহস্য রাখিয়া সৌন্দর্য্য প্রকাশিত দেখিতে ইচ্ছা করি, কতকটা জিনিষ যেন অন্তরাল করিয়া অঙ্কিত করিতে সাধ যায়। দেখিয়া থাকিবেন যে অনেকে ফোটা তুলিবার সময় 'হাফফেস' 'থ্রি ফোর্থ ফেস,' তুলিতে পছন্দ করে। এইরূপ ফটো তুলিবার ভাব আমরা বর্ত্তমানবস্থায় মুখ্যভাবে ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু মোটের উপর চিত্রের এই রহস্যময় ভাব আপনা হইতেই আমাদের মনে আইসে। ইহার প্রভাব সর্ব্বত্র প্রায় সমান রূপে পরিলক্ষিত হয়; কারণ ইহা স্বাভাবিক।—এই অর্দ্ধরহস্যের ভাব সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান। কতকটা অন্তর, কতকটা বাহির লইয়া সমস্ত প্রকৃতিরই চিত্র। মানব প্রকৃতি সেইহেতু এই ভাবের মাধুরীতে এই রহস্যপ্রান্তে সহজেই আকৃষ্ট হয়। কি বিদেশীয় কি স্বদেশীয় সকলেই এই অর্দ্ধ রহস্যে মোহিত। ইংরাজ কবি Keatsয়ের ইহাতে কি

মুগ্ধতা দেখুন ;—"The dashing point poured on, and where its pool lay half a-sleep in grass and rushes cool."

আবার তিনি আরেক স্থলে মানব প্রকৃতিরও এই আধভাবে মোহিত হইয়া গাহিয়াছেন:—"Watch her half smiling lips." আমাদের বঙ্গকবি বলরাম দাসও মুগ্ধ হইয়া এই প্রকারই গাহিয়াছেন "আধচরণে আধ-চলনি আধ মধুর হাস" আরও "মন্থর চলনখানি আধ আধ যায়।" বিদ্যাপতির গানেও আছে "আধ-আচর খসি, আধ-বদনে হাসি, আধহি নয়নতারা।" বক্ষস্থলের অর্দ্ধ সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া বিদ্যাপতি অন্যত্র গাহিয়াছেন,—'আধ-লুকায়ল, আধ উদাস' প্রকৃতিতে হেলাফেলা ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ আলো-ছায়ার খেলা দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাপতি এই উদাস কথাটীর যোগে এখানেও অনেকটা সেই ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন।

কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসও এই অর্দ্ধরহস্যের মধুরিমায় আকৃষ্ট! বিক্রমোর্ব্বশীতে আছে "প্রিয়শ্চরিতং লতে ত্বয়া মে গমনেঅস্যাঃ ক্ষণবিঘ্নমাচরন্ত্যা যদিয়ং পুনরপ্যরালনেত্রা পরিবৃত্তার্দ্ধমুখী ময়াদ্য দৃষ্টা। রাজা বলিতেছেন, "হে লতে তুমি ক্ষণকালের জন্য এই উর্ব্বশীর গমনবাধা উৎপাদন করিয়া আমার প্রিয় আচরণ করিয়াছ যেহেতু আমি অরালনয়নার অর্দ্ধমুখ ফিরান আবার দেখিতে পাইলাম।" এই অর্দ্ধরহস্যের যে কি মাধুরী তাহা হৃদয়ে অনুভব করা যায়, তর্কে বুঝান যায় না।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শাস্ত্রে রমণীর সম্মান ও আত্মরক্ষা।

আমরা পূর্ব্বাবধি দেখিয়া আসিয়াছি যে মনুপ্রমুখ ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষিগণ পতি-সেবাকে নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্ব অথবা সতীত্বের মধ্যবিন্দু এবং গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্মকে পরিধিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া আর্য্যসমাজকে এক আশ্চর্য্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সমাজচরিত্র-জ্ঞানের পরিচয় পাশ্চাত্য জগতের রমণীকুলভূষণ মহারাণীর আদর্শ গার্হস্থ্যজীবনে আমরা বিশেষ রূপেই প্রাপ্ত হইতেছি। ঋষিদিগের জ্ঞানের এত প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াও বর্ত্তমান মহিমান্বিত যুগের অনেক শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি যে মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন না তাহা জানি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহারা নিজে যে সকল প্রলাপ বকিবেন, তাহাই তাঁহারা বেদ-বাক্যরূপে প্রচার করিতে সচেষ্ট এবং তাঁহাদের দুরাশাও বড় কম নহে যে, তাঁহারা অপরাপর জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের সেই সকল প্রলাপ বাক্য বেদবাক্য বলিয়া গৃহীত হইবার আশা করেন। এই সকল শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিরা প্রকৃত শিক্ষিত নহেন, তাঁহারা শাস্ত্রের মর্ম্ম-সংগ্রহে অক্ষম হইয়া কেবল দোষদর্শনে অভিজ্ঞ হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকটে শাস্ত্রের সহস্র গুণও দুর্লক্ষ্য, কিন্তু, শাস্ত্রের ভ্রম থাকুক বা না থাকুক, তাঁহারা শাস্ত্রের একটির পর একটি করিয়া ভ্রম বা দোষ বাহির করিতে অসাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট। এক কথায়, শাস্ত্রসমূহকে কর্ম্মনাশা নদীর গর্ভে চিরকালের জন্য ফেলিতে পারিলে তাঁহারা ভুলিতে চাহেন না। এই সকল শিক্ষিতাভিমানী ও পাশ্চাত্য উদ্ধতভাবে গঠিতহৃদয় ব্যক্তি আমার শাস্ত্রসমর্থক বাক্য শুনিয়া আমার প্রতি যে ভ্রূ কুঞ্চিত করিতে বিরত হইবেন না, আমার এরূপ আশঙ্কা হয়। এরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিসংহিতাগ্রন্থে একটীও স্থানে স্ত্রীলোকদে বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই। স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা, স্ত্রীলোকের অস্বতন্ত্র থাকিবার কথা, গৃহকর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবার কথা, এই সকল বিষয় অতিস্বাধীনতাপ্রিয় পাশ্চাত্যদিগের সুতরাং এখানকার শিক্ষিতাভিমানীদিগেরও চক্ষে অকর্ম্মণ্যতার নামান্তর এবং অযৌক্তিক প্রতীয়মান হইলেও সংহিতাগ্রন্থসমূহে সমর্থিত হইয়াছে; কিন্তু যে

সাহিত্য, গণিত প্রভৃতির শিক্ষা ইহাঁদিগের চক্ষে রমণীয় বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহার একটী কথাও, এক কথায় স্ত্রীলোকদিগকে বিদুষী করিবার কথা সমগ্র সংহিতাগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, এরূপ বিদ্যাশিক্ষার কথা না থাকিলেও মনুপ্রমুখ সংহিতাকার ঋষিদিগের ভ্রম দৃষ্ট হইতেছে না। বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে তাঁহারা যে কেন একটীও কথা বলেন নাই, তাহার কারণ যথাসময়ে উল্লিখিত হইবে; তাহার পূর্ব্বে তাঁহারা স্ত্রীজাতির পাতিব্রতা, গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে এত বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলেন কেন, তাহাই দেখা যাউক্।

মনুসংহিতা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, তাহা রচিত হইবার সমসময়ে মনু একদিকে যেমন সাধ্বী রমণীর রমণীয় সতীত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দেবীর উপযুক্ত ভক্তি অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, অপরদিকে ব্যভিচারস্রোতও কিছু বেশী রকম প্রবাহিত হইতে দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন; অনুমান হয় যে, এই সময়ে স্ত্রীজাতির অধিকার সম্বন্ধীয় দারুণ অশান্তিজনক এক মহা আন্দোলন উঠিয়া ব্যভিচার-স্রোত বর্দ্ধিত করিবার বড়ই সহায় হইয়াছিল। এই আন্দোলনসূত্রে বর্ত্তমানকালের ন্যায় প্রশ্ন উঠিল যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ করিতেই হইবে অথবা পানাহার ও যথেচ্ছ বিহরণ বিষয়ে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতাই বা না থাকিবে কেন ইত্যাদি। মহর্ষি মনু এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া অশান্তির স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। মনু আন্দোলনকারীদিগকে বুঝাইতে পারিয়াছিলেন যে, একদিকে স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষা করা অত্যন্ত কর্ত্তব্য— দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিতে পারি যে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার বহু-শতাব্দীপূর্ব্বে মনুই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোককে পথ ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে; পুরুষের অপেক্ষা যে স্ত্রীর বেশী সম্মান ছিল, তাহা পতিত স্ত্রীর প্রায়শ্চিত্তেই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু অন্য-দিকে তিনি বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের সতীত্বের পথ হইতে অতি সামান্য-মাত্র মন্দ প্রসঙ্গ অপসারিত করা কর্ত্তব্য। মনু একদিকে বারম্বার বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকেরা গৃহলক্ষ্মীস্বরূপে পূজার্হ; অপরদিকে 'দুষ্ট

স্ত্রীলোক বিশেষ অপরাধ করিলে তাহার মস্তক ভিন্ন পৃষ্ঠদেশ প্রভৃতি স্থানে স্বামীকর্তৃক বেত্রাহত হইবারও বিধি দিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে স্ত্রীজাতির মাতৃত্ব পরিস্ফুট করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া তিনি আন্দোলনকারীদিগের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে স্ত্রীলোকের বিবাহ করা কর্ত্তব্য প্রজনার্থ অর্থাৎ মাতৃত্ব বিকশিত করিবার জন্য—মাতৃত্বই স্ত্রীলোকের বিশেষত্ব ও সর্ব্বোচ্চ অধিকার; এবং এই মাতৃত্ব বিকশিত করিতে গেলে স্ত্রীলোকের পতিগতপ্রাণ হইতে হইবে—পাতিব্রত্য ব্যতীত নিষ্কলঙ্ক মাতৃত্ব পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা নাই। সতীত্ব রক্ষা করিতে গেলে স্ত্রীলোকের মদ্যপান, পরগৃহবাস প্রভৃতি পানাহার ও যথেচ্ছ বিচরণ সম্বন্ধে স্বাধীনতা, যাহার অপর নাম স্বেচ্ছাচারিতা, তাহা দূর হইতে সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। একমাত্র অবরোধপ্রথাই এই স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণের প্রধান ঔষধ। মনু অন্য কোন কারণে নহে, কেবল স্বেচ্ছাচারিতার ঔষধরূপেই স্ত্রীলোকের অন্তঃপুরে থাকিয়া পতি পুত্র প্রভৃতির সহিত অস্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কেহ যেন মনুপ্রবর্ত্তিত অবরোধপ্রথাকে মুসলমানগণকর্ত্তৃক অথবা তাহাদের ভয়ে প্রবর্ত্তিত কঠোর জেনানাপ্রথার ন্যায় বোধ না করেন। তীর্থদর্শন, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মসাধনোপযোগী কার্য্যস্থলে, আত্মীয়স্বজন, বিশেষত পতির সমভিব্যাহারে হিন্দুরমণীর স্বাধীনতা চিরকাল ছিল এবং এখনও আছে। ধর্ম্মকার্য্যে হিন্দুরমণীকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে কোন হিন্দুই দ্বিধা করেন না—আমি নিজে কত সধবা বিধবা রমণীকে আত্মীয়স্বজনের সহিত তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া পদব্রজে হিমালয়ের সন্নিহিত প্রদেশ হইতে যাত্রা করিয়া এই বঙ্গদেশের সীমান্তে উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি এবং হিন্দুরমণীর দেবভক্তি দেখিয়া এক অপূর্ব্ব ভক্তিরসে বিগলিত হইয়াছি। ধর্ম্মের নামে ও পতির কার্য্যে পতিপ্রাণা হিন্দুরমণী বিলাসবিভ্রম, সঙ্কোচ, মান বিভব প্রভৃতি সকলই অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। মনুর উপদেশ ও অনুশাসন হিতকর বলিয়া আন্দোলনকারীগণ এবং জনসাধারণও বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, কারণ তাঁহারই প্রবর্ত্তিত নিয়ম স্থান ও অবস্থাভেদে একটু আধটু পরিবর্ত্তন সহকারে সমগ্র ভারতভূমিতে অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার ন্যায় ঋষি-

দিগের কৃপায় যে ভারতের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, ব্যভিচারস্রোত কিরূপ কমিয়া গিয়াছিল, সতীসাধ্বীর আবাসভূমি বলিয়া এই পুণ্যশ্লোক ভারতবর্ষের যে কিরূপ খ্যাতি হইয়াছিল, বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক ছাত্রেরাও ইতিহাসে তাহার সাক্ষ্য পাইতেছে।

মনু অবরোধপ্রথা যে স্বীয় মস্তিষ্ক আলোড়ন পূর্ব্বক নূতন আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি যে বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যলাভের যোগ্য নহে", এবং "স্ত্রীলোকেরা গৃহে রুদ্ধ থাকিলেও আত্মরক্ষিত না হইলে অরক্ষিত", ইহাতেই আমাদের এরূপ অনুমান করা বোধ করি অসঙ্গত হইবে না যে, মনুসংহিতার বহুপূর্ব্ব হইতেই অবরোধপ্রথা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের আবহমানকাল হইতে এক সংস্কার চলিয়া আসিতেছে যে, মনুস্মৃতির পূর্ব্বেই বৈদিককাল। অনেকে ইহা অস্বীকার করিলেও আমরা ইহার বিরুদ্ধে বিশেষ প্রমাণ না পাইলে এই সংস্কার পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। বরঞ্চ মনুস্মৃতির অনেকস্থানে আমরা বৈদিককালের ছাঁয়া অনুভব করিতে পারি। সুতরাং মনুসংহিতার বহুপূর্ব্বাবধি স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা কিরূপ ছিল দেখিতে গেলে দেখিতে হইবে যে বৈদিককালে স্ত্রীলোকের অবস্থা কিরূপ ছিল। ঋগ্বেদ, গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি শ্রুতিগ্রন্থ এই অনুসন্ধান বিষয়ে আমাদের একমাত্র অবলম্বন। অনেকের ধারণা আছে যে শ্রুতিগ্রন্থে, অন্ততঃ ঋগ্বেদে, বৈদিককালের স্ত্রীলোকদের পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতা, অর্থাৎ তাঁহারা যাহাকে স্বাধীনতা বলেন তাহা ছিল এবং তখন বাল্যবিবাহ বা অবরোধপ্রথাও ছিল না; এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের ইহাও ধারণা আছে যে মনু অন্ততঃ এই কয়েকটী বিষয়ে বেদবিরুদ্ধ পথে গিয়া সমাজের যথেষ্ট অকল্যাণ সাধন করিয়ছেন—অর্থাৎ মনুই সর্ব্বপ্রথম বাল্যবিবাহের সঙ্গে সঙ্গে অবরোধপ্রথার প্রবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের আর একটী সংস্কার এই যে যৌবনবিবাহ ও স্ত্রীস্বাধীনতা এবং বাল্যবিবাহ ও অবরোধপ্রথা পরস্পর একান্ত সহযোগী। বলা বাহুল্য যে তাঁহারা এই উভয় প্রকার সংস্কার পাশ্চাত্যপণ্ডিতদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আপনাদের স্বাধীনচিন্তা প্রয়োগ করিতে অবসর পান নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অধ্যবসায় ও গবেষণার প্রতি যথো-

চিত সম্মান দেখাইয়াও আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, বৈদিককালের স্ত্রীলোকদের অবস্থা পর্য্যালোচনাকালেই দেখিতে পাইব যে তাঁহাদের এই সংস্কার ভ্রান্ত। মনু নিজেও বলিয়াছেন যে তিনি যে কোন ব্যক্তির যে কোন ধর্ম্ম বলিয়াছেন, সে সকলই বেদে অভিহিত হইয়াছে, (১) এবং সকল শাস্ত্রকার একবাক্যে মনুসংহিতার বেদমূলকত্বহেতু শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন (২); আমরাও দেখিব যে প্রকৃতই মনু বেদেরই অনুসরণ করিয়া অবরোধপ্রথা রক্ষা করিয়াছেন এবং নিতান্ত আবশ্যক না হইলে বাল্যবিবাহ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস যে শ্রুতিগ্রন্থে যে সকল বিধি ও বৈদিক কালের আচারপদ্ধতি দৃষ্ট হয়, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মনু তাঁহার সংহিতায় সেই সকল বিধিবদ্ধ করিয়া সংস্কৃত আকারে আমাদের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন।

বেদ খুলিলেই দেখিতে পাই যে দেবোদ্দেশে যাগযজ্ঞ তখনকার একটী প্রধান কার্য্য ছিল। ধর্ম্মসাধন এই সকল ক্রিয়াকলাপে স্ত্রীলোকেরা কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া যোগ দিতেন। বেদে আছে "যে যজ্ঞে নারী প্রবেশ ও তথা হইতে বহির্গমন অভ্যাস করে;" "যখন * আর্য্য * * দীর্ঘ সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকেন, তখন পত্নী * * অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে যজ্ঞগৃহে আহ্বান করেন।" (৩) অনেকস্থলে দেখা যায় যে স্ত্রীপুরুষে একত্র যজ্ঞ নিষ্পাদন করিতেন। (৪) মনুসংহিতায় আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে স্ত্রীলোকের যথেষ্ট সম্মান ছিল; বেদে দেখিতে পাই যে বৈদিককালেও স্ত্রীলোকেরা যথেষ্ট সম্মানিত হইতেন। বেদে আছে "যদি পিতামাতা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই উৎপাদন করেন, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ক্রিয়াকর্ম্ম করেন এবং অন্য সম্মানিত হয়েন।" (৫) বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

(১) যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
সসর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥

(২) মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।

(৩) "যত্র নার্য্যপচ্যবমুপচ্যবং চ শিক্ষতে।" ঋ ১ম, ২৮ সূ

"যদা সমর্যং ব্যচেদৃঘাবা দীর্ঘং যদাজিমভ্যখ্যদর্যঃ।
অচিক্রদ্বৃষণং পত্ন্যচ্ছা দুরোণ আনিশিতং সোমসুদ্ভিঃ॥ ৪ম, ২৪সূ, ৮ঋ

(৪) ভবতে মর্যো মিথুনা যজত্রঃ।" ১ম, ১৭৩সূ, ২ঋ

(৫) "যদী মাতরো জনয়ন্ত বহ্নিমন্যঃ কর্ত্তা সুকৃতোরণ্য ঋন্ধন্॥ ৩ম, ৩১সূ, ২ঋ

করিয়া 'জায়াই গৃহ' (ঋগ্বেদ, ৩ম, ৫৩সূ, ৪থ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা গৃহসূত্রেও স্ত্রীলোকের প্রতি ঠিক এইরূপ উচ্চ সম্মানের কথা দেখিতে পাই। গোভিলীয় গৃহসূত্রে দেখি 'গৃহাঃ পত্নী" (১) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং গৃহ্য অগ্নিতে হোম করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে।

উপরে যে সকল উক্তি উদ্ধৃত হইল, তাহাতে স্পষ্ট অনুমান হয় যে, বৈদিক কালে আর্য্যেরা স্ত্রীলোকের যথার্থ সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানিতেন। ঋষিরা স্ত্রীলোককে প্রধানতঃ গৃহকার্য্যেরই উপযোগী বলিয়া ভাবিতেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহারা ধর্ম্মসাধন যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের কালে অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; তবে বাহিরে আসিবার কালে সংবৃত হইয়া আসিতেন। (২) অন্যান্য বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলেও দেখা যায় যে তাঁহারা সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইতেন। বিবাহের পর যখন বধূ নববিবাহিত স্বামীর সহিত স্বামীগৃহে উপস্থিত হইতেন, তখন সুলক্ষণা পুরন্ধ্রীগণই তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক যান হইতে অবতরণ করাইতেন। (৩) আবার দেখা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন পড়িলে বৈদিক-রমণী সমরক্ষেত্রে দাঁড়াইতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০২ সূক্তে দেখা যায় যে মুদ্গলঋষির পত্নী কিরূপ বীরত্বের সহিত শত্রুপক্ষের গাভীহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। এইরূপ দুই চারিটী ব্যতিরেকস্থল দেখা যায় বলিয়া যে তখন অবরোধপ্রথা ছিল না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। বরঞ্চ Exception proves the rule, এই প্রবচনের দ্বারা বৈদিক কালে অবরোধপ্রথার অস্তিত্বই সপ্রমাণ হইতেছে। একটী নিয়ম সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই যে লোকে সাধারণ কোন ঘটনার উল্লেখ করিতে উদ্যুক্ত নহে। বায়ু বহিতেছে, প্রাণীমাত্রেই উদর পূরণ করিয়া থাকে এই

(১) ইহার অর্থে শ্রদ্ধাস্পদ সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় করিয়াছেন—"পত্নী গৃহকার্য্যের উপযোগিনী" আমার কিন্তু বোধ হয় যে বেদের অনুসরণ করিয়া "পত্নীই গৃহ" এইরূপ অর্থ করিলেই সুসঙ্গত হইত। গোভিল গৃহ্যসূত্র ১প্র, ৩খ, ১৫সূ দেখ। স্মৃতিশাস্ত্রেরও "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"; এই উক্তি দ্বারা শেষোক্ত অর্থই সমর্থিত হইতেছে।

(২) ঋগ্বেদ ৮ম, ১৭সূ, ৭ঋ; ২৬সূ, ১৩ঋ দেখ।

(৩) গোভিল গৃহ্যসূত্র, ২প্র, ৪খ, ৬—৯

সকল সাধারণ ঘটনা অতি প্রয়োজনীয় ঘটনা হইলেও কে তাহা লক্ষ্য করে এবং কয়খানা পুস্তকেই বা তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়? কিন্তু যদি একদিন বিষম ঝটিকা আসিল অথবা যদি কোন প্রাণী উদর পূরণ না করিয়া বহুদিবস সুস্থশরীরে জীবিত থাকিল, তবেই দেখিতে দেখিতে পুস্তকে পত্রিকায় তাহার কত ভাবে, কত ছন্দে উল্লেখ দেখা যায়। এই নিয়ম সত্য হইলে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে বৈদিক কালে অবরোধ-প্রথা আর্য্যদিগের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া বেদে তাহার কোনই উল্লেখ দেখা যায় না; কেবল যে যে বিশেষ ঘটনাসূত্রে কোন বিশিষ্ট রমণী অথবা সাধারণত স্ত্রীলোকমাত্রেই অন্তঃপুরে আবদ্ধ না থাকিয়া প্রকাশ্যে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ দেখিতে পাই। এই সকল প্রমাণ অবলম্বনে আমাদের অনুমান হয় যে বৈদিক কালাবধি আর্য্য-দিগের মধ্যে অবরোধপ্রথা প্রচলিত ছিল, এবং মহর্ষি মনু স্ত্রীলোকদিগের মাতৃত্ব বিকশিত করাইবার জন্য তাহা বিধিবদ্ধ করিয়া, একটা প্রণালীর মধ্যে আনয়ন করিয়া বলিয়া গেলেন যে "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্র্যের যোগ্য নহে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গোবিন্দজীর মন্দির।

"While stands the coliseum, Rome shall stand.
When falls the coliseum, Rome shall fall".

Byron.

যতকাল জয়পুরে রহিবে গোবিন্দ,
কাশী বৃন্দাবন সম থাকিবে মাহাত্ম্য।

কাশীতে বিশ্বেশ্বর, পুরীতে জগন্নাথ ও জয়পুরে গোবিন্দজীর মন্দির সু-প্রসিদ্ধ। গোবিন্দজীর মূর্ত্তি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। একটি ক্ষুদ্র অলৌকিক ইতিহাস গোবিন্দমূর্ত্তির সহিত জড়িত আছে। কথিত আছে

একদা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্রবধূ অনিরুদ্ধভার্য্যা ও বজ্রমাতা উষা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদিচ্ছানুসারে ক্রমান্বয়ে তাঁহার তিন মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। প্রথম মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের আকার—রমণীমোহন মূর্ত্তি—বিশিষ্টরূপে প্রতিফলিত হয় নাই—চরণদ্বয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই মূর্ত্তি মদনমোহন নামে খ্যাত।

দ্বিতীয় মূর্ত্তি গঠিত হইল। ইহাও তাঁহার অনুরূপ হইল না বক্ষস্থলে ঈষৎ আভাসমাত্র ছিল। এই মূর্ত্তি গোপীনাথ (অর্থাৎ গোপিনীনাথ) নামে খ্যাত। আবার যথাক্রমে তৃতীয় মূর্ত্তি রচিত হইল। এবার উষাদেবী মূর্ত্তি দেখিবা-মাত্র মুখাবগুণ্ঠন টানিলেন—এই মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের—উষাদেবীর বৃদ্ধ শ্বশুর-দেবের মুখসাদৃশ্য ছিল! ইহাই গোবিন্দ বা গোবিনজীর মূর্ত্তি।

সাধারণ হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই যে মদনমোহনের শ্রীচরণ, গোপীনাথের শ্রীহৃদয় ও গোবিনজীর শ্রীমুখমণ্ডল একত্র সন্দর্শন করিলে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিশদরূপে উপলব্ধ হয়। সম্ভবতঃ; গোবর্দ্ধন বিগ্রহ—গোবর্দ্ধননাথ—গোবিন্দজীর Prototype বা আদিমূর্ত্তি। গোবর্দ্ধননাথ বৃন্দাবনে স্বনাম-খ্যাত পর্ব্বতে—গোবর্দ্ধন গিরিতে অবিষ্ঠিত ছিলেন।

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উৎপত্তি অত্যদ্ভুত ও বিস্ময়কর। রামানুজ লক্ষ্মণ লঙ্কাধিপ দশানন কর্ত্তৃক শক্তিশেলে আহত হন। রামানুচর হনুমান্ সুমেরু হইতে বিশল্যকরণী নামক ঔষধি আনিতে আদিষ্ট হইলেন। পথিমধ্যে বৃক্ষের নাম তিনি বিস্মৃত হইলে অনন্যোপায় হইয়া সুমেরু গিরি উৎপাটন পূর্ব্বক লঙ্কাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার পৃষ্ঠস্থিত সুমেরুর উপর ভীষণ অরণ্য, এবং স্ব স্ব কার্য্যরত নাগরিকসহ নগরাবলী দীপমালায় দীপ্তিমান ও সুশোভিত ছিল। এইরূপে তিনি বাসুকির ভারাংশ স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করিয়া অযোধ্যা অতিক্রম করিতেছিলেন। কিন্তু হায়! তিনি কৈকেয়ীসুত ভরতের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহাকে দুষ্কৃতেচ্ছু রাবণচর রাক্ষসবিশেষ ভাবিয়া বাণবিদ্ধ করিলেন। যন্ত্রণায় ক্ষিপ্রোল্লম্ফন হেতু, তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে সুমেরুর কিয়দংশ স্খলিত হইয়া বৃন্দাবনে পড়িল—ইহাই গোবর্দ্ধনগিরি। গোবর্দ্ধনগিরি শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিস্তম্ভ। ব্রজবাসীরা জলাশায় ইন্দ্রপূজা করিত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পূজা স্থগিত করিয়া

দিলেন। ইহাতে ইন্দ্র মহাক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্পাদমাস একাদিক্রমে ব্রজবাসী-দিগের উপর সবজ্র বারি বর্ষণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা গোবর্দ্ধনগিরি উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের মস্তকের উপর ধরিলেন—ইন্দ্রের প্রতিহিংসা-প্রয়াস ব্যর্থ হইল। তাঁহার বজ্র শরৎ-গর্জ্জন করিয়া নিবৃত্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণের এই অলোকসামান্য কার্য্যের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ব্রজবাসীরা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে তাঁহার গোবর্দ্ধননাথ নামক মূর্ত্তি প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। গোবর্দ্ধননাথ গোবিনজীর মূর্ত্ত্যন্তর বা আদিম মূর্ত্তি।

যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইল। কত ঘটনাবলী ভারতের বক্ষে অভি-নীত হইল। কত রাজবিপ্লব সংঘটিত হইল। কত রাজবংশের উত্থান, পতন ও পুনরুত্থান হইল। তেত্রিশ কোটি দেবতার হস্তে ভারতের শুভাশুভভাগ্য অর্পিত ছিল। হায়! মন্দভাগ্য ভারত! মীড ও ম্যাসিডোনিয়াণগণ যে রত্ন পাইতে ব্যর্থপ্রয়াস হইয়াছিল; তেত্রিশকোটি রক্ষাদেবতা সত্ত্বেও সে রত্ন মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। বিজাতীয় পতাকা হিন্দুমন্দিরের ত্রিশূল অধি-কার করিল। হিন্দুদেবালয় মসজিদে পরিণত হইল। খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে গজনী-অধিপতি মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার কুদৃষ্টি হিন্দু-দেবালয়প্রতি পতিত হইল।

হিন্দুদেবস্থলপ্রতি তাঁহার অশনি দৃষ্টিপতনের কারণও ছিল। তৎকালে প্রসিদ্ধ হিন্দুদেব-মূর্ত্তির হীরকের চক্ষু ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বর্ণময় ছিল। অতএব স্বধর্ম্ম-সঙ্কীর্ত্তনেচ্ছোন্মত্ত মামুদের হস্তে হিন্দুদেবদেবীকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। মহম্মদীয় পতাকা হিন্দুমন্দিরের উপর উড্ডীন হইতে লাগিল। যবনস্পর্শাশঙ্কায় গোবর্দ্ধননাথ স্বনামখ্যাত পর্ব্বতে "অন্ত-র্হিত" হইলেন।

বালমুকুন্দ ও গোকুলনাথ যমুনার তীর-ভূমিতে এবং অন্যান্য মূর্ত্তি অন্যান্য স্থানে প্রোথিত হইল। গোবিনজীরও অনুরূপদশা ঘটিল। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বল্লভাচার্য্য গোবর্দ্ধননাথ এবং অন্যান্য মূর্ত্তি পুনরুদ্ধৃত করেন। তাঁহার বংশাবলী আজিও গোবর্দ্ধনবিগ্রহের সেবায়ৎ। গোবিনজীর পুনরু-ত্থান অতি বিস্ময়কর। সেয়দহোসেন দিল্লীশ্বর বাদশাহের বঙ্গপ্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার অধীনে দাবীর খাশ ও সাকরমল্লিক নামক দুইজন সম্ভ্রান্ত

মুসলমান কর্ম্মচারী ছিলেন। যখন বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যদেব হিন্দুধর্ম্ম-কঙ্কাল রক্তমাংসে আবৃত করিতেছিলেন, তখন দাবীর খাশ ও সাকরমল্লিক রূপ ও সনাতন নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম আলিঙ্গন করেন। রূপসনাতন—এই যুগল নাম, "হরিহর" নামদ্বয়ের ন্যায় যুক্তোচ্চারিত হয়। রূপসনাতনগোঁসাই চৈতন্যকর্ত্তৃক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত—শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি—ব্রজবাসীর প্রিয়স্মৃতিখনি যমুনাপুলিনস্থ বৃন্দাবনে পর্ণকুটীরে বাস করিতেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, রূপ গোঁসায়ের পর্ণশালার অনতিদূরে এক অরণ্যাকীর্ণ স্থানে একটী গাভী প্রত্যহ যাতায়াত করিত। একদা স্বপ্নযোগে রূপ ঐ গাভীর চলাচল অনুসরণ করিতে আদিষ্ট হন। তিনি দেখিলেন যে, গাভীটি একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার বৃন্ত হইতে অজস্রধারে দুগ্ধধারা নিঃসৃত হইয়া ভূমিতল প্লাবিত করিতে লাগিল। এইস্থানে গোবিনজী প্রোথিত ছিলেন। রূপগোঁসাই গোবিনজীমূর্ত্তি পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনি গোবিন্দজীকে একটী পর্ণ-মন্দিরে অধিষ্ঠিত করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। সময়স্রোত, প্রবাহিত হইতে লাগিল। অতঃপর একদা মহারাজ মানসিংহ বাদশাহ আকবরকর্ত্তৃক সসৈন্যে কাবুল-বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। তত্রত্য হিমপ্রধান প্রদেশে তিনি গুরুতর পীড়াক্রান্ত হইলেন। তিনি মানত করিলেন বিজয়ী এবং রোগমুক্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিলে তিনি গোবিনজীর প্রস্তরমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন; ভারতবর্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, মহারাজ মানসিংহ তাঁহার মানসিকানুসারে রক্তপ্রস্তর-নির্ম্মিত সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বোচ্চ মন্দির গোবিন্দজীকে উৎসর্গ করিলেন। অদ্যাপিও এই মন্দির মানমন্দির নামে খ্যাত। মানমন্দির রাজপুত জাতির শিল্প নৈপুণ্য, বুদ্ধি-কৌশল এবং উদ্যমশীলতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। মানমন্দিরের চূড়ার উপর ভীমায়তন একটি প্রদীপ প্রত্যহ রজনীতে জ্বলিত—প্রত্যহ ন্যূনাধিক একমণ ঘৃত এই প্রদীপে দগ্ধ হইত। বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার শিখা চন্দ্রসমদৃষ্ট হইত। কথিত আছে একদা রজনীতে বাদসাহ আরঙ্গজিব তাঁহার প্রিয় বেগমের সহিত দিল্লীর প্রাসাদোপরে বিহার করিতেছিলেন। শাহজাদী বেগম বৃন্দাবনাভিমুখে স্থির চন্দ্র-সম একটি জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখিতে পাইলেন। ইহাই মানমন্দিরের চূড়াস্থিত প্রদীপ। তিনি বাদশাহকে জিজ্ঞাসা করি-

লেন—"আমি প্রত্যহ রজনীতে নক্ষত্রের ন্যায় একটি তেজঃপুঞ্জ দেখিতে পাই; নক্ষত্রের গতিবিধি আছে—ইহার গতিবিধি নাই। এই সন্নিকৃষ্ট অপূর্ব্ব দীপ্তাগ্নি-সম জ্যোতিঃপুঞ্জ সম্বন্ধে তুমি কি কিছু জ্ঞাত আছ?"

বাদশাহ বলিলেন "না"।

এই কথা শুনিয়া তাঁহার প্রিয় বেগম উত্তর করিলেন "যখন তুমি এই অদূরবর্ত্তী নবালোক বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কি প্রকারে তবে এই সুবিশাল ভারতসাম্রাজ্যের খবরাখবর রাখিতে সমর্থ হইবে? তোমা কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের সুশাসন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাল হইতে আমাকে তোমার সিংহাসনে বসিতে দাও। আর তুমি—তুমি কূপমণ্ডুকের মত অন্তঃপুরে জীবন যাপন কর।" বাদশাহ এই অনুচিত তিরস্কারবচন শুনিয়া যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও ক্ষুব্ধমন হইলেন। তিনি সেই রাত্রিতে বৃন্দাবনাভিবর্ত্তী আলোকরহস্যের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া এক দরবার করিয়া বসিলেন।

চারিদিকে লোক প্রেরিত হইল। যখন বাদসাহ শুনিলেন যে "কাফের" দিগের গোবিনজীর মন্দিরের উপর এক ভীমাকার প্রদীপ জ্বলে, তিনি মহাক্রুদ্ধ হইয়া বৃন্দাবনের সমস্ত মন্দিরের চূড়া এবং প্রস্তরমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন।

এই রাজনীতিবিগর্হিত প্রলাপাদেশ শুনিবামাত্র জয়পুররাজ মদনমোহন, গোপীনাথ ও গোবিন্দমূর্ত্তিত্রয় স্বরাজ্যে অন্তরিত করিলেন। খৃঃ ১৭১১ সালে গোবিন্দজীর মূর্ত্তি বর্ত্তমান নগর হইতে অন্যূন তিনক্রোশ দূরে "খোরিরপাড়া" নামক গ্রামে পুনরন্তরিত হয়। আবার খৃঃ ১৮১৯ সালে গোবিন্দজী "অম্বর (আমের) ঘাটে" পুনরানীত হন। মহারাজ জয়সিংহ স্বনামখ্যাত নগর সংস্থাপন করিয়া গোবিনজীকে উৎসর্গ করেন। অদ্যাপিও তাঁহার বংশাবলী জয়পুরসংক্রান্ত রাজকীয় পত্র গোবিনজীর প্রতিনিধিস্বরূপ সই করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক গোবিনজী তাঁহার নবস্থাপিত নগরে জয়পুরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বর্ত্তমান গোবিনজির মন্দির রাজপ্রাসাদ ভূমির অন্তর্ভূত। এক সময় এই স্থান রাজমৃগয়াভূমি ছিল—রাজমহল নামে অভিহিত ছিল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় গোবিন্দ নামের উল্লেখ আছে। একটি শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা গেল। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন;—

"কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ !
কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাংক্ষিতং নো
রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥"

(ভগবদ্গীতা)

পাণ্ডবগীতায়ও গোবিন্দ নামের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—

"গোকোটিদানং গ্রহণেষু কাশীপ্রয়াগগঙ্গাযুতকল্পবাসঃ
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দনাম্না ন সমং ন তুল্যং ॥

(পাণ্ডবগীতা)

গোবিন্দেতি সদা স্নানং গোবিন্দেতি সদা জপঃ।
গোবিন্দেতি সদা ধ্যানং সদা গোবিন্দকীর্ত্তনম ॥
অক্ষরং হি পরং ব্রহ্ম গোবিন্দেত্যক্ষরত্রয়ম্।
তস্মাদুচ্চরিতং যেন ব্রহ্মভূযায় কল্পতে॥ (পাণ্ডবগীতা)

বর্ত্তমান মহারাজা দ্বিতীয় মাধব সিংহজীর বৃদ্ধপিতামহ মহারাজ প্রতাপ সিংহকর্ত্তৃক জয়পুরী ভাষায় রচিত একটি গানও সন্নিবেশিত হইল।—

"আজ মিলো মোহে গোবিন্দ প্যারো,
নেনন ভর ভর রূপ নিহারো।
শ্যামলি সুরত মাধুরী মুরত,
চঞ্চল উচ্ছল জোবন মত্তবারো॥
আজ মিলো মোহে গোবিন্দ প্যারো।
নাভি গভীর উদর, রোমাবলী,
কুস্তুভ মণি নকবেসর বারো।
মোর মুকুট পীতাম্বর সোহে
শ্রুতি কুণ্ডল মকরাকৃতি বারো।
আজ মিলো মোহে গোবিন্দ প্যারো।
রাজা প্রতাপসিংহ স্মরণ তিহারো
তন মন ধন চরণ পর বারো।
আজ মিলো মোহে গোবিন্দ প্যারো॥"

"আজ মিলিল গোবিন্দ রতন,
রূপ নেহারিব ভরি ভরি দুনয়ন।
শ্যাম মুখ ভাতি, মধুর মুরতি,
চঞ্চল সে অঙ্গে প্রমত্ত যৌবন
নাভি সুগভীর, রোমরাজি ধীর—
হৃদয়ে কৌস্তুভ, নাসা আভরণ—
ময়ুর মুকুট, পীতাম্বর ঝুঁট,
শ্রবণে কুণ্ডল মকর আকৃতি।
প্রতাপ ভূপতি স্মরণ সম্প্রতি॥
তনু মন ধনে চরণে প্রণতি।"

জয়পুর গোবিন্দজীর মন্দিরের জন্য হিন্দুদিগের মহাতীর্থস্থান। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে আবালবৃদ্ধবনিতা গোবিন্দজীর আরাধনা দেখিতে যায়।

গোবিন্দজীর উপাসনাদৃশ্য অতি মনোহর।

রাজপুত বালা সব হাতে লয়ে ফুল—
পদ্ম, চাপা, বেল, জুঁই গোলাপ অতুল
গোবিন্দ চরণতলে করিগো অর্পণ
মাগে কেহ মা বাপের শান্তি-সুখ, ধন,
কেহ মাগে সন্তানের সম্পদ কুশল;
কেহ বা স্বামীর তরে হৃদি শতদল—
সঁপি একমন প্রাণে করিছে পূজন
পার্থিব সম্পদ কেহ অপার্থিব ধন। *

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

* The maid or matron as she throws
Champoc or lotus, *bell* or rose
Prays for a parent's peace or wealth,

কচুপোড়া।

উপকরণ।—কচু তিন ছটাক, আদা এক তোলা, শুক্না লঙ্কা ছয়টা, রসুন ছয় কোয়া, কাগজি বা পাতিনেবু তিন চারিটা অথবা নূতন তেঁতুল আধ পোয়া, সরিষা এক তোলা, কোরা নারিকেল এক ছটাক, নুন এক তোলা।

প্রণালী।—কচু তিন ছটাক ওজন করিয়া লও। কচুর খোলা ছাড়াইবার দরকার নাই, কচুর চারিদিকে পুরু করিয়া কাদার লেপ দাও। নিবন্ত উনানে যেমন করিয়া বেল পোড়ায়, সেই রকমে এই কচুও পুড়াইতে দাও। মাঝে মাঝে ইহা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিবে, তাহা হইলে সমানভাবে পুড়িয়া যাইবে। ক্রমে কচুর উপরের মাটি পুড়িয়া লাল্‌চে হইয়া আসিবে। কচু এইরূপ নরম আঁচে পুড়িতে প্রায় এক ঘণ্টা কি তাহারও বেশী সময় লাগিবে। জলন্ত আঁচে পোড়াইতে দিলে দেখিয়াছি, কচুর ভিতর অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সিদ্ধ হইয়া যায়; আধ ঘণ্টা কি কুড়ি মিনিট লাগে। কচি কচু হইলে তাহার কমে মিনিট পনেরর ভিতর হইয়া যায়। কচুতে মাটীর লেপ না দিয়া পোড়াইতে চাও ত কচুকে বড় বড় খণ্ডে বিভক্ত করিয়া চিমটার দ্বারা আগুণের উপর ধরিয়া পোড়াইতে পার, কিন্তু মাটীর লেপ দিয়া পোড়াইলে পোড়েও ভাল, এবং আস্বাদও ভাল হয়।

কচু পোড়ান শেষ হইয়া গেলে নামাইয়া ঠাণ্ডা হইতে দাও। তারপরে উপরের মাটির লেপ খুলিয়া ফেল, এবং একটি ছুরি দিয়া খোসা ছাড়াইয়া ফেল।

Prays for a child's sucess or health,
For a fond husband breathes a prayer,
For what of good on earth is given,
To lowly life, or hoped in heaven.

H. H. Wilson.

* সচরাচর "কচুপোড়া" বিদ্রূপ বাক্যরূপে ব্যবহৃত হইলেও, আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, আমাদের প্রণালীমতে কচুপোড়া মাখিয়া খাইলে পাঠকেরা এইরূপ বিদ্রূপ বাক্য ব্যবহার করিতে কখন ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন না।

আদার খোসা ছাড়াও, শুক্না লঙ্কার বোঁটা খুলিয়া ফেল, রসুনের খোসা ছাড়াইয়া ফেল, সরিষাগুলি এক বাটী জলে ফেলিয়া ছাঁকিয়া তোল। আদা, শুক্না লঙ্কা, রসুন ও সরিষা শিলে পিষিতে থাক; আধবাঁটা হইলে পর ইহারই সঙ্গে কোরা নারিকেল ও কচু রাখিয়া সব একত্র মিহি করিয়া বাঁট। তারপরে উহাকে নেবুর রস ও নুন মিশাইয়া, নুন টক সমান করিয়া মাখ। নেবুর অভাবে তেঁতুল বা কাঁচা আম পিষিয়া লইয়াও টক করিতে পার। নারিকেলের অভাবে এক কাঁচ্চা সরিষা তেল দিলেও চলে অথবা তাহা না দিলেও চলে। রসুনও না পাইলে নাই দাও।

সিদ্ধ কচুও এইরূপে মাখিতে পার। কচুর ন্যায় ওলও এইরূপে মাখা যায়।

ভোজন বিধি।—কচু পোড়া, ভাত ও খিচুড়ির সঙ্গে খাও, বৈকালে পুরী বা লুচিরও সঙ্গে খাইতে বেশ লাগে। ইহা অতিশয় মুখরোচক। একটুকু চাকিলে সমস্তটুকু শেষ না করিয়া উঠিতে ইচ্ছা হয় না।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

হিন্দুস্থানি কোপ্তা।

উপকরণ।—ভেড়ার বা পাঁটার কিমামাংস এক পোয়া, কিসমিস এক কাঁচ্চা, পেঁয়াজ দেড়ছটাক, আদা আধতোলা, ছোটএলাচ দুইটা, লঙ্গ পাঁচটা, দারচিনি সিকি তোলা, শুক্না লঙ্কা চার পাঁচটা, ছাড়ান বাদাম এককাঁচ্চা, নুন প্রায় তিনআনি ভর, দই একছটাক, ছোলার ছাতু এক কাঁচ্চা, ঘি আধপোয়া, গোলমরিচগুঁড়া প্রায় তিন আনি ভর।

প্রণালী।—আস্ত মাংস হইতে হাড় প্রভৃতি বাছিয়া ফেলিয়া ছুরি বা চপার দিয়া খুব থুড়িয়া লইবে—ইহাই কিমামাংস। আজ কাল মাংস কিমা করিবার নানা প্রকার যন্ত্র পাওয়া যায়। মাংসের দোকানে কিমামাংস চাহিলে তাহারা আপনারাই কিমা করিয়া দেয়। কিমামাংসটা একদফা পিষিয়া তাল করিয়া উঠাইয়া রাখ। মাংস পিষিবার কালে উহার মধ্য হইতে সরু সরু সুতার মত যে দেখিতে পাইবে তাহা বাছিয়া ফেলিতে হইবে। সরু সরু সুতার মত যাহা থাকে তাহাকে মাংসের রগ বলে। কিসমিস, বাদাম, আধ

ছটাক পেঁয়াজ, আদা, শুকলঙ্কা এই গুলিও পিষিয়া রাখ। ইচ্ছা করিলে কিস-মিস, বাদাম না দিলেও হয়।

ছোটএলাচ, লঙ্গ এবং দারচিনি কুটিয়া রাখ। ঐ পেষিত কিমামাংসে কিসমিস, বাদাম, পেঁয়াজ ও আদা প্রভৃতি বাঁটা মশলা, নুন, দই ও দু তিনচুটকি গরমমশলার গুঁড়া একত্র সব মাখিয়া প্রায় একঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখ।

ফ্রাইপ্যানে এক কাঁচ্চা ঘি চড়াইয়া ঐ ভিজান মাংস সবসমেত ছাড়িয়া কস। ঘন ঘন নাড়িয়া দাও। মাংসের জল মরিয়া শুষ্ক রকমের হইয়া আসিলে নামাইবে। প্রায় মিনিটদশ লাগিবে।

আবার ফ্রাইপ্যান চড়াইয়া আধপোয়া ঘি ঢালিয়া দাও। একছটাক পেঁয়াজ লম্বাদিকে স্লাইস স্লাইস কুঁচাইয়া লাল করিয়া ভাজ। ভাজিতে প্রায় সাত আট মিনিট লাগিবে। ভাজা পেঁয়াজগুলি ঐ কসা মাংসের সহিত একত্র মিহি করিয়া পিষিয়া লও। এখন এই পেষা মাংসে ছোলার ছাতু, গোলমরিচ-গুঁড়া মিশাইয়া দশটি কোপ্তা গড়; কোপ্তার আকার গিলার ন্যায় চেপটা কর। আবার ঘি চড়াইয়া দাও। ঘিয়ের ধোঁয়া বাহির হইলে পর, চার পাঁচটি করিয়া কোপ্তা ছাড়; বেশ লাল হইয়া ভাজা হইলে পর নামাইয়া আবার অন্যগুলা ছাড। এক এক খোলা ভাজা হইতে প্রায় পাঁচ ছয় মিনিট করিয়া লাগিবে। ইহার জন্য মন্দা আঁচ চাহি। যদি উনানে জ্বলন্ত আঁচ থাকে তাহা হইলে ভাজিবার পাত্র নামাইয়া নামাইয়া ভাজিতে হইবে।

এই কোপ্তা মুখে দিলে মুখের ভিতরে কেমন মিলাইয়া যায়। মাংস সিদ্ধ করিয়া কোপ্তা করিলে তাহার আস্বাদ ততটা ভাল লাগে না।

ভোজন বিধি।—ইহা ভাত, খিচুড়ি বা পোলাওয়ের সঙ্গে খাইতে যেমন ভাল লাগে লুচি কি রুটী প্রভৃতিরও সঙ্গে সেই রূপই ভাল লাগে। বস্তুতঃ এই কোপ্তা অতিশয় সুস্বাদু।

ব্যয়।—কিমামাংস এক পোয়া দুই আনা, কিসমিস্ আধ পয়সা, ছাড়ান বাদাম এক পয়সা, দই এক পয়সা, ছোলার ছাতু আধ পয়সা, ঘি প্রায় সাত আট পয়সা। আনুমানিক পাঁচ আনা খরচ করিলেই হইতে পারে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

লেডিকেনি।

উপকরণ।—দোবারা চিনি দু সের, জল সাড়ে ছয় পোয়া, দুধ আধ পোয়া এই কয়টী রসের উপকরণ।

দেশী ছানা আধসের, খাসা ময়দা আধপোয়া, মেওয়া (ডেলাক্ষীর) এক পোয়া, শফেদা (চালের গুঁড়ি বা ময়দা) এক কাঁচ্চা, বড় এলাচ তিনটী, জল প্রায় এক ছটাক; এইগুলি দিয়া খামির প্রস্তুত হইবে।

খাসা সন্দেশ এক ছটাক, মেওয়া (ডেলাক্ষীর) এক ছটাক, খাসা ময়দা এক কাঁচ্চা, ছোট এলাচ বারটী, বড় এলাচ তিনটী; এই কয়টী পুরের উপকরণ।

ভাজিবার জন্য দুইসের ঘি আনিয়া রাখিতে হইবে।

প্রণালী।—একটি বড় কড়াতে দুইসের দোবারা চিনি ঢালিয়া তাহাতে ছয় পোয়া জল ঢালিয়া মিশাও। কড়া উনানে চড়াইয়া দাও। মিনিট পনের কুড়ি পরে রস ফুটিয়া উঠিলে আধপোয়া দুধে আধপোয়া জল মিশাইয়া সমস্তটা ইহাতে ঢালিয়া দাও। প্রায় মিনিট চার পাঁচ হাতা দিয়া রসটা ঘাঁটিয়া দাও, তারপরে আর ঘাঁটিও না; দেখিবে কেমন আপনি আপনি ফেনার মত গাদ (চিনির ময়লা) উপরে ফুলিয়া জড় হইতেছে। ক্রমে ঝাঁঝরি করিয়া ছাঁকিয়া ছাঁকিয়া সব গাদটা উঠাও এবং একটী পাত্রে রাখ। সব গাদ উঠিয়া যাইবার পর মিনিট দশ পনের ফুটিলে তবে রস নামাইবে। লেডিকেনির জন্য এক তারবন্দ রস বা পানতোয়ার রস প্রস্তুত করিতে হইবে। পাতলা রস হইলে লেডিকেনিও বেশ রসভরা হইবে। এই রস পাকিতে প্রায় ত্রিশ হইতে চল্লিশ মিনিট পর্য্যন্ত সময় লাগিবে।

সব বড় এলাচের দানাগুলি ছাড়াইয়া একটু ময়দা মাখিয়া ইহার চটচটে ভাব শুকাইয়া লও।

একটি কাঠের বারকোসে ছানা ছড়াইয়া দাও। একখানি কাপড় ছানার উপরে রাখিয়া চাপড়াও, তাহা হইলে যে জলটা থাকিবে সব টানিয়া লইবে। তারপরে হাতের তেলো দিয়া ছানাটা মাড়িয়া লও, এবং বারকোসের এক-ধারে ঠেলিয়া রাখ। এবারে প্রায় পাঁচ কাঁচ্চা মেওয়া (ডেলাক্ষীর) লইয়া

এই রকমে হাতের তেলো দিয়া মাড়িয়া মোলায়েম করিয়া লও। এখন হাতের তেলো দিয়াই মেওয়ার সহিত ঐ ছানা মাড়িতে মাড়িতে মিশাও। অর্দ্ধেক বড় এলাচের দানা, আধপোয়া খাসা ময়দা, আর এক কাঁচ্চা শফেদা ইহাতে মাখিয়া লইয়া, তারপরে এক ছটাক জল আস্তে আস্তে মিশাইয়া সবটা ভাল করিয়া মাড়,—বেশ মিলাইয়া যায় যেন। এই খামির কাদা কাদা হইবে। এইবারে ইহা হইতে চব্বিশটা নাড়ু গড়। অবশ্য খুব বড় করিতে চাহ ত উনিশ কুড়িটা হইবে।

খাসা সন্দেশ এক ছটাক, তিন কাঁচ্চা মেওয়া (ডেলাক্ষীর) বারকোসের উপরে রাখিয়া হাতের তেলোয় করিয়া মাড়িয়া লও। তারপরে এক কাঁচ্চা-টাক খাসা ময়দা মাখিয়া লও। তিনটী বড় এলাচের দানাগুলি ও ছোট এলাচগুলি একটি কাগজের ভিতরে রাখিয়া নোড়া দিয়া থেঁতলাও। তার-পরে যখন কাগজ খুলিয়া দেখিবে এলাচ আধগুঁড়া হইয়াছে, তখন পুরের উপরে ছড়াইয়া দিয়া পুরটা ভাল করিয়া মাখ। এই মাখা সন্দেশ হইতে কলসা ফলের ন্যায় ছোট ছোট গুলি তৈয়ার কর। এক একটা বড় গোল্লার ভিতরে বুড়া অঙ্গুলি দিয়া আল্‌গা ভাবে ঈষৎ চাপিয়া লও, তারপরে ঐ ছোট ছোট এক একটা পুরের গুলি ইহার ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়া ভাল করিয়া মুখবন্ধ করিয়া দাও, যেন মোড়ার দাগ না থাকে। এই প্রকারে সবগুলি গড়া হইয়া গেলে পর, ঘি চড়াইতে হইবে।

কড়ায় তুসের ঘি একেবারে চড়াও; ঘি প্রায় সাত আট মিনিট পাকিলে, ঘিয়ের বেশ ধোঁয়া উঠিলে তবে কড়া একবার নামাইবে। কড়ার তলায় ঘিয়ের ভিতরে একখানি শালপাতা বা কলাপাতা ছাড়িয়া দিবে, তাহা হইলে গোল্লাতে লাল দাগ লাগিবে না। কারণ যখন গোল্লা ছাড়া যায় তখন গোল্লা সমূহ একেবারে তলায় চলিয়া গিয়া তারপরে ক্রমে ক্রমে উপরে ভাসিয়া উঠে, সেই জন্য সহজেই লৌহকড়ার লাল দাগ ইহাতে লাগিয়া যায়। ইহাতে দুই জন লোকের আবশ্যক। একজন একটা একটা করিয়া আল্গাভাবে ছাড়িবে, আর একজন কেবল একধার হইতে আর একধার কড়া এমনি করিয়া হেলা-ইবে যে ঘিটা যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া যায়, আর এইসঙ্গে মনে হইবে যেন নাড়ুগুলি নীচে হইতে উপরে উঠিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই রকমে কড়া

নাড়িতে নাড়িতে দেখিবে ঘি ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে, তখন কড়া আবার উনানে চড়াইবে। সব গোল্লা ঘিয়ে ছাড়া হইলে পর শালপাতাটা উঠাইয়া লইলেও হয়। এখন উনানের নরম আঁচ চাহি; অধিক আঁচ হইলে সহজেই গোল্লার গায়ে লালচে দাগ হইয়া যাইবে, আর ভিতরে কাঁচা থাকিবে। আগুণে কড়া চড়াইয়াও কড়ার দুই আংটা ধরিয়া হিলাইতে অর্থাৎ দুলাইতে থাক। প্রায় মিনিট পনের পর্য্যন্ত কড়া নরম আঁচে চড়াইয়া ভাজিতে হইবে; এই পনর মিনিটের মধ্যেও দুতিনবার কড়া নামাইয়া নামাইয়া ঘিয়ের ভাপ মারিয়া লইতে হইবে। কড়া অধিকাংশ সময় হিলাইতে হইবে, আর মাঝে মাঝে তাড়ু দিয়া নাড়ু উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিবে। ক্রমে যখন দেখিবে নাড়ুর ভিতর সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে অর্থাৎ অনেকটা শক্ত হইয়া আসিয়াছে তখন জ্বলন্ত আঁচ করিয়া দিবে, যাহাতে কড়ার চারিদিকে দাউ দাউ করিয়া আঁচ লাগে। এই সময়ে আস্তে আস্তে সমস্ত নাড়ুগুলা উল্টাইয়া দাও। অথবা কড়ার তলায় ঘিয়ের ভিতরে তাড়ু ঘবড়াইয়া দিলে টগবগিয়া ফুটের সহিত আপনিই উল্টাইয়া যাইবে। এই রকম ফুট প্রায় মিনিট চার দিয়া আবার নামাইতে হইবে। মিনিট দুই পরে ভাপ খানেকটা কমিয়া আসিলে আবার কড়া উনানে চড়াইতে হইবে; মিনিট চার আস্তে আস্তে ফুটিলে, আবার পাঁচ সাত মিনিট জ্বলন্ত আঁচ করিয়া দিবে, আবার কড়া নামাইবে। এই প্রণালীতে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ মিনিট জ্বলন্ত আঁচ দিতে হইবে। যখন দেখিবে নাড়ুর গা ক্রমেই ঘোর লাল হইয়া আসিতেছে তখন আবার নরম আঁচ দিবে কিন্তু তা বলিয়া অধিক ক্ষণ ধরিয়া কড়া উনানে কখনই বসাইয়া রাখিবে না। মিনিট দুই নীচে নামাইয়া হিলাইবে। সবশেষে প্রায় পাঁচ মিনিট খুব টগবগিয়া ফুটিলে পর, কড়া নীচে নামাইয়া তাড়ু দিয়া গোল্লা উল্টাইয়া দিবে, তারপর ঝাঁঝরি করিয়া উঠাইয়া রসে ফেলিবে। প্রায় একদিন নাড়ু রসে ফেলিয়া রাখিলে বেশ রসভরা হইয়া উঠিবে। লেডিকেনি ভাজিতে কমবেশী প্রায় পাঁচ কোয়ার্টর সময় লাগিবে। মোটামুটি প্রথমতঃ পনের কুড়ি মিনিট নরম আঁচ চাহি, ইহাতে নাড়ুগুলি সিদ্ধ হইয়া আসিবে, পরে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ মিনিট জ্বলন্ত আঁচ দিতে হইবে, এই সময়ের মধ্যে নাড়ুগুলির লাল্‌চে রং হইয়া আসিবে। তৎপরে পনের ষোল মিনিটের দশ মিনিট নরম আঁচ দিতে হইবে ইহাতে

নাড়ুর অবশিষ্ট রং ঠিক হইয়া যাইবে। সবশেষে মিনিট চার পাঁচ জ্বলন্ত আঁচ দিয়া টগবিগয়া ফুটাইয়া লইবে।

ব্যয়।—দোবারা চিনি দুইসের আটআনা, দুধ দুই পয়সা, দেশী ছানা আধসের চারআনা, খাশা ময়দা গড়ে তিনছটাক তিন পয়সা, মেওয়া (ডেলাক্ষীর) পাঁচ আনা, শফেদা আধ পয়সা, বড় এলাচ এক পয়সা, ছোট-এলাচ দুপয়সা, খাসা সন্দেশ চারপয়সা, ঘি দুইসের দুইটাকা। সর্ব্বশুদ্ধ তিন-টাকার কিছু বেশী খরচ হইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

সান্ধ্য-স্বপ্ন

১

ওপারে বনের কোলে ডুবিছে তপন,
বহিছে সন্ধ্যাসমীর,
নীরব নদীর তীর,
জলে স্থলে শূন্যে এবে ঝরিছে স্বপন।

২

দু এক্‌টি তারা ওই উঁকি মারে ধীরে,
ঈশানে উঠিছে চন্দ্র,
গ্রামে শঙ্খধ্বনি মন্দ্র,
ছায়াময় উজ্জ্বলতা কাঁপিতেছে নীরে।

৩

অদূরে তরণী যায় ভেটেলে ভাসিয়া,
মাঝি গো অলস স্বরে,
গাহে গান তরীপরে,
দাঁড়িরা কহিছে কথা হাসিয়া হাসিয়া।

দেখিতে দেখিতে যায় ভাসিয়া কোথায়,
মিশে যায় হাসি গান,
শ্রান্ত দিবা অবসান,
দিবসের পাখী ধায় আপন বাসায়।

৬

ধীরে ধীরে চারিধারে জাগে অন্ধকার,
রাত্রি আসে যায় দিবা,
দূরে গ্রামে ডাকে শিবা,
সন্ধিসূত্রে শান্ত হেরি বিশ্বের আকার,
সন্ধিক্ষণে ব'সে একা ভাবি বিশ্ব কা'র।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও রাজা রামমোহন রায়।

যে দুই দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষের নাম উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের বিষয়ে অতি সামান্য কথাও বলিবার জন্য আমার ন্যায় দুর্ব্বল বঙ্গবাসীর অগ্রসর হওয়া নিতান্তই ধৃষ্টতা। তবে মহাপুরুষদিগের নামোচ্চারণে আমার নিজের পুণ্যলাভ এবং তাঁহাদিগের মহত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিয়া আমাদিগের শিক্ষালাভ হইতে পারে, এই আশায় আমি তাঁহাদিগের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে সাহসী হইতেছি।

মহাপুরুষদিগের নামে যে আজকাল সভা প্রভৃতি আহূত হয়, ও তাঁহাদিগের বিষয় আলোচনা হয় ইহাও আমাদিগের বিশেষ আনন্দের বিষয়। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ কিছুই অনুষ্ঠিত হইল না বলিয়া কতই আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরে তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইল, তাঁহার জীবনচরিত লিখিত হইল এবং

তাঁহার স্মরণার্থ বৎসরে বৎসরে সভাধিবেশন হইতেছে। স্বদেশীয়দিগের অন্তঃকরণ হইতে কৃতজ্ঞতা যে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, এই সকলে তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হই। পূর্ব্বকালে পিতৃপুরুষদিগকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ঋষিরা তর্পণের সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, মহাপুরুষদিগের সম্মানার্থ তাঁহাদিগের পূজা করিবার বিধি দিয়া হিন্দুজাতির হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁহাদের নাম খোদিত করিয়া দিয়াছেন। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এরূপ বিধি সম্পূর্ণরূপে দেওয়া না যাউক, কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে যদি স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের সম্মানার্থ অন্তত বাৎসরিক সভারও অধিবেশন করিয়া তাঁহাদের গুণব্যাখ্যা করা যায়, তবে তাহার শুভফল অতি শীঘ্রই আমাদিগের দেশের যুবকবৃন্দের মধ্যে দেখা যাইতে পারে। আমরা যদি উচ্চ আদর্শ সর্ব্বদাই চক্ষের সমক্ষে রাখিয়া কার্য্য করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগেরও উন্নতি যে অবশ্যম্ভাবী, একথা বলা বাহুল্য। এই কারণেই "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস" এই প্রবাদবাক্য চলিয়া আসিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষে রাজা রামমোহন রায় এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, এই দুই নরসিংহের ন্যায় মহাপুরুষের অভ্যুদয় অতি অল্পই হইয়াছে। এই দুই জনই দুই অটল পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া যেন ভারতের নূতন সংগঠিত ধর্ম্মের দুই দ্বার রক্ষা করিতেছেন। রাজা রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করিলেই ব্রাহ্মসমাজেরই কথা যেমন সর্ব্বপ্রথমে আমাদের স্মরণপথে উদিত হয়, সেইরূপ স্বামী দয়ানন্দের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের কথা মনে আসে। আমরা এতদূর সঙ্কীর্ণহৃদয় হইয়া পড়িয়াছি, যে আমরা প্রায়ই মহৎ লোকদিগকে সাম্প্রদায়িক ভাবেই দেখিতে চেষ্টা করি এবং এই প্রকারে তাঁহাদিগকে সম্প্রদায়ের অতীত করিয়া সার্ব্বভৌমিকভাবে দেখিতে অনভ্যস্ত হইতেছি। আমাদিগের দেশে যে সকল ধর্ম্মসংস্কার সাধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বোধ হয় একটিও তাহার বিমলশোভন প্রথম সৌন্দর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে সমর্থ হয় নাই—ধর্ম্মসংস্কারকদিগকে সাম্প্রদায়িক চক্ষে, বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের নেতামাত্ররূপে দেখিতে যাওয়াই তাহার এক প্রধান কারণ। যে সকল ধর্ম্মবীর সাম্প্রদায়িক ভাবের অতীত থাকিয়া জনসাধারণকে উপধর্ম্মের তীক্ষ্ণ কণ্টকরাশি হইতে রক্ষা

করিবার চেষ্টা করেন এবং বিপথগামী ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মের সরল পথের অভিমুখী করিবার চেষ্টা করেন, সেই বিপথগামী ব্যক্তিরাই তাঁহাদিগকে সম্প্রদায়ের নেতারূপে দৃষ্টি করিয়া আপনাদিগের ও ভবিষ্যদ্বংশের বিশেষ অনিষ্টের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। আমার এই কথাগুলি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে আমরা যেন আর রাজা রামমোহন ও স্বামী দয়ানন্দকে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে না দেখি—আর বাস্তবিকও ইহাঁদিগের কেহই বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নেতা হইবার জন্য ধর্ম্ম-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহাঁরা উভয়েই আপনাদের হৃদয়ের আকর্ষণে, ভগবানের প্রেরণায় এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মের সরলপথ অনেকটা প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, এইরূপ উদার চক্ষে দৃষ্টি করিয়া সেই রাজর্ষি রামমোহন রায় এবং পরম ব্রহ্মচারী স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, ব্রহ্মনামের এই দুই সুযোগ্য প্রচারকদিগকে ভক্তিভরে নমস্কার করি।

রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় স্বামী দয়ানন্দও মূলত ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। ইতিহাসে বিধাতার এই মঙ্গলবিধান দেখা যায় যে যখন মানব স্বীয় অপূর্ণতা-বশতঃ বিধাতার বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কাতরহৃদয়ে করুণা ভিক্ষা করে, তখনই তিনি স্বয়ং তাহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মঙ্গলালোকে সমস্ত হৃদয় উদ্ভাসিত করিয়া দেন। এই মঙ্গলবিধানের কার্য্য প্রতি মানবের জীবনে, প্রত্যেক সমাজের জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে দেখা যায়—সমগ্র জগতের কুত্রাপি এই বিধানের অন্যথা দেখা যায় না। এই বিধানবশেই হিন্দু-জাতির এরূপ গভীর ধর্ম্মপ্রবণতা এবং এই বিধানেরই ফলে হিন্দুর প্রাণ-প্রিয় জন্মভূমি এই ভারতবর্ষে অসংখ্য ধর্ম্মসংস্কারকের আবির্ভাব। সমগ্র জাতি যখন কাতর হইয়া সেই দেব-দেবের চরণতলে দণ্ডায়মান হয়, তখনই ভগবানের প্রেরণায় এক ক্ষণজন্মা পুরুষ তাঁহারই মঙ্গলকিরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিতে থাকেন। ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী জনসাধারণের কাতরহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি মাত্র। রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের কাতর প্রাণের ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অভিব্যক্তি এবং স্বামী

দয়ানন্দের আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের, বিশেষত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কাতরতা ও ধর্ম্মপিপাসার পরিচায়ক।

যে কালের, যে অবস্থার এবং যে স্থানের যাহা উপযোগী, করুণাময় ভগবান্ তখন তাহাই প্রেরণ করেন। ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে আমরা এই সত্যের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই। এক সময়ে এই ভারতে হিংসার ভীষণতা দেখিয়া দেখিয়া জনসাধারণের মনপ্রাণ জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছিল; লোকে অহিংসাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছিল—দেশ, কাল, ব্যবস্থা সকলই উপযোগী হইয়া উঠিল, অমনি বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়া অহিংসাধর্ম্মের বংশীধ্বনিতে সকলকে আকৃষ্ট করিলেন। আর এক সময়ে এই ভারতবর্ষে, বিশেষত এই বঙ্গদেশে বলিদান শবসাধন প্রভৃতি তান্ত্রিক আচার ব্যবহারের কঠোরতায় মানবহৃদয় নির্ম্মম এবং সুতরাং নীরস অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন লোকেরা আর থাকিতে পারিল না—সমগ্রদেশ হরিপ্রেমের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল, অমনি তাহারই অভিব্যক্তিস্বরূপে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনের উন্মাদিনী শক্তিতে সমগ্রদেশ একেবারে ডুবাইয়া দিয়া গেলেন। সঙ্কীর্ত্তনের প্রতি শব্দে সেই হরিপ্রেম-ভিক্ষার প্রতিধ্বনি ও সেই সরল শ্রদ্ধার ছায়া আজও আমরা অনুভব করিতে পারি।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বে এই সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভারতের কার্য্যত এক নূতন যুগের অবতারণা হইয়াছে। এই সময়ে আবার দুর্ব্বল ভারতসন্তান নানা কারণে অজ্ঞানসাগরে ডুবিয়া আপনার চিরসঞ্চিত ধর্ম্মধন অবহেলা করিয়া উপধর্ম্মের ছায়ায় ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরগুলি অবলম্বন করিয়া দুর্লভ মানবজন্ম বৃথাই যাপন করিতে লাগিল। অন্যদিকে ঠিক সেইসময়ে এই অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভারতে পাশ্চাত্যজ্ঞানের বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। জনসাধারণ অজ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে পড়িয়া আত্মহারা হইয়া পড়িল। সকলে কাতরকণ্ঠে ভগবানকে ডাকিল দেশ, কাল, অবস্থা অনুকূল হইয়া উঠিল, আর ভগবান রাজা রামমোহনরায়কে জনসাধারণের উদ্ধারার্থ প্রেরণ করিলেন। রামমোহন রায় কোথা হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া অজ্ঞানের কুঠার ও বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি উপনিষদুক্ত সেই "সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা" ব্রহ্মধনকে পুনর্লাভ করিয়া বর্ত্তমান যুগে এই বঙ্গদেশে

সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মনামের জয়পতাকা উড্ডীন করিলেন এবং কোথায় ইংলণ্ড, কোথায় আমেরিকা এবং কোথায় এই দীনহীন বঙ্গদেশ, সকলকে এক কোমলকঠোর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এক অপূর্ব্ব মিলনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহারই পথানুবর্ত্তী ব্রহ্মপরায়ণ ভক্ত সন্তানেরা এই ভারতের যেখানে গমন করিতে লাগিলেন, সেই খানেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজয়ালোক অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। সর্ব্বত্র ব্রহ্মনামের জয়জয়কার পড়িয়া গেল। এইরূপে ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে দেখি যে ভগবান যথাসময়ে ও যথাস্থানে উপযোগী ব্যক্তি ও ঘটনা প্রেরণ করিয়া সকলকেই আপনার দিকে আহ্বান করেন। নদীসকল সুখে দুঃখে অপরাজিত চিত্তে ধাবিত হইয়া যেমন সাগরের কোলে বিশ্রামসুখ অনুভব করে সেইরূপ জগতবাসী সকলে সুখে দুঃখে তাঁহারই ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিবে এই উদ্দেশে তিনি সর্ব্বসময়েই যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে আমরা যেমন ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনায় ভগবানের মঙ্গলবিধান দেখিলাম, সেইরূপ বর্ত্তমান শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী দয়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের স্থাপনায়ও আমরা সেই সত্যেরই আর একটি প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রাপ্ত হই। দুর্ব্বল ভারতবাসী যখন ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের সত্যসকল হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন না, জ্ঞানবিজ্ঞানের দুইচারিটা বাঁধা বুলি শিক্ষা করিয়া আত্মাভিমানে ও অহঙ্কারে স্ফীত হইতে লাগিলেন; আপনাদিগকে সকলের অতীত বোধ করিয়া আপনাদিগের কথাকেই অভ্রান্ত বেদবাক্য মনে করিয়া তদনুরূপ প্রচারও করিতে লাগিলেন; আপনারা একরূপ উপদেশ দিয়া কার্য্যত তাহার বিপরীতে চলিতে লাগিলেন; যখন তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে বিবাদ কলহ আনয়ন করিয়া জনসমাজের শান্তি বিধ্বস্ত করিয়া তুলিলেন, সেই সময়ে ব্রহ্মচারী স্বামী দয়ানন্দ ব্রহ্মনামের বিজয়পতাকা নূতনস্থানে রোপিত করিয়া নূতনভাবে তাহা প্রচার করিতে লাগিলেন। একই হিমালয় হইতে জলরাশি আহরণ করিয়া যেমন সিন্ধু, জাহ্নবী প্রভৃতি নদনদী সকল বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তকে সিক্ত রাখিয়াছে, সেইরূপ রাজা রামমোহনরায় এবং স্বামী দয়ানন্দ উভয়েই সেই অতু-

ন্নত উপনিষদ্ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা আহরণ করিয়া বিভিন্নপ্রণালী অবলম্বনে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন।

এই সূত্রে থিওসফিষ্টগণ আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠার পক্ষে যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বোধ করি অসঙ্গত হইবে না। ইংরাজীশিক্ষার প্রবর্ত্তনা যেরূপ ব্রাহ্মসমাজকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য লোকের মন প্রস্তুত করিয়া ব্রহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সহায় হইয়াছিল, সেইরূপ থিওসফিষ্টদিগেরও অভ্যুদয় আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠার বিশেষ অনুকূলতা করিয়াছিল। অধিকাংশ ব্রাহ্মই সেশ্বর পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের অতিরিক্ত আমাদের স্বদেশীয় যোগাচার্য্যদিগের সূক্ষ্ম যোগতত্ত্বসকল আমলেই আনিতেন না। ব্রাহ্মসমাজের একখানি মুখপত্র এই সমস্ত যোগতত্ত্ব বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের এই অবনতির কালে কেমন এক বিকৃত স্বভাব দাঁড়াইয়াছে যে পশ্চাত্যদিগের মুখ হইতে কোন সূক্ষ্ম বা স্থূলতত্ত্বের পক্ষসমর্থন না দেখিলে আমরা সহজে তাহা বিশ্বাস করিতে চাই না। যখন থিওসফিষ্টদিগের নেতা ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি ও কর্ণেল অলকট্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহোদয়গণ প্রাচ্য যোগতত্ত্বের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া অপূর্ব্ব তেজের সহিত সেই সকল সমর্থন করিতে লাগিলেন, তখন ভারতের সকল স্থান হইতে দলে দলে থিওসফিষ্ট হইয়া যোগতত্ত্বের অনেক কথায়, কার্য্যে নাই হউক, অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন এবং ভারতের উত্তরপশ্চিমবাসীগণের অনেকে স্বামী দয়ানন্দে সেই সকল যোগতত্ত্বের সত্যতার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া তাঁহারই জয়পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহাই স্বামী দয়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের সহসা বিস্তৃত প্রতিষ্ঠালাভের ঐতিহাসিক রহস্য।

আর্য্যসমাজের বিস্তৃত প্রতিষ্ঠালাভের আর একটী কারণ তাহার ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা অধিকতর জাতীয়ভাবে ধর্ম্মপ্রচার। বাহির হইতে দেখিলে স্থূলদর্শী লোকদিগের চক্ষে সহসা বোধ হইবে যে দয়ানন্দের আর্য্যসমাজ এবং রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে যে উভয়ে অতি ঘনিষ্ঠসূত্রে সম্বদ্ধ। উভয়েরই মূলমন্ত্র এক। মনুষ্য জন্মগ্রহণমুহূর্ত্তে প্রথম নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে যে ব্রহ্মনাম গ্রহণ করিয়া থাকে; বায়ুর প্রতি হিল্লোলে যে ব্রহ্মগাথা শুনিতে পাওয়া

যায়; বাহিরের এই অনন্ত আকাশে বিধৃত অগণ্য অগণ্য সূর্য্যচন্দ্রের নিয়মিত ভ্রমণে এবং আমাদের প্রত্যেকের আত্মার ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত আনন্দলাভ করিবার ক্ষমতায় যে ব্রহ্মের দুরনুমেয় মহত্ত্ব ও আনন্দের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই দেবাধিদেব মহাদেবেরই মহিমাপ্রচারের জন্য যেমন ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, তেমনি তাহারই জন্য আর্য্যসমাজেরও জন্ম। উভয়েই একই উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, আমি অবগত হইয়াছি যে আর্য্যসমাজ তাঁহাদের সভাধিবেশনে পাঠোপযোগী "আর্য্য" পুস্তক-তালিকার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ এবং তদবলম্বিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" এই দুই পুস্তকই সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। এক সময় স্বামী দয়ানন্দ লাহোরে তাঁহার অবস্থিতিকালে কিরূপ উপাসনাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিবেন এই বিষয় লইয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় একদিন তিনি তথাকার ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়া উপাসনাপদ্ধতি দৃষ্টি করিয়া তাহারই আদর্শ লইয়া আপনাদিগের উপযোগীভাবে উপাসনাপদ্ধতি সংগঠিত করিলেন—ইহা আমি আর্য্যসমাজের কোন বিশিষ্ট সভ্যের নিকট শুনিয়াছি। আবার আমরাও তাঁহার বেদভাষ্য প্রভৃতির নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের সাহায্য পাইয়া যথেষ্ট কৃতজ্ঞ আছি। ইহাতেই বুঝা যাইবে যে উভয়ে কেমন ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু উভয়ের প্রচারপ্রণালী কিছু ভিন্ন। রাজা রামমোহন রায়ের প্রণালীকে আমরা জাতীয়তা অপেক্ষা যুক্তিবিচারের অধিকতর অনুকূল এবং স্বামী দয়ানন্দের প্রণালীকে যুক্তিবিচার অপেক্ষা জাতীয়তার অধিকতর অনুকূল বলিয়া বিবেচনা করি। ইংরাজীতে বলিতে গেলে রাজা রামমোহন রায়ের প্রণালীকে more rational than national এবং স্বামী দয়ানন্দের প্রণালীকে more national than rational বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। রামমোহন রায় যে জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া যুক্তিবিচার অবলম্বন করিয়াছিলেন, অথবা স্বামী দয়ানন্দই যে যুক্তিবিচার পরিত্যাগ করিয়া জাতীয়ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা যেন কেহ না ভাবেন। তাঁহাদের উভয়েরই প্রচারপ্রণালী ঐ উভয় প্রকার ভাবের উপরেই সংগ্রথিত—তবে কেহ বা একভাবের প্রতি, কেহ বা অপর ভাবের প্রতি একটু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়া-

ছেন, এইমাত্র দেখা যায়। ভগবানের মঙ্গলবিধানে তাঁহাদিগের এই বিভিন্ন ভাবপ্রবণতা বিভিন্ন দেশকাল ও অবস্থার উপযোগী হইয়াই আসিয়াছিল।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারপ্রণালার মূলমন্ত্র যুক্তিবিচার এবং সহায় আপ্তবাক্য, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রচারপ্রণালীর মূলমন্ত্র আপ্তবাক্য এবং সহায় যুক্তিবিচার, রামমোহন রায় যুক্তিবিচারে প্রতিপন্ন করিলেন যে ব্রহ্মোপাসনাই মানবের শ্রেষ্ঠতম অধিকার ও কর্ত্তব্য এবং তৎসঙ্গেই ইহাও দেখাইলেন যে আমাদিগেরই শাস্ত্রে এতৎবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর ও অধিকতর উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি একথা বলেন নাই যে অন্য শাস্ত্রে ব্রহ্মকথা থাকিলে তাহা গ্রহণ করিবে না, প্রত্যুত তাঁহার মতে সর্ব্বশাস্ত্র হইতেই ব্রহ্মোপদেশ গ্রহণ করা যাইতে পারে। রামমোহন রায় যে দেশে ও যে কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে যুক্তিবিচারকেই প্রধান অস্ত্রস্বরূপে গ্রহণ না করিলে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। বঙ্গদেশের আবহাওয়ার গুণ এমনি যে এখানকার অধিবাসী মাত্রেই অল্লাধিক নৈয়ায়িক—তাই মিথিলা হইতে নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র আনীত হইয়া এমনি তেজের সহিত বর্দ্ধিত হইল যে আজ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের অন্য কোন বিভাগ বঙ্গদেশের এই গৌরব অপহরণ করিতে পারে নাই। এই আবহাওয়ার এমনি গুণ যে, অমন যে প্রেমিকশ্রেষ্ঠ চৈতন্যদেব, তিনিও ইহারই গুণে কাশীতে বিচারকালে শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তির উপরেই অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন। এক কথায়, বঙ্গবাসী স্বভাবতই অল্লাধিক নৈয়ায়িক। ইহার উপর রাজা রামমোহন রায়ের কালে ইংরাজী শিক্ষার সূচনায় এবং খৃষ্টীয় মিশনরিদিগের সহায়তায় শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই তর্কের প্রতি কিছু বেশী মাত্রায় পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আবার মিশনরিগণ কথায় কথায় শাস্ত্রের দোষ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ধর্ম্মপ্রচারে উদ্যত হইলে তিনি যে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। তাই রামমোহন রায় যুক্তিবিচার অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মপূজা প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশীয় শাস্ত্র অবলম্বনে উপাসনাপদ্ধতি রচনা করিলেন। রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী সময়েও তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে দেশকাল-পাত্রের

বিভিন্নতা অনুসারে ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন সহকারে মূলত তাঁহারই প্রণালী রক্ষিত হইল। কেবল মধ্যে একবার এই ব্রাহ্মসমাজে যুক্তিবিচারের স্থানে বেদমূলক জাতীয় ভাবেরই প্রাধান্য স্থাপনের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু ৺অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মনীষিদিগের সহায়তায় তাহার মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল। তখন জাতীয়ভাবের সহায়তায় যুক্তিবিচারের ভিত্তিভূমির উপরে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের নামেই জাতীয়তা অপেক্ষা যুক্তিমূলক সার্ব্বভৌমিকতা জ্বলন্ত অক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে একদিকে মানবহৃদয়ের স্বাধীনতার বিজয়-ঘোষণা হইল বটে, কিন্তু অপরদিকে একটু অনিষ্টেরও সূচনা দৃষ্ট হইল। অনেক দুর্ব্বল মনুষ্য স্বাধীনতার নামমোহে মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিল বটে কিন্তু ক্রমে বিকৃত স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা আনয়ন করিয়া সমাজকে কলঙ্কিত করিল। এই স্বেচ্ছাচারিতা যখন নিষ্ঠাবান্ পশ্চিমভারতের চক্ষে পতিত হইল, তখনই অর্য্যসমাজের আবির্ভাব, ইহা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি।

ইতিপূর্ব্বে ইহাও দেখিয়া আসিয়াছি যে রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি স্বামী দয়ানন্দের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি স্বাধীনতার ছায়ায় আনীত সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বোক্ত স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজকে যুক্তিবিচার অপেক্ষা জাতীয়ভাবের উপরেই অধিকতর গঠিত করিবার চেষ্টা পাইলেন। তিনি বেদাদি শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিলেন। তিনি ব্যাকরণাদি অবলম্বনে ব্রহ্মানুবোধক নূতন বেদভাষ্য প্রণয়ন করিয়া স্বভাবত নিষ্ঠাবান্ পশ্চিমভারতবাসী এবং অবান্তরে সমগ্র ভারতবাসীকে বলিলেন যে বেদাদি শাস্ত্রে যখন একমাত্র ব্রহ্মপূজারই বিধি আছে, তখন আমাদের মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। নিষ্ঠাবান পশ্চিম ভারতের হিন্দুগণ বেদের নামে দলে দলে স্বামী দয়ানন্দের শিষ্য হইতে লাগিলেন। পশ্চিমভারতের হিন্দুদিগের মধ্যে শাস্ত্রাদির প্রতি যেরূপ গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা আছে, তাহাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে দয়ানন্দের ন্যায় লোক না উঠিলে তথায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের বিলক্ষণ অসুবিধা হইত। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, ব্রাহ্মসমাজ ভারতের পশ্চিমবিভাগে বঙ্গদেশের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গীন প্রভাব

বিস্তার করিতে পারে নাই। রামমোহন রায় বঙ্গবাসীর প্রকৃতির উপযোগী বুঝিয়া উপনিষদ্ হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত স্বমত সমর্থনের জন্য গ্রহণ করিয়া এথানে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের সহজউপায় করিয়া গিয়াছেন; স্বামী দয়ানন্দ পশ্চিমবাসীর প্রকৃতির উপযোগী বুঝিয়া তাঁহার মতে পুরাণ ঋষিপ্রণীত বেদ অবধি মনুসংহিতা পর্য্যন্ত শাস্ত্র অবলম্বনে আত্মমত অতিষ্ঠিত করিয়া তথায় ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারের উপযুক্ত উপায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। স্বামী দয়ানন্দ শাস্ত্রের সম্মান যথেষ্ট রক্ষা করিলেও প্রকৃত মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা তাঁহা কর্ত্তৃক কিছু সঙ্কীর্ণ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয় এবং রাজা রামমোহন দয়ানন্দ সরস্বতীর ন্যায় শাস্ত্রমর্য্যাদা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিতে না পারিলেও মনুষ্যত্বের সম্মান বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

যাই হৌক্ আমি এতক্ষণে দেখিয়া আসিলাম যে আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ মূলে একমন্ত্র লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও বিভিন্ন প্রচার প্রণালী অবলম্বনে দুই বিভিন্ন পথে গিয়া পড়িয়াছেন—ব্রাহ্মসমাজ কিছু অতিরিক্ত স্বাধীনতার দিকে এবং আর্য্যসমাজ শাস্ত্রবিশেষের প্রতি অন্ধভক্তির অনুরূপ এবং জাতীয়তার ছায়ায় পরিপুষ্ট কিছু অতিরিক্ত ভক্তির দিকে। ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে ব্রাহ্মসমাজে এই অতিরিক্ত স্বাধীনতায় কিছু কুফল ফলিয়াছে। আর্য্যসমাজেও সেইরূপ অতিরিক্ত জাতীয়তায় শাস্ত্রের একদেশ ভক্তিতে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতে পারি যে, বেদাদিতে "নিয়োগপ্রথার" অস্তিত্ব দেখা যায় বলিয়াই দয়ানন্দও তাহা সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ইহা দেশের মঙ্গলের পক্ষে কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। আমরা মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে এই নিয়োগপ্রথার ফলে অনেক কুফল হওয়াতে তৎকালে উহা পূর্ব্বপ্রচলিত নিন্দিত আচার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় ইহার মন্দফল অনুভব করিয়া এই সকল অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্র হইতেও প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ইহা হইতে লোককে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু স্বামীদয়ানন্দ সরস্বতী কেবল এইপ্রথা বেদে উল্লিখিত বলিয়া ইহার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য পণ্ডিত লোকদিগের স্বমত সমর্থনের জন্য সহজে প্রমাণপ্রয়োগের অভাব ঘটে না। আরও একটি দৃষ্টান্ত দিই—এই সেদিন আর্য্যসমাজের নেতা-

দিগের পরস্পরের মধ্যে এই অতিরিক্ত শাস্ত্রভক্তি হইতে উৎপন্ন এক মহাতর্ক আসিয়া বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছিল। আমিষ আহার এবং নিরামিষ আহার, ইহার মধ্যে কোন্‌টি বেদে সমর্থিত হইয়াছে, ইহাই তর্কের বিষয়। এই বিষয় লইয়া দলাদলি মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে এতর্ক আসিল না যে শরীর রক্ষার জন্য কোন্ প্রকার আহার অবলম্বনীয় অথবা অন্য কোন কারণে কোনটী পরিত্যজ্য—তর্ক আসিল বেদে কোন্ প্রকার আহার অনুমোদিত হইয়াছে; জাতীয়তার দোহাই দিয়া এই প্রকার সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া অনেক [illegible]াদের সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁহাদের গুরূপদিষ্ট এই জাতীয়তার প্রতি [illegible] থাকাতে একটি অপূর্ব্ব সুফলও ফলিয়াছে। এত দলাদলি মারামারির পরেও এক মুসলমান গুপ্তঘাতকের ছুরিকাঘাতে আর্য্যসমাজের অন্যতম গুরুকল্প ভক্তিভাজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লেখরামের মৃত্যুতে তাঁহারা সকল বিবাদ কলহ ভুলিয়া গিয়া একপ্রাণে মিলিত হইয়া আর্য্যোচিত প্রকৃত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মেরা মৈত্রীর বিষয়ে সহস্রবার বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিলেও স্বয়ং অভিমানমুগ্ধ হইয়া আজও প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারিতেছেন না।

স্বামী দয়ানন্দ ও রাজা রামমোহন উভয়েই প্রধানত ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন—ধর্ম্মসংস্কারই তাঁহাদের উভয়েরই জীবনের মধ্যবিন্দু ও ব্রত ছিল অন্যান্য কার্য্য ইহারই আনুষঙ্গিক পরিধিস্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাই আমি আজ ধর্ম্মসংস্কার বিষয়ে উভয়ের অবলম্বিত প্রণালী আলোচনা করিলাম। ইহার উপর তাঁহাদের পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে দুঃসাহস বলিয়া বিবেচনা করি এবং সেই কারণে তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে ব্রহ্মতেজে যাঁহাদের হৃদয় মন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের নিকটে অনেককেই অবনতমস্তক হইতে হয়। রাজা রামমোহনের পাণ্ডিত্যের কাছে তাঁহার সমসাময়িক একজনও কি অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন? সেইরূপ স্বামী দয়ানন্দ যে বেদভাষ্য প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার সারবত্তা বিষয়ে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এ পর্য্যন্ত স্বদেশীয় বিদেশীয় কোন পণ্ডিতই তাহার বিরুদ্ধে অখণ্ডনীয় আপত্তি আনয়ন করিতে পারেন নাই।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ যখন আপনাদিগের ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া পরস্পরের সহিত সাধুভাবে পরস্পরের গুণ সকল গ্রহণ পূর্ব্বক মিলিত হইতে পারিবেন—ব্রাহ্মসমাজ নিজ উদারভাবের উপর আর্য্যসমাজের জাতীয়তার প্রতি নিষ্ঠা আত্মগত করিবেন এবং আর্য্যসমাজ স্বীয় জাতীয়তানিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সার্ব্বভৌমিক উদারতা মিশ্রিত করিবেন, এবং এইরূপে যখন এক বৃহৎ ধর্ম্মপরিবার অবতীর্ণ হইবে, তখনই পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইবেন, ঋষিযজ্ঞ সম্পাদিত হইবে, ইন্দ্র-দেব স্বর্গলোক হইতে পারিজাত বর্ষণ করিবেন; দিক্ সকল সুপ্রসন্ন হইবে, বায়ু সুগন্ধ বহন করিবে, বসুন্ধরা শস্যপূর্ণ হইবে এবং সকলেই ব্রহ্মানন্দের কণামাত্রে অভিষিক্ত হইয়া আনন্দময় হইয়া উঠিবে—জগত হইতে অশান্তি ও দুঃখরাশি চলিয়া গিয়া এক অপূর্ব্ব শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। *

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রামকমল।

১২

এই উইলের সম্বন্ধে পাঠককে একটু বলিয়া দিই; অন্নদাপ্রসাদের সঙ্গে নীলকান্তের পূর্ব্ব হইতেই ভিতরে ভিতরে মনান্তর ছিল। নীলকান্ত বরাবর তাঁহার ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইতেন, কিন্তু তাঁহার দাদা রামজীবনের জন্য কিছু বলিতে পারিতেন না—বলিতে সাহসী হইতেন না; —অন্নদাপ্রসাদ রামজীবনের প্রাণের বন্ধু ছিলেন। রামজীবন অন্নদাপ্রসাদের কথা বিপদে সম্পদে বহুমূল্য জ্ঞান করিতেন।

বাটীর উদ্যানে একদিন রামজীবন বসিয়া আছেন, বসিয়া ধীরে ধীরে তামাকু টানিতে ছিলেন, এমন সময় একদিন অন্নদাপ্রসাদ অতিব্যস্ততার

* এই প্রবন্ধটী পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে তত্ত্ববিদ্যা সমিতির কোন অধিবেশনে পঠিত।

সহিত তাঁহার কাছে আসিয়া বলিলেন,—"ভাই রাম, নীলকান্ত দেখ্‌ছি আমাকে বাড়ী থেকে তাড়াবে। তার ব্যবহার দেখ্‌বে? আমার বিরুদ্ধে না লেগে তার জলগ্রহণ হয় না; একজনকে সে চিঠি পাঠিয়েছিল তার কতক অংশ আমার হস্তগত হ'য়েছে। তাতে নীলকান্ত লিখেছেন—"দাদার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই, অন্নদাটাই দাদার মাথা খেলে মন্মথ। বানর ও ছাগলের গল্প জান? বানর ছাগলের মুখে দই মাখিয়ে আপনি গিয়ে ছাদে ব'সে রৈল যেন মহা নির্দ্দোষী। দাদা হ'য়েছেন ছাগল আর অন্নদাটা হ'য়েছে বানর।"

"ভাই রাম দেখ্‌লে কেমন লেখা। তোমার ছোট ভাই হ'য়ে কেমন তোমাকে সম্মান করে দেখেছো। ভাই তুমি তোমার নিজের বিষয়ের ভার তোমার ছোট ভায়ের উপর দিয়ে যাবে মনে ক'রেছিলে তা' মন থেকে দূর কর। তোমার ছেলে রামকমলের নামে একটা উইল ভিতরে ভিতরে ক'রে রেখে যাও। নীলকান্ত আজকাল বড় অসচ্চরিত্র হ'য়ে উঠেছেন, আপনার বিষয়তো সব একরকম উড়িয়েছেন, শেষকালে তোমার বিষয়টাও ওড়াবেন। ভাই আমার মেয়েটী যখন তোমারই ছেলের বউ হবে তখন রামকমলের কথা আমি না ভেবে কিছুতেই থাক্‌তে পারিনে। তুমি তোমার ছেলের নামে গোপনে একটা উইল ক'রে রেখে যাও।"

অন্নদাপ্রসাদের কথামত রামজীবন গোপনে রামকমলের নামে একটা উইল করিয়া গিয়াছিলেন।

১৩

রাধানাথ ৺অন্নদা চাটুয্যের বাড়ীতে আসিল। বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, দুয়ার বন্ধ, দরজায় ধাক্কা মারিল, চীৎকার করিয়া বলিল "ঝি ও ঝি কে আছগো দরজা খোল।" শুনিয়া একটী ঝি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। রাধানাথ কহিল, "আমি রাধানাথ গিন্নি মা ঠাকরুণের পুরোণো চাকর। ঠাকরুণকে গিয়ে বল "রাধানাথ একবার তাঁর শ্রীচরণ দর্শন কত্তে এসেছে।" ঝি গিয়া তাহা বর্ষীয়সী ঠাকুরাণীকে বলিল। তিনি তাহাকে লইয়া আসিতে বলিলেন।

রাধানাথ গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক করযোড়ে বৃদ্ধা মাতা ঠাকুরাণীর কাছে

আসিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিল। বৃদ্ধা বলিলেন "এই যে রাধানাথ কেমন আছ?" রাধানাথ কহিল "আর মা ঠাকুরুণ কেমন আছি, যেমন ভগবান রেখেছেন। কমলা দিদি আমাদের কোথায়? কমলা দিদিমণির বিয়ের কি কচ্চেন?" বৃদ্ধা বলিলেন "আমি আর কি কচ্চি বল—অন্তরে সহসা কি ভাবের উদয় হইল, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন, "কমলার বাপ মা কেউ নেই, আমি একা আর কি কর্ত্তে পারি, যারা আত্মীয় কুটুম্ব তারা মাঝে মাঝে এখানে আসে, গল্প ক'রে চ'লে যায়, কমলার জন্যে কইতো কারো তেমন চেষ্টাই দেখিনি।" একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন "যাই হোক বিধেতা আছেন তিনি প্রজাপতি তিনিই বিয়ে দিয়ে দেবেন।" রাধানাথ কহিল "তা তো ঠিক, কিন্তু আপনাদের চেষ্টা না কল্লে চলবে কেন?" বৃদ্ধা কহিলেন "তা তুমি একটা পাত্তর টাত্তর ঠিক ক'রে দাও না।" রাধানাথ বলিল "তা দিতে পারি, আমার হাতে একটী ছেলে আছে, বড়লোকের ছেলে, কিন্তু তার বিষয়আশয় তেমন কিছুই নেই, সে তার খুড়োর প্রসাদে খাচ্চে দাচ্চে, তার যা কিছু ছিল প্রায় সব তার বাপ উড়িয়ে গেছেন। যৎসামান্য বিষয় যদি তার থাক্‌তে পারে। তার উপর নির্ভর ক'রে আপনি কমলার বিয়ে দেবেন?" বৃদ্ধা বলিলেন, "কাদের বাড়ীর ছেলেগো?" রাধানাথ বলিল "ছেলেটী হচ্চে রামজীবন বাঁড়ুয্যের ছেলে।" বৃদ্ধা কহিলেন "আহা ছেলেটী বেশ, আমি তাকে দেখেছি, আমি সেই ছেলেটীকে চাই, তাকে দেখ্‌লেই মনে হয়গো সে বড় ভাল ছেলে। আমার অন্নদারও তার সঙ্গে বিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল, তাঁর বাপেরও কমলার সঙ্গে বিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল। কে বল্লে তার বিষয়আশয় নেই সে যে তার বাপের অতুল বিষয়ের অধিকারী। রামজীবন উইল ক'রে গেছেন সেই উইলটী আমার ছেলেকে দেখ্‌তে দিয়েছিলেন। তাতে আর আমার ছেলেতে হরিহরাত্মা ছিল।" রাধানাথ বলিল "কই মা, তা যদি থাকে, তা হ'লে এখনই দাও না, একবার দেখিয়ে আসি, দেখিয়ে এসে আপনার নাত্নীর সঙ্গে এখনি ছেলেটীর বিয়ের ঠিক ক'রে দিই, কিন্তু মা ঠাকুরুণ ঘটকালী চাই।" বৃদ্ধা কহিলেন "সে আবার বলতে, সে বিষয়ে রাধানাথ তোমার কিছুমাত্তর ভাবৃতে হবে না, তোমার যাতে সন্তোষ হয়,

তাই আমি করবো, বাবা তুমি বেঁচে থাকো।—ছেলেটীর সঙ্গে কমলার, যত শীঘ্র পার বিয়ের ঠিক ক'রে দাও। ব'স আমি উইলটী এনে দিচ্চি।" এই বলিয়া বৃদ্ধা উইলটী রাধানাথের কাছে আনিয়া দিলেন। উইলটী পাইয়া রাধানাথ হর্ষে গদগদ হইয়া উঠিল, শঠতা ও পুলকপূর্ণ চক্ষে কহিল "মা ঠাকরুণ প্রণাম, তবে আজ্ঞ আসি, এক জায়গায় যেতে হবে বিলম্ব হ'য়ে গেছে।"

১৪

উইলটী পাইয়া রাধানাথের মহাখুসি। সে একজন অর্থপিশাচ, টাকার জন্য সে সকল কার্য্যই করিতে পারে। পুরস্কার লাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়া সে একরূপ দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পথে যাইতে যাইতে রাধানাথ সহসা এক পঙ্কিল স্থানে পড়িয়া গেল; তাহার বস্ত্রাদি সব পঙ্কে কলুষিত হইয়া মলিন আকার ধারণ করিল। রাধানাথের অন্তর যে অর্থ লোভে পাপপঙ্কে পতিত হইয়াছে তাহারই ছবি যেন দৈবঘটনায় স্ফুটতররূপে দেখাইয়া দিল।

নিকটে গঙ্গা বহিতেছিল, সেথায় রাধানাথ স্নানার্থে গমন করিলেন। উইলটী একটি পাতলা কাপড়ে ঢাকিয়া, গঙ্গাতীরে উপরে রাখিয়া স্নান করিতে গঙ্গায় নাবিলেন। এখানে গঙ্গাতীর তরুরাজি সমাকীর্ণ ছিল; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষে স্থানটি প্রায় পরিপূর্ণ ছিল। সেই সকল বৃক্ষে গৃধ্র শকুনির আবাসস্থান ছিল।

রাধানাথ স্নান করিতেছেন, ইত্যবসরে একটি বৃহৎ শকুনি আসিয়া সেই বস্ত্রাবৃত কাগজটী লইয়া (হইবে নিজ কুলায়ের জন্য) উড়িয়া গেল, রাধানাথ তাহার খুনাক্ষরও জানিতে পারিল না। উইলপত্রটি আদায় করিয়াছেন, নীলকান্তের কাছে পুরস্কার পাইবেন, ভারি ফুর্ত্তি, একটু আয়েসে স্নান করিতেছেন।

স্নান হইয়া গেলে, রাধানাথ উঠিয়া দেখিল কাগজ নাই! চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল, কোথায়ও দেখিতে পাইল না।—তাহার পুরস্কারের আশায় বজ্র পড়িল। ভাবিল পুরস্কারার্থী কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দী হয়তো গোপনে গোপনে আসিয়া তাহা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু ক্ষণ-

কাল পরে আবার নিজ মনে বলিল "না তা হ'তে পারে কি? এই স্থানটী অরণ্য সমান এখানে আমি যে এসেছি তা তো কেউ জানে না। কি জানি কেউ জানলেও জানতে পারে।" ভাবিতে ভাবিতে অত্যন্ত মর্ম্মাহতচিত্তে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল, পাদপ সমূহের মর্ম্মরধ্বনি যেন তাহার মর্ম্ম-মাঝে হতাশসঙ্গীত প্রেরণ করিতে লাগিল। পুনরায় হতাশ হৃদয়ে উঠিয়া বলিল "হায় টাকাটা হাতের কাছে এসে মারা গেল হারালেম। একজন আমলার পক্ষে তা যথেষ্ট, আমি বসে পায়ের উপর পা রেখে জীবন কাটাতে পাত্তেম। যাক এখন আর আক্ষেপ ক'রে কি হবে, বুঝতে পাচ্চি ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, নীলকান্ত বাবুর কাজে দৈববিড়ম্বনা ঘট্‌লো।"

পাকে পড়িয়া রাধানাথের মুখে ধর্ম্মবাক্য আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু অর্থগৃধ্নু জনের ধর্ম্মের মায়া অপেক্ষা টাকার মায়া সহসা প্রবল আকার ধারণ করিয়া উঠিল, বলিল "যাক্ ও রামকমলের বাপের বিষয় রামকমলই পাবে, এইবার তাকে হাতকরাই ভাল; সে যখন উইলের কথা জেনেছে, অন্নদাপ্রসাদ বাবুর বাটীতে বৃদ্ধা ঠাকুরাণীর কাছে উইলটী দেখেছে তখন উইলের নকলতো রামকমল কোর্ট থেকেই ইচ্ছে কর্‌লে পেতে পারেন। যাক্ এ টাকাটা গেছে গেছে এবার রামকমলকে হাতক'রে দুনো লাভ কর্‌তে হবে। খোকাবাবু আপনার বিষয় আজ না হোক্ কাল বুঝে নেবেই নেবে। আর তার পেছনে পরামর্শ দেবার বিস্তর লোক জুটেছে। এখন খোকাবাবুর খোসামোদ কর্‌লে আমার ডান্‌হাতের ব্যাপারের বিষয় আর ভাবতে হবে না।"

"এবার খোকাবাবুর খুড়োর নামে খোকাবাবুর কাছে বেশ ক'রে লাগাতে হবে। আর খোকাবাবুর সঙ্গে যাতে আমার পুরানো মনিবের কন্যেটীর বিয়ে হয় তাই প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌তে হবে। বিয়েটা দিতে পার্‌লে বৃদ্ধা মা ঠাক্‌রুণের কাছে বেশ ঘট্‌কালিটা মার্‌তে হবে। যাক্, উঠি যাই, আর খোকাবাবুর খুড়োর তরফে যাচ্চিনে। যাহোক্ এখনও খোকাবাবুর খুড়োকে আমার হাতে রাখতে হবে। দুকূল বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে।"

১৫

রাধানাথের কাছে নীলকান্ত সমস্ত ব্যাপার শুনিয়াছেন। শুনিয়া অবধি

তাঁহার অন্তরে আর সুখ নাই। তিনি এখন চারিদিকে যেন তাঁহার শত্রু দেখিতেছেন, সকলেই যেন তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি বিকৃতমনে সমুদয় জগতকে বিকৃত দেখিতেছেন, প্রকৃতির ভীষণ তাড়না বিষম বিড়ম্বনাই তিনি এখন শয়নে স্বপনে দেখিতে পাইতেছেন আর তাঁহার মনে সুখ নাই। তিনি নিজ প্রকোষ্ঠে নিশীথে একা বসিয়া ভাবিতেছেন ও বলিতেছেন "আমার বড় ভাই হ'য়ে আমাকে একবারও কিছু বল্লে না, লুকিয়ে এরূপ কল্লে। অন্নদাকে জানালে, আমাকে একবারও জানালে না। যাক্ আর বেশীদিন সংসারে থাকা কিছু নয়।"

বড় ভাই রামজীবনের ব্যবহার ভাবিতে ভাবিতে নীলকান্ত এতই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন যে আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। "যাক্ আমার যেমন অদৃষ্ট তেমনি ফল।" বলিতে বলিতে শুইয়া পড়িলেন। জানালা দিয়া দ্বাদশীর জ্যোৎস্না তাঁহার মুখে পড়িল।—দেখিতে দেখিতে ক্ষানিকক্ষণ পরে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

১৬

জাহ্নবী কুলুকুলু রবে তীর চুম্বন করিয়া ধীরে বহিয়া যাইতেছে। পারে দুএকটি তরী ভাসিয়া যাইতেছে। তীরের উপরে একটি প্রকাণ্ড বট গাছ বায়ুভরে অনবরত আন্দোলিত হইয়া মর্ম্মরশব্দ করিতেছে। তাহার তলে একাকী রামকমল উদাস হৃদয়ে চিন্তিত মনে বসিয়া আছেন।—সন্ধ্যা হইয়াছে, পূর্ব্বদিকে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে, পশ্চিমদিকে আকাশ জলদপটলাবৃত হইয়া লোহিত, পাটল প্রভৃতি নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে রামকমল নীরবে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন, প্রকৃতির পানে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছেন,—সহসা তাহার মাথার উপরে দুইটী নিশাচর পক্ষী পাখার ঝাপটা মারিয়া, বটগাছের মাথায় গোল করিতে লাগিল, তাহাদের নীড়ের কুটাকাট সমূহ রামকমলের গায়ে পড়িতে লাগিল, রামকমল অধীর হইয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি একটি ঢিল লইয়া গাছের উপর দিকে ছুড়িলেন, পক্ষীদ্বয় তবুও কলহ ছাড়িল না, রামকমল তাহাদের লক্ষ্য করিয়া পুনরায় আর একটী ঢিল ছুড়িলেন। এইবার সেইটা গিয়া পক্ষীদের গায়ে লাগিল, তাহারা ভয়ে যেমন দ্রুত ঝাপটাইয়া পলাইতে যাইবে, অমনি তাহাদের বাসা হইতে

একটি বস্ত্রখণ্ড রামকমলের মাথার উপর একটু স্পর্শ করতঃ আড়ভাবে পড়িয়া গেল; রামকমল চমকিয়া উঠিলেন, সেই বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে একটা কি যেন বাঁধা আছে বলিয়া তাঁহার বোধ হইল, সেই বস্ত্রখণ্ডটি আগ্রহান্বিত হইয়া ভালরূপে নাড়িতে লাগিলেন, এবং তাহার বন্ধনাংশটি খুলিয়া ফেলিলেন। —খুলিয়া দেখেন—তাহার মধ্যে তিন চারিটি কাগজ পত্র বাঁধা। একটু আলোয় গিয়া সেই কাগজগুলি কতক কতক পড়িয়া দেখিলেন। দেখিয়া অবাক্—তাঁহার বাপের উইল!—যেটা তিনি বৃদ্ধার কাছে দেখিয়া ছিলেন; এখানে তাহা পক্ষীদ্বয়ের বাসায় কিরূপে আসিল, তাহারা কিরূপে পাইল ভাবিতে লাগিলেন, ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। ভাবিতে ভাবিতে রামকমল তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

১৭

উইলটি লইয়া সেই রাত্রে রামকমল বৃদ্ধার বাড়ীতে গেলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি আদর সম্ভাষণ করিলেন। পরে রামকমল জিজ্ঞাসা করিলেন "মাঠাকরুণ আমাকে সেদিন যে উইলটি দেখাইয়াছিলেন সেটা কি এখনও আপনার কাছে আছে! বৃদ্ধা কহিলেন "না সেটা রাধানাথ ব'লে আমাদের একজন পুরোনো কর্ম্মচারী ছিল সেই দেখিতে নিয়েছে। বাবা তুমি যাহাতে বিষয় পাও সেইজন্য সে চেষ্টা করবে।' রামকমল বলিলেন 'মাঠাকরুণ সে যে আমাদের বাড়ীর কর্ম্মচারী। আমি অনেকের মুখে শুনেছি সেটা ভারি জুয়াচোর। উইলটী নিয়ে কি আর সে দিত, কি দুরভিসন্ধিতে নিয়েছিল কে জানে।" "কি হবে বাবা তাহ'লে?" সে পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীতে কর্ম্মচারী ছিল, তাকে বিশ্বাসী ব'লে আমার বিশ্বাস ছিল তাই তার কথামত তাকে দেখতে দিয়েছি, সে বলেছে উকিল টুকিলকে দেখিয়ে তুমি যাতে বিষয় পাও তাই করবে।" রামকমল কহিল "আস্ত জুয়াচোর। যাইহোক, ঠিক সেই রকম একটী উইল—সেই উইলই হবে আমার বেশ মনে হচ্চে, আমি গঙ্গাতীর থেকে পেয়েছি। বৃদ্ধা সচকিত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; কিরূপে রামকমল পাইলেন তাহাই জানিবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। রামকমল তখন সমুদয় ঘটনাটি বিবৃত করিয়া বলিলেন এবং উইলটী কাপড়ের মধ্য হইতে বাহির করিয়া দেখাইলেন। বৃদ্ধা সমুদয় দেখিয়া ও

শুনিয়া বলিলেন "আশ্চর্য্য ভগবানের লীলা! দেখেছ তা'হলে আমাকে মেয়েমানুষ পেয়ে আচ্ছা ঠকানটা ঠকিয়েছিল। ভগবান সে ঠকানর থেকে আমাকে রক্ষা করলেন। শত্রুমুখে ছাই দিয়ে তোমার বাপের উইল তুমিই ফের পেলে। নইলে হয় তো সে কি করতো কে জানে। উইলটী পেয়ে হয়তো নানা কৌশলে অমার ঠেয়ে টাকা বের করতো, কি ফিকিরে ছিল কে জানে। আমার অন্নদা, বৌমা আর সেই বড় নাতিটি থাকলে কি এ দুর্দ্দশা হ'ত। আমলাগুল সব নেমকহারাম। যাক্ বাবা পেয়েছো তোমার ধন তুমিই পেলে বেশ হ'ল।'

কথায় কথায় রাত্রি ক্রমে অধিক হইল, রামকমল বলিলেন "মা ঠাকরুণ আজ তবে আসি, আমি এই উইলটা নিয়ে একজন বন্ধুর বাড়ীতে যাব।'

বৃদ্ধা। "এস"

১৮

রামকমল চারিদিক হইতে, বিশেষতঃ রাধানাথের কাছ থেকে উইল সম্বন্ধীয় ব্যাপার ও তাঁহার পিতৃব্যের সম্পর্কে নানা কথা শুনিয়া অনেক বিশ্বাস ক[illegible] অনেক বিশ্বাস করেনও নাই। কিন্তু পিতৃব্যের স্নেহহীনতা [illegible] বড়ই কাতর হইতেন—ভগবানকে ডাকিয়া বলিতেন "[illegible] আর কার কাছে বলবো। পিতার তুল্য পিতৃব্য হায় হায় কোথায় তাঁহার পিতৃতুল্য স্নেহ!—বাস্তবিক এই সংসারে যার বাপ নেই সেই পিতৃহীনকে যে কি কষ্ট পেতে হয় তা সেই জানে। একে পিতৃহীন তাতে মাতৃহীন আমি বাস্তবিক এ সংসারে অনাথ, বিষয়ের উত্তরাধিকারী হঁয়েছি, সকলই তুচ্ছ, হে ভগবান্ তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা, আমার পিতৃব্যের মনে যা থাক্ আমাহ'তে আমার পিতৃব্যের যেন একচুল হানি না হয়।

১৯

এখন নীলকান্তের মহাভ্রম হইয়াছে, কাহার কাছে রাধানাথের চাতুরী সব জানিতে পারিয়াছেন যে, সে সকল কথা এখন প্রায় রামকমলকে বলে। সেই কারণে আর কোনও আমলার প্রতি তাঁহার আর বিশ্বাস নাই। নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া নিজমনে কহিতেছেন 'আমলাদের স্বভাবই

ওই। অমন নেমকহারাম কারাও হয় না।' এখন তাঁহার মহাভয় রামকমল সব জানিতে পারিয়াছে, তাতে সাবালক হইয়াছে, সে এখন তাঁর বাপের বিষয় আপনি হাতে লইয়া প্রভুত্ব করিবে। ভয় ভাবনায় তিনি সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। ভাবিলেন এইবার পূর্ব্ব হইতে রামকমলের একটু মনযোগানো দরকার। দেখিলেন বিবাহের কথায় সহজেই লোকের মন গলে তাহাতে শুনিয়াছেন রামকমল কাহাকে বিবাহ করিতে চায়। রামকমলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামকমল গম্ভীরভবে আসিলেন বলিলে "কাকামশায় আপনি কি আমায় ডেকেছেন?" নীলকান্ত কহিলেন "হাঁ রামকমল তুমি অত গম্ভীর হ'য়ে র'য়েছো কেন?' রামকমল নীরবে বলিল 'না'। নীলকান্ত কহিলেন 'আমার ইচ্ছা তুমি এবার বিবাহ করে সংসার কর'। রামকমল কহিল "না এখন আমি বিবাহ করবো না।' নীলকান্ত কহিলেন 'বিবাহ করবে না, সে কি? তোমার বাবা একটী অতি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক করে গিযেছিলেন।' এবার রামকমল একটু বিচলিত হইয়া উঠিল, প্রথম কথায় ভাবিয়াছিল তাহার খুড়ো না জানি অন্য কাহার সঙ্গে বিয়ে দেবেন। কিন্তু তাহা যখন নয় তখন তাহার মনটা প্রফুল্ল আকার ধারণ করিল; না থাকিতে পারিয়া একটু আগ্রহ সহকারে বলিল 'মেয়েটীর নাম কি?' খুড়ো বলিলেন 'কমলা'। কাকার মুখে কমলার সঙ্গে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া [illegible] মন কিঞ্চিৎ পুলকিত হইয়া উঠিল, সহসা মুখের গাম্ভীর্য্য দুঃখের ভাব দূর হইয়া গেল বলিলেন 'পিতার যা ইচ্ছে, তোমার যা ইচ্ছে,, তাই হোক।'

কাকা বলিলেন 'আমি এই মাসেই তোমার বিয়ের ঠিক করবো। রামকমল শুনিয়া ভিতরে ভিতরে গলিয়া গেলেন, ভাবিলেন কাকার অশেষ স্নেহ। রামকমলের খুড়োকে অনেক সময়ে স্নেহহীন বলিয়া ধারণা হইত এবার তাহা গেল;—বলিলেন 'আমারই ভুল' কাকার স্নেহ আমি বুঝিতাম না।'

কিন্তু ঈশ্বরই জানেন কাহার মনে কি আছে! কমলার সঙ্গে রামকমলের বিবাহ কথা পাড়িয়া নীলকান্তের মনের কষ্ট আরও বাড়িল, অন্নদাপ্রসাদের স্মৃতি আসিয়া তখন তাহাকে দ্বিগুণ দগ্ধ করিতে লাগিল;—বলিলেন অন্নদাটাই যত নষ্টের মূল।

কষ্টে—মদের মাত্রা চতুর্গুণ বাড়াইয়া তুলিলেন।

২০

আজ বিবাহের দিন খুব ধুমধাম। বরযাযাত্রা সম্পন্ন হইল। কন্যার বাড়ীতে বর গিয়াছেন। নীলকান্ত বিবাহ দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

কন্যার বাড়ীতে বাসরঘরে খুব ধুম চলিল। খুব আমোদ আহ্লাদ চলিতেছে।

নীলকান্ত বাড়ীতে আসিয়া মদের উপর মদ খাইয়াছেন। যকৃতে বিপ্লব বাধিল—রক্তবমন হইতে লাগিল, নীলকান্ত হতচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন, ডাক্তার আসিয়া দেখিল নাড়ী নাই। কন্যার বাড়ীতে সংবাদ গেল। বাসরঘরে ক্রন্দন কোলাহল উঠিল, হাসি ক্রন্দনে পরিণত হইল।

দুটী ফুল।

ভুলভাঙ্গা।

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

এ জনমে চাহি নাই যাহা, কেন সখা আমারে তা দিলে;
হৃদয়ের স্থিরতা নাশিয়া, কেন সেথা তরঙ্গ তুলিলে?
বেশ সুখে ছিলাম ভ্রমেতে, কেন মোর সে ভুল ভাঙ্গিলে?
আমার সে ভ্রম ঘুচাইয়া, হৃদয়ের শান্তি ঘুচাইলে!

ভগ্ন-হৃদয়।

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

(আমার) এ জীবনের প্রভাত কেটেছে
কল্পনার প্রেমের খেলায়;
ভাবি নাই জীবন মধ্যাহ্নে

সত্য আসি বাধাবে প্রলয়।
সত্য আর কল্পনা মিলিয়া
দারুণ বিপ্লব বাধায়েছে;
সে বিপ্লবে প'ড়ে হৃদিখানি
শতধা হইয়া ভেঙ্গে গেছে।
কেন সখা মোরে লাজ দাও
ও পূর্ণ হৃদয় বিনিময়ে
কেন এই ভগ্ন হৃদি চাও?

শ্রীভূপেন্দ্রবালা দেবী।

সেন-রাজগণের ইতিহাস

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১মতঃ। আসাম হইতে আমি একখানি হস্তলিখিত 'দানসাগর পুঁথি পাইয়াছি। তন্মধ্যে বল্লালসেন নিজ পরিচয় এইরূপ দিতেছেন;—

"হেমন্তঃ পরিপন্থিপঙ্কজসরঃ সর্গস্য নৈসর্গিকে-
রুদ্গীতঃ স্বগণৈরুদাত্তমহিমা হেমন্তসেনোঽজনি।
তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্ বরেন্দ্রে
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বম্॥
দৈন্যোত্তাপভৃতামকালজলদঃ সর্ব্বোত্তরঃ ক্ষ্মাভৃতাং
শ্রীবল্লালনৃপস্ততোঽজনি গুণাভির্ভাবগর্ব্বেশ্বরঃ।"

'কমলকুলবিনাশক হেমন্তঋতুর ন্যায় রিপুকুল-বিনাশক হেমন্ত সেন,—যাঁহার উদাত্তমহিমা আত্মীয়গণকর্ত্তৃক উদ্গীত হইয়াছে, তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন।

তৎপরে বিজয়সেন বরেন্দ্রে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার বীরধ্বজত্ব দেশ বিদেশে স্বীকৃত হইত।

তৎপরে রাজগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জন্ম হইতেই যিনি রাজা সর্ব্বগুণান্বিত তিনি নিদাঘ-পীড়িত লোকের মধ্যে অকালজলদোদয়ের ন্যায় জন্মগ্রহণ করিলেন।

২য়তঃ। ইদিলপুরের ঘটকগণের নিকট হইতে আমি প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের যে পুরাতন কারিকা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে আছে,—

"পঞ্চ গৌড়াধিপস্যাস্য স্পর্দ্ধা কাশীশ্বরেণ চ।
সম্মানেন চ দানেন কাশীশ্বরমধঃকৃতঃ॥
কিন্তু সাগ্নির্মহাদ্যাপি বিপ্রাদ্যৈর্বিকলা সভা।
মনস্বী তেন ভূপোঽয়ং ভূদেবৈর্নিন্দ্যরাজ্যকঃ।
মতিশ্চক্রে তদানেতুং গৌড়রাজ্যে দ্বিজোত্তমান্॥
কোলাঞ্চ দেশতঃ পঞ্চ বিপ্রা জ্ঞানতপোবৃতাঃ।
মহারাজাদিশূরেণ সমানীতাঃ সপত্নীকাঃ॥
ক্ষিতীশ মেধাতিথি চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ স চ ধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড়মণ্ডলে॥
ইতিপঞ্চ সমাখ্যাতাঃ রাজ্ঞা তেন পরীক্ষিতাঃ।
কামঠী ব্রহ্মপুরাচ হরিকোটি স্তথৈবচ॥
কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম এষাং স্থানানি পঞ্চ চ।
এষাঞ্চ বহবঃপুত্রাস্তপোনিধূতকল্মষাঃ॥
ভূপালৈঃ পূজিতা যে চ ধনৈগ্রামৈস্তথোত্তমৈঃ।
মহাবংশপ্রসূতাস্তে ব্রাহ্মণা পূজিতা নৃপৈঃ॥

*　　*　　*　　*

শ্মাপালপ্রতিভূর্ভুবঃ পতিরভূদ্ গৌড়ে চ রাষ্ট্রে ততঃ
রাজানুভূৎ প্রবলঃ সদৈবঃ শরণঃ শ্রীদেবপালস্ততঃ।
প্রজ্ঞা-বাক্য-বিবেক-শীল বিনয়ৈঃ শুদ্ধাশয়ঃ শ্রীযুতো
ধর্ম্মে চাস্য মতিঃ সদৈব রমতে স স্বীয়বংশোদ্ভবঃ॥

*　　*　　*　　*

বিপ্রপালো হি বল্লালো রাজা বিজয়নন্দনঃ।
ব্রাহ্মণায় কুলস্থানং দত্তবান্ ভুবি দুর্ল্লভম্॥
তাম্রপাত্রে কুলং লেখ্য শাসনানি বহূনি চ।
এতেভ্যো দত্তবান্ পূর্ব্বং কলৌ বল্লাসেনকঃ॥
বল্লালতনয়ো রাজা লক্ষ্মণোঽভূন্মহাশয়ঃ।
জন্মগ্রহভয়াদ্দোষাৎ কলঙ্কোঽভূদনন্তরম্॥
প্রায়শ্চিত্তং ততঃকৃত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রতিগ্রহান্।
তৎপুত্রঃ কেশবো রাজা গৌড়রাজ্যং বিহায় চ॥
মতিঞ্চাপ্যকরদ্বন্দ্বে যবনস্য ভয়াত্ততঃ।
ন শক্নুবন্তি তে বিপ্রাস্তত্র স্থাতুং যদা পুনঃ॥

মহারাজ আদিশূর পঞ্চগৌড়ের অধিপতি ছিলেন। কাশীরাজ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সম্মানে ও দানে কাশীশ্বর তঁাহার নিকট হীন হইয়া পড়েন, কিন্তু আদিশূর এক বিষয়ে বড় উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁহার সভায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণ কেহই ছিল না। তিনি অন্যস্থান হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইবার কল্পনা করিলেন। মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক কোলাঞ্চ দেশ হইতে জ্ঞানী ও তপস্বী সপত্নীক পাঁচটি ব্রাহ্মণ আনীত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি এই পাঁচজনে গৌড়মণ্ডলে আসিলেন। মহারাজ তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া কামটী, ব্রহ্মপুরী, হরিকোট, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম এই পঞ্চ স্থান দান করেন। রাজা যাঁহাদিগকে এইরূপে ধন ও গ্রাম দিয়া পূজা করিলেন, তাঁহারা সকলেই মহাবংশ-প্রসূত ও দ্বিজনৃপগণ-প্রপূজিত। * * * আদিশূরের পর তাঁহার বংশধরেরা কিছুদিন গৌড়ে রাজত্ব করেন। ঈশ্বরানুগ্রহে প্রজ্ঞা, বিবেক, শীল ও বিনয়বান্ দেবপাল প্রবল রাজা হন, ইনি নিজ কুলধর্ম্মে বিশেষ নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। * * * বিজয়ের পুত্র বল্লাল ব্রাহ্মণগণকে প্রতিপালন করিতেন তিনই ব্রাহ্মণগণকে ভূলোকদুর্লভ কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদানকরেন। তাম্রপাত্রে কুল ও বহুতর শাসন লিখিয়া ইনি ব্রাহ্মণদিগকে দিয়াছিলেন। বল্লালের পুত্র রাজা লক্ষ্মণও মহাশয় হইয়াছিলেন, তিনি মন্দগ্রহে জন্মিয়া ছিলেন বলিয়া ভয়ে কিঞ্চিৎ কলঙ্কগ্রস্ত হন। তৎপরে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিগ্রহ করাইয়া

প্রায়শ্চিত্ত করেন। তাঁহার পুত্র রাজা কেশব শকযবনের ভয়ে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া গৌড় পরিত্যাগ করিতে মনন করেন।”

৩য়তঃ। প্রাচীন কুলাচার্য্য এড়ু মিশ্রের কারিকায় আছে,—

“আস্তে পশ্চিমদিগ্বিশেষবিষয়ঃ শ্রীকান্যকুব্জাহ্বয়ঃ
তন্মধ্যেঽস্তি বিশিষ্টবিপ্রনিলয়ঃ কোলাঞ্চদেশঃ শুভঃ॥
তস্মাদানয়াদাদিশূরনৃপতিঃ পূর্ব্বন্তু পঞ্চদ্বিজান্
তানানীয় বিশিষ্ট পঞ্চনগরং তেভ্যো দদৌ গৌড়তঃ॥
কালে ভূরি তিথৌ গতে সমভবদ্‌বল্লালসেনোনৃপঃ।
সংপ্রত্যর্পণদিৎসয়া দ্বিজগণান্ স্থানানয়ৎস্বান্তিকং॥”

“পশ্চিমে কান্যকুব্জ নামে দেশ আছে। তন্মধ্যে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ নিসেবিত কোলাঞ্চ নামক পবিত্র স্থান আছে। মহারাজ আদিশূর সেখান হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদিগকে বাসের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দিয়াছিলেন। বহুদিন পরে বল্লালসেন গৌড়ে রাজা হন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে দান করিবার ইচ্ছায় নিকটে আনাইয়া ছিলেন।

৪র্থতঃ। পূর্ব্বোক্ত মৎসংগৃহীত দানসাগরের ২২০ পৃষ্ঠায় আছে;—

“অত্র সম্বৎসরাদিসময়বিশেষপ্রতিপাদনেন দানসাগরস্য নির্ম্মাণকালস্যৈব সংবৎসর প্রতিপাদনায় লিখ্যতে,—

নিখিল চক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লালসেনেন পূর্ণে
শশিনবদশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ।
রবিভগণাঃ শরশিষ্টা যে ভূতা দানসাগরস্যাস্য।
ক্রমশোঽত্র সংপরিদাস্বদাদ্যা বৎসরা পঞ্চ॥
তদেবমেকনবত্যধিক বর্ষ সহস্রারেঽ দ্বিতেশাকে
সংবৎসরাঃ পতন্তি বিশ্বপাদারম্ভ চ।

‘এক্ষণে দানসাগরের রচনাকাল নিরূপন করিবার জন্য সংবৎসরাদি সময় বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিয়া লিখিতেছি,—

নৃপকুলতিলক বল্লালসেন দানসাগর রচনা করেন। শকবর্ষের ১০৯১ (শশি—১, নব—৯, দশ—১০, বামাবর্ত্তে ১০৯১) অব্দে দানসাগর রচিত হয়। রবিভগণকে ৫ দিয়া (শরশিষ্টাঃ —বাণেন বিভক্তাঃ) ভাগকরিলে

যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই দানসাগরের রচনা কাল। "ক্রমশঃ সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও উদাবৎসর নামক এই পঞ্চবৎসর আছে। বিশ্বপদ হইতে আরম্ভ করিয়া গণনা করিলে শকাব্দা একনবত্যধিক সহস্র সংবৎসর নামা বৎসর হইতেছে।" অর্থাৎ বিশ্বপদ হইতে গণনা রম্ভ করা অর্থে বর্তমান কলিযুগের উৎপত্তি দিন হইতে রবিভগণ, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারিযুগের পৃথক্ পৃথক্।

সত্যযুগের রবিভুগণ	...	...	১৭২৮০০০
ত্রেতাযুগের ,,	...	...	১২৯৬০০০
দ্বাপরের ,,	...	...	৮৬৪০০০
আর ১০৯১ শাকে কলিযুগেরভগণ		...	৪২৭০

এই চারিটি রাশিযোগ করিয়া ৩৮,৯২,২৭০ হয়। ইহা ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট কিছু থাকে না। এইকালে দানসাগর রচিত হয়।

৫মতঃ। সম্প্রতি মহারাজা বিশ্বরূপ সেন দেবের যে তাম্রশাসন আমি আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাতে আছে;—

"অবাতর দথান্বয়ে মহতি তত্র দেব স্বয়ং
সুধাকিরণশেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া।
খেলৎখড়্গলতাপমার্জ্জনকৃতং প্রত্যর্থিদর্পজ্বর-
স্তস্মাদপ্রতিমল্লকীর্ত্তিরভবদ্বল্লাল সেনো নৃপঃ॥
* * * * *
তস্মাল্লক্ষ্মণসেন ভূপতিরভূদ্ভূলোককল্পদ্রুমঃ।
পূর্ব্বং জন্মশতেষু ভূমিপতিনা সন্ত্যজ্য মুক্তিগ্রহং
ন্যূনং তেন সুতার্থিনা সুরধুনীতীরে হরঃ প্রীণিতঃ॥
এতস্মাৎ কথমন্যথা রিপুবধূবৈধব্যবদ্ধব্রতো
বিখ্যাত-ক্ষিতিপাল-মৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্বরূপো নৃপঃ॥"

"সেই পবিত্র বিপুল (চন্দ্র) বংশে স্বয়ং চন্দ্রচশেখর বিজয়সেন নামে জন্মগ্রহণ করেন। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন, ইহার খড়্গলতার খেলা দেখিয়াই ইহার শত্রুকুলের সমুদয় দর্প অপনীত হইত। বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ ভূতলে কল্পদ্রুম ছিলেন। তিনি সুতার্থী হইয়া গঙ্গাতীরে আরাধনা করিয়া

শিবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহা হইতে রিপুকুলবধূবৈধব্যবদ্ধব্রত সর্বনৃপ-চূড়ামণি শ্রীবিশ্বরূপ নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন।”

৬ষ্ঠতঃ। পূর্ব্বোক্ত এড়ুমিশ্রের কারিকার আর একস্থলে আছে ;—

নৃপং তং কেশবো ভূপতিঃ।
সৈন্যৈর্বিপ্রগণৈঃ পিতামহকৃতৈরন্যৈশ্চযুক্তো গতঃ॥
তাং চক্রে নৃপতির্মহাদরতয়া সম্মানয়ন্ জীবিকাং।
তদ্বর্গস্য চ তস্য প্রথমশ্চক্রে প্রতিষ্ঠান্বিতঃ।
ভূপালঃ স চ কেশবং নরপতিং কিঞ্চিৎপ্রসঙ্গান্তরে।
বাক্যং প্রাহ তদা পিতামহঃ কৃতী বল্লালসেনো নৃপঃ।
কীদৃগ্‌বিপ্রকুলাকুলাদিনিয়মঃ কস্মাৎ কথং বা কৃতঃ।
কেনোদ্যোগভরেণ বিপ্রনিকরং চক্রে তদাখ্যাহি মে॥
তং শ্রুত্বা কুলপণ্ডিতং কথয়িতুং তত্তজ্জগাদাদরাৎ।
এড়ুমিশ্রমশেষশাস্ত্রমখিলং বিপ্রং যথা পারগং॥”

“কেশব সৈন্যসামন্ত ও তদীয় পিতামহ স্থাপিত ব্রাহ্মণবর্গসহ রাজসমীপে উপনীত হইলেন। রাজা সানুচর কেশবকে পরমাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের জীবিকা নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে রাজা কেশবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহার পিতামহ বল্লালসেন কি জন্য, কোথা হইতে, কি উপায়ে ও কিরূপ চেষ্টায় কি নিয়মে ব্রাহ্মণগণের কুলনিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। ইহা শুনিয়া কেশব কুলপণ্ডিত এড়ুমিশ্রকে যথাবৎ বর্ণনা করিতে অনুমতি করিলেন।”

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশগুলি হইতে আমি যাহা যাহা স্থির করিতে পারিয়াছি, নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে ;—

১। হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন পিতার মৃত্যুর পর বরেন্দ্রভূমিতে রাজা হইয়াছিলেন।

২।৩। কোলাঞ্চ হইতে আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। তিনি বিজয়সেনের পুত্র মহারাজ বল্লালসেনের বহুপূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আদিশূর বা তদ্বংশীয়ের রাজত্বের পর পালবংশীয় দেবপাল গৌড়ের রাজা হন। দেবপালের বহুপরে সেনরাজেরা আবার রাজত্ব প্রাপ্ত হন। বল্লালসেন কতকগুলি

তাম্রশাসন (দানপত্র) প্রদান করিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণসেন জন্মকালের কুগ্রহ-সংস্থান বশতঃ কলঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কেশবসেন লক্ষ্মণসেনের পুত্র এবং তিনি যবনের ভয়ে পিতৃরাজ্য ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন।

৪। বল্লালসেন ১০৯১ শকে অর্থাৎ ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

৫। বিশ্বরূপসেন নামে একজন পরাক্রান্ত নৃপতি বল্লালসেনের পৌত্র ও লক্ষ্মণসেনের পুত্র ছিলেন এবং তাহার প্রদত্ত তাম্রশাসন তাঁহার রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে প্রদত্ত হয়।

৬। কেশবসেন (গৌড়বিজয়ের পর) অন্য একজন রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পূর্ব্বোক্ত কয়টী মীমাংসা ধরিয়া বিচার করিলে আমি বুঝিতে পারি না যে সার আলেকজ্যাণ্ডারের কথামত মগধরাজ গুপ্তবংশীয় আদিত্যসেনের বংশে বাঙ্গালার সেনরাজগণের উৎপত্তি এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ যে বীরসেন বা বিজয়সেনকে আদিশূর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা কিরূপে গ্রাহ্য করা যাইতে পারে।

মিঃ প্রিন্সেপ ও ডাক্তার মিত্রের মতে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভ কাল আইন-ই-আকবরী অনুসারে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন; কিন্তু আইন-ই-আকবরীতে ঐ অব্দ পাওয়া যায় না, বরং আকবরনামায় আছে এবং মিঃ বিভারিজ ইহার প্রথম উল্লেখ করেন যে লক্ষ্মণাব্দ ১১১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ডাঃ কিলহর্ণ একথার সপক্ষতা করিয়াছেন, কিন্তু ইহারা সকলেই বিশ্বাস করিয়াছেন যে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেকের সময় হইতে লক্ষ্মণাব্দ প্রচলিত হইয়াছে। উপরোদ্ধৃত বিবরণাদি হইতে কিন্তু একথার পোষণ হয় না। ১১১৯ খৃষ্টাব্দই লক্ষ্মণাব্দের আরম্ভ কাল হইলেও ইহা তাঁহার রাজ্যাভিষেক কাল নহে। আমি দেখাইয়াছি যে মহারাজ বল্লালসেন দেব ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) দানসাগর রচনা করেন এবং তখনও তিনি নিজে আপনাকে গৌড়রাজ বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে বল্লালসেন তৎকালে সিংহাসনে বর্ত্তমান থাকিতে লক্ষ্মণ কখনই সে সময় গৌড়াধিপতি হন নাই। ১১১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ বৎসর হইতেছে আইন-ই-আকবরী বল্লালসেনের বঙ্গশাসনকাল

৫০ বৎসর লিখিত আছে। যদি ইহা বিশ্বাস করা যায়, তবে ১১১৯ খৃষ্টাব্দকে বল্লালসেনেরই রাজ্যাভিষেক কাল বলা উচিত। তবে এক তর্ক উঠিতে পারে যে হয়ত ঐ সময়ে লক্ষ্মণসেন যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এবং ঐ সময় হইতে লক্ষ্মণাব্দ স্থাপিত হয়; কিন্তু ইহাও প্রকৃত ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কারণ, হিন্দুরাজারা স্ব স্ব রাজত্বকালের শেষাংশে স্ব স্ব পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেন, ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে।

ইহা গ্রাহ্য করিলে ইহাও অবশ্য গ্রাহ্য করিতে হইবে যে বল্লালসেন রাজ্যাভিষেক কালে (১১১৯ খৃষ্টাব্দে) ৫০।৬০ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন* তাহাহইলে, দানসাগর রচনা কালে তাঁহার বয়স ১০০।১১০ বৎসর হইয়াছিল; কিন্তু কোন বঙ্গরাজকে এত অধিক বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে আমরা শুনি নাই। এতদ্দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে বল্লালের রাজ্যাভিষেক কালে লক্ষ্মণসেন যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হন নাই।

একটী প্রচলিত প্রবাদ আছে যে যখন বল্লালসেন মিথিলা জয় করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন রাজ্য মধ্যে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয় এবং সেই সময়েই লক্ষ্মণসেন ভূমিষ্ঠ হয়েন। † অনতিবিলম্বে সেই শিশুই রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। বোধ হয় ইহা হইতেই মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজের আশ্চর্য্য গল্পের ভিত্তি-সংগ্রহ করিয়াছেন। যাহা হউক এই প্রবাদ হইতে আমরা এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি যে বল্লালসেন রাজ্যারোহণ করিয়াই কিছুদিন পরে মিথিলাজয়ে গমন করেন এবং মিথিলাজয়ের পর পুত্র-

* নগেন্দ্র বাবুর কথা বুঝা গেল না। ১২৬৬ই হউক ১১১৯ হউক যাহাই কেন ধরুন না, কোন অব্দ বিশেষে রাজা হইলেই যে তাঁহার বয়স ৫০।৬০ হইবে, ইহার অর্থ কি? ২৫।২৬ হইবে না কেন? বল্লালসেনের জন্মাব্দ ধরিতে পারা যায় না যে তদ্দ্বারা তাঁহার বয়স নিরূপণ করা যাইবে। তৎপরে বল্লালসেনের ১০০ বা ১১০ বৎসর বয়স হইয়াছিল বলিয়াই যে লক্ষ্মণসেন বল্লালের রাজ্যারম্ভ কালে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন নাই, ইহাই কিরূপ মীমাংসা।

সম্পাদক।

† "প্রবাদঃ শ্রূয়তে চাত্র পারম্পরীণ বার্ত্তয়া।
মিথিলে যুদ্ধযাত্রায়াং বল্লালোহভূন্মৃতধ্বনিঃ॥
তদানীং বিক্রমপুরে লক্ষ্মণো জাতবানসৌ।

জন্মবার্ত্তা প্রাপ্ত হন। এই সংবাদে তিনি এত আহ্লাদিত হন যে তিনি তাঁহার নবজিত রাজ্যে সেই সময় হইতে একটী নূতন অব্দ (পুত্রের নামে) প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অব্দ এখনও মৈথিলী পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত আছে কিন্তু বাঙ্গালায় ইহা প্রচলিত হইয়াছিল কিনা তাহার কোন চিহ্ন নাই।

বল্লালসেন ১১১৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন, অতএব তিনি যে বহুবর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু তিনি সামাজিক সংস্কারে প্রবৃত্ত ছিলেন, কৌলিন্য-প্রথা তাঁহাদ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। একার্য্যে তাঁহার জীবনের অনেকাংশ ব্যয়িত হইয়াছিল নিশ্চয়। ইহাও তাঁহার দীর্ঘকাল রাজত্বের আর একটী প্রমাণ।

বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেন প্রজাবৃন্দের বড় প্রিয় ছিলেন। তিনি নিজে বিদ্বান ও পণ্ডিতগণের সম্মানদাতা ছিলেন। তাঁহার রচিত শ্লোক 'সদুক্তি কর্ণামৃত' 'শার্ঙ্গধর পদ্ধতি', 'পদ্যাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ দেখা যায়। এমন কি মওলানা মিন্‌হাজ্‌-উদ্দীন তাঁহার বিষয়ে লিখিতে লিখিতে লিখিয়া গিয়াছেন,—"অল্পই বা কি আর বেশীই বা কি, তাঁহাদ্বারা কোনরূপ অত্যাচার কখন হয় নাই।" *

আইন-ই-আকবরী অনুসারে লক্ষ্মণ ৭ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন † ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আবার মিন্‌হাজের মতে তিনি ৮০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে মিঃ বিভারিজ বলেন ;—

"তারপর যদি লক্ষ্মণ ১১১৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করিয়া থাকেন ও ৮০ বৎসর কাল রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন তাহাহইলে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্ব ফুরাইয়াছে বলিতে হয়। সার আলেকজ্যাণ্ডার কনিংহাম ও মেজর রেভারটী নদীয়া আক্রমণের যে সময় নিরূপণ করিয়াছেন, ইহা প্রায় তাহার কাছাকাছি হইয়াছে। যদি ব্লকম্যান সাহেবের প্রদত্ত কালসংখ্যা গ্রহণ করা যায় অর্থাৎ ১১৯৮ বা ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ ধরা যায় তাহাহইলেও আবুল ফজল্‌ প্রদত্ত তাঁহার রাজ্যারোহণ কাল ১১১৯ খৃষ্টাব্দ এক প্রকার মিলিয়া যাইতেছে ও

* Barefty Tabaqat-i-nasiri, pp.—55.

† Jarrett, Ain-i-Akbari Vol. p. 146.

তবকত-ই-নাসিরিতে লিখিত তাঁহার রাজ্যশাসন কাল ৮০ বৎসরও মিলিয়া যাইতেছে।" *

আমি দেখাইয়াছি যে বল্লালসেন কর্ত্তৃক মিথিলা বিজিত হয় এবং সেই সময়েই লক্ষ্মণের জন্ম হওয়ায় তৎকালীন অন্যান্য ঘটনার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট রাখিবার জন্য মিথিলায় একটি অব্দ প্রচলিত হয়। আমি আরও দেখাইয়াছি যে বল্লালসেন ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সকল বিবরণ ধরিয়া বিচার করিলে আইন-ই-আকবরী কথিত ৭ বৎসর বা মিনহাজ্ কথিত ৮০ বৎসর কাল লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না। বল্লালসেনের পর লক্ষ্মণসেন ১১৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৭।২৮ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। আবুল্ ফজল্ বোধ হয় ভ্রমক্রমে ২৭ বৎসর স্থলে ৭ বৎসর লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়াই বেশী সম্ভব বোধ হয়। মিন্হাজ্ যখন দিল্লী হইতে মিথিলার ভিতর দিয়া লক্ষ্মণাবতী ভ্রমণে গিয়াছিলেন তখন হয়ত শুনিয়াছিলেন যে বাঙ্গলাদেশ লসং ৮০ অব্দে মুসলমান করগত হয়, ইহা হইতেই হয়ত তিনি মীমাংসা করিয়াছিলেন যে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব কাল ৮০ বৎসর।

মিন্হাজ্ বলেন,—যখন তিনি (মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার) বিহার জয় করিলেন তখন তাঁহার বীরত্ব রায় লক্ষ্মণিয়ার কর্ণে ও তাঁহার রাজ্যের অন্যান্য স্থলে প্রচারিত হইল।

কতকগুলি জ্যোতিষী পণ্ডিত ও মন্ত্রী রায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন, আমাদিগের ব্রাহ্মণগণের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে ভবিষ্যৎকথা এইরূপ লিখিত আছে যে এরাজ্য তুর্কীদের হস্তে পড়িবে, এবং তাহা ঘটিবার সময় নিকটস্থ হইয়াছে! তুর্কীরা বিহার জয় করিয়াছে, পরবৎসরে তাহারা নিশ্চয়ই এদেশে আসিতেছে। আমাদের মতে যুক্তিসিদ্ধ এই যে রায় যবনের হাতে অত্যাচার সহ্য করা অপেক্ষা সমস্ত লোকজন লইয়া এদেশ পরিত্যাগ করেন। যখন সকলে এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে বুঝিল তখন অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোক সে দেশ ত্যাগ করিয়া সঙ্কনাথ (জগন্নাথ), বঙ্গ ও কামরূপে প্রস্থান করিল কিন্তু রায় লক্ষ্মণিয়ার নিকট রাজ্য পরিত্যাগ বড় প্রীতিকর হইল না।"

* J. A. S. B 1888, pt. 1, p. 3.

মিনুহাজের এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার কর্ত্তৃক নদীয়া আক্রমণের পূর্ব্বে কতকগুলি পণ্ডিত ও অন্যান্য লোক ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করিয়া রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগন্নাথ, পূর্ব্ববঙ্গ ও কামরূপে গমন করেন।

আবুল-ফজল্ বলিয়াছেন যে লক্ষ্মণের পর লক্ষ্মণের পুত্র মাধবসেন ১০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন; কিন্তু বোধ হয় লক্ষ্মণের পর বাঙ্গালায় মাধব রাজা হন নাই, হয় তিনি যুবারজপদে আরূঢ় ছিলেন আর নতুবা তিনি পিতৃপ্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করিতেন। লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত বটু-দাসের পুত্র শ্রীধরদাস প্রণীত সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে মাধবসেনের রচিত শ্লোকা-বলীও দেখা যায়। আমার ইহাও বিশ্বাস হইতেছে যে মাধবও পণ্ডিত-গণের পরামর্শে কেদারনাথ তীর্থে গমন করেন। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিতে তাহা প্রমাণিত হইতে পারে।

কামাউনের অন্তর্গত আলমোড়া নগরের নিকটে যোগেশ্বরের এক মন্দির আছে। এই মন্দিরে মাধবসেনদত্ত একখানি তাম্রশাসন আছে। অধিকন্তু কেদারতীর্থের মধ্যে বলেশ্বর মন্দিরে ১১৪৫ শকে (১২২৩ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসন আছে তন্মধ্যেও ভট্টনারায়ণবংশীয় রুদ্রশর্ম্মার নাম ও বলব্রাহ্মণ শব্দ খোদিত আছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গপ্রাকৃত।

ষিম্বর বিশিষ্ট সংস্কৃত শব্দের 'ষ্ট' বা 'ষ্ঠ' বঙ্গপ্রাকৃতে অধিকাংশ সময়ে 'ট' বা 'ঠ'তে পরিণত হয়। যথা জ্যেষ্ঠ=জেঠা, নিষ্ঠা=নেঠা, কাষ্ঠ=কাঠ ও কাঠা, পৃষ্ঠ=পিঠ, শ্রেষ্ঠী=শেঠ, অষ্ঠি=আঠি, ইষ্টক=ইট, কুষ্ঠ=কুঠ, মিষ্ট=মিঠে, পিষ্টক=পিটে, উষ্ট্র=উট, অষ্ট=আট, দৃষ্টি=দিঠি, ষষ্ঠী=ষাট, মুষ্টি=মুঠি, রাষ্ট্র=রাঠা (মহারাষ্ট্র=মহারাঠা), গোষ্ঠ=গোঠ।

সংস্কৃতের 'স' প্রাকৃতে 'ছ' বা 'চ্ছ' হয়। যথা বৎস=বচ্ছা বা বাছা,

বৎসর=বচ্ছর* বা বছর, মৎস্য=মাছ, মহোৎসব=মোচ্ছব, জ্যোৎসনা=জোছনা বা জোচ্ছনা, উৎসন্ন=উচ্ছন্ন।

অথাদ্যি, সাধ্যি, বাদ্যি, মধ্যি, সত্যি, নিত্যি ইত্যাদি—যফলাযুক্ত তবর্গান্ত সংস্কৃত শব্দের শেষের স্বর অকার হইলে বঙ্গপ্রাকৃতে তাহা ইকার হয়, যথা অথাদ্য=অথাদ্যি, বাদ্য=বাদ্যি যেমন 'গড়ের মাঠে বাদ্যি বাজে,' মধ্য=মধ্যি যেমন মধ্যিখান, সত্য=সত্যি; যেমন সত্যি কথা, নিত্য=নিত্যি, বৈদ্য=বদ্যি, নৈবেদ্য=নৈবিদ্যি।

আজ, সাঁঝ, বাজা, মিছা, মাঝ,—দ্বিস্বর সংস্কৃত শব্দের অন্তে-স্থিত 'ত্য', 'থ্য', 'দ্য', 'ধ্য', অনেক সময়ে বাঙ্গলায় ক্রমান্বয়ে চ, ছ, জ, ও ঝ হয়, ত্য স্থানে চ, থ্য স্থানে ছ, দ্য স্থানে জ ও ধ্য স্থানে ঝ হয়। পূর্ব্ব স্বরটী হ্রস্ব থাকিলে তাহাও দীর্ঘ হয়। যথা 'অদ্য' 'দ্য' জ হইল ও পূর্ব্বহ্রস্বস্বর অকার দীর্ঘ হইল আকার হইল; অদ্য=আজ হইল, মধ্য=মাঝ, মিথ্যা=মীছা, সন্ধ্যা=সাঁঝ, বাদ্য=বাজা, ইত্যাদি।

দ্বিস্বর বিশিষ্ট সংস্কৃত শব্দের শেষাক্ষর যদি যুক্তাক্ষর হয়, তাহা হইলে বঙ্গ প্রাকৃতে অনেক সময়ে তাহার পূর্ব্বস্বর আকার হয়। যথা পক্ষী=পাখী, এইস্থলে 'পক্ষী' শব্দের 'ক্ষ' যুক্তাক্ষর হওয়ায় পূর্ব্ব দীর্ঘ হইয়া আকার হইল পক্ষী=পাখী হইল। এইরূপে ভণ্ড=ভাঁড়, লক্ষ=লাখ, অক্ষি=আঁখি ইত্যাদি সিদ্ধ হয়। যুক্তাক্ষরের পর যদি হসন্ত বর্ণ থাকে তাহা হইলেও পূর্ব্বের ন্যায়ই দীর্ঘ হয়। যথা চণ্ডাল=চাঁড়াল্; বন্ধন্=বাঁধন্ ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় 'স' ও 'শ'র উচ্চারণ—সঙ্গীতের সা শব্দ ছাড়া যুক্তাক্ষর ভিন্ন অন্যস্থলে বাঙ্গলায় স'র উচ্চারণ 'শ'র ন্যায় হইয়া থাকে। যথা সময় শময়, মাস=মাশ, বাস=বাশ, শাসন=শাশন উচ্চারিত হয়। আবার যেখানে তালব্য শ রফলা বিশিষ্ট সেখানে 'শ'র উচ্চারণ সর্ব্বসময়ে দন্ত্যসর ন্যায় হইয়া থাকে, যথা অশ্রু=অস্রু, শ্রম=স্রম, শ্রবণ=স্রবণ, সশ্রম=শস্রম, ইত্যাদি।

* সঙ্গীতের সারঙ্গ শব্দের উচ্চারণ বিকল্পে তালব্য শ'র ন্যায় হয়। যথা সারঙ্গ ও শারঙ্গ।

মেঝোবাবু—মেঝোবাবু—মেঝো = মধ্যম।

সেজোবাবু—সেজো = সদ্যোজাত, সদ্যঃ হইতে সেজো।

নবাবু—ন = নবজাত, নব হইতে ন।

নতুনবাবু—নতুন = নূতনজাত।

সস্তা—সুঅবস্থা হইতে সস্তা আসিয়াছে, সুঅবস্থা = স্ববস্থা = স্বস্থা = সস্তা। জিনিষের সুঅবস্থা না হইলে সস্তা হয় না। ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিলে অর্থাৎ সুঅবস্থা হইলে তবেই না ধান্যের মূল্য কমিয়া যায় অর্থাৎ "সস্তা" হয়। এই কারণে "সুঅবস্থা" শব্দই 'সস্তা' শব্দের মূল বলিয়া বোধ হয়।

রামপ্রসাদের নূতন গান।

(সাংখ্য স্বরলিপি)

ভক্তকবি রামপ্রসাদ নিম্নলিখিত গানটী বারাণসীধামে দেবী অন্নপূর্ণার কাছে গিয়া গাহিয়াছিলেন। এই গানটি পূর্ব্বে ওস্তাদমহলে আদৃত হইত—মজলিস-গায়ক রাধানাথ স্যাঁকরা ও কৃষ্ণমোহন স্যাঁকরা এই গানটী গাহিতেন। অন্যান্য গায়কেরাও গাহিতেন। কোন কোন গায়ক এই গানটী খাম্বাজ প্রভৃতি নিজ মনোমত রাগ রাগিণীতে বসাইয়া গাহিতেন।

এই গানটীতে কবি ক্ষুধিত জনের অন্নকাতরতার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক ক্ষুধায় প্রপীড়িত আত্মার ব্যাকুলভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অন্নের সহিত মোক্ষপ্রসাদ প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই, তিনি পার্থিব ক্ষুধার সঙ্গে আধ্যাত্মিক ক্ষুধায়ও কাতর হইয়া গাহিয়াছেন;—

"মোক্ষপ্রসাদ দেও অম্বে··
জঠরের জ্বালা আর সহে না।"

এই গানটী ইতিপূর্ব্বে কোনও পুস্তক বা পত্রে বাহির হইতে দেখি নাই।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

অন্নদে গো অন্নদে গো অন্নদে গো অন্নদে।
জানি মায়ে দেয় ক্ষুধায় অন্ন অপরাধ করিলে পদে পদে।
মোক্ষ প্রসাদ দেও অম্বে, এ সুতে অবিলম্বে,
জঠরের জ্বালা আর সহেনা তারা কাতরা হইও না প্রসাদে॥

তালি। ১ (স্থা, স্ত) । ২ । ৩ । ০ ॥
মাত্রা। ২ ২ । ২ ৭ ২ ॥

(স্থা): —II সা সা। সা সা। সা সা। ধা৳ পা৳ ধা।
(স্থা): —II অ ন্ন। দে —। — গো। — — —।

সা রে। গা গা। গা মা। গা রে। সা সা। সা সা।
অ ন্ন। দে —। — —। গো —। অ ন্ন। দে —।

সা সা। ধা৳ পা৳ ধা। সা রে। গা গা। গা গা।
— গো। — — —। অ ন্ন। দে —। — —।

গা মা। গা রে। র্গা রে। র্সা সা। সা সা। সা
— —। জা —। নি —। — মা। য়ে দে। -য়

সা। সা সা। সা নি। স্ রে৳ রে৳ নি৳ সা৳। সা সা।
ক্ষু। ধা —। — —। — — — —। — অ।

ন্সা ধা। ধা সা। সা সা। সা রে। রে রে। রে রে।
ন্ন —। — অ। প রা। — ধ। ক রি। লে —।

গা রে। পা পা। মপা মা। মা গমা। গা রে। II
— —। প দে। প দে। — —। — —। II

(স্থা-পু): —সা: সা। ন্সা সা। সা সা। ধা৳ পা৳ ধা।
(স্থা-পু): —অ ন্ন। দে —। — গো। — — —।

(স্ত):— সা সা। সা সা। সা রে। গা গা।
(স্ত):— মো ক্ষ। প্র সা। — দ। দে —ও।

গা গা। গা মা। মা মা। মা গা। গ্মা¼ মা¼ গা¼
অ ম্বে। — এ। সু তে। — —। —— — —

মা¼। মা গা। গা গা। র্সা সা। সা সা। সা সা।
—। — অ। বি ল। ম্বে —। — জ। ঠ রে।

। সা রে। রে রে। রে রে। গা রে। গা পা।
। —র্ জা। ল্যা —। — আ। — —র্। স হে।

মপা মা। মা গা। মা মা। মা মা। গা মা। পা
না —। — তা। রা —। — —। কা ত। রা

ধা। ধা ধ্নিঁ। ধা ধ্নিঁ। পা পা। পা পা। পা ধা।
হই। ও না। — —। — —। প্র সা। — —।

পা মা। গা রে॥
দে —। — —॥

(স্থা-পূ):—সা সা। সা:॥ ॥

(স্থা-পূ):—অ ম্ব। দে ॥ ॥

স্বরলিপি ব্যাখ্যা।

১। স্থা=আস্থাই। স্ত=অন্তরা।

২। II (যুগল আই চিহ্ন)=দুইবার আবৃত্তির চিহ্ন।

৩। স্বরের পার্শ্বে সংখ্যাচিহ্ন=মাত্রাচিহ্ন। যথা পা¼=সিকিমাত্রিক পা।

৪। চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন ঁ =কোমলের চিহ্ন।

৫। যে স্বরের নিম্নে হসন্তচিহ্ন থাকিবে, সেই স্বরটীকে দ্রুত ছুঁইয়াই চলিয়া যাইতে হইবে। ইহাকে হসন্তমাত্রিক বা খণ্ডমাত্রিক স্বর বলা যায়। যথা গ্মা। এখানে গান্ধারকে দ্রুত ছুঁইয়াই মধ্যমে যাইতে হইবে।

৬। স্বরের নীচে সংখ্যাচিহ্ন=নিম্ন সপ্তকের চিহ্ন যথা, ধা=দ্বিতীয় নিম্ন বা মন্দ্র সপ্তকের ধা।

৭। যদি কতকগুলি সুর একই নিম্ন সপ্তকের হয়, তাহা হইলে প্রথম সুরটীর নিম্নে ফুটকি বা ক্ষুদ্র কসি টানিয়া যাইতে হইবে। যথা, ধা পা ধা।

৮। ঃ (বিসর্গ চিহ্ন) = সমের চিহ্ন। (স্থা—পু) = আস্থাই পুনরায়।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমালোচনা।

আমরা সমালোচনাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যে অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল পথে পদার্পণ করিতেছি, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেছি। কিন্তু পুস্তকপত্রাদির সমালোচনা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া, ইহার উপকারিতা আছে বলিয়া আমরা এই গুরু-ভার কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেছি। প্রকৃত সমালোচনায় জনসাধারণকে ক্রমশ গুণগ্রাহী করিয়া দেওয়া হয়। বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষ গুণগ্রাহিতার বড়ই অভাব। এবিষয়ে সকলেরই সাধ্যমত যত্ন করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় আমরাও এই সমালোচনা ক্ষেত্রে নামিয়াছি।

সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা—৪র্থ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা—

এই পত্রিকা সাহিত্যপরিষদের মুখপত্র স্বরূপে ত্রৈমাসিক আকারে প্রকাশিত হইতেছে। সাহিত্যপরিষৎ বঙ্গদেশের একটি প্রকৃত অভাব মোচন করিয়াছে। ইহার মুখপত্রও পূর্ব্বাপর উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইয়া বঙ্গভাষার শ্রী-বৃদ্ধি সাধনের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "উপসর্গের অর্থবিচার" প্রবন্ধ সর্ব্বপ্রথম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রবন্ধটী যে বড়ই মনোগ্রাহী হইয়াছে, সে কথা বলা বাহুল্য। দ্বিতীয় প্রবন্ধ "সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল" এবং চতুর্থ প্রবন্ধ "বাঙ্গালা পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ"—এই দুইটী প্রবন্ধ নূতন নূতন আবিষ্কৃত পুরাতন বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস এইরূপ প্রস্তাবের নিকট বিশেষ ঋণী থাকিবে। "কাটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন পিত্তলফলক" প্রবন্ধে লেখকের উপযুক্ত গবেষণা দৃষ্ট হয়।

আমরা সমালোচনার্থ আরও অনেকগুলি মাসিকপত্র ও পুস্তকাদি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাদিগের সমালোচনা এবারে স্থানাভাবে যাইতে পারিল না।

পুণ্য।

বিশ্বামিত্র।

চৌদিকে শাল্মলী বট সুগভীর শাল
প্রসারিয়া ঘিরিয়াছে বাহু সুবিশাল ;
সান্দ্র তপোবনে ব্রহ্মর্ষির আবাস
শ্যাম ভূর্জ্জপত্রভারে শোভে আচ্ছাদিত।
শুভ্র উপবীত বক্ষে বেদীর উপরে
বিশাল ন্যগ্রোধতলে শান্ত সুপবিত্র,
মধুপর্ক পান করি বিমল আনন—
আপিঙ্গল জটাজাল মস্তকের পরে—
প্রশস্ত শরীর বিরাজেন বিশ্বামিত্র।
গোধূলীর সমীরণে চির-প্রসারিত
অগুরু ধূপের স্নিগ্ধ বহিছে সুবাস ;
বনচ্ছায়ে সমাসীন সিদ্ধ মুনিগণ।
ব্রহ্মার বেদগান ঋষিদের প্রাণে
সুধীরে উদয় হয় দিবা অবসানে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যৌবন-বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কিনা।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা এই যে, অবরোধপ্রথার সহিত বাল্যবিবাহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং বৈদিককালে এই দুইটীর কোনটাই প্রচলিত ছিল না, মনুই প্রথম এই দুইটী প্রবর্ত্তিত করিয়া অমঙ্গলের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। আমরা দেখিয়া আসিলাম যে অবরোধপ্রথা বৈদিককাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহা মঙ্গলজনক বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইতেছে না। এবারে আমরা দেখিব যে অবরোধপ্রথার সহিত বাল্যবিবাহের কোন অপরিহার্য্য সম্বন্ধ (necessary connection) নাই, এবং বৈদিককালে অবরোধপ্রথা সত্ত্বেও যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল, আর মনুও বাল্যবিবাহের সপক্ষ নহেন। বেদে আছে "যুবতী জায়া পাইলে গুণী ব্যক্তিও যেরূপ তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না;" (১) "যে কোন কন্যা পিতৃগৃহে বিবাহলক্ষণযুক্তা হইয়া আছে, তাহার নিকটে গমন কর" (২) "নিতম্ববতী অন্য অবিবাহিতা নারীর নিকটে যাও, তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামিসংসর্গিনী করিয়া দাও।" (৩) এই সকল উক্তি হইতে কি স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে না যে বৈদিককালে যৌবনবিবাহ প্রচলিত ছিল? গোভিলগৃহ্যসূত্রে বিবাহের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে তখনকার কালে স্ত্রীলোকের যৌবনবিবাহের পক্ষে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। গোভিল বলেন বিবাহকালে বামপার্শ্ববর্ত্তিনী "কন্যা স্বীয় দক্ষিণহস্তের দ্বারা বরের দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া থাকিবে" এবং "[illegible] পর উভয়ে [illegible]" (৪) "অর্থাৎ উত্থানকালে বরের বামহস্ত কন্যার পৃষ্ঠ [illegible] স্কন্ধে এবং কন্যার দক্ষিণহস্ত পৃষ্ঠ হইয়া দক্ষিণস্কন্ধে থাকিবে।" (৫) যদি ইংরাজদিগের বিবাহ সম্বন্ধীয়

---

(১) ৮ ম, ২ সূ, ১৯। (২) ১০ ম, ৮৫ সূ, ২১।

(৩) ১০ ম, ৮৫ সূ, ২২।

(৪) পূর্ব্বো কটান্তে দক্ষিণতঃ পাণিগ্রাহস্যোপবিশতি দক্ষিণেন পাণিনা দক্ষিণম সমন্বারব্ধায়াঃ" গোভিল গৃহ্য ২ প্র, ১ খ ২৫—২৬

(৫) সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের অনুবাদ।

পুরাতন উপানহ নিক্ষেপ পূর্ব্বকালের প্রচলিত আসুর বিবাহের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, তবে গোভিলোক্ত এই আচার যে যৌবন-বিবাহেরই সমর্থক, এ কথা কি প্রকারে অস্বীকার করিব? নববিবাহিত যানারূঢ় বধূকে স্বামীভবনে প্রথম অবতরণকালে বামদেব্য সামগান করিতে হইত। ইহা অষ্টবর্ষের গৌরীলক্ষণাক্রান্তা কন্যার কর্ম্ম নহে, তাহা বলা বাহুল্য। যাই হউক, এ বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহিত আমাদের কোনই মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে না, তখন ইহার উপরে অধিক বাক্য প্রয়োগ করা অনাবশ্যক।

এই যৌবনবিবাহের উল্লেখসূত্রে আমরা একটী কথা বলিয়া রাখি। বর্ত্তমানকালে আমাদের অনেকে, বিশেষত প্রাচীনপ্রথার পক্ষপাতী অনেকে মনে করেন যে ব্যভিচার প্রভৃতি দোষের একটী প্রধান কারণ স্ত্রীলোকের যৌবনবিবাহ। আমার তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। যে সকল স্ত্রীলোকের হৃদয় দূষিত, তাহাদের বাল্য বিবাহই হউক বা যৌবনবিবাহই হউক, তাহারা মন্দ কর্ম্মের অভিমুখে ধাবিত হইবেই; যাহাদের সাধু হৃদয়, তাহারা মন্দ কর্ম্মের দিকে কিছুতেই যাইবে না। অনেকে বলেন যে বাল্যবিবাহে, ভগ্নী যেরূপ ভাইকে প্রীতি করে সেইরূপ স্ত্রী স্বামীকে প্রীতি করিতে শিখে। আমার মতে স্বামীস্ত্রীর ভালবাসা আর একটু প্রগাঢ় হওয়া আবশ্যক। যৌবনের প্রথম উন্মেষে যখন হৃদয়ে নব অনুরাগের সূত্রপাত হইতে থাকে, সেই সময়ে বিবাহ হইলে সেই নবোন্মেষিত হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ স্বামীর দেহ মন আচ্ছাদিত করিয়া বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিবে। ব্যাসদেব তাঁহার মহাভারতে যৌবনবিবাহের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে "যৌবনবিবাহেই স্ত্রীর অনুরাগ ও সন্তানগণ হীন হয় না।" (১) আর বৈদিককালেও স্ত্রীলোকের ব্যভিচার পতিবিদ্বেষ প্রভৃতির অস্তিত্ব যে ছিল তাহা বেদের অনেক স্থলেই দেখা যায়। (২) কিন্তু জ্ঞানবান্ ঋষিদের কেহই একথা বলেন নাই যে এই সকল দোষের মূল যৌবনবিবাহ। রক্ষকের অভাব, বৈধব্য ও দ্যূতক্রীড়া, অর্থ

---

(১) "প্রজা ন হীয়তে [illegible]" মহাভা, [illegible]।

(২) ঋগ্বেদ ৪।৫।৬, এবং মনু ৯অ ১৩।

লোভ এবং দ্যূতক্রীড়াদিতে স্বামীর আত্মনাশ ও স্ত্রীপরিত্যাগ এই সকল যে স্ত্রীলোকের দোষের কারণ হয়, বেদে তাহার স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যায়। বেদের একটী সূক্তে দ্যূতক্রীড়ার কুফল সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, আমি তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—"আমার এই রূপবতী পত্নী কখন আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে নাই, কখন আমার নিকট লজ্জিত হয় নাই। সেই পত্নী আমার নিজের ও আমার বন্ধুবর্গের বিশেষ সেবা শুশ্রূষা করিত। কিন্তু কেবলমাত্র পাশার অনুরোধে আমি সেই পরম অনুরাগিনী ভার্য্যাকে ত্যাগ করিলাম। যে ব্যক্তি পাশক্রীড়া করে, তাহার শ্বশ্রূ তাহার উপর বিরক্ত, স্ত্রী তাহাকে ত্যাগ করে, যদি কাহারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করে, দিবার লোক কেহ নাই। * * * পাশার আকর্ষণ বিষম কঠিন; যদি কাহারো ধনের প্রতি পাশার লোভদৃষ্টি পতিত হয়, তাহা হইলে উহার পত্নীকে অন্যে স্পর্শ করে। * * * দ্যূতকারের স্ত্রী দীনহীনবেশে পরিতাপ করে, পুত্র কোথায় বেড়াইতেছে, ভাবিয়া তাহার মাতা আকুল। * * * আপনার স্ত্রীর দশা দেখিয়া দ্যূতকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অন্যান্য ব্যক্তির স্ত্রীর সৌভাগ্য ও সুন্দর অট্টালিকা দেখিয়া তাহার পরিতাপ হয়। সে হয়ত প্রাতে সুশ্রী ঘোটক যোজনাপূর্ব্বক গতিবিধি করিয়াছে, কিন্তু সন্ধ্যার সময় নীচলোকের ন্যায় তাহাকে শীতনিবারণের জন্য অগ্নিসেবা করিতে হয়।" *

মনুসংহিতায়ও আমরা দেখি যে, মদ্যপান, দুর্জ্জনসংসর্গ, পতিবিরহ, যথেচ্ছা বিচরণ, অকালনিদ্রা ও পরগৃহবাস এই ছয়টীকে স্ত্রীলোকের দোষের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কুত্রাপি যৌবনবিবাহ ব্যভিচার প্রভৃতির কারণ, এরূপ উল্লেখ নাই। এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে মনুসংহিতায় যখন যৌবনবিবাহের উল্লেখই নাই, তখন তাহার স্ত্রী দূষণ বলিয়া উল্লেখ থাকিবারও কোন কারণ নাই। আমরা কিন্তু দেখিব যে মনু যৌবনবিবাহেরই উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু নিতান্ত বিশেষ কারণ থাকিলে তিনি বাল্যবিবাহ দিতেও নিষেধ করেন নাই। একথায় অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন, কারণ তাঁহাদের চিরপোষিত সংস্কারের বিরুদ্ধে

* ঋং ১০ ম, ৩৪ সূ

ইহা উক্ত হইল; কিন্তু যখন বেদে যৌবনবিবাহের উল্লেখ আছে, তখন মনুও যে বেদের অনুসরণ করিয়া তাহারই বিধি দিবেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? বরঞ্চ মনু যদি বিনা কারণেও বাল্যবিবাহ মাত্রেরই বিধি দিতেন, তাহাতেই আমরা অধিক আশ্চর্য্য হইতাম।

যাই হৌক্, এখন দেখা যাউক যে মনু বিবাহ সম্বন্ধে কিরূপ বিধি দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদি উৎকৃষ্ট ও রূপগুণাদিসম্পন্ন পাত্র পাওয় যায় তবে কন্যা বিবাহের যোগ্য বয়ঃক্রম প্রাপ্ত না হইলেও পাত্রটীকে হাতছাড়া করিবার অপেক্ষা তাহার সহিত সেই অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিবে। (১) কিন্তু যদি উপযুক্ত গুণবান্ পাত্র না পাওয়া যায়, আর মনুকে যদি মানিতে হয়, তবে এই অবস্থায় কন্যা প্রাপ্তযৌবনা হইলেও পিতৃগৃহে আমরণ অপেক্ষা করিবে; মনু বড়ই জোরের সহিত আদেশ করিতেছেন যে গুণহীন পাত্রে পিতা "কদাপি" প্রাপ্তযৌবনা কন্যাকেও সম্প্রদান করিবে না। (২) ভাষ্যকার মেধাতিথি ঋষিও তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে যৌবন-সঙ্কারের (ঋতুমতী হইবার) পূর্ব্বে কন্যাদান অনুচিত এবং তাহার পরেও উপযুক্ত পাত্রলাভ না করিলে বিবাহ দিবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিলাম যে মনুর মতে উপযুক্ত বরপ্রাপ্ত হইলে কন্যার প্রাপ্তবয়স্কা হইবার অল্পাধিক তারতম্য থাকিলেও কন্যাসম্প্রদান কর্ত্তব্য। এখন কাজেই প্রশ্ন উঠিতেছে এই যে কন্যাকে কখন্ বিবাহের উপযুক্ত প্রাপ্তবয়স্কা বলিয়া বোধ করা যাইবে? ইহার উত্তরে মনু বলেন যে যৌবনের সূত্রপাত হইবার তিন বৎসরের পরে বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইল বলিয়া জানিতে হইবে।

---

(১) উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ ॥
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাৎ যথাবিধি ॥ "অপি" শব্দের দ্বারা "হাতছাড়া করিবার অপেক্ষা" এই ভাবার্থ আসিতেছেনা কি?

(২) উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাৎ যথাবিধি ॥
কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ॥ ৯অ, ৮৮—৮৯

"কুমারী কন্যা ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসর উদীক্ষা (১) পূর্ব্বক কালযাপন করিবে; তাহার পরে সদৃশ পতি লাভ করিবে।" (২) ভাষ্যকারের মতে যৌবনসঞ্চারের (বা ঋতুদর্শনের) কাল দ্বাদশ বৎসর—"ঋতুদর্শনঞ্চ দ্বাদশ-বর্ষাণামিতি স্মর্য্যতে।" মনুরও ইহাই মত বলিয়া বোধ হয়; কারণ তিনি বিবাহের উপযুক্ত বয়সের ন্যূনকল্প দ্বাদশবৎসর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন "ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং" অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরের পুরুষ দ্বাদশবার্ষিকী কন্যাকে বিবাহ করিবে কিন্তু সেই কন্যার হৃদ্য অর্থাৎ সহজ কথায় "বাড়ন্ত" হইয়া হৃদয়ের প্রীতি উৎপাদক হওয়া আবশ্যক। আমাদের অনুমান হয় যে, তখন অনেক লোকে ধনলোভ প্রভৃতি নানা কারণে একদিকে যেমন কন্যাসম্প্রদানে বিলম্ব করিত, সেইরূপ অনেক সময় অতি অল্পবয়স্কা বালিকারও বিবাহ দিত। (৩) তাই মনু দেশাচারের অনুরোধে তাহাও স্বীকার করিয়া বলিলেন যে, "অথবা চব্বিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ অষ্টবৎসর বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিবে; কিন্তু দুই বিকল্পের মধ্যে যাঁহারা সত্বর হইয়া শেষোক্ত বিকল্প স্বীকার করেন, অর্থাৎ বালিকা-বিবাহ করেন, তাঁহারা ধর্ম্মে, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিষয়ে অবসাদ প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ তাহারা উন্নতির পরিবর্ত্তে শীঘ্রই অবনতি প্রাপ্ত হয়। "ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্ট-বর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ।" ইহাতেই বোধ হইতেছে যে ষোড়শ বৎসরই

---

(১) "উদীক্ষা" কালযাপন করিবার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; আমার বোধ হয়, 'প্রতীক্ষা' বা 'অপেক্ষার' অর্থের সহিত 'উদীক্ষা"র অর্থ কিছু বিশেষভাবে ভিন্ন। "উদীক্ষেত" প্রতীক্ষার ভাব যেন থাকিয়াও নাই বলিয়া বোধ হয়।

(২) "ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
উর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিং॥ ৯অ, ৯০

ইহার টীকায় টীকাকারগণ লিখিয়াছেন যে ঋতুমতী হইবার তিন বৎসরের পরেই কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে। এ কথা তাঁহারা এই শ্লোকে যে কোথায় পাইলেন তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না। এই সকল দেখিয়া সাধারণ লোকে কন্যার যৌবনবিবাহ দিতে ভয় প্রাপ্ত হয়। কোন্ অবস্থায় কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে, তাহা মনু তো নিজেই বলিয়া দিয়াছেন।

(৩) 'ধনার্থিনোঽপি বালানাং বিবাহয়ন্তি'

৯অ, ৮৮ শ্লোকের মেধাতিথি

মনুর মতে কন্যাসম্প্রদানের উপযুক্ত কাল। তবে এ সময়েও অনুপযুক্ত গুণহীন পাত্রে কন্যাদান নিতান্তই অনুচিত, তাহাও মনু বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যদি এমন হয় যে উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত হইয়াছে এবং কন্যার ষোড়শ বৎসর বয়সও হইয়াছে অথচ অভিভাবকেরা অর্থলোভবশতঃ বা অন্য কোন তুচ্ছ কারণে সেই পাত্রকে কন্যাসম্প্রদানে অভিভাবকেরা অসম্মত হন, তাহা হইলে কন্যা স্বয়ং বিবাহ করিলেও পাপভাক্ হইবে না এবং যাহাকে বিবাহ করিবে সেও সেইরূপ পাপভাক্ হইবে না। (১) তবেই বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে মনুর মত এই দেখিতেছি যে বাল্যবিবাহের (যথা, ২৪ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সহিত আট বৎসর বয়স্কা কন্যার বিবাহের) ফল ধর্ম্মবিষয়ে অবসাদ; ন্যূনকল্পে ত্রিশবৎসর বয়স্ক পুরুষ দ্বাদশ বৎসরের "হৃদ্যা" কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমকল্প এই যে অন্যূন ত্রিশবৎসর বয়স্ক পুরুষ অন্যূন ষোড়শবৎসর বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবে। এখন, মনুর এইরূপ বিধি থাকিলেও যদি অন্য কোন স্মৃতিকার ইহার বিপরীত কথা বলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইবে, এ কথা বোধ হয় শাস্ত্রপক্ষপাতী কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না, কারণ "মন্বর্থ-বিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে।" আমরা সম্বর্ত্তসংহিতায় দেখি যে ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই দশম বৎসরবয়স্কা কন্যার বিবাহই প্রশস্ত। তিনি "দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা" সূত্রে কন্যার পারিভাষিকত্ব উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য; অষ্টবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ (শব্য); কিন্তু কন্যার (অর্থাৎ দশবর্ষীয়ার) বিবাহই প্রশস্ত। (২) পরাশরের মতে দশম হইতে দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই কন্যার বিবাহ দেওয়া

---

(১) অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ যদি স্বয়ং।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি॥" ৯অ, ৯১

(২) তস্মাদ্বিবাহয়েৎ কন্যাং যাবন্নর্তুমতী ভবেৎ।
বিবাহোঽষ্টমবর্ষায়াঃ কন্যায়াস্তু প্রশস্যতে॥ সম্বর্ত্ত।

অনেকেই শেষ পংক্তির অর্থ করেন যে অষ্টমবর্ষীয় কন্যার বিবাহই প্রশস্ত; কিন্তু আমাদের তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। প্রথম পংক্তির সহিত শেষ পংক্তির বিশেষ সম্পর্ক নাই। প্রথম পংক্তিতে ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই বিবাহের কথা আছে; তাহার সহিত 'কিন্তু অষ্টবর্ষীয়ার

কর্ত্তব্য। (১) অন্যান্য স্মৃতিকারদিগের এই সকল কথা আমার কেবলমাত্র অর্থবাদ বলিয়া বোধ হয়। কন্যার হৃদয়ে ঋতুমতী হইবার পর পাছে এতটুকুও আঁচড় লাগে, তাহারই অতিমাত্র ভয়ে তাঁহারা ঋতুমতী হইতে না হইতে কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অন্যান্য স্মৃতিকারদিগের মধ্যে কেবল বশিষ্ঠ মনুর মত বেশ অনুসরণ করিয়াছেন দেখিতে পাই। তিনি বলেন "কুমারী ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে; তিন বৎসরের ঊর্দ্ধে উপযুক্ত পতি গ্রহণ করিবে;" "পিতা ঋতুকাল-ভয়হেতু "নগ্নিকা" কন্যা দান করিবে, কারণ কন্যা ঋতুমতী হইয়া (অধিককাল) অপেক্ষা করিলে পিতা দোষপ্রাপ্ত হয়েন; উপযুক্ত পাত্র কর্ত্তৃক অভিযাচ্যমান এবং বিবাহেচ্ছু কন্যা (অপ্রদত্তা থাকিলে) যতবার ঋতুমতী হয়েন, ততবার তাহার পিতামাতা ভ্রূণহত্যার পাপভাগী হয়েন।" (২) যাই হোক, আমরা দেখি যে প্রামাণিক কোন সংহিতাগ্রন্থে অষ্টবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিয়া গৌরীদানের ফললাভ করিবার কোন কথাই উক্ত হয় নাই, অনেকগুলিতে দশমবর্ষীয়া কন্যাদানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত দেখা যায় এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক স্মৃতি মনুসংহিতাতে যৌবনবিবাহই সমর্থিত হইয়াছে। গৌরীদানের মাহাত্ম্য এই দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতিকে আরও দুর্ব্বল করিবার জন্য কিরূপে যে তাহাদের অন্তরাসন গ্রহণ করিল তাহা বলা বড় সহজ নহে এবং সে বিষয়ে অনু-

বিবাহ প্রশস্ত" এ কথার কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না, কারণ অষ্টমবর্ষে ঋতুমতী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই কারণে স্পষ্টই বোধ হয় যে শেষ পংক্তির প্রথম চরণের প্রতিযোগিতা সম্পর্কেই "কিন্তু" ব্যবহার করিয়া "কন্যা" বিবাহেরই প্রশস্ততা উক্ত হইয়াছে।

(১) "অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ং॥ ৭ম অধ্যায় ৬—৭

(২) কুমার্য্যৃতুমতী ত্রিবর্ষাণ্যুপাসীতোর্দ্ধং ত্রিভ্যো বর্ষেভ্যঃ পতিং বিন্দেৎ তুল্যং। * * * প্রযচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যামৃতুকালভয়াৎ পিতা। ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি॥ যাবচ্চ কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি তুল্যৈঃ সকামামভিযাচ্যমানাং। ভ্রূণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ॥ ১৭অ

সন্ধান করিতে গেলেও একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস প্রণয়ন করিতে হয়। মরীচি সংহিতা নামক একখানি মাত্র সংহিতায় আছে যে গৌরীদানের ফল স্বর্গধাম, নবমবর্ষীয়া রোহিনীদানের ফল বৈকুণ্ঠধাম এবং কন্যাদানের ফল ব্রহ্মধাম লাভ। সুতরাং মরীচিরও মতে দেখি কন্যাদানই শ্রেষ্ঠ।

বশিষ্ঠোক্তিতে আমরা দেখিয়াছি যে "নগ্নিকা"—সম্প্রদানের কথা আছে। অনেক আচার্য্য এই নগ্নিকা অর্থে অতি বালিকা অর্থাৎ যখন বালিকারা উপযুক্তরূপে বস্ত্র পর্য্যন্ত পরিধান করিতে সমর্থ হয় না, সেই অর্থ ধরিয়া শৈশববিবাহ সমর্থন করিতে উদ্যত হয়েন। আমার বোধ হয়, যেমন অষ্টবর্ষীয়া বালিকার গৌরী, নবমবর্ষীয়ার রোহিণী নাম পারিভাষিকরূপে গৃহীত হইয়াছিল, সেইরূপ নগ্নিকা শব্দটী অনৃতুমতী কন্যার পারিভাষিক শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি যে বৈদিককালে যৌবন-বিবাহই প্রচলিত ছিল এবং গোভিলগৃহ্যসূত্রোক্ত বৈবাহিক আচারপদ্ধতি হইতেও তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু এই গৃহ্যসূত্রের একস্থানে আছে যে বিবাহকর্ম্মে "নগ্নিকা কন্যাই শ্রেষ্ঠ।" (১) ইহার অর্থে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় করিলেন "যে কন্যার ঋতু প্রকাশ পায় নাই;" কিন্তু ইহার পরে আর একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া এবং নিজের পূর্ব্বসঞ্চিত ভাবকে সমর্থন করিতে যাইয়া বলিলেন, "অথবা ঋতু প্রকাশ পাইলেও কুচোত্থান হয় নাই, এরূপ অপ্রাপ্ত যৌবনা," "বিশেষতঃ ঐ কন্যা উলঙ্গভাবে খেলা করিতেও লজ্জিত না হয়, এরূপ বয়সের হইলেই ভাল হয়।" হায় কি বিসদৃশ ব্যাখ্যা! আমাদের শাস্ত্র আলোচনা করিয়া যে জ্ঞান হইয়াছে তাহাতে বুঝিয়াছি যে নগ্নিকাশব্দ অনৃতুকা কন্যার পারিভাষিক শব্দমাত্র। নগ্নিকা অর্থে অতি বালিকা বা শিশু অর্থ হইলে মহাভারতে ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাকে নগ্নিকা বলা হইত না! মহাভারতে আছে "ত্রিশবর্ষীয় পুরুষ ষোড়শবর্ষীয়া 'নগ্নিকা' কন্যাকে ভার্য্যা গ্রহণ করিবে।"(২) গৃহ্যসূত্রের মতে ঋতুমতী কন্যা অপেক্ষা নগ্নিকা বা অনৃতুকা কন্যাই বিবাহে

---

(১) ৩প্র, ৪খ, ১—৬সূ।

(২) "ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শাব্দাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।"

মহাভারত

প্রশস্ত। সকল শাস্ত্রকারদিগেরও এই মনোগত ভাব বলিয়াই বোধ হয়; তাই বলিয়া তাঁহারা যে বাল্যবিবাহ সমর্থন করিয়াছেন এরূপ কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না।(১) বর্ত্তমানের চিকিৎসা বিদ্যার কথা ছাড়িয়া দিলেও প্রাচীনকালের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র প্রণেতা ঋষিরাও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বলিয়া গিয়াছেন। যে অস্ত্রচিকিৎসাবিশারদ সুশ্রুত ঋষির চিকিৎসাসম্বন্ধীয় অস্ত্র-বিবরণ পাঠ করিয়া পাশ্চাত্যচিকিৎসকেরা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, সেই সুশ্রুত স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে "২৫ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষ যদি অপ্রাপ্ত—ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাতে সন্তানোৎপাদন করে, তবে সেই সন্তান গর্ভেতেই বিপদ্‌গ্রস্ত হয় এবং যদি বা জন্মগ্রহণ করে, তবে সে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ও অদীর্ঘজীবী হয় অতএব অত্যন্ত বালিকাবস্থায় গর্ভাধান করিবে না।" (২) সম্ভবতঃ এই কথারই আংশিক অনুসরণ করিয়া রঘুনন্দনও বলিয়াছেন যে "কুড়ি বৎসরের পুরুষ পূর্ণ ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করিলে উত্তম সন্তান

(১) পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় গৃহ্যাসংগ্রহ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ব্যঞ্জনৈস্তু সমুৎপন্নৈঃ সোমো ভুঞ্জীত কন্যকাং।
পয়োধরৈস্তু গন্ধর্ব্বা, রজসাগ্নিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
তস্মাদব্যঞ্জনোপেত মরজা মপয়োধরাং।
অভুক্তাঞ্চৈব সোমাদ্যৈঃ কন্যকান্তু প্রশস্যতে॥ গৃ. সং ২।১৭—২০

এ সকল কথা নিতান্তই অপ্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়, কারণ আজ পর্য্যন্ত বিবাহ কালে, তাহা বাল্যবিবাহই হউক বা যৌবন-বিবাহই হউক, যে সকল মন্ত্র পঠিত হয়, তন্মধ্যে একটী মন্ত্রের অর্থই এই যে সোম, গন্ধর্ব্ব ও অগ্নি কর্ত্তৃক স্ত্রী ভুক্ত হইয়া, মনুষ্য তাহার চতুর্থ পতি। আমার বোধ হয় সোম কর্ত্তৃক ভুক্ত হইবার অর্থ এই যে, কন্যার কামবৃত্তির প্রথম উদ্রেক হইতেছে কিন্তু এখনও তাহা অনেকটা অপ্রস্ফুটিত অবস্থায়; কুচোদ্গম হইলে গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক ভুক্ত হইবার অর্থ এই যে কামবৃত্তি তখন কিঞ্চিৎ প্রস্ফুটিত হয়; ঋতুমতী হইলে অগ্নি কর্ত্তৃক ভুক্ত হইবার অর্থ এই যে তখন কামবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে।

(২) ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিঃ। যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ সঃ বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরঞ্জীবেজ্জীবেদ্বাদুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ। তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং নকারয়েৎ॥
সুশ্রুত শারীরস্থান ১০ম।

হয়, তাহার ন্যূন বয়সে হইলে অধম সন্তান হয়।"(১), যাই হোক্, এই সকল বিষয় লইয়া সম্মতি আইনের প্রস্তাবকালে এত অধিক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে যে আমি আর তাহা পুনরায় উত্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি না।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দিলীপ ও ভীমরাজ।

(জয়পুরী আষাঢ়ে গল্প)

পুরাকালে দিলীপ নামে এক সমৃদ্ধিশালী রাজা ছিলেন। বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি বিক্রমে রঘু, ধনে কুবের এবং দানে কর্ণের তুল্য ছিলেন; এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন নরাধিপের একটী সুন্দরী রাণী ছিলেন। তিনিও দয়াদাক্ষিণ্যে কোন অংশে রাজা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। ঐ রাণীর গর্ভে একটী দেবকন্যাবৎ রাজকুমারী জন্মগ্রহণ করিয়া রাজবাটী আনন্দময় করিয়াছিল। ভাগ্যবলে আবার রাজা একটী সুদক্ষ মন্ত্রীও পাইয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিবলে তিনি নানান্ দেশ জয় করিয়া পরে মহারাজ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

রাজবাটীর সন্নিকটে প্রাচীর বেষ্টিত একটী সুরম্য উদ্যান ছিল। উদ্যানের দ্বারদেশে সিপাহীগণ সশস্ত্রে সর্ব্বদা পাহারা দিত। মহারাজের আজ্ঞা ব্যতীত উদ্যানের অভ্যন্তরে কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। একদা সন্ধ্যাকালে রাজা ও মন্ত্রী ঐ উদ্যান মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহারা একটী নির্ঝরিণী সমীপে আসিয়া উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে নানা ফলফুলের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।—অকস্মাৎ

(১) "পুমান্ বিংশতিবর্ষশ্চেৎ পূর্ণষোড়শবর্ষয়া স্ত্রিয়া সঙ্গচ্ছতে গর্ভাশয়ে শুদ্ধে রজস্যপি।
অপত্যং জায়তে শ্রেষ্ঠং তয়োর্ন্যূনেঽধমং স্মৃতং"॥
লোহিতিতন্ত্র, শ্রীরামপুর সংস্করণ, ৩১১ পৃঃ মোহিনী বাবু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত।

মহারাজের দৃষ্টি একটী সুপক্ক আম্রফলের প্রতি পতিত হইল, তিনি মন্ত্রীকে কহিলেন "দেখ মন্ত্রী, আমার ঐ আম্রটী খাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে। তুমি কোন প্রকারে ফলটীকে সংগ্রহ কর।"

মন্ত্রী বলিলেন—"মহারাজ! কিরূপে আমি ফলটী সংগ্রহ করিব? বৃক্ষে আরোহণ করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।"

অবশেষে রাজা কহিলেন, "তুমি আমার স্কন্ধদেশে আরোহণ করিয়া আম্রফলটী উৎপাটন কর।"

মন্ত্রী করযোড়ে বলিলেন, "মহারাজ! আমি কিরূপে আপনার স্কন্ধে আরোহণ করিব? আপনি বরঞ্চ আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন।"

রাজা উত্তর করিলেন, "আমি তোমাপেক্ষা বলিষ্ঠ। আমি তোমার স্কন্ধে চড়িলে তোমার মত দুর্ব্বল লোকের যথেষ্ট আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। তুমি অত্যন্ত প্রভুভক্ত, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। উদ্যান মধ্যে অপর লোক কেহই নাই, যে তোমাকে আমার স্কন্ধে আরোহণ করিতে দেখিবে। আমিও কাহাকেও একথা প্রকাশ করিব না। অতএব তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার স্কন্ধে চড়িয়া আম্রটী পাড়িতে পার।" মন্ত্রী অগত্যা মহারাজের স্কন্ধে চড়িলেন, কিন্তু ফলটীকে নাগাল পাইলেন না। অবশেষে মহারাজের মস্তকে পা রাখিয়া হস্তগত করিলেন। পরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া উভয়ে সানন্দে ফলটী ভক্ষণ করতঃ রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যখন রাজা ও মন্ত্রী আম্র পাড়িতেছিলেন, তখন এক সন্ন্যাসী ঐ উদ্যান মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া সমস্ত ঘটনা দর্শনপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে রাজবাটীতে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ দিলীপ সিংহের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিল,—"মহারাজ! আমাকে প্রাণদান করুন।"

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি কাহাকেও হত্যা করিয়া আসিয়াছ?"

সন্ন্যাসী বলিল, "কাহাকেও হত্যা করি নাই, এবং কখন করিবও না। যদি আমি কখনও কাহাকেও হত্যা করি, আপনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমার প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিবেন।" এই অশ্রুতপূর্ব্ব

প্রার্থনা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—"তবে প্রাণদান কি জন্য ?"

সন্ন্যাসী কহিল,—"মহারাজ ! কোন কারণ থাকুক বা না থাকুক আপনি আমার প্রাণদান করুন।"

রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা তোমার প্রাণদান করিলাম।" সন্ন্যাসী কহিল,—"কাগজে লিখিয়া দিন।"

কিছুদিন গত হইলে রাজা দিলীপ কোন বিশেষ কারণ বশতঃ রাগান্বিত হইয়া মন্ত্রী এবং তাঁহার পরিবার ও আত্মীয়বর্গের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। সিপাহীগণ রাজাজ্ঞানুসারে মন্ত্রী এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে ধৃত করিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসীও মন্ত্রীর কুটুম্ববর্গের মধ্যে একজন, কাজেকাজেই তিনিও ধৃত হইয়া বধ্যভূমিতে আনীত হইলেন। তখন সন্ন্যাসী সিপাহীদিগকে বলিল ;—"আমার প্রাণদণ্ড করিবার পূর্ব্বে একবার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করাও। এই আমার শেষ প্রার্থনা।"

সিপাহীগণ তাহাকে রাজসমীপে লইয়া গেল। সন্ন্যাসী তখন মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"রাজন্ ! কিছুদিন পূর্ব্বে আপনি আমার প্রাণদান করিয়াছিলেন। এখন কি কারণে আমার প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।" এই কথা বলিয়াই তিনি রাজদত্ত কাগজখানি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে নির্গত করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। রাজা পত্র দেখিয়া বলিলেন,—"তোমাকে প্রাণদণ্ড হইতে মুক্ত করিলাম। কিন্তু বল দেখি তুমি কি কারণে পূর্ব্বে আমার নিকট প্রাণদান চাহিয়াছিলে ?" সন্ন্যাসী উত্তর করিল,—"মহারাজ ! আপনি ও মন্ত্রী একদা রাজোদ্যানে বিচরণ করিতে করিতে একটী আম্রফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সে বিষয় কি মনে আছে ? আমি সেই সময় উদ্যানে লুক্কায়িত থাকিয়া দেখিলাম যে মন্ত্রী আপনার মস্তকোপরে পদস্থাপনপূর্ব্বক ফলটী বৃন্তচ্যুত করিল। আমার তৎক্ষণাৎ চিরপ্রচলিত প্রবচন "অত্যুত্থানং হি পতনায়" স্মৃতিপথে উদয় হইল এবং বুঝিতে পারিলাম যে এই অতি হৃদ্যতা কখন চিরস্থায়ী হইবে না। শীঘ্রই এই সৌহার্দ্দ্য বিচ্ছেদে পরিণত হইয়া বিষম বিপদ উপস্থিত

করিবেক। আমি মন্ত্রীর একজন আত্মীয়, কি জানি পাছে ঐ কুলাঙ্গারের জন্য আমারও প্রাণদণ্ড হয়, তাই আমি অগ্রেই আপনার নিকট প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছিলাম।”

রাজা এই কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। এবং তাহাকে মন্ত্রী কার্য্যের উপযুক্ত ভাবিয়া সভাসমক্ষে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিলেন।

এদিকে সিপাহীগণ মন্ত্রী ও তাঁহার পরিবারবর্গের একে একে মস্তকচ্ছেদন করিল। মন্ত্রীর ভীমরাজ নামক অষ্টাদশবর্ষীয় একটী পুত্র ছিল। সে নগরপ্রান্তে বেড়াইতে বেড়াইতে শুনিতে পাইল যে সিপাহীগণ রাজাজ্ঞানুসারে তাহার পিতা ও আত্মীয়স্বজনকে ধৃত করতঃ বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া শিরশ্ছেদন করিয়াছে। সে এই কথা শুনিবামাত্র ক্ষণবিলম্ব না করিয়া নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিশ্রান্ত দৌড়িতে লাগিল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া ভীমরাজ জনৈক রাজদর্জ্জির নিকট আশ্রয় লইল। দর্জ্জি তাহার সুন্দর কান্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ ও করুণচিত্ত হইল, এবং তাহাকে তাহার সহিত যাবজ্জীবন বাস করিতে অনুরোধ করিল। মন্ত্রীপুত্র তাহাতে অমত করিল না। ভীমরাজ দর্জ্জিগৃহে থাকিয়া সূচীকার্য্য সুচারুরূপে শিক্ষা করিল, এবং উভয়ে বস্ত্রাদি শেলাই করিয়া কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। একদিন সন্ধ্যাকালে মহারাজা দিলীপ সিংহ ঐ দর্জ্জিকে ডাকাইয়া একখানি বহুমূল্য বস্ত্র দিয়া বলিলেন,—“কল্য প্রভাতে এই বস্ত্রের একটী উৎকৃষ্ট পোষাক প্রস্তুত করিয়া অবশ্য আনিবে। যদি কল্য প্রভাতে না আনিতে পার তাহা হইলে যাবজ্জীবন তোমায় কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হইবে।” দর্জ্জি মহাভীত হইয়া বিষণ্ণমনে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিল, এবং ভীমরাজকে কহিল, “কল্য প্রভাতে এই বস্ত্রের পোষাক প্রস্তুত করিয়া রাজসমীপে লইয়া যাইতে হইবে, তাহা না হইলে আমায় চিরকাল কারাগারে বাস করিতে হইবে।” যুবক উত্তর করিল,—“মাতুল তজ্জন্য চিন্তা করিও না। আমি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া পোষাকটী প্রস্তুত করিয়া দিব।” এই কথাবার্ত্তার পর যুবক আহারাদি সমাপন করিয়া পোষাক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে রাত্রি দুই ঘটিকা উত্তীর্ণ হইল। যুবা তখন দেখিল বস্ত্র প্রায় শেষ হই-

য়াছে কেবল মাত্র পকেট সেলাই করিতে বাকী আছে। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া উহা সেলাই করিয়া দিব, এই ভাবিয়া ভীমরাজ পোষাকটীর একটী পুঁটুলী করিয়া মস্তকে উপাধান স্বরূপ রাখিয়া নিদ্রিত হইল।

এদিকে রাজা ও মন্ত্রী দর্জ্জি কি করিতেছে তাহা দেখিতে কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। অনন্তর উভয়ে বণিকবেশে রাত্রেরাত্রেই রাজভবন পরিত্যাগপূর্ব্বক দর্জ্জির গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে দর্জ্জির বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ছিদ্র হইতে দেখিলেন—একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে ও একজন অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক রাজপরিচ্ছদ মস্তকের নীচে রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছে। রাজা ইহা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইলেন এবং মন্ত্রীকে কহিলেন, "কল্য প্রভাতে প্রস্তুত পোষাক না পাইলে দর্জ্জির শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিব।" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছেন এমন সময় তাঁহারা দেখিলেন যে, যুবক হঠাৎ উঠিয়া রোদন করিল, তাহার পরমুহূর্ত্তেই হাসিয়া উঠিল, এবং পরিশেষে করযোড়ে কি প্রার্থনা করিয়া পুনরায় নিদ্রিত হইল। রাজা এই ব্যাপার দেখিয়া মন্ত্রীকে বলিলেন,—"কল্য প্রভাতে যে কোন উপায়ে হউক এই যুবককে রাজসভায় আনয়ন করিও।" অতঃপর উভয়ে নিজ নিজ আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে দর্জ্জি পকেট সেলাই করিয়া পরিচ্ছদ লইয়া রাজসমীপে উপনীত হইল। রাজা এই প্রস্তুত পোষাক পাইয়া কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং দর্জ্জিকে বলিলেন,—"তোমার দ্বারা এ পরিচ্ছদ কখনই প্রস্তুত হয় নাই, এখন সত্য করিয়া বল এ বস্ত্র কে সেলাই করিয়াছে?" দর্জ্জি করযোড়ে বলিল,—"মহারাজ আমার একটী ভাগিনেয় এই পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছে।"

রাজা বলিলেন,—তোমার ভাগিনেয়কে কি কারণে সঙ্গে করিয়া লইয়া আস নাই। যাও শীঘ্র তাহাকে আনয়ন কর।"

দর্জ্জি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বাটীতে গমন করিল এবং ভীমরাজকে সমভিব্যাহারে লইয়া পুনরায় রাজসমীপে উপস্থিত হইল। রাজা যুবককে লক্ষ্য করিয়া দর্জ্জিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এইটীই কি তোমার ভাগিনেয়?"

দর্জ্জি উত্তর করিল,—"হাঁ, মহারাজ।"

তখন রাজা তাহাকে কহিলেন,—"তোমার ভাগিনেয়ের সহিত আমার কোন গুপ্তকথা আছে, অতএব তুমি একটু অন্তরালে যাও, দৰ্জ্জি রাজসন্নিকট হইতে গমন করিলে পর রাজা ভীমরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—যে পরিচ্ছদ রাজঅঙ্গকে শোভিত করিবেক, তুমি কোন্ সাহসে তাহা তোমার মস্তকের নীচে রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিলে?"

ভীমরাজ এই প্রশ্ন শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল ও কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"মহারাজ! রাজপরিচ্ছদ রাখিবার উত্তম স্থান না পাইয়াই মস্তকের নীচে রাখিয়াছিলাম।"

এই উত্তর শুনিয়া রাজা অতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"তোমার গৃহে এত সিন্দুক থাকিতে মস্তকের নিম্নদেশ ব্যতীত তোমার কি অন্য কোন স্থান ছিল না?"

ভীমরাজ উত্তর করিল,—"মহারাজ! ক্রোধ সম্বরণ ও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক এ দাসের প্রতি কর্ণপাত করুন।"

রাজা দ্বিগুণতর রাগান্বিত হইয়া কহিলেন,—"তোর কি উত্তর আছে শীঘ্রই বল্।"

যুবক কহিল,—"রাজন্! আমরা গরীব মূর্খলোক। পরন্তু আমাদের মধ্যে এরূপ কথিত আছে যে মস্তক সমস্ত অবয়বের রাজা। কারণ রাজার অবর্ত্তমানে রাজ্য যেরূপ ছারখার হইয়া যায়, মস্তকের অভাবে মানবও সেইরূপ বিনষ্ট হয়। মহারাজ সত্য, আমাদের বাড়িতে সিন্দুক আছে, কিন্তু তাহা রাজপরিচ্ছদ রাখিবার উপযুক্ত নয়। অতএব রাজপরিচ্ছদ রাজার নিকট—সর্ব্বাবয়বের রাজা মস্তকের নীচে রাখিয়া ছিলাম।"

রাজা ও মন্ত্রী যুবকের এই উত্তর শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অনেক পুরস্কার দিলেন এবং কহিলেন, "এক্ষণে তুমি আমার একটী প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমাদের কৌতুহল দূর কর।" এই বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গতরাত্রে তুমি নিদ্রিতাবস্থায় কেন সহসা উঠিয়া বসিলে, একবার রোদন করিলে; পরক্ষণেই আবার হাসিলে এবং শেষে করযোড়ে কি প্রার্থনা করিয়া পুনরায় নিদ্রা যাইলে।"

যুবা এই প্রশ্ন শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল,—"মহারাজ!

আমাকে ক্ষমা করুন। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাকে অনুরোধ করিবেন না। কোন গূঢ় কারণ বশতঃ আমি এক্ষণে ভবদ্দৃষ্ট ঘটনার অর্থ প্রকাশ করিতে অসমর্থ।”

রাজা নানাপ্রকার ভয় দেখাইলেন কিন্তু যুবক কিছুতেই প্রশ্নের উত্তর দিল না। রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া যুবককে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। দর্জ্জি এই ভীষণ ব্যাপার দর্শন করিয়া ক্ষুব্ধমনে স্বগৃহে প্রস্থান করিল।

এই ব্যাপারের অনতিকাল পরে ক্ষেম সিংহ নামক অন্য এক রাজা একই প্রকারের দুইটী স্বর্ণময় পুত্তলী প্রস্তুত করাইয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে কেহ এই পুত্তলিকাদ্বয়ের মধ্যে উত্তমাধম বিচার করিয়া দিবে তাহাকে তিনি স্বীয় দুহিতা মীরাবাই এবং অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিবেন। এই ঘোষণা দিলীপ সিংহের কর্ণগোচর হইল। তিনি সমস্যা ভঞ্জনার্থে পুত্তলীদ্বয় আনাইলেন কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন বৈসাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন না। পরিশেষে মহারাজ দিলীপ, আহার নিদ্রা ও রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া দিনরাত পুত্তলিকার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। এই কথা শুনিয়া রাজ্যমধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কারাগারে 'দর্জ্জির ভাগিনেয়' মন্ত্রীপুত্র ভীমরাজ কর্ণপরম্পরায় সমস্ত বিবরণ শুনিয়া কারাধ্যক্ষকে কহিল,—“সত্বর মহারাজকে গিয়া নিবেদন কর—যদি তিনি রাজকন্যার সহিত আমার বিবাহ ও অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি।” কারাধ্যক্ষ মন্ত্রীকে তাহার সমস্ত কথা বলিল। মন্ত্রী রাজার নিকট ঐ কথা জ্ঞাত করিলে পর রাজা কহিলেন, “শীঘ্র ঐ যুবককে আমার নিকট আনয়ন কর। যদি সে এ সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে তাহা হইলে নীচ বংশোদ্ভব হইলেও সে রাজকুমারী এবং অর্দ্ধেক রাজ্য পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।”

অনন্তর কারাধ্যক্ষ যুবককে মুক্ত করিয়া উভয়ে অশ্বারোহণে রাজসমীপে উপনীত হইল। যুবক রাজাকে দেখিবামাত্র বলিল;—“মহারাজ শীঘ্র প্রশ্ন বলিয়া এ দাসের উৎকণ্ঠা দূর করুন।”

রাজা সর্ব্বসভামধ্যে পুত্তলিকাদ্বয় আনিতে আদেশ করিলেন। পুত্তলিকা-

দ্বয় তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত হইলে পর রাজা তাহাকে বলিলেন,--"তুমি যদি ইহাদের মধ্যে কোন্‌টা উত্তম কোন্‌টা অধম বলিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি অর্দ্ধরাজ্য সহ রাজকুমারীকে তোমায় প্রদান করিব। আর যদি মিথ্যা ভান করিয়া কারামুক্ত হইয়া থাক তাহা হইলে তোমার শির-শ্ছেদনের আজ্ঞা দিব।"

ভীমরাজ বলিল,—"আপনারা সকলে আমার নিকট হইতে অল্পক্ষণের জন্য চলিয়া যান ও আমার মামাকে একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করান।"

অবিলম্বে তাহার মামা দর্জ্জি আসিয়া উপস্থিত হইল। ভীমরাজ তাহার নিকট হইতে দুইটী সূচী লইয়া তাহাকে গৃহে যাইতে বলিল। অনন্তর ভীমরাজ একটী সূচী লইয়া একটী পুত্তলিকার কর্ণবিবরে প্রবেশ করাইয়া দিল কিন্তু উহা মুখ হইতে বহির্গত হইয়া ভূমিতে পড়িল। সে সূচী তুলিয়া লইয়া দ্বিতীয় পুত্তলের কর্ণবিবরে প্রবেশ করাইল কিন্তু এবার সূচি বহির্গত না হইয়া ভিতরেই রহিল। ভীমরাজ ইহা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল, তাহার সমস্যার মীমাংসাও হইয়া গেল। সে রাজাকে খবর প্রেরণ করিল। রাজা আসিলে পর ভীমরাজ কহিল,—"প্রথম পুত্তলিকা অধম ও দ্বিতীয়টী উত্তম।"

রাজা তাহাকে এরূপ উত্তমাধম বলিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

যুবক কহিল,—"আমি এক্ষণে আমার মীমাংসার কারণ বলিব না। যে রাজা আপনার নিকট এই দুইটী পুত্তলী পাঠাইয়াছেন, তাঁহার নিকট এই উত্তর প্রেরণ করুন। তিনিই বুঝিতে পারিবেন। আপনাকে ইহার কারণ বলিয়া দিলে, তিনি আপনাকে উত্তরদাতা ভাবিয়া স্বীয় কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিয়া ফেলিবেন। সেই রাজকুমারী ও অর্দ্ধরাজ্য আমার প্রাপ্য। এক্ষণে আপনি স্বীয় দুহিতা ও অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্ত হউন।"

রাজা কহিলেন,--"অগ্রে তুমি রাজকুমারী মীরাবাইকে বিবাহ করিয়া অর্দ্ধরাজ্য পাও, তৎপরে আমি আমার প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিব।"

ভীমরাজ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কহিল,—"শীঘ্র আপনি এই উত্তরসহ পুত্তলী তথায় পাঠাইয়া দিন।"

রাজা তাহাই করিলেন এবং যুবককে রাজবাটীতে স্থান দিলেন।

মহারাজ ক্ষেমসিং তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাইয়া মহা আহ্লাদিত হইয়া মন্ত্রীকে কহিলেন,—"শীঘ্র উত্তর দাতাকে আমার নিকট আনয়ন কর। অবিলম্বে রাজকন্যা এবং অর্দ্ধরাজ্য দিয়া প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্ত হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি এই উত্তর দিয়াছেন তিনি রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র।"

এই বলিয়া তিনি মন্ত্রীকে হস্তী, অশ্ব ও সৈন্য সামন্ত সঙ্গে দিয়া যুবককে আনিতে পাঠাইলেন। অনন্তর মন্ত্রী মহারাজ দিলীপ সিংহের নিকট হইতে ভীমরাজকে লইয়া গেলেন।

মহারাজ ক্ষেম সিংহ যুবককে দেখিয়া কহিলেন,—"তুমি তোমার অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছ। তুমি রাজকুমারীর পাণিগ্রহণের একমাত্র পাত্র।"

যুবক বলিল,—"মহারাজ! সূচী কি পুত্তলিকার উদর হইতে বাহির করিয়াছেন?"

রাজা কহিলেন,—হাঁ, তাহাতেই আমি বুঝিয়াছি তুমি অতি বুদ্ধিমান।"

অতঃপর মহা ধুমধামে রাজকন্যার ভীমরাজের সহিত বিবাহ হইয়া গেল ভীমরাজ অর্দ্ধরাজ্য যৌতুকস্বরূপে পাইলেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হইলে ভীমরাজ তাহার শ্বশুর রাজা ক্ষেম সিংহের নিকট প্রার্থনা করিল,—"মহারাজ! রাজকুমারীকে লইয়া দিন কতকের জন্য স্বদেশে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি। আপনার অনুমতির প্রার্থনা করিতেছি।" রাজা ইহাতে অমত না করিয়া কন্যা ও জামাতাকে সৈন্য সামন্ত সঙ্গে দিয়া বিদায় দিলেন।

রাজকুমারীর সহিত ভীমরাজ মহারাজ দিলীপ সিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল,—"মহারাজ! এক্ষণে আমাকে রাজকন্যা এবং অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন।"

রাজা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অর্দ্ধরাজ্যের সহিত তাহাকে কন্যাদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন তো তোমার বলিবার কোন আপত্তি নাই, বল দেখি কেমন করিয়া জানিলে যে একটী পুত্তল উত্তম ও অপরটী অধম।"

জামাতা ভীমরাজ উত্তর করিল,—'আমি পুত্তলিকাদ্বয়ের কর্ণের ছিদ্রে সূচী প্রবেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম, দেখিলাম একটীর কর্ণবিবরে প্রবেশ করিয়া মুখ হইতে নির্গত হইল অপরটীর মুখ হইতে নির্গত না হইয়া অভ্যন্তরেই রহিয়া গেল। তাহাতে তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে কোন কথা কানে শুনিবামাত্র মুখ হইতে নির্গত করা উচিত নহে। এই উপায়ে পুত্তলিকাদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টী উত্তম ও কোন্‌টী অধম জানিতে পারিলাম। যাহার মুখ হইতে সূচী নির্গত হইল সেইটী অধম; যাহার মুখ হইতে নির্গত হইল না সেইটী উত্তম।"

রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভীমরাজ যে কারণে আমি তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, আপত্তি না থাকে তো তাহা বলিয়া আমার কৌতূহল দূর কর।"

ভীমরাজ কহিল,—"মহারাজ আমি দর্জ্জির ভাগিনেয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছি বটে কিন্তু আমি নীচ বংশজাত নহি। আপনি রাগান্বিত হইয়া যে মন্ত্রীর শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিয়াছিলেন, আমি তাঁহারই পুত্র ভীমরাজ। প্রাণভয়ে গুপ্তভাবে দর্জ্জি ব্যবসা করিয়া এতদিন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলাম। আমি যে অর্দ্ধরাত্রে হঠাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া কাঁদিয়াছিলাম তাহার অর্থ এই যে আমি কোথায় মন্ত্রীপুত্র ছিলাম এখন একজন সামান্য দর্জ্জি বলিয়া পরিচিত। তৎপরক্ষণে যে হাঁসিয়াছিলাম তাহার কারণ এই যে পলায়ন করিয়া মৃত্যু হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। শেষে হাত যোড় করিয়াছিলাম তাহার কারণ এই যে ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই, সকলই তাঁহার ইচ্ছাধীন।"

মহারাজ দিলীপ এই সকল কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত এবং 'বিপরীতে হিত' দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

ভীমরাজ অবশেষে উভয় রাজ্যের রাজা হইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ দর্জ্জিকে অমাত্য বর্গের মধ্যে প্রধান করতঃ রাজকন্যাদ্বয়ের সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

শ্রীশোভনাসুন্দরী দেবী।

তর্পণ-তত্ত্ব।

দক্ষিণদিক।

শৈশব হইতেই হিন্দুরা দক্ষিণদিক সম্বন্ধে একটা ভয় পোষণ করিয়া আসিতেছেন। শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছি "দক্ষিণে যমের দুয়ার";— হিন্দুজাতির মধ্যে এই বিশ্বাস অনেকটা বদ্ধমূল হইয়া আছে। তাহাদের বিশ্বাস যে ভীষণ যমরাজ বুঝি দক্ষিণদিকে বাস করেন, হয় ত বা মৃত্যুর পরে সেই খানে গিয়া যমযন্ত্রণা ভুগিতে হইবে। কিন্তু এই সকল বিশ্বাস ও প্রবাদের মূল কোথায়? যেমন সমুদ্রগামী নদীর উৎপত্তি সমুচ্চ পর্ব্বতে এই সকল বিশ্বাসেরও মূল সেইরূপ শাস্ত্রের সমুচ্চ শিখর; কিন্তু শাস্ত্রের উচ্চ-স্থানে তাহার উৎপত্তি হইলে কি হয় ক্রমশঃই যেমন নিম্নে নামিয়াছে অমনি অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার আচ্ছন্ন করিয়া স্বচ্ছ জ্ঞানস্রোতকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে;—ইহার অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতি কাহারো দৃষ্টি নাই।

যে দক্ষিণদিক মলয় পবনের জন্য সকলের প্রিয় তাহা যমের দুয়ার হইতে গেল কেন? পিতৃলোকের সহিত দক্ষিণদিকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই ইহার কারণ; যমরাজকে পিতৃপতি বলে।

পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণাদিক তথৈবচ।

"পিতৃদিগের স্থান আকাশ ও দক্ষিণদিক"। এই শাস্ত্রবাক্যে দক্ষিণদিক সম্বন্ধীয় সকল কথাই বীজরূপে নিহিত আছে।

এই পিতৃস্থানের কথা বলিতে গিয়া শাস্ত্রকারেরা যেমন পিতৃলোক অর্থে চন্দ্রলোক ধরিয়াছেন, সেইরূপ অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত করিয়াছেন। পূর্ব্বে 'চন্দ্র ও পিতৃলোক' প্রবন্ধে বলিয়া আসিয়াছি যে শ্মশানপতি ও শ্মশানলোক হিসাবে চন্দ্রলোকের অন্যতম নাম পিতৃলোক, ইহা ব্যতীত জনক বা জন্ম-দাতাও পিতৃলোক এবং দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণসম্পন্ন লোকেরাও পিতৃলোক; আবার একদিকে বাসভূমি গৃহ যেমন পিতৃগেহ বা পিতৃস্থান, সেইরূপ পিতৃস্থান বলিতে শ্মশানকে বুঝায়। সকল দিক দিয়াই দেখাইব যে পিতৃলোকের স্থান দক্ষিণে।

পাঠক নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবেন যে চন্দ্র অধিকাংশ সময়ে আকাশের দক্ষিণে অবস্থিতি করে, দক্ষিণে হেলিয়াই যেন উহা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্রের গতি যেন অনেকটা দক্ষিণপ্রবণ; কিন্তু দক্ষিণদিকের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধ এখানেই শেষ হইল না। শরত ও হেমন্ত প্রভৃতি কালে সূর্য্য যখন দক্ষিণায়নে ফিরিয়া থাকেন তখন শাস্ত্রমতে ওষধীপতি সোমের আধিপত্য বিস্তৃত হয়, মহর্ষি সুশ্রুত বলিতেছেন,—

তয়োর্দক্ষিণং বর্ষাশরদ্ধেমন্তা

স্তেষু ভগবানাপ্যায়তে সোমঃ ॥

"বর্ষা, শরত ও হেমন্ত এই তিন কাল দক্ষিণায়ন কাল এই কালে ভগবান চন্দ্র আপ্যায়িত হয়েন।" বর্ষা, শরত ও হেমন্তের প্রাদুর্ভাব কখন হয় তাহাও পরে বলিয়াছেন "ভাদ্রপদাশ্বযুজৌ বর্ষা, কার্ত্তিকমার্গশীর্ষৌ শরৎ, পৌষ মাঘৌ হেমন্তঃ।" "ভাদ্র ও আশ্বিন (আমাদিগের শরৎকাল) বর্ষাকাল, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ (আমাদিগের হেমন্ত) শরৎ এবং পৌষ মাঘ (আমাদিগের শীত) হেমন্ত। তবেই দেখা যাইতেছে ভাদ্র অবধি মাঘ মাস পর্য্যন্ত প্রায় দক্ষিণায়ন কাল এবং দক্ষিণায়ন কালের কয়মাস হিন্দুমতে চন্দ্রেরই ভোগকাল। দক্ষিণায়ন চন্দ্রলোকের ভোগকাল এই হিসাবেও চন্দ্রলোকরূপ পিতৃলোকের স্থান দক্ষিণদিক। আমরা এবিষয়ে ভবিষ্যতে সবিশেষ আলোচনা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পিতৃস্থান বলিতে যেমন এক অর্থে বাসভূমি গৃহ সেইরূপ শ্মশানকেও বুঝায়,—

পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিনাদিক তথৈবচ।

"আকাশ ও দক্ষিণদিক পিতৃদিগের স্থান অর্থাৎ শ্মশান" এই শাস্ত্রবাক্যেরই অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা বলিতেছি যে বাস্তবিকই দক্ষিণদিক সর্ব্বতোভাবে শ্মশানদিক। ইহা যেমন শাস্ত্রসম্মত বাক্য সেইরূপ বিজ্ঞানসম্মত বাক্যও বটে। বহুকাল পূর্ব্বে শাস্ত্রকার ঋষিরা যাহা বুঝিয়াছিলেন বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগেরও কথায় তাহারই প্রতিধ্বনি পাই। পৃথিবীর দক্ষিণদিক কি জানি কেন লোকালয়শূন্য শ্মশান। পৃথিবীর উত্তরদিকে উত্তর মেরুর নিকট পর্য্যন্ত লোকালয়ের আবাসভূমি কিন্তু দক্ষিণদিকে

কেবল অনন্ত জলরাশি ও দক্ষিণ সমুদ্রপারে জনশূন্য শ্মশানসদৃশ ভূখণ্ড। কেবল পৃথিবীর দক্ষিণাংশ নয় আকাশেরও দক্ষিণাংশ শ্মশানবৎ ভীষণ। বর্ত্তমান-কালে দক্ষিণসমুদ্রযাত্রী নাবিকেরা যে খণ্ড খণ্ড অঙ্গারগহ্বরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের আকাশে দক্ষিণদিগ্বিভাগ ক্ষত বিক্ষত দেখিয়া ভীতনেত্রে চাহিয়া থাকে সে গুলি আর কিছু নয় ইহারা দক্ষিণাকাশের লোকশূন্যতা বা শ্মশানভাবের পরিচায়ক। বর্ত্তমানকালে নাবিকেরা দক্ষিণদিগস্থ কাল কাল খণ্ডাকাশগুলিকে রূপকোক্তিতে কয়লার থলিয়া (Coal sacks) নামে অভিহিত করে। পৃথিবীর দক্ষিণ যেমন লোকশূন্য আশ্চর্য্য এই যে দক্ষিণাকাশও সেইরূপ লোকশূন্য শ্মশান-সদৃশ। আকাশের লোক কাহারা, না গ্রহ তারকারা। দক্ষিণাকাশ কাল কাল খণ্ডে ক্ষত বিক্ষত হইবার কারণ আধুনিক জ্যোতির্বিদেরা বলেন ঐ সকল স্থান অতি দূর দূর পর্য্যন্ত গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি লোকশূন্য।* প্রসিদ্ধ পর্য্যটক বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ মহোদয় হাম্বোল্ড বলেন, They seem to be really holes by means of which our vision pierces into the remotest spaces of the universe. অর্থাৎ "এই কাল কাল খণ্ডাকাশগুলা বাস্তবিকই আকাশের গহ্বরস্বরূপ যাহার মধ্য দিয়া আমাদের দৃষ্টি বিশ্বাকাশের দূর হইতেও সুদূরে যাইয়া থাকে।" অতএব দেখা যাইতেছে যে যদি গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতিকে আকাশের লোক বলিয়া ধরা যায়, এবং বাস্তবিকই উহারা গ্রহলোক ও নক্ষত্রলোক বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি না কি যে দক্ষিণাকাশ অনেকটা লোকালয়শূন্য শ্মশানবৎ। শাস্ত্রকারেরা লোকশূন্যতাকে এমনি ভীতিচক্ষে দেখিয়াছেন যে বাসভূমি গৃহও সন্তানসন্ততি দ্বারা পরিবৃত না হইলে, প্রজাশূন্য হইলে সেই গৃহকেও শ্মশানের ন্যায় বলিয়া গিয়াছেন।

'যন্নবালৈর্প্পরিবৃতং শ্মশানমিবতদ্‌গৃহং।'

দক্ষিণদিকের খণ্ডাকাশগুলা অঙ্গারকৃষ্ণ হওয়ায় পিতৃস্থান বা যমপুরী বলিবার আরও বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। যমুনার জল কালো বলিয়াই

* According to Astronomers, these patches are due to the sky being at these parts to a great extent without stars. The Universe.

যমুনা হিন্দুদিগের নিকট যমভগ্নী। রাত্রি, কৃষ্ণ অন্ধকারময় বলিয়া যমশব্দপ্রসূত "ত্রিযাম" ও "যামিনী" রাত্রিরই নাম। ইহা শুদ্ধ আমাদের দেশে নয় প্রায় সর্ব্বদেশে ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়। গ্রিসীয় পুরাণেও দেখা যায় যমদেব প্লুটোকে কাল গরু বলী দেওয়া হইত। বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্যেরাও মৃত্যুচিহ্নস্বরূপ কৃষ্ণবসন পরিয়া থাকেন।

উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে যে বিপরীত ভাব বিদ্যমান তাহা চিরকাল মানবের মনকে স্তম্ভিত করিয়াছে। বৈদিককাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্তও মানব এই পার্থক্য অনুভব না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। "To the dwellers in Australia or New Zealand, or South America, or the Cape Colony, the heaven has an unwonted aspect, as well as the earth a different vegetation. "কি অষ্ট্রেলিয়া, কি নিউ জিল্যাণ্ড কি দক্ষিণ আমেরিকা বা কেপকলনি পৃথিবীর দক্ষিণে সকল স্থানেই আকাশের এক অপরিচিত নূতন দৃশ্য এবং ভূমিতলের এক অভিনব (উত্তর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন) উদ্ভিদ-রাজ্য দেখা যায়" পণ্ডিত হাম্বোল্ডও উত্তর ভূভাগ হইতে দক্ষিণে যাত্রাকালে এক অভূতপূর্ব্ব আতঙ্ক মনের মধ্যে অনুভব করিয়া উত্তরাকাশ হইতে দক্ষিণাকাশ যে সম্পূর্ণ অভিনব সৃষ্টি তাহা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ যাত্রাকালে কোন ইংরাজ পর্য্যটকও ঠিক এই ভাবই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে "আমি পরিষ্কার রাত্রে জাহাজের উপর বেড়াইতেছি, ক্রমশঃ আমার সমক্ষে উত্তরদিকের দ্যুলোক প্রত্যক্ষরূপে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল এবং আমার মনে এক অভূতপূর্ব্ব শক্তিতে এই ভাব জাগিতে লাগিল যে আমি গৃহ হইতে দূরে--বহু দূরে। যে সকল গ্রহ তারকা আমি বাল্যকালে ও যৌবনে সানন্দে ও কৌতুকনেত্রে দেখিয়া আসিয়াছি তৎসমুদয় অদৃশ্য হইয়া গেল এবং দক্ষিণের অপরিচিত নূতন আকাশ আমার মাথার উপরে দেখা দিল।"

ভ্রমণকারী পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা দক্ষিণাকাশের সম্পূর্ণ অপরিচিত দৃশ্য দেখিয়া যেমন ভীতঅন্তঃকরণে বর্ণনা করিয়াছেন, আর্য্যমনীষিগণও সেইরূপ দক্ষিণদিকের শ্মশানবৎ ভীষণতা উপলব্ধি করিয়া পিতৃস্থান নাম না দিয়া থাকিতে পারেন নাই।

এই প্রবন্ধে আমরা পিতৃদিগের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম প্রবারান্তরে পিতৃকাল সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তানসেনের বিবাহ।

যে কেহ বড়লোক হইয়াছেন, দেখি তাঁহাদের অনেকেই প্রায় বাল্য-কালে চঞ্চল ও দুর্দ্দান্ত ছিলেন। সংসারে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যেমন অমাবস্যার পরে পূর্ণিমার আবির্ভাব হয়, রাত্রির পর দিন আসে, সেইরূপ অনেক সময়ে দুর্দ্দান্ত মোহময় জীবনের পরে শান্ত জ্যোতির্ম্ময় মহৎ জীবনের প্রকাশ হইতে দেখা যায়। ইহা শুধু ব্যক্তিগত নহে, ইহা জাতিগত ও কাল-গত। যে জাতি পূর্ব্বে হেয় ছিল, তাহা পরে উন্নত হইয়া শ্রেষ্ঠ লাভ করি-য়াছে; যে জর্ম্মণজাতি বুদ্ধিহীনতার অন্ধকারে আবৃত বলিয়া অপর ইউ-রোপীয়জাতির নিকটে অনাদৃত হইত, সেই জর্ম্মণজাতি এখন বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে মহোন্নত,—জ্ঞানে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ড পূর্ব্বে এককালে অসভ্যতার ভূমি—ও ক্ষুদ্র কীটতুল্য ছিল, এখন বর্ত্তমানকালে তাঁহার প্রভাব সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকার ঘটনা আমরা সাধারণতঃ ব্যক্তিতে, জাতিতে ও কালেতে অর্থাৎ দেশকালপাত্রে প্রায় অনেক সময়ে ঘটিতে দেখি। কিন্তু সেই হেতু ইহা আমাদের মনে করা উচিত নয় যে বড়লোক হইতে গেলেই বুঝি প্রথম হইতে, দুর্দ্দান্ত ও দুষ্ট হওয়া বিধেয়। কারণ প্রকৃতির প্রকৃত নিয়ম তাহা নহে। প্রকৃতি আমা-দের অতি সহজে ক্রমশঃ উন্নতির পথে লইয়া যান। প্রকৃতপক্ষে স্বভাবের নিয়ম ক্রমোন্নতি। আমরা যদি ধীরে ধীরে আপন কর্ত্তব্যপালন করিয়া যাই, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে, বিনা কোলাহলে, নিঃশব্দে, গ্রহ তার-কার ন্যায় উন্নতির পথে পরিভ্রমণ করিতে পারি। আমরা যখন তাহা না

করি, অন্যায় করি, অকার্য্য করি, তখনই প্রকৃতিতে সমুদয় পদার্থ তুমুল কোলাহল, আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তাহার প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হয়।

তানসেন প্রথম বয়সে [illegible] করিলেন না, পিতার কথা শুনিলেন না, পিতৃবাক্য অবহেলা করিয়া সঙ্গীত না শিখিয়া, রাখাল বালকদের সঙ্গে গরু চরাইয়া আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলেন, প্রকৃতি কিন্তু তাঁহার সঙ্গীতের সেই পরমকার্য্যে অবহেলাজনিত অভাব নানারূপে পূর্ণ করিবার জন্য বিচলিত হইয়া উঠিল, প্রকৃতি মহাকোলাহলে তাঁহার সেই সঙ্গীতবিষয়ে কর্ত্তব্যহীনতার প্রতিবিধান করিল। তানসেনের অবহেলার প্রায়শ্চিত্ত হইল, তানসেন শেষে সঙ্গীতের যথার্থ উপলব্ধি করিয়া তজ্জন্য কতই না ব্যাকুল হইয়াছিলেন—গান হইতে গানের সেই আদিদেব মহাদেবের মহিমা উপলব্ধি করতঃ তিনি শেষে তাঁহার জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। [illegible] তানসেন শৈশবে সঙ্গীত [illegible] করিলেন; [illegible] তাঁহার পিতা মুকুন্দরাম পাছে তাঁহাকে [illegible] বলিয়া [illegible] পূর্ব্বক সঙ্গীতশিক্ষায় তানসেনের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন, [illegible] মুকুন্দরাম তাহা করেন নাই, মহাদুঃখে আকুল হইয়াই করিতে পারেন নাই। মহাদুঃখ হইবারই কথা। মুকুন্দরামের সন্তান বাঁচিত না, হইয়াই মরিয়া যাইত, তাই হজরত গউস নামে একজন মুসলমান সাধু পুরুষের নিকট [illegible] প্রার্থনা করিয়া [illegible] কষ্টে যদিবা একটি পুত্র [illegible] তাঁহার মহাশোক [illegible] তিনি সাতিশয় কাতর হইয়া তাঁহার একমাত্র পুত্রের আমোদে বাধা না দিয়া দুঃখিত [illegible] "যাক গো চরাক গে" বলিয়া [illegible] তাহাকে গোচারণক্রীড়াতেই আসক্ত থাকিতে দিলেন; মনে ভাবিলেন "যাক রাখালদের সঙ্গে গরু চরাক বেড়াক গে ও গানশেখা কিছু হবে না।" পুত্রের ব্যবহারে পিতার মন দুঃখে কষ্টে উদাস হইল, আবার পিতারও ঐরূপ বাক্যে ও ব্যবহারে পুত্রেরও মন উদাস আকার ধারণ করিল, তিনি একেবারে [illegible] গৃহ হইতে বাহির হইয়া আপন মনে যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পিতৃতিরস্কারে তিনি মর্ম্মাহত চিত্ত হইয়াছেন। অভিমানে আক্ষেপে তখন

ব্রহ্মের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বেদ না শিখিয়াও বেদজ্ঞান জন্মিয়াছিল, "আদনাদ অনহদ ভয়ো তাতেঁ উপাজৌ বেদ॥ এবং ইহাতে যথার্থ প্রেমানন্দে তাঁহার মন প্লাবিত হইয়াছিল। তিনি যখনই তাঁহার গানে ভগবানকে ডাকিতে গিয়াছেন তখনই তাঁহাকে 'প্যারে' অর্থাৎ প্রিয়তম না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি বিশ্বব্যাপী প্রেমে মগ্ন হইয়া তাঁহার বৈরাগ্যের মধ্যে "রাগ প্রেমকে প্রাণ" ইহা কিবা অনুভব করিয়াছিলেন। যাহার যেরূপ ভাব অন্তরের প্রেম সে সেইরূপ ভাবেই ব্যক্ত করিয়া থাকে; তানসেনের গায়ক গোষ্ঠীতে জন্ম, তাই তিনি গায়কের অনুরাগপূর্ণ অন্তঃকরণে রাগরাগিণী মূর্ত্তিমান করিতেন।

তানসেন যদিচ পিতৃবাক্য অবহেলা করিয়া সঙ্গীতের প্রতি মনোযোগ দিলেন না, জীবনে সঙ্গীত কিন্তু তাঁহাকে ছাড়িল না—তাঁহার মূল প্রকৃতি যাইবে কোথায়. গৃহ হইতে বহির্গমনকালে তাঁহার বৈরাগ্যের ও দুঃখ ক্লেশের মাঝেও সঙ্গীতের ভাব উছলিয়া উঠিত, ভ্রমণকালে তিনি জীবজন্তুগণের নানবিধ স্বরের অনুকরণ করিতেন। প্রসিদ্ধ আছে বারানসীর সন্নিধানস্থ কোন বনে তানসেন একদিন গরু চরাইয়া বেড়াইতেছেন, সেই সময়ে সেইস্থান দিয়া সঙ্গীতসাধক যোগী হরিদাস স্বামী বৃন্দাবন হইতে বারানসীতীর্থে যাত্রা করিতেছিলেন। তানসেনের বালকসুলভ চপলতা বশতঃ সহসা তাঁহাকে ভয় দেখাইবার প্রবৃত্তি জন্মিল, তিনি সেই বনে গোপনে অন্তরালে থাকিয়া শার্দ্দুলস্বরের অনুকরণ করিলেন। হরিদাস স্বামী সেই স্বর শুনিয়া ভাবিলেন "এ সামান্য বন, নিকটে জনপূর্ণ বারানসীধাম, এখানে বাঘ থাকা অসম্ভব, তিনি কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে শিষ্যবর্গকে সেই স্বর কোথা হইতে আসিতেছে, অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। শিষ্যবর্গ অন্বেষণ পূর্ব্বক একটী বালককে ধৃত করতঃ স্বামীজীর সমীপে লইয়া গেল। স্বামীজী তাহার মুখশ্রী ও লক্ষণাদি দর্শন করিয়া বুঝিলেন যে বালকটী কম লোক নয়;—তাহার অসামান্য ভাব সূক্ষ্মরূপে বুঝিতে পারিয়া সমস্ত পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক তানসেন তাহার সমস্ত পরিচয় প্রদান করিলে পর, হরিদাস স্বামী তাহার পিতার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষী হইলেন। অনন্তর স্বামীজী তানসেনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া তাঁহার পিতা মুকুন্দরাম

পাঁড়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাঁড়েজীর সহিত স্বামীজীর আলাপ পরিচয়াদি হইল। স্বামীজী মুকুন্দরামের নিকট তাঁহার পুত্রের সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষার জন্য অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তন্নুয়াকে বৃন্দাবনে লইয়া গেলেন। তন্নুয়া সেথায় কতিপয় বৎসর স্বামীজীর কাছে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিয়া একজন গায়ক হইয়া উঠিলেন। এখন তানসেন গুরুর নিকট সম্ভবতঃ আরও কিছুকাল সঙ্গীত শিক্ষা করিতেন, কিন্তু দৈব বশতঃ আর তাহা ঘটিল না, তাহাতে বাধা পড়িল,—তাঁহার এই নব যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে তিনি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন, স্বামীজীর ন্যায় গুরুর উপদেশ পাইয়া, তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, আর তাঁহার পিতার তিরস্কারের জন্য অভিমান নাই, তাঁহার নিজ দোষ এখন নিজে বুঝিয়াছেন,—পিতাকে দেখিবার জন্য তানসেনের মন বড় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তিনি গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৃহে পৌছিবামাত্র দেখেন তাঁহার পিতা মুমূর্ষুপ্রায়। অল্পকালের মধ্যে মুকুন্দরামের মৃত্যু হইল। প্রাণবিয়োগের পূর্ব্বে মুকুন্দরাম তানসেনকে জানাইয়া গেলেন যে, হজরত মহম্মদ গওস নামক এক মুসলমান সিদ্ধপুরুষ তাঁহার পিতার তুল্য। তিনি গোয়ালিয়রে থাকেন। তাঁহার সহিত তানসেন যেন একবার সাক্ষাত করেন ও তাঁহার কথা যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গেলেন।

মুকুন্দরামের লোকান্তর গমনের পর, তানসেনের চিত্ত বড় ব্যাকুল হইল—তিনি আর গৃহে না থাকিয়া পুনরায় বৃন্দাবন যাইতে মানস করিলেন। বৃদ্ধা জননীকেও সঙ্গে লইলেন। পথে যাইতে যাইতে তাঁহার বৃদ্ধা মাতৃদেবী পথেই রোগাক্রান্ত হইয়া স্বর্গধামে উপনীত হইলেন। ইহাতে তানসেনের মন অত্যন্ত উদাস হইল। তাঁহার তরুণ হৃদয় দুঃখে শোকে ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। তিনি এখন পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালক।

এই বিপদে সাতিশয় কাতর হইয়া উদাসীনের ন্যায় একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে বৃন্দাবনধামে গুরুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি নানারূপে সান্ত্বনা ও তত্ত্বোপদেশের দ্বারা তানসেনের অন্তঃকরণে শান্তি প্রেরণ করিলেন, তানসেনের দুঃখক্লেশের অনেকটা উপশম হইল।

একণে তাঁহার মন পিতৃআজ্ঞা পালনার্থে চঞ্চল ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা ঘন ঘন তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইয়া তাঁহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। পিতৃআজ্ঞা পালনার্থে স্বামীজীর নিকট বিদায় লইয়া গোয়ালিয়রে প্রস্থান করিলেন। তথায় আসিয়া হজরত মহম্মদ গওসের অনুসন্ধানার্থে ফিরিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বেই তাঁহার সহিত তানসেনের সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধ গওস তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ ও সমাদর করিলেন। এই মুসলমান পীরপুরুষের জন্যই তানসেন জন্মগ্রহণ করিয়া বাঁচিয়াছেন, তাঁহার উপর তাই গওসের পিতৃতুল্য স্নেহের সঞ্চার হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। তাঁহার তানসেনকে স্বীয় বিষয়ের উত্তরাধিকারী করিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল এবং যাহাতে তানসেন বিবাহ করিয়া সংসারী হয়েন এই অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তানসেন তাঁহার কথানুযায়ী কাজ করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। এবং সেই বৃদ্ধ গওসের কাছে কিছুদিন বাস করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তা রাজা মানের বিধবা পত্নী মৃগনয়নীর গানের খ্যাতির কথা শুনিলেন। রাণীর গান শুনিবার জন্য তাঁহার [illegible] হইল, ইহা রাণীর কানে গেল; রাণী আদেশ দিলেন। তানসেন আদেশ পাইয়া প্রাসাদে গমন করিয়া তাঁহার গান শুনিলেন। এখন [illegible] [illegible] কিছুদিন ধরিয়া তানসেন রাণীর গান শুনিবার জন্য প্রাসাদে যাতায়াত করেন—রাণীর গান শোনেন, রাণীকে নিজের গান শোনান, কোনদিন বা মহারাণীর শিষ্যগণের গান শোনেন, এইরূপে তানসেন সঙ্গীতের আনন্দের দ্বারা অন্তরে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি রাণীর রাজ্যে বাস করিয়া সঙ্গীত বিষয়ে আরও উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন।

[illegible] তানসেন' নামক প্রবন্ধে বলিয়া আসিয়াছি যে ভাল গায়ক হইতে হইলে [illegible] [illegible] শ্রবণ [illegible] ভাল কাণ আবশ্যক। তানসেনের জীবনে এই সঙ্গীত শ্রবণাদির বেশ সুব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রথমে তিনি পিতৃগৃহে গান শুনিতে পাইতেন; গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বসঙ্গীত শ্রবণ করিলেন; পরে দৈবক্রমে হরিদাস স্বামীর সহিত মিলন হইল; তিনি [illegible] তাঁহার নিকট গান শিক্ষা করিতে পাইলেন। পরে গোয়ালিয়রে

একটি গানে তাঁহার প্রিয়তম ঈশ্বরকে 'তুঁহি পুরাণ তুঁহি কোরাণ' না বলিয়া যাইতে পারেন নাই।

"তুঁহি বেদ তুঁহি পুরাণ তুঁহি হৃদীশ তুঁহি কোরাণ।"

তানসেনের সম্বন্ধে একটি আখ্যানেও আমরা তাঁহার এই দুই ভাবের পরিচয় পাই; এককালে তিনি, যেস্থানে বাস করিতেন সেথায় একটি ক্ষুদ্র নদী বহিত। পরপারে ঝিলমিলানন্দ নামক মহাদেবের মন্দির ছিল। সেথায় তিনি প্রত্যহ অত্যল্পতোয়া নদীটি পার হইয়া দুগ্ধ দিয়া পূজা করিতে আসিতেন। পূজার সময় তাঁহার একটু দুগ্ধ চাই। একটু দুগ্ধ না দিয়া তিনি পূজা করিতেন না। একদিন বৃষ্টিতে নদীটি ভরিয়া গেল, তিনি অন্য দিন পাত্রে করিয়া ওপারে পূজার দুগ্ধটুকু লইয়া যাইতেন। আজ নিরুপায় দেখিয়া, অধীর হইয়া, তাড়াতাড়ি দুগ্ধটুকু মুখে পুরিয়া সন্তরণপূর্ব্বক পূজার্থে ওপারে গমন করিলেন।* প্রবাদ আছে তাহাতে দৈববাণী হইল যে তানসেন তাহার জন্য যবন হইলেন। এই প্রকারে সকল দিক দিয়াই দেখি যে হিন্দুমুসলমান এই উভয় ভাবের ছায়া তিনি কিছুতেই অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়েন নাই। এমনি তাঁহার অদৃষ্ট যে, জীবনের একটি যে মহাঘটনা বিবাহ তাহার বেলায়ও তিনি হিন্দুমুসলমানের প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়েন নাই—তানসেন যখন গোয়ালিয়রে রাণী মৃগনয়নীর কাছে রাজপ্রাসাদে সঙ্গীত শ্রবণাদির জন্য যাতায়াত করিতেন, তখন, রাণী যে সকল শিষ্যাকে গান শিখাইতেন, সেই শিষ্যগণের মধ্যে তানসেনের যাহার প্রতি মন গেল, যাহার সহিত প্রণয়ে আবদ্ধ হইলেন আশ্চর্য্য এই, যে অদৃষ্টবশতঃ তিনিও হিন্দুমুসলমান। সেই শিষ্যার পিতা সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার পূর্ব্ব হিন্দু নাম প্রেমকুমারী ছিল, পরে যখন তাঁহার পিতা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন তখন হইতে লোকে তাঁহাকে হোসেনী ব্রাহ্মণী বলিয়া ডাকিত। এই হোসেনী ব্রাহ্মণীরই প্রণয়পাশে তানসেন আবদ্ধ

* অধীরতা তানসেনের চরিত্রের একটি বিশেষ দোষ ছিল। তিনি এই অধৈর্য্যের বশীভূত হইয়া সংসারে অনেক দুঃখ ক্লেশ আনিয়াছিলেন।

হইলেন। প্রেমকুমারী অতিশয় সুন্দরী ও সুগায়িকা ছিলেন। তানসেন ইঁহার সৌন্দর্য্যে ও সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তানসেন প্রেমকুমারীর প্রেমে আবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে কিরূপে লাভ করিবেন তজ্জন্য ভাবিত হইলেন।—প্রেমকুমারী গোয়ালিয়রের মহারাজা রাজামানের বিধবা পত্নী মৃগনয়নীর শিষ্যা; তাঁহার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন।—তানসেন মহাসমস্যায় পড়িলেন। গোয়ালিয়রে আসিয়াছেন, গোয়ালিয়রের রাণীকে না বলিয়া কার্য্য করা দুরূহ, তাহাতে তাঁহার আবার শিষ্যা, তিনি কিরূপে রাণীর নিকটে বলিবেন—বলিতে তাঁহার লজ্জা হইবারই কথা। কিন্তু সেই প্রেমের কথা কতদিন অপ্রকাশিত থাকিবে, শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। মহারাণী মৃগনয়নী শুনিতে পাইলেন। তিনি এখন, দুজনের প্রেম স্বাভাবিক দেখিলেন, তাহাতে উভয়েই সঙ্গীতজ্ঞ। তানসেনও বেশ গাহিতে পারেন, প্রেমকুমারীও বেশ গাহিতে পারেন; তাঁহাদের মধ্যে প্রেম সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। রাণী মৃগনয়নী রুষ্ট হইলেন না, তাঁহাদের মিলনে বাধা না দিয়া প্রত্যুত তাঁহাদের কামনা সফল করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু দেখিলেন যে প্রেমকুমারী এখন মুসলমান, তাহা হইলে তানসেনের বিবাহ মুসলমানশাস্ত্রমতেই হইবে; তাই তিনি গোয়ালিয়রের মুসলমান সিদ্ধপুরুষ মহম্মদ গওসের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। মহম্মদ গওস তানসেনকে ইতি-পূর্ব্বেই জানিতেন। তিনি তানসেনকে জানাইলেন যে হোসেনী এখন তো আর হিন্দু নয়, মহম্মদ ধর্ম্মাবলম্বী, যদি তানসেন তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহেন তো তাঁহাকে মুসলমান শাস্ত্র মতে করিতে হইবে। তানসেন কি করেন, প্রেমকুমারীকে বিবাহ করিতে তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা, অগত্যা তাহাই করিতে স্বীকার করিলেন।

গোয়ালিয়রেই উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। নবযৌবন বয়সে সম্ভবতঃ একবিংশতি বা দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সের সময় (পঞ্চবিংশতি বৎসরের উর্দ্ধে নয়) তানসেনের বিবাহ হইল।

এই বিবাহে তানসেনের সঙ্গীতের উন্নতি বাড়িল বৈ কমিল না—যেন ষোলকলা পূর্ণ হইল, কারণ গায়কের অর্দ্ধাঙ্গিনী গায়িকা হইল। এই বিবাহ তানসেনের সঙ্গীতময় জীবনে একটী প্রধান ঘটনা।

এই বিবাহ প্রধানতঃ সঙ্গীতজ্ঞা মহারাণী মৃগনয়নীর যত্নে ও সহায়তাতেই সুসম্পন্ন হইল। তানসেন তজ্জন্য মহারাণী মৃগনয়নীর প্রতি বরাবর কৃতজ্ঞ-চিত্ত ছিলেন। সে কৃতজ্ঞতার জন্য তিনি অনেক গানে তাঁহার স্তুতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। কোন গানে তাঁহাকে তারার মধ্যে তারকা বলিয়া গিয়াছেন। "চন্দ্রবদনী মৃগনয়নী তার মধ্য তারকা"। কোন গানে তিনি বলিয়াছেন :—

"চন্দ্রবদনী মৃগনয়নী হংসগমনী চলিহৈ পূজন মহাদেব"।

কোন গানে তিনি রাণী মৃগনয়নীর গুণকীর্ত্তন করিয়া গাহিয়াছেন—"মহারাণী সুখদাই"।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রথম কবিতা।

ঘোমটায় ঢাকা নব-বধূ
আছিলে লুকায়ে অন্তঃপুরে ;
লাজ শঙ্কা দিয়ে জলাঞ্জলি,
কেন ছুটে আসিলে সুদূরে ?

সুমধুর স্নেহের নিলয়ে
গাঁথা ছিলে সোহাগ সুতায় ;
বাহিরের প্রখর কিরণ
যদি তোর নাহি সহে গায় !

এখানে যে বড় ভিড় ভাড় ;
নিবিড় এ জনতার মাঝে,
নীরব আরামে আর তুমি
কেমনে ফুটিবে, কোন লাজে ?

ক্ষীণ আশা, ক্ষীণতর আলো
ঘুচাইবে কেমনে আঁধার ;
দুইবিন্দু প্রাণ-গলা বারি
[illegible]

জানি, তুই নিখিলের স্রোতে
ঢেলে দিতে চাস্ ক্ষুদ্র হিয়া,
জননীরে পূজিবারে চাস্
হৃদয়ের রক্তবিন্দু দিয়া।

ভগ্ন বীণা ছিন্নতারে বাধি ;
হরিবি কেমনে বিশ্বক্ষুধা ;
কে তোমার গানে দিবে সুর,
কোথা পাবি সঞ্জীবনী সুধা ?

এখনি উঠিবে খর রবি,
জাগিবে ধরণী সচেতনে ;
এই বেলা চল্ ফিরে, সখি,
লুকাইয়ে থাকিগে' নিজনে।

সেখানে বসিয়া দুই জনে
গাথিব, বাঁধিব কত গান ;
তুমি আমি গলায় গলায়,
সাধিব, মিলাব একতান

নীরবে মলয় বায়ু আসি,
সাবাসি' বুলাবে হাত গায় ;
প্রশংসিবে নিঝর উচ্ছ্বসি ;
নবোৎসাহ ছুটিবে শিরায়।

এখনি উঠিবে খর রবি,
জাগিবে ধরণী সচেতনে ;
এই বেলা আয়, চলে আয়,
লুকাইয়ে থাকিগে নিজনে।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

সন্দেশ।

বঙ্গদেশে যে সকল মিষ্টান্নের প্রচলন আছে দেখা যায়, তাহাদের অধিকাংশই বাঙ্গালার নিজস্ব নহে। আহার বিষয়ে এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে উন্নতি খুব অল্পই হইয়াছে; ভারতের পশ্চিম প্রদেশের নিকট এ বিষয়ে অনেক পশ্চাৎপদ। বাঙ্গলার যাহা কিছু খাদ্য সামগ্রী আছে, তাহার অধিকাংশই হয় হিন্দুস্থানের অর্থাৎ ভারতের পশ্চিম প্রদেশের নিকট হইতে ঋণ করা, না হয়ত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থোল্লিখিত প্রণালীরই অনুকরণ, তাই 'পানতয়া" 'জিলাপি' প্রভৃতি অতি প্রচলিত মিষ্টান্নের নামগুলি পর্য্যন্তও আমরা হিন্দুস্থানী দেখিতে পাই। (১)

হিন্দুস্থানীরা আহারে বলবীর্য্য 'তাগদ' যাহাতে হয়, সেজন্য কত যত্ন করে, কিন্তু বাঙ্গালীরা রসোপভোগ চায়, তাহাতে বলবীর্য্য হউক বা না হউক। ঘৃত দুগ্ধ, হালুয়া প্রভৃতি বীর্য্যকর ও পুষ্টিকর দ্রব্য হিন্দুস্থানীরা সচরাচর খাইয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালীরা ঘৃত দুগ্ধ অপেক্ষা বিকৃত দুগ্ধ ছানা ভালবাসে; এবং ছানা প্রস্তুত সন্দেশই বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান মিষ্টান্ন।

ব্যঞ্জনাদি রন্ধনকালেও হিন্দুস্থানীদিগকে হিং, জীরা প্রভৃতি হজমী ও উপকারী মশলা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে দেখি। বাঙ্গালীরা ভোজনকালে ক্ষীর, মৎস্য প্রভৃতি শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও অপকারী বিরুদ্ধ দ্রব্য একত্র ভোজন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। পশ্চিমবাসীরা এ সকলের বিশেষ বিরোধী। আপাততঃ ক্ষীর, মৎস্য প্রভৃতি বিরুদ্ধ দ্রব্য একত্র আহারে হয়ত বা কিছু নাও হইতে পারে কিন্তু ইহার কুফল অনেক সময়ে অম্ল প্রভৃতি রোগে পর্য্যবসিত হয়। (২) বাঙ্গালীর এত রোগ কেন? আহার বিষয়ে অসতর্কতাই যে

---

(১) পানতয়া, জিলাপি প্রভৃতি মিষ্টান্নের নামগুলি কোথা হইতে আসিল এবং কেনই বা আসিল এ বিষয়ে আমি সাহিত্য নামক পত্রে "খাবারের নামতত্ত্ব" প্রবন্ধে স্পষ্টরূপে দেখাইয়া আসিয়াছি। ১৩০৩ সালের ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের সাহিত্য দেখ।

(২) এইরূপ বিরুদ্ধ ভোজন করিলে রক্ত দূষিত হয় "বিরুদ্ধ বীর্য্যভাচ্ছোনিত প্রদূষণায়" মৎস্য মাংস প্রভৃতি দুগ্ধের সহিত একত্র ভোজন যে নানা রোগের আকর তাহা আয়ুর্ব্বেদে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। অধুনা পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরাও এইরূপ দুগ্ধ ও মাংস প্রভৃতির

অন্যতম কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীর রোগের কথা পশ্চিমে একটা প্রবচনের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। 'পুরবী রোগী' প্রবাদটী পশ্চিমের সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে বদ্ধমূল।

যে ছানা হিন্দুস্থানবাসীরা মুর্দ্দা অর্থাৎ মৃত পদার্থ বলিয়া, দশ সের ও বিশ সের দুগ্ধও যদি ছানা হইয়া যায়, তবু ফেলিয়া দেয়, সেই ছানা বাঙ্গালীর খাবারের প্রতিপদে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। হিন্দুস্থানীরা বলে যেমন মৃতজীব পরিত্যজ্য সেইরূপ মৃত দুগ্ধ ছানাও বিশেষ অপকারী বলিয়া, পরিত্যজ্য। কিন্তু এই ছানা বাঙ্গালীর কালিয়ায়, পোলাওয়ে, আম্বলে এবং মিষ্টান্ন প্রভৃতি সকল আহার্য্য দ্রব্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, এমন কি যে মিষ্টান্নটীর নাম ক্ষীরমোহন তাহা ছানারই প্রস্তুত, ক্ষীরের সহিত সম্পর্ক অত্যল্পই। পশ্চিমে ছানার আদর নাই তাহার কারণ খুব সম্ভবতঃ দুগ্ধের প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধা এবং ছানার ধারক গুণ; আয়ুর্ব্বেদে ইহার গুণ লিখিত আছে,—

'বাতঘ্নী গ্রাহিণী রুক্ষা দুর্জ্জরা দধিকুর্চ্চিকা।'

"ছানা বাত নাশক, সহজে জীর্ণ হয় না, রুক্ষ এবং ধারক। গ্রাহী অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধকারক বলিয়াই পশ্চিমের টান দেশে ছানা এত ঘৃণিত হইয়া থাকিবে। ছানার যে কোন উপকারিতা নাই তাহা নহে। বঙ্গের জল হাওয়া ততটা টান বা কষা নহে যে ছানার গ্রাহিণী শক্তি বিশেষ অপকার করিবে। যে কোন কারণেই হউক না কেন বাঙ্গালা মিষ্টান্নে ছানা প্রধান উপকরণ হইয়া পড়িয়াছে, এই কারণে ছানা ও ছানাসর্ব্বস্ব সন্দেশের বিষয়ে এ প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

ছানা নামটী কোথা হইতে আমরা পাইলাম দেখা যাউক। ছানা নামটীর মূল কোথায়? ছানা শব্দ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত "ছিন্ন" শব্দই ছানা শব্দের মূল। যেমন 'চিহ্ন' শব্দ হইতে 'চেনা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে দেখা যায়, সেইরূপ "ছিন্ন" হইতে 'ছেনা' বা 'ছানা' দাঁড়াইয়াছে। দুধ ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া ছানা নাম। কিন্তু সংস্কৃতে 'ছানা' অর্থবাচক 'ছিন্ন' বলিয়া কোন শব্দ নাই। সংস্কৃত 'ছিন্ন' শব্দের অর্থ 'ছেঁড়া' এবং দুধ ছিঁড়িয়া গিয়া ছানা হয় বলিয়াই আমরা সংস্কৃত 'ছিন্ন' শব্দকে এই অর্থে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি।

বাঙ্গালায় 'ছানা' শব্দে যে "শাবক" বুঝায় তাহারও মূলে ঐ সংস্কৃত 'ছিন্ন'

শব্দ। নাড়ী ছিন্ন করিয়াই শাবকেরা বাহির হয় বলিয়া এস্থলেও 'ছেনা' বা 'ছানা', বলে।

সংস্কৃতে ছানার অন্যতম নাম "কিলাট"।

নষ্ট দুগ্ধস্য পকস্য পিণ্ডঃপ্রোক্তঃ কিলাটকঃ।

"পক্ক নষ্ট দুগ্ধের পিণ্ডকে কিলাট বলে।" ছানা পিণ্ডাকৃতি হয় বলিয়াই উহার অন্যতম নাম কিলাট।

পক্কং দধ্না সমং ক্ষীরং বিজ্ঞেয়া দধিকূর্চিকা।
তক্রেণ তক্রকূর্চা স্যাত্তয়োঃ পিণ্ডঃ কিলাটকঃ॥

"দধির সহিত দুগ্ধ পক্ক হইলে যে ক্ষীরবিকার প্রস্তুত হয় তাহার নাম দধিকূর্চিকা এবং তক্রের সহিত পক্ক দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত পদার্থের নাম তক্রকূর্চা। তাহাদের উভয়ের পিণ্ডকেই কিলাট বলে।" শোষিত ক্ষীরপিণ্ডকেও 'কিলাট' বলে। অতএব দেখা যাইতেছে পিণ্ডীভূত দ্রব্যের সাধারণ নাম কিলাট। ইংরাজীতেও ইহার অনুরূপ শব্দ আমরা দেখিতে পাই। ইংরাজী 'ক্লট' (clot) শব্দে ঘনীভূত বা পিণ্ডীভূত হওয়া বুঝায়। দুগ্ধ পাক করিয়া পিণ্ডভাব প্রাপ্ত হইলে তাহাকে 'ক্লটেড ক্রীম' (clotted cream) ইংরাজীতে বলে। পাক বিষয়ে সুপণ্ডিত কোন সাহেবও 'ছানার' ইংরাজী নাম ডিভনশায়র ক্লটেড ক্রীম (devonshire clotted cream) বলিয়াছেন। এই ক্লট শব্দ ও কিলাট শব্দদ্বয় যে একই শব্দ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। খুব সম্ভবতঃ সংস্কৃত কিলাট শব্দ হইতে ইংরাজী 'ক্লট' (clot) শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। কিন্তু কিলাট শব্দেরও মূলে আমরা আরেকটী শব্দ দেখিতে পাই, যেটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। এই শব্দটী বেদমন্ত্রের 'কীলাল' শব্দ।

ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃন।

"অমৃত, ঘৃত, দুগ্ধ ও কীলাল (অন্নের মণ্ড) ইহারা অন্নরূপে পিতৃগণকে তৃপ্ত করুক" এই যজুর্ব্বেদোক্ত প্রসিদ্ধ মন্ত্রটীর বিনিয়োগ পিণ্ডপিতৃযজ্ঞে পিণ্ডসেচনে অর্থাৎ এই মন্ত্রে পিতৃদিগের পিণ্ডসিঞ্চন হয়। পিতৃপিণ্ডের জন্য অন্নমণ্ডকেই কীলাল বলে। এই বৈদিক 'কীলাল' শব্দের পরিণতিই 'কিলাট' বা 'কীলাট'। 'ডলয়োরভেদঃ' এই নিয়মানুসারে কীলাল হইতে 'কীলাড' হইয়াছে এবং কীলাড শব্দের 'কীলাট' বা কিলাট এ পরিণত হওয়া স্বাভাবিক

সন্দেশের উপকরণে এক ছানাই সর্ব্বস্ব। প্রায় দেখা যায় উপকরণের অথবা আহার প্রস্তুতপ্রণালীর অনুযায়ী নামে খাদ্য সামগ্রীর নাম হইয়া থাকে; কিন্তু সন্দেশের নাম সে কারণে হয় নাই।

বাঙ্গালার সর্ব্ব প্রধান মিষ্টান্ন সন্দেশ। এত দেশ থাকিতে এই মিষ্টান্নের সন্দেশ নাম হইতে গেল কেন? সন্দেশের প্রকৃত অর্থ খবর বা বার্ত্তা; বঙ্গে প্রধানতঃ এই মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়াই জ্ঞাতি কুটুম্বের খবর বা সন্দেশ লওয়া হইত বলিয়া ইহার সন্দেশ নাম হইয়াছে। জ্ঞাতি কুটুম্বের নিকট খাদ্যসামগ্রী পাঠাইলে তাহাকে 'তত্ত্ব পাঠান' বলে। জ্ঞাতি কুটুম্বের খবরাখবর লইতে গেলেই রিক্তহস্তে না করিয়া কিছু আহার সামগ্রী প্রেরণ করাই এ দেশের আচার সম্মত; তাই কুটুম্বের নিকট আহারাদি প্রেরণের নামই ক্রমে 'তত্ত্ব পাঠান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গে হিন্দুদিগের মধ্যে তত্ত্ব পাঠাইবার কালে সন্দেশ প্রেরণ করাই প্রচলিত প্রথা। তত্ত্ব বা তত্ত্বানুসন্ধান অথবা সন্দেশ অর্থাৎ খবর লইবার কালে যে মিষ্টান্ন প্রেরণ করা হয়, তাহারই নাম সন্দেশ। কিন্তু তত্ত্ব পাঠাইবার কালে প্রধানতঃ সন্দেশ প্রেরণের ব্যবস্থা হইল কেন? তাহার একটী কারণ বাঙ্গালীরা ছানা-প্রিয় এবং অপর কারণ ইতর জাতির স্পর্শেও সন্দেশে কোন দোষ নাই বলিয়া। মেঠাই প্রভৃতি অনেক মিষ্টান্নেই বেশন, চালের গুঁড়ি প্রভৃতি থাকায় উহা অন্নের সামিল বলিয়া ধরে। এই কারণে প্রকৃত অন্ন যেমন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির স্পর্শে হিন্দুদিগের অভোজ্য বলিয়া পরিগণিত, সেইরূপ বেশন, চালের গুঁড়িপ্রভৃতি যে সকল মিষ্টান্নে থাকে, তাহারাও সকলের হাতে খাইবার যোগ্য নহে বলিয়াই বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের বিশ্বাস। তাই সন্দেশের ন্যায় মিষ্টান্ন, যাহাতে চালের গুঁড়িপ্রভৃতির কোন সম্পর্ক নাই, যাহা সকলের হাতেই খাওয়া যায়, এইরূপ মিষ্টান্নের প্রেরণ সকলের পক্ষে বড় সুবিধাকর। অবশ্য এ প্রথা কেবল বঙ্গেই প্রচলিত অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই।

সন্দেশ এক প্রকার নয়, নানা প্রকারের হইয়া থাকে; কিন্তু জিনিষ প্রায়ই একই, অধিকাংশ সময়ে পার্থক্য কেবল আকৃতিতে অথবা দু একটু উপকরণের তারতম্যে। যেমন তালশাঁসের ন্যায় যে সন্দেশের গড়ন, তাহার নাম তালশাঁস-সন্দেশ, আমের ন্যায় গড়ন যাহার তাহার নাম আম-সন্দেশ।

যে সন্দেশ] চিনির পরিবর্ত্তে নূতন গুড়ের তৈয়ারী তাহার নাম নূতন গুড়ের সন্দেশ ইত্যাদি। লেচি সন্দেশ নামেরও কারণ লেচি বা নেচির অনুরূপ গড়ন। রুটী প্রভৃতি প্রস্তুত কালে থেশা ময়দা হইতে যে খণ্ড খণ্ড কাটা হয়, তাহাকেই 'নেচি' বা 'লেচি' বলে। লেচি শব্দ সংস্কৃত 'লোপ্‌ত্রী' শব্দের অপভ্রংশ (৩) 'লোপ্‌ত্রী' হইতে হিন্দুস্থানী ভাষায় 'লোথ্রা ও' 'লোই' এবং বাঙ্গালায় লেটি ও লেচি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জলপথে কাশী যাত্রা।

মঙ্গলে উষা বুধে পা
যেথা ইচ্ছা সেথা যা।

কলিকাতা হইতে কাশী পর্য্যন্ত ট্রেণের সাহায্যে দু এক দিনের মধ্যে যাত্রা করিয়া আমরা সহজে সুখ অনুভব করিতে পারি বটে, কিন্তু সপরিবারে আত্মীয় স্বজন সঙ্গে লইয়া কলিকাতা হইতে ষ্টীমার—নৌকাসহযোগে যাত্রা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ কাল বৈশাখের ঝড়ের সময়। সকলেই জানেন কাল বৈশাখের সময় বৈকালে প্রায়ই কিরূপ ঝড় ঝটিকা হয় এবং সমস্ত দিন প্রবল বাতাস বহিতে থাকে। এই সময় গৃহেতেই দুদ্দাড় করিয়া অনবরত দুয়ার জানালা পতনের যেরূপ উৎপাত আরম্ভ হয়, তাহাতে সহজেই বোঝা যায় যে নদীতে কত ভয় বিপদ। এই সময় গঙ্গার উপরে তরণী সমূহের তরঙ্গে তরঙ্গে উত্থান পতন নিয়তই দেখা যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের এই ঝড় ঝটিকার সময় জানিনা কেন, পিতৃদেব প্রকৃতির কি বিচিত্র ভাব অনুভব করিয়া বারানসী অঞ্চলে ট্রেণে করিয়া না গিয়া ভারতের পুণ্যস্মৃতিময়ী জাহ্নবী-বক্ষে নৌকা ভাসাইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন। উদ্যোগ

---

(৩) সংস্কৃত পাকশাস্ত্রে "লোপত্রী" অর্থাৎ 'লেচি' বেলন দ্বারা বলিবার কথা অনেক স্থলেই

আরম্ভ হইল, শ্যাম বাবু নামে আমাদের নিকট সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় ব্যক্তিকে ষ্টীমার, বজরা ও পান্সী প্রভৃতি ঠিক করিবার জন্য বলিলেন।

এক দিন সকালে দৌলত খাঁ নামে গঙ্গার এক ঘাটমাঝিকে সঙ্গে করিয়া শ্যাম বাবু উপস্থিত। ষ্টীমার সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা চলিল। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, জোব্বা-পরিবেষ্টিত বৃদ্ধ থুরথুরে ঘাটমাঝিটী ষ্টীমার সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে মৌলবীর ন্যায় দীর্ঘ শ্মশ্রু দোলাইতে দোলাইতে চলিয়া গেল।

এখন রীতিমত আয়োজন চলিতে আরম্ভ হইল; আজ ষ্টীমারের সারেঙ্গ আসিতেছে, আজ টাণ্ডেল আসিতেছে, আজ কালাচাঁদ মাঝি আসিতেছে। আমরা বাড়ীর দক্ষিণ বারান্দায় পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়িতেছি, বাতাস হুহু স্বরে স্রোতের মত বহমান হইয়া যাইতেছে,—একটু অন্যমনস্ক হইলেই ব'য়ের পাতা উড়িয়া যায়, লিখিবার কাগজ উড়িয়া যায়,—কিন্তু অন্যমনস্ক না হইয়া যাইতে পারিতেছি না, মাঝি মাল্লা, খালাসীদের কথাবর্ত্তা শুনিবার জন্য সততই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছি। প্রাতঃকালের বাতাসে তরুপত্ররাজি মর্ম্মর মধুর ধ্বনি করিতেছে; দক্ষিণ দিকের পুষ্করিণীতে হাঁসগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে; ষ্টীমারে যাইবার কথা শুনিয়া আমাদের মন আনন্দে নৃত্য করিতেছে। কত লোক আনাগোনা করিতেছে, কি বলিতেছে সকলই আমরা আগ্রহসহকারে শুনিতেছি। ঝটিকার কালে জলপথে যাত্রা যে কি ভয়াবহ তাহা আমরা পূর্ব্বেই রবিনসন্ ক্রুসো পাঠ করিয়া অনুভব করিয়াছিলাম। রবিন্সন্ ক্রুসোর বিচিত্র কল্পনা আমাদিগের মনকে বিক্রীড়িত করিয়াছিল। সমুদ্রের তুলনায় গঙ্গা যদিও কিছু নয়, কিন্তু তবুও ঝটিকার কালে ভাসমান ক্ষুদ্রপোতে অবস্থান করা বড় কম আশঙ্কাজনক নহে। বৃদ্ধদের মুখে শুনা যায়, যে বিখ্যাত আশ্বিনের ঝড়ে গঙ্গায় লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোতও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

দিন কয়েকের মধ্যেই ঘাটমাঝি দৌলৎ খাঁ সন্ধান আনিল, যে আপকার কোম্পানী একটী ষ্টীমার বিক্রয় করিতেছে;—সেইটাই কেনা হইল। তাহার নাম রুবি (Ruby)। এখন পান্সী, ভাউলে ও আর কি কি ভাড়া করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই কুষ্টিয়া হইতে আমাদের

বজরা আসিয়াছে ; কেবল ভাড়া করা হইল একটী বড় পান্সী ও আরেকটী এক কামরা ছোট বোট। এই পান্সীতেই আমাদের রন্ধনকার্য্য চলিত।

পিতৃদেব কাকামহাশয়কে সঙ্গে লইয়া এই ষ্টীমার করিয়াই ফরাশডাঙ্গায় দাদামহাশয়ের কাছে দেখা করিতে গেলেন এবং সেই সঙ্গে পশ্চিম যাইতেছেন, ইহাও তাঁহাকে জানাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মোট কথা ২৫এ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে এক রকম বন্দোবস্ত হইয়া গেল। ষ্টীমারের সমস্ত খালাসী এবং বজরার সমস্ত দাঁড়ি মাঝিদের কাছ থেকে এক এক ষ্ট্যাম্প দিয়া এগ্রিমেণ্ট লওয়া হইল, যে, যে পর্য্যন্ত না আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসি, কেহ পলাইতে পারিবে না। এবং সেই অনুসারে তাহাদের কতকটা করিয়া অগ্রিম বেতনও দেওয়া হইল।

এইবারে খাবার দাবারের সরঞ্জাম সংগ্রহ ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা বিদ্যালয় থেকে আসিয়া দেখিতাম চাল, ডাল, ময়দা, চিনি ও মসলা প্রভৃতি বস্তাতে পুরিয়া সেলাই করান হইতেছে, কোন দিন বা পাচক ব্রাহ্মণ আসিয়া, মাটীর হাঁড়ি, কড়া, খুন্তী, বেড়ী প্রভৃতি গুছাইয়া লইতেছে, কোন দিন বা টিনের কৌটাবদ্ধ মাছ, তরী তরকারী, দুধ প্রভৃতি বিলাতী সামগ্রী পেঁটরায় পোরা হইতেছে ; এ সকল সামগ্রী বেড়াইতে যাইবার সময় সঙ্গে থাকা বিশেষ আবশ্যক, কারণ নদীতে গেলে কখন কি পাওয়া যায় তাহার ত ঠিক নাই ; কিছু না পাওয়া গেলে এই টিনের মাছ এই টিনের তরকারীতে অন্ততঃ কোন প্রকারে খাওয়া চলে। টাটকা দুধের অভাবে বিলাতী 'টিনের দুধ'ও খাওয়া যেতে পারে। টিনের দুধ দিয়ে চা বা কোকো বেশ খাওয়া চলে। আমাদের সঙ্গে দু জন সূপকার গিয়াছিল, একজন জাতিতে ব্রাহ্মণ, অপরটী যদিও জাতিতে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের অপেক্ষা রাঁধিতে জানিত ভাল, ইহার নাম ছিল নবীন। নবীন চপ, কাটলেট প্রভৃতি বিলাতী রান্নায় দক্ষহস্ত ছিল। নবীন সূপকার আসিয়া তাহার রাঁধিবার যত কলাই করা পাত্র এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় সরঞ্জাম ঠিক করিয়া লইল।

এই প্রকারে একে একে যত আহার্য্য দ্রব্য ও কাপড় প্রভৃতি ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্যাক হইয়া গেলে, ২৮ শে ২৯ শে হইতেই একে একে সমস্ত জিনিষ পত্র ষ্টীমারে ও নৌকায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কেবল যেগুলি নিতান্ত আমাদের সঙ্গে থাকা দরকার, সেইগুলিই পরে আমাদের সঙ্গে যাইবে বলিয়া রহিয়া গেল।

ঘরগুলা যেন কেমন খালি খালি মনে হইতে লাগিল ; এতদিন এই বাড়ী ছাড়িবার জন্য কতই না মনের আনন্দ হইয়াছে কিন্তু এখন যেন ওরই মধ্যে একটু বাড়ীর জন্য মায়া করিতে লাগিল।

এখন শ্যাম বাবুর আহ্লাদ দেখে কে! যে দিন থেকে জিনিষ পত্র চালান যাইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন থেকেই শ্যামবাবু ষ্টীমারে গিয়া রীতিমত আড্ডা বসাইয়াছেন। শ্যামবাবু লোকটী বেশ খোলা খালা মোটা সোটা মানুষটী, শুভ্র শ্মশ্রুরাজি তাঁহার মুখে গাম্ভীর্য্য ফুটাইয়া তুলিত। সহসা দেখিলে তাঁহাকে গম্ভীর প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত তাহা নয়। ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে শ্যাম বাবু যেমন ভাল বাসিতেন এমন আর কাহাকেও সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু আবার এদিকে সকল কাজেই শ্যাম বাবুকে চাই। শ্যাম বাবু হাঁক ডাক ধমক ধামক না দিলে যেন বোধ হইত কাজটী ঠিক করান হইতেছে না। এরকম সেকেলে লোক বোধকরি একালে দুর্লভ ; ছেলেদের মধ্যে যে সব চেয়ে দুর্ব্বল তার পক্ষ লইতেন শ্যাম বাবু,—তাহার পক্ষ লইয়া তিনি অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে লড়াই করিতেন, শ্যাম বাবু যাহার দলে তাহারি জিত হইত। ষ্টীমারের উপরে শুভ্র শ্মশ্রুবিলম্বিত মুখে বসিয়া যখন তিনি খালাসী ও মাঝি মাল্লাদের উপর হুকুম জারী করিতেন, তখন তাঁহাকে দ্বিতীয় কাপ্তেন বলিয়া মনে হইত। খালাসীরা তাঁহাকে কাপ্তেন সাহেব বলিয়াই ডাকিত। গলার জোরে তিনি কাজ সাফাই করিতে অদ্বিতীয় ছিলেন।

আজকের রাত্রিটা কাটিলেই কাল আমরা বোটে উঠিব, মনে বেশ একটু আনন্দ হইতেছে, আত্মীয় স্বজনেরা অনেকে দেখা করিতে আসিয়াছেন। আমরা আপনার জিনিষটা এটা সেটা বইটী, কলমটী, দোয়াতটী সব এক একটী ছোট বাক্সতে গোছাইতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অন্য দিন পড়িবার কালে বড়ই ঘুম পাইত, আজ ছুটী, পণ্ডিত ও মাষ্টার মহাশয় আসেন নাই। আজ ঘুমেরও দেখা নাই। যতক্ষণ না দশটার ঘণ্টা বাজিল, ততক্ষণ ঘুমের সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না।

শ্যাম বাবু পঞ্জিকা দেখিয়া আজিকার দিন যাত্রার জন্য শুভ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। একে জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি তায় আবার বুধবার, পঞ্জিকার মতে হউক বা না হউক শ্যাম বাবুর মতে দিনটা খুব শুভ। আজ আমাদের

যাত্রা স্থির। পাছে তাঁহার কথায় আমাদের কিছু সন্দেহ হয় তাই একটী খনার বচন আওড়াইয়া তাহার মূলেই কুঠারাঘাত করিলেন। সেই অবধি আমরা বচনটী শিখিয়া রাখিয়াছি।

"মঙ্গলে উষা বুধে পা
যেথা ইচ্ছা সেথা যা"

আমরা রোজ যেমন ভোরে উঠিয়া বাগানে যাই আজ তেমনি গেছি। বাগানে বড় বড় বেল ফুটিয়া আছে, দক্ষিণের বাতাসে ফুলের গন্ধ সেবন করিতে করিতে কেমন প্রফুল্ল মনে আমরা এদিক ওদিক বেড়াইতেছি, কেহ বা আম-গাছের তলায় আম কুড়াইতেছি, কেহ বা ফুল তুলিতেছি, কেহ বা দৌড়া-দৌড়ি করিতেছি, এই জ্যৈষ্ঠ মাসে সকল গাছগুলিই প্রায় ফলভারে অবনত। ক্রমে পত্রাবলীর ফাঁক দিয়া সহস্র রশ্মির শুভদৃষ্টি দেখিয়া আমরা বাগান হইতে চলিয়া আসিলাম; গৃহে আসিয়া দেখি কাকাতুয়াটী চীৎকার করিতেছে; ইনিও আমাদের সহযাত্রীর মধ্যে এক জন, ইঁহারও বোধ হয় কাশী যাবার নামে আনন্দ হইয়াছে তাই এত চিৎকার আরম্ভ করিয়াছেন।

বাগান হইতে আসিয়া দেখি যে বিছানাদি যেসব জিনিষ আমাদের সঙ্গে যাইবে সে সকল বাধা হইতেছে। আমরা স্নান আহারাদি সমাপন করিয়া, পোষাক পরিধান করিয়া দুইটার মধ্যে সকলেই প্রস্তুত হইয়া রহিলাম; এখন গাড়ীতে চড়িবার বিলম্ব টুকুও যেন সহ্য হইতেছেনা, মনে হইতেছে যে কখন গিয়া নৌকায় উঠিতে পারিব।

তিনটাও বাজিল আর আমরা সকলের নিকট বিদায় লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম; গরুর গাড়ীতে জিনিষ পত্র তুলিয়া দেওয়া হইল, জগন্নাথের ঘাটের নিকট আমাদের গাড়ী আসিয়া থামিল। এখানে আসিয়া দেখি এখনও বজরা আসে নাই, বজরা খানিকটা দূরে চাঁদ পালের ঘাটের * কাছে আছে, কেবল পান্সিটা আর ছোট বোটটা ঘাটে রহিয়াছে। বড় বজরার অন্বেষণে তখনি একজন লোক পাঠান গেল। রৌদ্রের তাতে আমরা গাড়ীতে বসিয়া একটু অস্থির হইয়া

* চাঁদপালের ঘাট চাঁদপাল মুদির নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! এত বড় বড় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এত বুদ্ধি খাটাইয়া যে নাম কিনিতে না পারেন, চাঁদপাল মুদি চার পয়সার [illegible] বেচিয়া সেই নাম রাখিয়া গেল।

উঠিয়াছি। গাড়ী থেকে দেখিতে পাইতেছি গঙ্গার মাঝ দিয়া এক একটী ষ্টীমার হংসীর মত হুস হুস শব্দে ছুটিয়া যাইতেছে আর তাহারি ঢেউ লাগিয়া তীরস্থ নৌকাগুলি ঈষৎ কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে আমাদেরও বজরা দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে ঘাটে আসিয়া হাজির হইল। বজরা ঘাটে লাগাইলে পর শ্যামবাবু নামিয়া কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন। বলিলেন 'তোমরা যে এখানে আসিয়া গাড়ী থামাইবে তা আর আমি কি করিয়া জানিব'। আমরা গাড়ী হইতে নামিলাম, বজরার কালাচাঁদ মাঝি আসিয়া পিতৃদেবকে ও কাকা মহাশয়কে লম্বা চওড়া দুই মস্ত প্রণাম ঠুকিয়া বজরা হইতে একটী কাঠের তক্তা পাতিয়া দিল। প্রথমে কাকিমাতা ও মাতাঠাকুরাণী উঠিলেন। পরে আমরা অতি সন্তর্পণে কাঠের সিঁড়িতে আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া সকলে বজরাতে উঠিলাম। এখন বন্দোবস্তের গোছাইবার ভার শ্যামবাবুর উপর। তিনি হাঁকডাক করিয়া ধমক ধামক দিয়া বজরায় জিনিষ পত্তর সব তোলাইতে লাগাইলেন। পান্‌সীতে রামেশ্বর ঠাকুর পাচকের সমস্ত সরঞ্জাম গুছাইয়া দিলেন; একজন চাকর ও দাসীও পান্সীতে উঠিল। এই সঙ্গে তৃণাদি লইয়া একটি অজা পান্সীতে উঠিলেন। এই অজাটির গুণ অনেক; খাইতেন যে খুব বেশী তাহা নয় কিন্তু দুধ দিতে গরুর মত। প্রতিদিন একবারে আড়াইসের ঠিক দুধ দিত, এই ছাগলটীর জন্মভূমি রাজসাহী জেলা। ইহাকে আমরা 'রাঙ্গী' বলিয়া ডাকিতাম।— অন্যান্য চাকর দাসীরা ছোট বোটটাতে উঠিল। আমাদের যে সব জিনিষ ততটা দরকারী নয় সে গুলিও ছোট বোটটাতে স্থান পাইল। শ্যামবাবু এবং কর্ম্মচারী ব বাবু চামরু শিকারীকে সঙ্গে লইয়া আমাদের বজরায় উঠিলেন, চামরু শিকারী সঙ্গে বন্দুক ও তলোয়ার প্রভৃতি সরঞ্জম লইয়া উঠিল। চামরু জাতিতে সাঁওতাল কিন্তু এদেশে থাকিয়া থাকিয়া এক প্রকার বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছে; সে একজন দক্ষ শিকারী, অনেকগুলি ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছিল, আমরা উহাকে শিকারী বলিয়াই ডাকি। এইবারে মুটে মজুরকে প্রাপ্য দিয়া বজরা ছাড়িয়া দিল, আটজন দাঁড়ি দাঁড় টানিতে লাগিল। বজরা একে উহার উদরে ষ্টীমারের কয়লা পুরিয়া লইয়াছে তাহার উপর আবার আমাদের দ্রব্যাদি দ্বারা ভারাক্রান্ত, কাজেই মন্থর গমনা বজরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

জোয়ার আসিয়াছে, গঙ্গা জলে টলটল করিতেছে, চারিদিকের নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছে, আমাদের বজরা দেখিতে দেখিতে ষ্টীমারের পাশে আসিতে লাগিল, ষ্টীমার মাঝ গঙ্গায় তখন ফোঁস ফোঁস শব্দে অগ্নিশ্বাস ছাড়িতেছিল। ষ্টীমারের পার্শ্বে আমাদের নৌকা বাঁধিয়া দিল। বজরা হইতে কতকগুলা জিনিষ ষ্টীমারে পাঠাইয়া উহার ভার লাঘব করা হইল শ্যাম বাবু ও কর্ম্মচারী ব বাবু ষ্টীমারে উঠিলেন। সারেঙ্গ বলিল, যে ষ্টীমারের পশ্চাতে বজরা ও পান্সী বাধিয়া দিলে সহজে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবে; বজরা ষ্টীমারের পশ্চাতে বাধা হইবে শুনিয়া কাকীমাতা আর কাকামহাশয় সত্বর ষ্টীমারে গেলেন। অদ্যকার মত আমরা বজরাতেই রহিলাম। বজরা, পান্সী ও ছোট বোট লইয়া চারিটী জলযান সারি সারি একই শৃঙ্খলে বাধা হইয়া রহিল। এইবারে ষ্টীমারের নঙ্গর উঠাইবে।' খালাসীরা 'টানো জোসে' 'সাবাস জোয়ান' বলিয়া ঘড় ঘড় শব্দে নঙ্গর উঠাইতে লাগিল। নঙ্গর উঠান হইয়া গেলে, দূর দূরান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া বাঁশী বাজিয়া উঠিল, যেন একবার বিরহের সুরে বলিয়া গেল বিদেশ চলিলাম।—
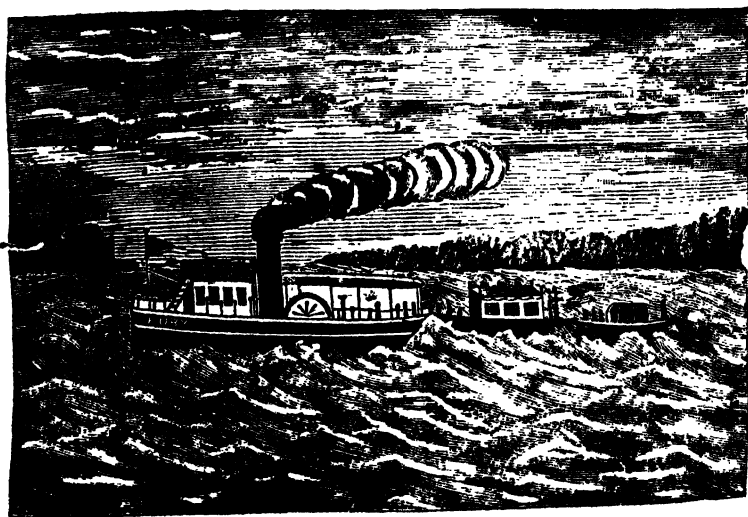
এখন প্রকৃত পক্ষে আমরা কলিকাতা ছাড়িয়া চলিলাম। পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, বেলা পড়িয়া যায় যায় হইয়াছে,—রুবি তিনটী সারি গাঁথা নৌকা

গঙ্গার জলে শরীরের রোমাঞ্চ উঠিতে লাগিল। শাদা শাদা মেঘ গুলি সান্ধ্য বায়ু সেবন করিতে করিতে যেন এক একবার আমাদিগের পানে কটাক্ষপাত করিবার জন্য সলজ্জা যুবতীর মত সসম্ভ্রমে থমকিয়া দাঁড়াইতেছিল। কলিকাতার পরপারে আসিলেই যেন প্রাণে কেমন একটু পল্লীগ্রামের শীতল ছায়া আসিয়া পড়ে।

এখন সহরের সে কোলাহল শোনা যাইতেছে না, গাড়ির গড় গড় শব্দ থামিয়া গেছে, লোক জনের সে সমাগম নাই। কলিকাতা ছাড়াইয়া যতই অগ্রসর হই, ততই নির্জন ও নিরিবিলি ভাব হৃদয় ছাইয়া ফেলে। কলিকাতার বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাগুলা রাক্ষসের ন্যায় আমাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে। সেখান হইতে উদ্ধার পাইয়া যেন প্রকৃতিমাতার শ্যামল স্নিগ্ধ মুখ দেখিতে পাই। কোথাও বা নিভৃত নিকুঞ্জ কুটীর, কোথাও বা বনের মত গাছের পর গাছ, মধ্যে দুই একটী কল শুঁড় তুলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে। এ সকল যে বিশেষ কিছু নূতন তাহা নয় কিন্তু কলিকাতার তুলনায়, অনেকটা শান্ত ভাব পূর্ণ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গঙ্গার স্নেহের আহ্বান মধুর কল্লোল ধ্বনি শুনিলে যথার্থ তাপিত প্রাণ শীতল হয়।

এখন সূর্য্য গঙ্গার জলে প্রায় ডুবো ডুবো হইযাছে, বোধ হইতে লাগিল যেন সূর্য্যদেব গৈরিক বসন পরিয়া সান্ধ্যস্নান করিতে গঙ্গায় নামিয়াছেন; সন্ধ্যার রঙ্গে গঙ্গার জল রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে; ঠিক এই সময়ে আমাদের অগ্নিপোত নৌকার সারি টানিয়া সালিকাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ এখানেই আমরা নঙ্গর করিলাম।

আজ চতুর্দ্দশী, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ চন্দ্র উঠিয়াছে, সমীরণে তরঙ্গ গুলি টল টল নৃত্য করিতেছে। জ্যোৎস্নার চুম্বনে সকলই পুলকিত, পশ্চিমে মেঘের রেখা চক চক করিতেছে, বাতাসে গাছ গুলি ঝির ঝির করিতেছে যেদিকে চাহিয়া দেখি, যেন মনে হয় ধরণী জ্যোৎস্নারূপ মাতৃস্নেহ পানে বিভোর। আমরা এসময়ে বজরায় এক কামরায় বসিয়া গল্প স্বল্প করিতেছি, কেহ কেহ বা প্রকৃতির শোভা দেখিতেই মগ্ন। আমরা এমন মধুরক্ষণে স্বপ্নেও কেহ একটুও বিপদের আশঙ্কা করি নাই, কিন্তু এদিকে দূরে মেঘের রজত রেখা ক্রমশঃই কাল হইয়া আসিতেছে। মেঘ যত ঘনাইয়া আসিতেছে বাতাস

ততই নিস্তব্ধ আকার ধারণ করিতেছে। চাঁদ ঢাকিয়া গেল বৈ আর দেরী নাই। অল্প অল্প ঝোড়ো বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল, রাহুর ন্যায় নিবিড় মেঘ আসিয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিল। আবদুল সারেঙ্গ ক্রমেই মেঘ ঘনাইয়া আসিতে দেখিয়া বলিল 'এরকম প্রশস্ত খোলা স্থানে এক সঙ্গে তিন চার খানি নৌকা থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা, ভাল স্থান দেখিয়া রাখিতে হইবে'।

সালিকার ঘাট হইতে ঘুষড়ির ট্যাঁক পোয়াটাক দূর; ষ্টীমার বজরাকে টানিয়া কিছু ক্ষণের মধ্যে ঘুষড়ির ট্যাঁকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ট্যাঁকে লইয়া যাওয়া এই কারণে নিরাপদ, যে ঝড়ের বেগ প্রায় প্রশস্ত নদীর উপরেই বেশী লাগে। বাতাস স্বভাবতঃ সোজা একটানা ভাবে প্রবাহিত হয়, এই জন্য নদীর যে স্থানটা একটু বাঁকিয়া কোলের মত হইয়া যায়, সে স্থানে ততটা ঝড় লাগে না। পান্সী ও ছোট বোটটা তীরে গিয়া লাগাইল, এবং বজরা-ও ষ্টীমার কিনারা হইতে একটু দূরে গভীর জলে পাশাপাশি বাঁধা থাকিয়া নঙ্গর করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। ঘুষড়ির ট্যাঁকে পৌছাইয়া সমস্ত ঠিক ঠাক করিতে না করিতে, বাতাসের জোর বাড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ কল্লোল ফেনাইয়া উঠিল। বজরার জানালা দরজা কিছুই বন্ধ হয় নাই; বিছানা চাদর সব উড়িয়া যাইতে লাগিল।—যে যেদিকে পারিল, জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া পড়িল; কিন্তু এদিকে এক মহা বিপদ ঘটিয়াছে তাড়াতাড়ি করিয়া যেমন দাঁড়ি ও খালাসীরা নঙ্গর ফেলিতে যাইবে আর কেমন করিয়া বজরার ও ষ্টীমারের নঙ্গরের শিকলে শিকলে জড়াইয়া গিয়াছে। খালাসীরা দিতেছে দাঁড়িদের নামে দোষ, দাঁড়িরা বলিতেছে খালাসীদেরই সমস্ত দোষ, কিন্তু কাহারো বুদ্ধি আসিতেছে না এ বিপদের প্রতিকার হইতে পারে কি উপায়ে। ঝড় বৃষ্টি সবেগে চলিয়াছে। এমন সময়ে পিতা সারেঙ্গকে ডাকিয়া দুই নঙ্গরই এক সঙ্গে উঠাইতে বলিলেন; তাঁহার কথা মত, যত খালাসী ও দাঁড়ি ছিল সকলে মিলিয়া নঙ্গর উঠাইতে লাগিল। প্রবল ঝটিকার মাঝে খালাসীদের হল্লাধ্বনি উঠিতে লাগিল, আমরা সকলেই বিপদের কাণ্ডারী ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম, ভগবানের নামে দেবতার প্রসাদ আসিল।—রাত্রি যখন নয়টা তখন আমাদের নঙ্গর উঠিয়া আসিল। সেই সন্ধ্যা সাতটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত দারুণ ঝড়ের মাঝে খালাসীরা নঙ্গর লইয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত

টানাটানি করিয়া তবে তুলিয়াছে। ঝড়ের সময় নঙ্গর উঠান কি সহজ, একে বাতাসের বেগ তায় জলের ভীষণ উন্মাদ নৃত্য, তাহার উপর আবার দুই নঙ্গরে জড়াজড়ি হইয়া গেছে। অন্য সময়ে নঙ্গর উঠাইতে যতটা বলের দরকার এ সময়ে তাহাপেক্ষা তিন গুণ বল প্রয়োগ আবশ্যক। আমাদেরও নঙ্গর উঠিয়া গেল আর কিছু পরে দেখিতে দেখিতে ঝড় বৃষ্টিও একেবারে কমিয়া আসিল; বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের কালে ঝড় এইরূপই হইয়া থাকে। সাড়ে নয়টার পর ফুর ফুর করিয়া অল্প অল্প ঠাণ্ডা দক্ষিণে বাতাস বহিতে লাগিল। এখন আর ষ্টীমার ও বজরা এক সঙ্গে বাঁধা রহিল না, ষ্টীমার নঙ্গর ফেলিয়া মাঝ গঙ্গায় ঝক ঝকে চন্দ্রালোকে স্থির হইয়া রহিল এবং বজরা কিনারায় লাগাইল।

এখনো আমাদের খাওয়া দাওয়া হয় নাই। আজ আমাদের পান্সীতে কিছুই রসুই হয় নাই। বাড়ী হইতে কিছু খাবার প্রস্তুত করিয়া আনা হইয়াছিল আর নবীন সূপকার ষ্টিমারে কিছু রাঁধিয়া রাখিয়াছিল, আজকের মত এক রকম তাহাই খাওয়া চলিবে। গোছাইয়া ঠিক ঠাক করিয়া খাবার আনিতে রাত দশটা বাজিলে, আমরা খাইতে বসিলাম; আমাদের খাইতে দেখিয়া ব্ল্যাকি কুকুরটাও * বেঞ্চির তলা হইতে গা ঝাড়া দিয়া চারিদিকে ল্যাজ নাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই রকম গল্পে স্বল্পে আহার করিয়া যখন শুইতে গেলাম তখন রাত বারটা।

---

* কাশী যাত্রায় কাকা মহাশয়ের ব্ল্যাকী নামক কুকুরটাও আমাদের সাথী ছিল। কুকুরটী নিউ

বঙ্গ প্রাকৃত।

গুলা ও গুলি।—বঙ্গ প্রাকৃত 'গুলা' বা 'গুলি' শব্দ অনেকার্থবাচক, এবং কোন একটী শব্দের শেষে যুক্ত হইয়া ইহারা ব্যবহৃত হয়, যথা, জিনিষ গুলা, লোক গুলা ইত্যাদি। এই 'গুলা' বা 'গুলি' শব্দ সংস্কৃত 'গণ শব্দ হইতে আসিয়াছে, এই কারণে আমরা মুখের ভাষায় 'গুলি' বা 'গুলা' না বলিয়া 'গুণি' বা 'গুণা' বলিয়া থাকি ; অনেকে 'গণা'ও বলিয়া থাকেন। যথা জিনিষগুণা বা জিনিষগুণি অথবা জিনিষ গণা ইত্যাদি। সংস্কৃত 'গণ' শব্দ হইতে 'গুণা' বা 'গণা' এবং পরে 'ণ' 'ল' হইয়া 'গুলা'য় দাঁড়াইয়াছে, যেমন "নম্ভ" কে লস্য বলে। সংস্কৃত 'গণ' শব্দ, বহু অর্থবাচক শব্দ, যথা প্রমথ গণ ; দেবগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ, পিশাচগণ ইত্যাদি। কিন্তু প্রাকৃত 'গুলা' শব্দ সংস্কৃত 'গণ' শব্দের গাম্ভীর্য্য হারাইয়াছে। প্রাকৃত 'গুলা' 'গণ' অপেক্ষা অনেকটা হীনার্থবাচক বা অশ্রদ্ধা ব্যঞ্জক হইয়া পড়িয়াছে, আমরা "দেবগুলা" বলিলে দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। সচরাচর ক্ষুদ্র বা অশ্রদ্ধেয় পদার্থের উল্লেখকালেই "গুলা" ব্যবহৃত হয়। 'গুলি' উহারই মধ্যে একটু কোমল প্রাণ, স্নেহ বা আদর ব্যঞ্জক।

গুণ ছুঁচ—সকলেই জানেন বোধ করি 'সূচী' হইতে 'ছুঁচ' আসিয়াছে ; কিন্তু 'গুন্' আসিল কোথা হইতে ? সংস্কৃত 'গোণী' অর্থে থলিয়া। এই 'গোণী' শব্দ হইতে 'গুণ' আসিয়াছে। চামড়ার থলিয়াকে সংস্কৃতে 'চর্ম্মগোণী' বলে।

বঙ্গ-প্রাকৃতে দ্বিরুক্তি—আমরা সচরাচর মুখে কথা কহিবার সময় একটী কথা দুইবার করিয়া বলিয়া থাকি, কিন্তু সে সময়ে শব্দের প্রথম অক্ষরটী পরিবর্ত্তন করিয়া বলি, যথা "জিনিষ টিনিষ" 'বই টই' বা 'বই ফই' ইত্যাদি। দ্বিরুক্তির কালে পরিবর্ত্তিত অক্ষরটী কখনো টবর্গের হয়, কখনো পবর্গের হয়। টিনিষ-এর বেলায় জ'র স্থানে 'ট' হইল 'বই ফই' এর বেলায় 'ব' 'ফ' হইল। দ্বিরুক্তিতে অক্ষরটী পরিবর্ত্তিত হইয়া 'ফ' হইলে যেন একটু ঘৃণা বা অবজ্ঞাসূচক ভাব ব্যক্ত করে, যেমন আমরা বলি "বই ফই গুলা ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও"। আমরা যেমন "চাকর টাকর", "রান্না টান্না" বলি সেইরূপ "চাকর বাকর" "রান্না বান্না" ও বলিয়া থাকি। কিন্তু "খাবার দাবার" এর বেলায় নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়—এস্থলে আদ্যক্ষর "খ"র পরিবর্ত্তে তবর্গের 'দ' হইয়াছে, তাই বলিয়া "খাবার টাবার" ও যে না বলি তাহা নহে।

দেশীয় চিত্রের বর্ত্তমান অবস্থা।
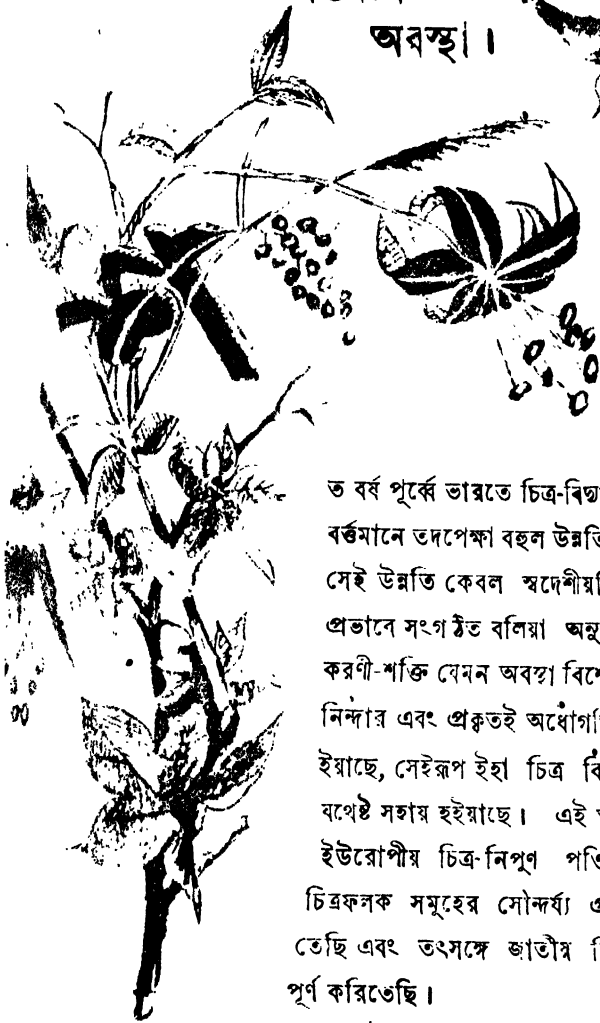
ত বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে চিত্র-বিদ্যার যেরূপ অনুশীলন
বর্ত্তমানে তদপেক্ষা বহুল উন্নতির চিহ্ন দেখা যাইতে
সেই উন্নতি কেবল স্বদেশীয়দিগের অনুকরণশীল
প্রভাবে সংগঠিত বলিয়া অনুমিত হয়। এই অ
করণী-শক্তি যেমন অবস্থা বিশেষে আমাদিগের জা
নিন্দার এবং প্রকৃতই অধোগতির কারণ হইয়া দাঁ
ইয়াছে, সেইরূপ ইহা চিত্র বিষয়ে আমাদের উন্ন
যথেষ্ট সহায় হইয়াছে। এই অনুকরণ ফলেই আ
ইউরোপীয় চিত্র-নিপুণ পণ্ডিতগণের জগৎবিখ
চিত্রফলক সমূহের সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিতে পা
তেছি এবং তৎসঙ্গে জাতীয় চিত্রভাণ্ডার ধীরে ধী
পূর্ণ করিতেছি।

আমার এই সকল কথায় কেহ যেন এরূপ মনে না ক
যে পুরাকালে ভারতভূমিতে চিত্রকুশল পণ্ডিতের অভ
ছিল। যদি কেহ ইলোরা, এলিফান্টা, অজন্তা, লেনা প্রভৃ

তখোদিত গুহাসমূহ দর্শন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি সহজেই বুঝিতে
রবেন যে প্রাচীন মহাত্মাগণ ভারতমাতাকে শিল্পজগতে কিরূপ উচ্চ সিংহা-
স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান জগতের সেই উচ্চ সিংহাসন অধি-
করা এখনও বহুকালসাপেক্ষ। মহারাজ অশোকের অধ্যবসায় ও উৎসাহ
াই ভারতের প্রাচীন গোরব এখনও স্থানে স্থানে দেদীপ্যমান রহিয়াছে
। যায়। কিন্তু হায়! আমাদের সে শিক্ষা, সে উৎসাহ এখন কোথায়!
। আমরা চিত্রবিষয়ে শিক্ষালাভের প্রত্যাশায় বিদেশীয়ের নিকটে হস্ত
ইয়া বসিয়া আছি। সামান্য যাহা কিছু ভিক্ষাস্বরূপে প্রাপ্ত হইতেছি.
। প্রাচীন চিত্রবিদ্যার তুলনায় যৎসামান্য হইলেও আমরা তাহাতেই যথেষ্ট
তৃপ্ত বোধ করিতেছি!

বিদেশীয় চিত্রের অনুকরণে আমাদের চিত্রবিদ্যার যে কোন প্রকার উন্নতি
নাই তাহা নহে—প্রত্যুত ইহা সত্য যে কিছু উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু অপর
ক এই অনুকরণ আমাদের অঙ্কিত চিত্রে বিদেশীয় ভাব অধিকতর প্রবেশ
ইয়া দিয়া অনেকটা অবনতিরও কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে আমা
স্বদেশীয় চিত্রশিল্পীদিগের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যাহাতে এই অবনতি প্রতি-
হয়। সামান্য আলোচনাতেই বেশ উপলব্ধ হইবে যে বিদেশীয় এবং
য় সৌন্দর্য্য বোধের মধ্যে কোথাও সম্পূর্ণ ঐক্য হইতে পারে না। যদি
ন ইউরোপীয় চিত্রকর তাঁহার অঙ্কিত কোন রমণী মূর্ত্তিতে ভারতীয় বেশ,
। হস্তে শঙ্খ এবং সীমন্তে সিন্দুর আরোপিত করিয়া তাহাকে "ক্লিওপেট্রা"
। অভিহিত করেন তাহা হইলে তাঁহার সেই অপূর্ব্ব "ক্লিওপেট্রা" দেখিয়া
। করি কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবে না। দেশীয় চিত্রের এখন
এইরূপই অবস্থা ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে স্বদেশীয়দিগের অঙ্কিত হিন্দু দেব-
ার প্রতিমূর্ত্তি সকল দেখিলেই আমার এই কথাগুলির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন
ব। সকল গুলিই এক অপূর্ব্ব ছাঁচে অঙ্কিত হইতেছে। মেনকার কর্ণে
তী ইয়ারিং, সরস্বতীর গাত্রে মুসলমানী ধরণের হাত কাটা জ্যাকেট এবং
নী ধরণের সাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চিত্র বিজাতীয় রুচির
ধিপত্য কেমন সুন্দর প্রকাশ করিতেছে। এইরূপ বিদেশীয় ভাব ও ছাঁচ
ায় চিত্রগুলিকে এক প্রকার কিম্ভূত কিমাকার করিয়া তুলিতেছে। যে

কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিলাম তাহা নিতান্ত স্থূল দৃষ্টি ব্যক্তিরও চক্ষে পড়িতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে আরও নানাবিধ বিদেশীয় ভাবের আধিপত্য লক্ষিত হইতে পারে। একেতো কাল মহিমায় বিদেশীয় প্রভাব অপ্রতিহত স্রোতে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উপর অনেক নিপুণ-হস্ত দেশীয় চিত্রকর দেশীয় চিত্র অপেক্ষা বিদেশীয় চিত্র অঙ্কনেই অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইহাতে আমাদের দেশীয় চিত্রের উন্নতি আশা সুদূর পরাহত বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহাদের সেই আগ্রহ দেশীয় চিত্রের চর্চ্চায় নিযুক্ত হইলে কত না আশা করা যায়।

বলা বাহুল্য যে আমাদের পক্ষে বিদেশীয় অপেক্ষা দেশীয় চিত্রের অনুশীলন অধিকতর আদরণীয়। অনুশীলন অভাবে দেশীয় চিত্রের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই নির্বাণপ্রায় গুণগ্রাহিতা যত দিন না আমাদের হৃদয়ে চর্চ্চাগুণে পুনরায় বদ্ধমূল হয়, তত দিন আমাদিগের পক্ষে দেশীয় চিত্র সকলের সৌন্দর্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। আমাদের নিজের হৃদয় দিয়া যাহা সংগঠিত তাহারই যখন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না, তখন বিদেশীয় চিত্রের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা কি আমাদিগের পক্ষে সহজ সাধ্য? আমাদিগের সৌন্দর্য্য বোধ থাকিলে আমরা মহাভারত, রামায়ণ, কাদম্বরী, শকুন্তলা প্রভৃতি পুস্তক হইতে কত না ছবি আবিষ্কার করিতে পারি—এই সকল পুস্তকের এমন একটী পৃষ্ঠা নাই, যাহা হইতে একটী না একটী ছবি প্রস্তুত হইতে পারে না। এই সকল পুস্তক যেমন সৌন্দর্য্যপূর্ণ, তেমনি ইহা হইতে অনুরূপ চিত্র অঙ্কিত করিলেও যে তাহা সৌন্দর্য্যপূর্ণ হইবে তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশে এইরূপ ছবির এখন বিলক্ষণ অভাব রহিয়াছে। খ্যাতনামা চিত্রকর রবিবর্ম্মা সেই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে মোচন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যদি অন্যান্য স্বদেশীয় চিত্রকরগণ তাঁহার এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তাহা হইলে কে বলিতে পারে যে দেশীয় সাহিত্যের ন্যায় দেশীয় চিত্রের অচিরে উন্নতি সাধিত হইবে না?

বর্ত্তমানে যাঁহারা চিত্রের উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদিগকে ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক চিত্রবিষয়ে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিতে হইবে; বিদেশীয় চিত্রও পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। এইরূপ আলোচনার

অভাবেই কলিকাতার চিত্রবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বৎসরে বৎসরে নানা অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত করিয়া জনসাধারণের আদর্শ অতীব মলিন করিয়া দিতেছে। উপসংহারে এইটুকু বলিতে চাহি যে বর্ত্তমানে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তান এবং সম্ভ্রান্ত ধনীসন্তানদিগের অনেকেই যখন এই শিল্পানুশীলনে মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য এবং ইহা হইতেই আমরা আশা করিতে পারি যে আমাদের দেশে শীঘ্রই চিত্রের উন্নতিসাধন করিতে পারিব।

শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

ললিতা।

(গল্প)

ফুলবেড়িয়া গ্রামে হরিনাথ বাবুরা প্রসিদ্ধ। ধার্ম্মিক বলিয়া গ্রামে তাঁহাদের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তাঁহারা গ্রামে যাহার দুঃখ দেখেন তাহারই দুঃখ মোচনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে হরিনাথ বাবু অগ্রণী। হরিনাথ বাবুরা পাঁচ ভাই। হরিনাথের সদ্দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া অন্যান্য ভাইরাও গ্রামে মন্দ সুনাম পান নাই। গ্রামের সকলেই তাঁহাদের ভালবাসে ও বিশ্বাস করে। জ্যেষ্ঠ হরিনাথ গ্রামের মধ্যে সাধু বলিয়া খ্যাত। গ্রামের ছেলে মেয়েরা অকাতরে তাঁহাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে। কত যুবতী তাঁহাদের বাড়ীর সাম্‌নে দিয়া সরলভাবে চলিয়া যায়। তাহাদের কুটিল কুন্তল কৃষ্ণ কবরীকে শোভিত করিয়া নাচিতে থাকে।

বাস্তবিকই তাঁহাদের হৃদয়ের মধুর পবিত্র ভাবে গ্রামের কোন লোকই তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করে না, প্রত্যুত গ্রামে তাঁহাদিগের ন্যায় লোকের বসতিতে গ্রামবাসীরা নিজেদের ধন্য ও সৌভাগ্যবান বলিয়া বোধ করে।

এক দিন একটী বালিকা চুবড়ী মাথায় করিয়া ফলমূলাদি বিক্রয়ার্থে হাটে যাইতেছিল। হরিনাথ বাবু উপরের বারান্দায় বসিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওগো কি নিয়ে যাচ্ছ? চুবড়ীতে তোমার কি ?" বলিয়া উত্তরে বলিল "আমার চবড়ীতে নেব পেয়ারা এই সব আছে।"

হরিনাথ বাবু বলিলেন "আচ্ছা নিয়ে এসো দেখি।" বালিকা লইয়া গেল; হরিনাথ বাবু ভাল ফলমূলাদি দেখিয়া সমুদয় কিনিয়া লইলেন এবং তাহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন; বালিকা সকলি বলিল ও প্রফুল্লচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেল।

২

হরিনাথ বাবু গৃহকক্ষে একেলা বসিয়া আছেন ও ভাবিতেছেন—বালিকাটী বড় ভাল, মুখে কেমন লক্ষ্মী শ্রী। এক গোত্র যদি না হইত, তাহ'লে আমার ছোট ভাই জগন্নাথের সঙ্গে বিয়ের ঠিক করা যেতো।

কান্তি মুকুর্য্যের ছেলেটীর সঙ্গে মেয়েটির বিয়ের ঠিক করলে মন্দ হয় না। আহা কান্তি মুকুর্য্যে বড় ভাল লোক ছিল। সে যখন বেঁচে ছিল, তখন সে তার ছেলেরে শেখাবার জন্যে কত আমাকে বলেছিলো। কাঠের ব্যবসাতেই তার সমস্ত দিন অতিবাহিত হত, তাই সে তাহার পুত্র রমেশকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য আমার নিকট পাঠাইয়া দিত।

কান্তি মুকুর্য্যে কাঠের ব্যবসা করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিল। সে মারা যাবার পর থেকে তার ছেলেটীকে আর এখানে দেখতে পাইনে কেন। সে আমাকে গোপনে বলে গেছে—কোথায় তার টাকা পোঁতা আছে। বলে গেছে রমেশ বড় হলে বিয়ে করলে তবে সেই টাকা তাকে দিতে।

কান্তি মুকুর্য্যে হরিনাথ বাবুর সাধু প্রকৃতি জানিয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার গুপ্ত সম্পত্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন।

৩

ললিতাদের বাড়ী হরিনাথ বাবুদের বাড়ী থেকে প্রায় আটদশ ক্রোশ দূরে, ললিতারা যে গ্রামে থাকে তাহার নাম নারায়ণগঞ্জ। তাহাদের অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা ছিল। ললিতা এই নারায়ণগঞ্জ হইতে ফুনবেড়িয়ার বিখ্যাত হাটে পণ্য দ্রব্য সকল বিক্রয়ের জন্য হাটের দিনে যাইত। হপ্তায় দুদিন হাট বসিত।

ললিতাদের গ্রামে তাহাদের বাড়ীর অনতিদূরেই একটী বিপণি ছিল। হাট যাইবার দিন ললিতা অনেক সময়ে সেই বিপণির অধিকারীর নিকট হইতে অনেক জিনিষও লইয়া যাইত। সেই দোকানদারের সঙ্গে তাহার এই বন্দো-

বস্তু ছিল যে যাহা বিক্রয় করিয়া হইবে, তাহার অর্দ্ধেক দোকানদার পাইবে, অর্দ্ধেক ললিতা পাইবে। কোনও কোনও জিনিষ ললিতা দোকানে একেবারে কিনিয়া হাটে যাইয়া বেশী দামে বিক্রয় করিয়া বেশ লাভবান হইত।

এইরূপে ক্রয় বিক্রয় করিয়া ললিতার দিন কাটিতে লাগিল। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কালক্রমে এই পণ্য দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যাপার লইয়া হৃদয় বিক্রয়ের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবার উপক্রম হইল। তরুণী ললিতা যখন বিক্রয়ের জন্য দোকানে জিনিষ লইতে আসিত, তখন দোকানদারটী তাহার মধুর সরল সৌন্দর্য্যে আকুল হইয়া তাহার পানে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকিত। দ্রব্যাদি তাহার চুবড়ীতে ঢালিয়া দিতে সহসা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত। একদিন দোকানদার ঐরূপ অনবহিতচিত্তে ললিতার চুবড়ীতে দ্রব্যাদি ঢালিতেছে, সহসা কতকগুলি পড়িয়া গেল ; ললিতা বলিল "ওগো না দেখে তাড়াতাড়ি ঢেলে ফেল্‌চো পড়ে যায় যে।" একদিন কতকগুলি জিনিষ দিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় ললিতা বলিল "ওগো আর দেরী সয় না, এ জিনিষ আরেক দিন নেবো। আজ হাটে যাই।"

কিন্তু ললিতার মুখ দেখিয়া মনে হয় যেন যেতে চায় চায় যেতে চায় না, এইরূপ যেন দুইটী বিরোধী ভাবের দ্বন্দ্ব ছায়ালোকের ন্যায় হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে।

যেমন ললিতারও মনে আবেশ মাধুরী দেখা দিয়াছে, সেইরূপ রমেশেরও চিত্তে প্রণয় মধুরিমা দেখা দিয়াছে। অন্তরের অন্তরীক্ষে এই আবেশদ্বয় যেন গগনে সম্মুখীন দুইটী মেঘের ন্যায় পরিশোভমান হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

৪

একদিন ললিতা হাট হইতে স্বীয় গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া, পথে বাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটী বাগানে বকুল গাছের তলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইয়া পুষ্প সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছে। বিহঙ্গমগণ মধুর আলাপ করিতেছে। ললিতা সেই সুন্দর কাননে নীরবে একা বসিয়া আছে। দেখিলেই মনে হয় যেন কি ভাবে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

এই কাননে ললিতা প্রায়ই হাটের দিনে গৃহে ফিরিয়া আসিবার সময় বকুল তলায় বিশ্রাম করিয়া যাইত এবং বকুল পুষ্প সংগ্রহ করিত। সংগ্রহ

করিত নিজের ব্যবহারের জন্য নয়, নারায়ণগঞ্জের সমীপবর্ত্তী গ্রাম সমূহে বেচিবার জন্য। কালীগঞ্জের বাবুদের বাড়ীতে তাহার বকুলের মালা বড়ই বিক্রয় হইত।

হাটের দিনে যেমন ললিতা হাটেও লাভ করিত, সেইরূপ বকুলের মালা বেচিয়াও মন্দ উপায় করিত না। কেহ বলিয়া দিলে অন্য দিনেও পুষ্প সংগ্রহপূর্ব্বক মালা গাঁথিয়া দিয়া আসিত।

আজ ও হাটের দিন; আজও হাট হইতে প্রত্যাগত হইয়া উপরোক্ত কাননে আসিয়া ললিতা বিশ্রাম করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে, ক্লান্তি দূর হইলে বকুল পুষ্প পাড়িবার জন্য গাছ নাড়া দিতে লাগিল ও গাছে ঢিল ছুড়িতে লাগিল।

পুষ্প ও পত্র রাশির সঙ্গে সঙ্গে সহসা গাছের উপর হইতে পত্রসহ একটী বকুলের মালা তাহার অঞ্চলে স্পর্শপূর্ব্বক ভূমিতে পড়িয়া গেল। ললিতা চমকিত হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি সেই দুটী কুড়াইয়া লইল।—পত্রটী খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

* * * * *

পড়িয়া ললিতার প্রাণ ঈষৎ বিচলিত হইয়া উঠিল। পত্রটী পুনরায় পড়িতে লাগিল ও এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। পরে কি ভাবিতে ভাবিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

রাত্রি হইয়াছে। ললিতার মা ললিতার কাছে নানারূপ গল্প করিতেছেন। ললিতার মামাও সেদিন তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া ছিল। ললিতার মায়ের নাম সুকুমারী। সুকুমারী গল্প বলিতেছেন। শুনিয়া মধ্যে মধ্যে গোবর্দ্ধন সহাস্য মুখে মন্তব্য ঝাড়িতেছেন। ললিতা কখনো মায়ের সমর্থন করিতেছে, কখনো কোন বিষয়ে তাহার মামার সমর্থন করিতেছে। ললিতার মা একটি বিবাহের গল্প করিতে করিতে বলিলেন "বরের বড় টাকা টাকায় ঘর ভরে যায়।" দোষের মধ্যে বরটী টেকো তা টাকায় সব কেটে যায়। মামা হাসিয়া ললিতাকে জিজ্ঞেস করিলেন "টাকার উলটা কি? ললিতা বলিল "কাটা"; মামা বলিলেন তবে তাই হয়, টাকায় সবই কেটে যায়। বলিয়া খুব একচোট হাসিয়া

লইলেন। ললিতাও হাসিল ললিতার মাতুল পুনর্ব্বার ললিতাকে বলিলেন "বরের গুণের মধ্যে কি? ললিতা হাসিয়া বলিল টাকা"। মামা বলিলেন বরটীর একাধারে দুই আছে, টাক ও টাকা।

গল্প চলিতে চলিতে অনেক রাত হইল; দূরে ঘন ঘন শৃগাল ডাকিয়া উঠিল; মামা উঠিলেন, বলিলেন "ললিতা তবে আসি।" সুকুমারীকে বলিলেন "তবে আসি।" বলিয়া চলিয়া গেলেন। সুকুমারী ও ললিতা উভয়ে নিদ্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে এই স্তব্ধ রাত্রে ললিতার, কাননের পত্র ও মালার কথা সহসা মনে পড়িয়া গেল, ললিতা মাকে সমুদয় কথা বলিয়া ফেলিল।

সুকুমারী রোষান্বিত হইয়া মনে মনে বলিলেন "দোকানদারের তো কম আস্পর্দ্ধা নয়। আমাদের আর তাহ'লে এখানে থাকা নিরাপদ নয় দেখ্‌চি। মহেশ ঘটক মাণিকগঞ্জে যে বরের কথা ব'লেছে সেইটির এইবারে শীঘ্র শীঘ্র চেষ্টা করা ভাল। দুই এক মাসের মধ্যেই এখান থেকে চ'লে গিয়ে আমার বাপের বাড়ী মাণিকগঞ্জ গিয়ে থাক্‌বো।"

৬

পরদিন প্রাতে সুকুমারী তাহার ভ্রাতার বাসায় গিয়া এই সকল কথা বলিলেন। দোকানদারটীকে একটী তিরস্কারপূর্ণ পত্র লিখিতে ও মাণিকগঞ্জে তাঁহাদিগকে এই মাসের মধ্যেই লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। গোবর্দ্ধন তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

৭

রমেশ দোকানে বসিয়া আহার দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছে ও মাঝে মাঝে কি ভাবিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে। সহসা ডাক পেয়াদা তাহার কাছে একটী পত্র আনিল। রমেশ খুলিয়া পড়িতে লাগিল * * *

পড়িয়া হতাশ হইল। দেখিল ললিতার মামার চিঠি। চিঠিতে তাহার প্রতি যথেষ্ট কটুভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে। রমেশকে যার পর নাই ঘৃণা করা হইয়াছে। "যাক্ আর তাহ'লে বিয়ে করবোনা, মিছে আমার এই দোকানদারী। বাবার মস্ত ব্যবসা ছিল, তিনি থাক্‌লে কি আমার আর টাকার ভাবনা থাক্‌তো? এ দোকানদারী আর ভাল লাগেনা। এর চেয়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে ভ্রমণ করলে ঢের সুখ আছে। কিন্তু ললিতা——

না কাল থেকে আর দোকানে বসবো না। দোকান বন্ধ ক'রে যাবো।"

লজ্জায় ও ঘৃণায় রমেশ সেই রাত্রেই দোকান পাট বন্ধ করিয়া সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে প্রস্থান করিল।

৮

দেখিতে দেখিতে প্রায় একমাস হইল। সুকুমারী এক্ষণে মানিকগঞ্জে যাইবার জন্য বড় আকুল হইয়া উঠিয়াছেন; মহেশ ঘটক তাঁহাকে মানিকগঞ্জের যে বরের কথা বলিয়াছিল তিনি নাকি এবার দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিবার জন্য নিজেই সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন; চারিধারে সুন্দরী মেয়ে খুঁজিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন। সেই ধনীর কোন আত্মীয় লোক মহেশ ঘটকের কথানুসারে, দুই এক দিন হইল ললিতার মায়ের কাছে আসিয়া ললিতাকে দেখিয়া গিয়াছে।—দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং সুকুমারীকে ললিতার বিয়ের সম্বন্ধে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগকে মাণিকগঞ্জে সত্বর যাইবার জন্য বলিয়া গিয়াছে।

সুকুমারী তাহার পর হইতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন—কবে মাণিকগঞ্জ গিয়া পৌছিবেন; এই ভাবিয়াই তিনি কাতর হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহার দাদা গোবর্দ্ধনকে ক্রমাগত অনুরোধ করিতেছেন।

দু এক দিনের মধ্যেই যাইবার ঠিক হইয়া গেল। সুকুমারীর কাছে সকল কথা শুনিয়া গোবর্দ্ধনেরও ইচ্ছা ললিতার শীঘ্র বিবাহ হইয়া যাক্—তাঁহারও মনে হইয়াছে পাত্রটী মন্দ কি?

৯

আজ শুক্লপক্ষ দ্বাদশী তিথি। আজ তাঁহারা নারায়ণগঞ্জ ছাড়িয়া মাণিকগঞ্জে যাইবেন! তাঁহারা নৌকায় উঠিয়াছেন। যে নদী দিয়া তাঁহারা মাণিকগঞ্জে যাইবেন সেই নদীটীর নাম ভৈরবী। ভৈরবী নদীটী নারায়ণগঞ্জের মধুমতী নদীর দ্বিগুণ প্রশস্ত। মধুমতী নদীতে নৌকায় তেমন ভয় নাই, ভৈরবী নদীতে বাস্তবিকই ভয়। তাহাতে স্থানে স্থানে ঘূর্ণি আছে এবং ঝড় ঝটিকা হইলে তাহার মধ্যে নৌকার অনেক সময়ে বিপদের সম্ভাবনা।

জ্যৈষ্ঠ মাস পড়িয়াছে। দুই তিন দিনের ভীষণ গ্রীষ্মের পর আজিকে প্রাতঃকাল হইতে মেঘ মেঘ করিয়াছে, বৈকাল বেলায় কি সন্ধ্যার শেষে একটা ঝড়

হইবারও সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয়। দেখিয়া আজিকার দিনটা দুর্দ্দিন বলিয়াই বোধ হইতেছে। গোবর্দ্ধনও দুর্দ্দিন বুঝিয়া সুকুমারীকে কহিলেন "কাল যাওয়া যাবে এখন আজ দুর্দ্দিন যেরকম দেখছি আজকে না যাওয়াই ভাল।" সুকুমারী অস্থির হইয়া উঠিলেন "তবে আর যাওয়া হয়েছে। না আজ নৌকায় যখন ওঠা গেছে আজই যাওয়া ভাল।" সুকুমারী আকুল হইয়া পড়িয়াছেন—মাণিকগঞ্জে পৌঁছিতে পারিলে হয়, সেই ধনী পাত্র গোপীনাথের সঙ্গে ললিতার বিয়েটা দিয়ে আসতে পারলে হয়—ধনী পাত্রের জন্য তিনি অতিশয় অধীর হইয়া উঠিয়াছেন—বলিলেন "না চল দাদা ও কিছু হবে না মেঘ কেটে যাবে এখন।" সুকুমারীর পাছে মনঃক্ষোভ হয় এই ভয়ে গোবর্দ্ধন আর কিছু বলিলেন না, বলিলেন "তবে চল"। দুর্দ্দিনের জন্য অপেক্ষা আর না করিয়া মাঝিকে নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন।

বেলা পাঁচটার সময় নৌকাটী মধুমতী নদী পার হইয়া ভৈরবী নদীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন প্রাতঃকালের সঞ্চিত মেঘ সমুদয় কাটিয়া গিয়াছে। দেখিয়া সুকুমারী বলিলেন "দাদা মিছি মিছি ভয় পাচ্ছিলে। কই তোমার মেঘ কোথা? মেঘ নাই দেখিয়া দাঁড়ি মাঝিরা এবার মাঝ নদী দিয়া তীর বেগে দাঁড় বহিয়া যাইতে লাগিল। দাঁড়িরা দাঁড় বাহিতে বাহিতে বলিল আজ রাত্রি দুই প্রহরের মধ্যেই মাণিকগঞ্জে পৌঁছিব।

প্রাতঃকালের সঞ্চিত মেঘরাশির সহসা অন্তর্দ্ধানে ও প্রকৃতির অত্যন্ত স্তব্ধ ও উত্তপ্ত ভাবে সুকুমারীর দাদা গোবর্দ্ধন কিন্তু অতিশয় মনে মনে ভীত হইলেন, ভাবিলেন হয় সন্ধ্যার শেষে নয় রাত্রিতে একটা ভীষণ ঝড় আসিবেই আসিবে।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অস্তাচলে গেল, উত্তর পশ্চিমে সহসা ঝিলিক দেখা দিল। তিনি মাঝিকে বলিলেন, সাবধান করিয়া দিলেন। মাঝি কহিল 'ভয় নাই, এই বাঁকটা ফিরিয়াই নৌকাটী কিনারায় লইয়া গিয়া বাঁধিব।'—

বাঁকটী ফিরিতে না ফিরিতে ঝটিকা রাক্ষসী সহসা নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া পড়িল। ভীষণ তরঙ্গে তাহাদের নৌকা দুলিতে লাগিল, নৌকা যায় যায় হইয়া উঠিল। মাস্তলটার কতকাংশ ভাঙিয়া গেল, মহাশব্দে নদীর উপরে

প্রায়। বেগতিক দেখিয়া দাঁড়ি মাঝি সকলে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল,—সাঁতরাইয়া পার হইবে। সিধা সাঁতরাইয়া তাহাদের কিনারায় উঠিবার ইচ্ছা ছিল, জলের ও বায়ুর বেগাধিক্যে তাহা হইল না, তাহাদিগকে অনেকদূর পর্য্যন্ত ভাসাইয়া লইয়া গেল।

নৌকাটী কিঞ্চিৎ হেলিয়া পড়িয়াছে।—তাহারা তিনজনে তাই তাড়া তাড়ি নৌকার পশ্চাতে রাশীকৃত খড়ের আঁটি বোঝাইয়ের দিকে ঝুঁকিল, ভাবিল, নৌকা ডুবিলে খড়ের গাদা করা আঁটির উপরে অন্ততঃ কতকক্ষণ ভাসিয়াও থাকিতে পারিবে; এবং মহাআর্ত্তস্বরে হরি রক্ষা কর, হরি রক্ষা কর বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল—গোবর্দ্ধন কম্পিত কলেবরে কৃষ্ণনাম জপিতে লাগিল।

দূরে নদীর তীরে এই সময়ে একজন সন্ন্যাসী বসিয়াছিলেন, তিনি এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া, নৌকাস্থিত বিপন্ন ব্যক্তিদের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়া আর থাকিতে পারিলেন না, সত্বর তাঁহার বড় একখানা ডোঙা লইয়া মাঝ নদীতে ছুটিয়া গেলেন এবং তড়িতে তিনি তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সেই বিপজ্জনক নৌকা হইতে তাঁহার ডোঙাটীতে উঠাইয়া লইয়া অবিলম্বে কিনারায় গিয়া উঠিলেন।

১০

নদীতীরে সন্ন্যাসীর কুটীর। তিনি তাহাদিগকে রীতিমত আতিথ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কাতর হইয়া দীর্ঘ শ্মশ্রু ও ঘন জটাধারী সন্ন্যাসী ঠাকুরকে কতই না বলিতে লাগিলেন; গোবর্দ্ধন কহিল "তুমিই সাক্ষাত হরি আমাদের আজি বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে।" ললিতার মা বলিল "তুমি না থাক্‌লে আমরা আজ সকলেই মারা যেতাম"। ললিতা বলিল "স্বামীজী আপনি না থাক্‌লে আমরা কেউ বাঁচতেম না।

ললিতার মুখে স্বামীজী কথাটী সন্ন্যাসীর প্রাণে গিয়া বিঁধিল, তিনি ঈষৎ বিচলিত হইয়া উঠিলেন,—পরক্ষণেই আবার সংযত ভাব ধারণ করিলেন। অপর কেহ তাহা জানিতে পারিল না।—বলিলেন "আমার আর কি ক্ষমতা, এ ভগবানেরই লীলা। তিনি তোমাদের বাঁচালেন।"

সুকুমারী কহিলেন "বাবা ঠাকুর এই মেয়েটীর বিয়ে নিয়েই এই বিপদ।

মাণিকগঞ্জে গোপীনাথ বলে একজন বড় ভাগ্যিমন্তর জমীদার আছেন, তার সঙ্গে বিয়ের আশা করে আমরা মাণিকগঞ্জে যাচ্ছিলেম, পথে এই কাণ্ড! আমাদের লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু হ'তে বসেছিল।"

সন্ন্যাসী বলিলেন "বিয়ের ঠিক হ'য়ে গেছে ?" গোবর্দ্ধন বলিলেন "এখন বিয়ের ঠিক কোথা, ঘটকের পছন্দ হ'য়েছে। ঘটক এসে মেয়েকে যত শীঘ্র হয় মাণিকগঞ্জে নিয়ে যেতে ব'লেছে। আমি অত ক্ষেপিনি, আমার এই ভগ্নী সুকুমারী বড্ড অধীর হয়ে উঠেছেন, অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে এই দুর্দ্দিনেও জোর করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে মাণিকগঞ্জে চ'লেছিলেন। পথে এই কাণ্ড! আমি সুকুমারীকে একবার ব'লেছিলেম যে লোকটা ধনী বটে কিন্তু যেরকম বাহিরে শুনেছি—

কথাটী শেষ না করিতে করিতে সন্ন্যাসী ঠাকুর আন্দাজে বলিয়া উঠিলেন "খুব মাতাল।" গোবর্দ্ধন হাত জোড় করিয়া কহিল "আজ্ঞে আপনি অন্তর্যামী আপনি সবই জানেন আপনাকে আর কি বলবো, আজ্ঞে হ্যাঁ বড্ড মাতাল। মদ নিয়ে দিবারাত প'ড়ে থাকে। এমন মেয়েটীর সঙ্গে অমন মাতালের বিয়ে দেওয়া আমার তেমন সঙ্গত ব'লেই বোধ হয় না। কি করবো আমার ভগ্নীর নিতান্ত ইচ্ছে যখন তখন আমি আর বারণ করলেম না, ব'ল্লে যদি মনে কষ্ট হয়।" সুকুমারী কহিল "তাতে দোষ কি! অতবড় জমীদার টাকাওয়ালা ও দোষ চাঁদে কলঙ্কের ন্যায়। ও কিছুই নয়।

সন্ন্যাসী কহিলেন "না, না ও রকম লোকের সঙ্গে বিয়ে দিলে অধর্ম্ম হয়। মেয়ের যে ওতে সর্ব্বনাশ হয়। যদি শ্রেয় চাও তো দিও না, দিওনা।"

গোবর্দ্ধন কহিলেন "ঠাকুর আমার ভগ্নী বলেন বিয়ে তো দিতে হবে কোথায় দেবেন, বর আবার সহজে কোথায় পাবেন।"

সুকুমারী কহিল "একটি পাত্র আপন হ'তেই ললিতাকে বিয়ে কোর্ত্তে চেয়েছিল, পাত্রটি রূপে গুণে সবেতেই সুন্দর, কিন্তু ঠাকুর তাহলে কি হবে, সে এর মত এমন ধনী নয়। সে ছেলেটি দোকানদারী করে। আমাদের বাড়ীর কাছে তার একটা দোকান আছে।"

এই দোকানদারের নাম শুনিবামাত্র ললিতার মুখমণ্ডল ঈষৎ রক্তিম আকার ধারণ করিল ও ঈষৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু রাত্রিতে অস্পষ্ট জোৎস্নাময়

এতক্ষণ যেন বিভীষিকা দেখিতে ছিল।—এতক্ষণে সে একটু যেন প্রাণ পাইল।

সন্ন্যাসী কহিলেন "দোকানদার হলেই বা সৎপাত্রে দান করা উচিত। সৎপাত্রে হ'লে, ধর্ম্ম থাক্‌লে তার ধন হ'তে কতক্ষণ! ধর্ম্মের পর অর্থ, ধর্ম্ম হ'লে ইহকাল পরকাল ভাল হয়। ধর্ম্মে সকল সম্পদলাভ হয়। এখন টাকার লোভে ঐরূপ লোকের হাতে কন্যা সমর্পণ করলে শেষে ঘোর দুঃখ উপস্থিত হবে। আর, টাকা টাকা করচো, ও টাকাও থাক্‌বে না। মদের হ্যাঁপায় টাকা কড়ি এক দমে উড়ে যেতে কতক্ষণ?" গোবর্দ্ধন কহিলেন "স্বামীজী তা ঠিকই ব'লেছেন, আমার তো এখন আর বিয়ের জন্য মাণিকগঞ্জে যাবার ইচ্ছে নেই। আমি বেশ বুঝেছি, যে এ বিয়ে ভগবানের ইচ্ছা নয়, তিনি পথে তাই ঐরূপ বাধা বিপত্তি দিলেন। আমরাতো মত্তেই ব'সেছিলেম।" ভগ্নীকে বলিলেন "কি বল মানিকগঞ্জে যাবে, তার সঙ্গে আর বিয়ে দেবে? "সুকুমারী কহিলেন."তবে থাক্‌, যখন তোমার ইচ্ছে নেই দেখছি, সন্ন্যাসীঠাকুর ভাল নয় বল্‌ছেন, দৈববিড়ম্বনা হ'ল, তখন দেখ্‌ছি এ বিয়ে শুভ নয়।—তবে থাক্‌ ফের বাড়ী ফিরে যাওয়া যাক্‌।" গোবর্দ্ধন কহিলেন "নারায়ণগঞ্জে ফিরে গিয়ে এখন দোকানের অধিকারী যুবকটীর সঙ্গে বিয়ের ঠিক করা যাক্‌গে। আর অবিবাহিত রাখা উচিত নয়—আর আমিও কার ঠেঁয়ে যেন শুনেছিলাম যে ছেলেটীর বাপের বেশ টাকাকড়ি ছিল, বাপ মারা যাবার পরে ছেলেটী তার দেশ ছেড়ে নারায়ণগঞ্জে তোমাদের ওখানে এসে দোকান ক'রেছে।"

সুকুমারী কহিল "তাকে অমন ক'রে চিঠি লেখা হ'য়েছিল। এখন কি উপায়।"

গোবর্দ্ধন কহিলেন " তুমিই তো আমাকেজোর জবরদস্তি ক'রে লেখালে। ফস্‌ করে, কাউকে কি অমন ক'রে লিখ্‌তে হয়,সে নিজে বিয়ে কর্ত্তে চেয়েছিল ব'লে কি তাকে অমন ক'রে চিঠি লেখা ভাল হয়েছে? তোমার কথায় চ'লে দেখ কত বিপদ ঘট্‌লো।" সুকুমারী কহিলেন "ঠাকুর কি ক'রবো? এই ললিতার জন্যই এত কাণ্ড। সেই গোলমাল হবার পর থেকে আর আমরা তার বাড়ীর ধারদিয়ে কখনো যেতেম না, ললিতাকেও একলা যেতে দিইনি। আমরা অন্য পথ দিয়ে আনা গোনা করতেম। সে যতদূর অপমানিত হবার হয়েছে, সে এখন কি আর ফিরবে?"

সন্ন্যাসী কহিলেন "কিছু ভয় নাই তাকে ফের একবার ভাল ক'রে বোলো, ধোরো, তাহ'লেই কাজ সফল হবে। সাধুতার দ্বারা সকলকেই জয় করা যায়।"

অনন্তর তাহারা সকলে এইবার গৃহে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সন্ন্যাসী কহিলেন "নিকটেই একটা খাল আছে সেখানে গেলে এখন বিস্তর নৌকা পাওয়া যাবে। এইবার জোয়ার এলেই নৌকাগুলা ছাড়বে। জোয়ার আসবার আর অল্পই দেরী আছে। এক জোয়ারে নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিবে।"

সন্ন্যাসীঠাকুরের কথানুসারে তাহারা সকলে পুনরায় নারায়ণগঞ্জে ফিরিয়া যাইবার জন্য স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকস্থ খালে, সত্বর যাইয়া একটী নৌকা ভাড়া করিয়া তাহাতে উঠিল। দেখিতে দেখিতে জোয়ারে সকল নৌকা ছাড়িয়া দিল।

১১

সেই রাত্রেই গোপনে স্বামীজী স্বীয় ডোঙ্গায় চাপিয়া ত্বরায় নিজ দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে যাহারা নদী তীরে দেখিত, তাহারা ভাবিল যে স্বামীজী হয়তো কোন পাহাড়ে চলিয়া গিয়া থাকিবেন এথানে হয় তো তাঁহার তপিস্যার বিঘ্ন হয়। বলা বাহুল্য ইনিই সেই সন্ন্যাসীর বেশধারী দোকানদার রমেশ।

১২

ললিতা, তাঁহার মাতা ও মামা তিন জনে নারায়ণগঞ্জে ফিরিয়া আসিলে গোবর্দ্ধন পুনরায় দোকানদারকে একটী ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তাহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে দোকানদার যুবক রমেশও গোবর্দ্ধনকে একটী প্রীতিপূর্ণ পত্র লিখিল ও তাহাতে ইঙ্গিতে জানাইল যে ললিতাকে তিনি বিবাহ করিবেন।

অনন্তর গোবর্দ্ধন আনন্দে রমেশকে ঘন ঘন নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন এবং একদিন সুবিধামত বিয়ের কথা ভাল করিয়া পাড়িলেন। দুই দিকেই ইচ্ছা রহিয়াছে, দুই হাতে তালি বাজিয়া উঠিল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। দু এক দিনের মধ্যেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

১৩

বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে, রমেশের ইচ্ছা হইল, সে ললিতাকে লইয়া ফুলবেড়িয়া গ্রামে যায়। ইচ্ছা যে ফুলবেড়িয়া গিয়া পৈত্রিক ব্যবসা তিনিও পুনরায় করেন; তাই ফুলবেড়িয়ায় গেলেন।

ফুলবেড়িয়া গ্রামে গিয়া বাস করিতেছেন, কিছু দিন যায়, এক দিন ব্যবসার কার্য্যের জন্য বাহির হইয়াছেন পথে হরিনাথ বাবুর সহিত দেখা হইল। দেখিয়া হরিনাথ বাবু তাঁহাকে আদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক গৃহে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার সহিত নানা কথাবার্ত্তা করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন "রমেশ তুমি বিয়ে কর।"

রমেশ ঈষদহাস্য মুখে বলিল, 'আমার বিয়ে হয়ে গেছে'। রমেশ বাল্যকাল হইতেই হরিনাথ বাবুকে "জেঠা" বলিয়া সম্বোধন করিত। রমেশের পিতার সহিত হরিনাথ বাবুর অতি সৌহৃদ্য ছিল।

হরিনাথ বাবু কহিলেন "বেশ হয়েছে। তোমার বাপ আমাকে গোপনে বলে গেছেন যে, তিনি তোমার জন্যে দুঘড়া টাকা পুঁতে রেখে গেছেন, তুমি বিয়ে করলে সেই টাকা যৌতুকস্বরূপ পাবে। বাবা বেশ হয়েছে, তুমি বিয়ে করেছো। এখানে তোমার বৌকে নিয়ে এসেছো"? রমেশ কহিল "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

হরিনাথ বাবু কহিলেন আজ আমি পোঁতা টাকা তুলিয়ে নিয়ে তোমার বাড়ীতে কাল তোমাকে ও বৌকে যৌতুক করতে যাবো।"

অনন্তর পুনরায় তাঁহারা অন্যান্য গল্প স্বল্প করিতে লাগিলেন। পরে হরিনাথ বাবু রমেশকে আহারাদি করাইয়া রাত্রি আটটার সময় নিজের লোক সঙ্গে দিয়া রমেশকে বাড়ী পঁহুছাইয়া দিলেন।

পর দিন প্রাতে হরিনাথ বাবু রমেশের বাড়ীতে আসিয়া পোঁতা টাকা ও নিজে একটি সোনার হার যৌতুক করিলেন। যৌতুক করিবার সময় রমেশের বধূকে চকিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।—"এ যে সেই ললিতা!—

"হরি তুমি হরি নাথের মনোবাঞ্ছা দেখ্‌ছি পূর্ণ করলে। কান্তির ছেলের সঙ্গে ললিতার বিয়ে হল।" হরি ভক্তের মনোবাঞ্ছা হরিই পূর্ণ করেন।

বাইসিকলের বাই।

গাড়ী নয় ঘোড়া নয় চাকা শুধু দুটী
তাই লয়ে যেথা খুসি বোঁ—করে ছুটি ;—
চল চল চড়ি তাহে আমরা তোমরা
কেহবা বোল্‌তা ভাই কেহবা ভোমরা,
সামনে একটু হেলে প্রাণটী বাঁচিয়ে
চল চল চলে যাই দুই পা নাচিয়ে ;
শুনিব না কারো কথা করিও না মানা
যেন উড়ে চলে যাব দৃশ্য দেখি নানা—
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া বনে কাননে পাহাড়ে—
জানোয়ার পেলে চড়ি ল্যাজে পিঠে ঘাড়ে,
উড়ে যাই উড়ে যাই লইয়া দুচাকা
প্রাণে যেথা সাধ যায়, যায় কিরে থাকা,
সখের আমোদ হেন ভুলিবে কে ভাই
নৃত্য করে প্রাণে বাইসিকলের বাই।

শ্রীবাইসিকল চটক।

"বাইসিকলের বাই" চিত্রটী কোন জর্মন পত্র হইতে গৃহীত।

কইমাছের পাত খোলা।

উপকরণ।—বড় বড় ডিম ওয়ালা কইমাছ আট নয়টা, হলুদ সিকি তোলা, রস্থন দুই কোয়া, শুক্না লঙ্কা তিন চারিটী, বড় পেঁয়াজ তিনটা বা আধ ছটাক, আদা আধ তোলা, রাই সরিষা এক কাঁচ্চা, গোটা ধনে সিকি তোলা, তেঁতুল এক ছটাক, সির্কা এক ছটাক, নুন প্রায় পোন তোলা, তেল আধ পোয়া, একটি দেড় হাত লম্বা কলাপাতা, চেয়ারি কাঠি চারিটী।

মাছবানান।—কই মাছ বানাইবার সময় আগেই খানিকটা ছাই বা বালি অথবা মাটী লইয়া বসিবে। মাছের গায়ে এক রকম লালের মত জিনিশ থাকাতে হাত হইতে পিছলিয়া যায়, সুতরাং ধরিবার সুবিধা হয় না। ছাই কি বালি ইত্যাদি মাছে মাখাইয়া লইলে শুক্না হইয়া যায় এবং সহজে আঁশ ছাড়ান যায়। প্রথমেই মাছের 'কানকো' টিপিয়া ধরিয়া গলার কাছে যে চারিটা ডানা আছে কাটিয়া ফেল। তার পরে বুকের এবং পিঠের শির কাঁটা কাটিয়া ফেল। স্বভাবতঃ দেখা যায় মাছের বুকে পিটে কাঁটা থাকে। এখন লেজা ও মুড়া দুহাতে ধরিয়া বঁটিতে চাঁচিয়া আঁশ ছাড়াও। মুড়ার উপর পর্য্যন্ত চাঁচিয়া আঁশ ছাড়াইতে হইবে। এইবারে লেজার পাখনা কাটিয়া ফেল। তার পরে দুইটা 'কান্‌কো" কাটিয়া ফেল এবং তাহার ভিতর হইতে 'ফুলকো' বাহির করিয়া ফেলিয়া দাও। যে মাছের ডিম থাকিবে সেই মাছের কানকো খুলিয়া যেখানটা ফাঁক হইয়া গিয়াছে সেইখান হইতে ইহার তেল পিত্তাদি বাহির করিয়া লইতে হইবে, দেখিও যেন পিত্ত গলিয়া না যায়। যে মাছের ডিম না থাকিবে তাহার পেটে দুইটা ডানার মধ্যে যে শাদা চামড়ার মত আছে সেইখানে দুইটা চির দিবে। এই শক্ত পেটের চামড়াটা কাটিয়া ইহার ভিতরে আঙ্গুল ঢুকাইয়া তেল পিত্তাদি মুড়ার দিকে উঠাইয়া দিয়া বাহির করিতে হইবে, ডিম থাকিলে এই চামড়াটা কাটিয়া ফেলিবার আবশ্যক নাই রাখিলে বরং কাজ দেখে। মাছ ধুইবার সময় আঙ্গুল দিয়া ঐ চামড়াটা চাপিয়া ধরিলে আর ডিম বাহির হইয়া যাইবে না। যাঁহারা মাছ বানাইতে জানেন তাঁহাদের এ সকল অভ্যস্ত। এইবারে মাটির উপরে রাখিয়া ঘষড়াইয়া এবং

ধুইয়া ইহার যতটা নাল বাহির করিতে পার কর। ধুইতে ধুইতে যখন দেখিবে ইহার আর নাল বাহির হইতেছে না তখন আর ধুইবার আবশ্যক নাই। একটু নুন মাখিয়া রাখ।

প্রণালী।—হলুদ, রসুন, শুক্নালঙ্কা, পেঁয়াজ, আদা, রাইসরিষা, ধনে, এই গুলি সব মিহি করিয়া পিষিয়া রাখ। এই পেষা মশলা যেন বেশ শুক্না রকম হয়।

তেঁতুল ধুইয়া লইয়া সির্কাতে ভিজাইতে দাও। পরে ইহার শিটা গুলি ফেলিয়া দিয়া কেবল রসটা লও। এই তেঁতুল মিশ্রিত সির্কায় পেষা মশলা ও নুন মিশাইয়া উহাতে মাছগুলি মাখ।

ছয়টী চেয়ারি কাঠি এক বিঘৎ সমান লম্বা করিয়া কাট এবং গুণ ছুঁচের ন্যায় মুখের দিক সরু করিয়া চাঁচিয়া রাখ। এইবারে মাছ গাঁথ। মাছের পেটের সাদা চামড়াতে যে চির দেওয়া হইয়াছে, তাহার ভিতরে কাঠি বিঁধাইয়া অপর দিক দিয়া বাহির কর, আবার আর একটা কাঠি ল্যাজার উপরে দুই দিকের শিরের কাঁটার ফাঁকে বিঁধাইয়া গাঁথ। যখন একটী মাছের পরে আর একটা মাছ গাঁথিবে তখন দ্বিতীয়টীর মুড়া প্রথম মাছের ল্যাজার দিকে থাকিবে আর ল্যাজা প্রথম মাছের মুড়ার দিকে থাকিবে। এই রকম উল্টা পাল্টা করিয়া প্রত্যেক দুইটা কাঠিতে তিনটা করিয়া মাছ গাঁথিতে হইবে। মাছগুলি গাঁথিবার অভিপ্রায় এই যে পোড়াইবার সময় এদিক ওদিক হইয়া যাইবে না, ঠিক থাকিবে।

একটি বড় হাঁড়িতে বা কলাই করা কড়াতে আধ পোয়া তেল চড়াও। এদিকে কলা পাতাতে কাঠি ধরিয়া ধরিয়া মাছগুলি সাজাইয়া রাখিয়া তাহার উপরে মসলা মিশ্রিত সির্কাও ঢালিয়া দাও। কলাপাতা দুই দিক হইতে লইয়া মুড়িয়া ফেল। প্রায় মিনিটচার তেল পাকিয়া তেলের ধোঁয়া উঠিতে থাকিলে, কলাপাতা জড়ান মাছগুলা হাঁড়ির তেলে ছাড়,কড়া বা হাঁড়ির উপরে কিছু ঢাকা দিয়া দাও। মিনিট সাত পরে হাঁড়ি হইতে যখন একটা কড়া গন্ধ বাহির হইবে তখন হাড়ি নামাইয়া কলাপাতা উল্টাইয়া দিবে, পুনরায় হাঁড়ি ঢাকিয়া দিবে। হয় সাত মিনিট পরে আর একবার মাছটা পাতাশুদ্ধ উল্টাইয়া দিবে। কিন্তু এই শেষবারে যখন উল্টাইবে তখন অতি সাবধানে আস্তে আস্তে উল্টাইতে হইবে,

কারণ তা না হইলে মাছ সহজে ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভব। এইরূপ ভাপে মাছ বেশ সিদ্ধ হইয়া গেলে নামাইয়া কলাপাতা এবং কাঠি খুলিয়া মাছগুলি তেল এবং মসলার সহিত ঢালিয়া দিবে। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় মিনিট কুড়ি লাগিবে। ইহার জন্ম আগুনের কিঞ্চিৎ নরম আঁচ চাই।

গুণাগুণ—কবয়ী মধুরা স্নিগ্ধা বল্যা বাত কফাপহা। কইমৎস্য মধুর, স্নিগ্ধ, বলকর, এবং বাত ও কফনাশক।

ব্যয়।—কইমাছ নয় আনা কি দশ আনা, হলুদ হইতে সির্কা অবধি সব গড়ে চার পয়সা ধরা গেল,তেল তিন পয়সা। মোটামুটি বার আনা খরচ পড়িবে।

শ্রীপ্রজ্ঞা সুন্দরী দেবী।

পটোলের দোল্মা।

উপকরণ।—আধসের কিমা মাংস, আদা দুই তোলা, পেঁয়াজ আধ পোয়া, শুক্‌না লঙ্কা চারিটা, ঘি তিন ছটাক, নুন প্রায় ছয় আনা ভর, কাগজি নেবু দুইটি, দই এক ছটাক, দালচিনি দুয়ানি ভর, লবঙ্গ দু-তিনটি, ছোট এলাচ একটি, জল এক পোয়া, পটোল আধসের (গুন্তিতে প্রায় চোদ্দ পনেরটা)।

প্রণালী।—পাঁটা বা ভেঁড়ার মাংস খুব থুরিয়া অর্থাৎ কিমা করিয়া তাহার মধ্যে যে ছিবড়া ছিবড়া সুতার মত থাকিবে সে গুলি বাছিয়া ফেলিবে। এই ছিবড়া গুলি থাকিলে মাংস খুব মিহি করিয়া পিষিলেও খাবার সময় দাঁতে কচকচ করে। কিমা মাংস চাহিলে মাংস বিক্রেতারা নিজে কিমা করিয়া দেয়।

আদা, শুক্‌লঙ্কা ও দেড়ছটাক মাত্র পেঁয়াজ পিষিয়া রাখ। অবশিষ্ট আধ ছটাক পেঁয়াজ খোসা ছাড়াইয়া লম্বা ভাবে কুঁচাইয়া রাখ।

দারচিনি, লঙ্গ ও ছোট এলাচ কুটিয়া রাখ।

বঁটি বা ছুরি দ্বারা পটোলের খোলা পরিষ্কার করিয়া ছাড়াও। পটোল-গুলার মাঝখানে লম্বালম্বি দিকে একটা একটা চির দাও। দুহাতে করিয়া পটোল গুলা একবার দলিয়া লও, তাহা হইলে ঐ গুলা নরম হইয়া আসিবে ও

[illegible] করা যাইতে পারিবে। এইবারে পটোলের পেটের মধ্যে একটা চেয়ারি কাঠি বা আঙ্গুল ঢুকাইয়া বীচিগুলি বাহির করিয়া ফেল। একটি পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে পটোল গুলি ফেলিয়া রাখ। সব বানান হইয়া গেলে ধুইয়া উঠাইয়া পটোলগুলির পেটের ভিতর হইতে জল বাহির করিয়া আর একটী পাত্রে রাখ। হাঁড়িতে আধ ছটাক ঘি চড়াও, কিমা (খুব কুচি করা) মাংস ছাড়। দু একবার নাড়াচাড়া করিয়া হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া দাও। মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলিয়া মাংসটা নাড়িয়া নাড়িয়া দিবে। মিনিট পাঁচ পরে ইহার জল মারিয়া অল্প ভাজা ভাজা হইলে নামাইয়া, শিলে পিষিয়া লও অথবা পুনরায় খুব থুরিয়া লইলেও হইবে। দুয়ানি ভর নুন ও একত্র পেষা আদা, পেঁয়াজ ও লঙ্কার সিকিভাগ মাত্র লইয়া এই মাংসতে মাখ। আবার হাঁড়িতে আধ ছটাক ঘি চড়াও এবং পেষা মাংসটা ছাড়। মিনিট দুই তিন নাড়িয়া একটু ভাজা ভাজা করিয়া নামাইবে এবং ইহাতে গরম মসলার গুঁড়া, (দারুচিনি, লবঙ্গ ও ছোট এলাচ যাহা পূর্ব্বে গুঁড়াইয়া রাখা হইয়াছে) গোল মরিচ গুঁড়া ও দুই চাকা নেবুর রস মাখিয়া রাখ। এইরূপে পুর প্রস্তুত হইল।

পটোলের ভিতরে এখন এই মাংসের পুর ভরিয়া সুতা দিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া দাও, তা না হইলে পটোলের পেট হইতে মাংস বাহির হইবার সম্ভব। আবার হাঁড়িতে এক ছটাক ঘি চড়াও, কুচা করা পেঁয়াজ গুলি ইহাতে ছাড়িয়া ভাজ। তিন চার মিনিট ভাজা হইলে পর পেষা মশলা যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা, দই ও সিকি তোলাটাক নুন হাঁড়িতে ছাড়িয়া মশলাটাকে কসিতে থাকে। প্রায় মিনিট ছয় সাত কসিয়া, যখন দেখিবে জল মরিয়া ঘিয়ের উপর মশলা বুড় বুড় করিতেছে তখন উহাতে এক পোয়া জল দিয়া হাঁড়ি নামাইয়া ফেলিবে।

এইবারে আর একটী হাঁড়িতে এক ছটাক ঘি চড়াও। ঘিয়ে মাংসের পুর ভরা পটোলগুলি ছাড়। পটোলগুলা শাদাটে করিয়া কস, মিনিট চারের মধ্যেই কসা হইয়া যাইবে; ইহাতে পটোলের জল মরিয়া গিয়া ইহার হালসেটে গন্ধ চলিয়া যাইবে। এইবারে পূর্ব্বের হাঁড়িস্থিত তৈয়ারী ঝোলটা ইহাতে ঢালিয়া দিয়া, হাঁড়ি ঢাকিয়া দাও। মিনিট সাত আট পরে জল মরিয়া পটোল সিদ্ধ হইয়া আসিলে নামাইবে।

(ক্রমশঃ)

ব্যয়।—পটোল তিন চার পয়সা, মাংস তিন আনা, আদা ও পেঁয়াজ দুই পয়সা, নেবু এক পয়সা, গরম মশলা এক পয়সা, ঘি তিন আনা। আন্দাজ আট আনা খরচ করিলেই হইবে। পটোলের দর সব সময়ে এক থাকে না।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

আমের ফুল।

উপকরণ।—দুধ একসের, চিনি আধপোয়া, কাঁচা আম তিনটে, (ওজন তিন ছটাক), বরফ আধ পোয়া।

প্রণালী।—একটি কড়ায় একসের দুধ চড়াইয়া দাও, প্রায় মিনিট পনের কুড়ি জ্বাল দেওয়া হইলে দেড় ছটাক চিনি ঢালিয়া দাও। তারপরে আরো দশ পনের মিনিট আওটান হইলে দুধ নামাইয়া একটি পাত্রে ঢালিয়া রাখ। দুধটা ঠাণ্ডা হউক এই দুধে সর পড়িতে দিবেনা। সর যাহাতে না পড়ে তজ্জন্য ঘন ঘন নাড়িতে হইবে। যতক্ষণ না দুধ ঠাণ্ডা হইয়া যায় একটি পাত্রে জল রাখিয়া তাহার উপরে দুধের বাটী বসাইয়া দিলে শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। আমগুলি খোলা সমেত জলে সিদ্ধ করিতে দাও, মিনিট কুড়ির ভিতরে সিদ্ধ হইয়া যাইবে। এবারে সিদ্ধ আমের রস একটী কাপড়ে খুবমতে ছাঁকিয়া রাখ এবং উহাতে আধ ছটাক চিনি মিশাও। দুধ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যাইলে একটা কাঠের হাতা বা চামচে দিয়া নাড়িয়া লও। তারপরে দুধে আম রসটা এক হাতে ঢাল আর অপর হাতে চামচে ধরিয়া আমের রসে দুধ মিলাইতে থাক ; প্রায় সাত আট মিনিট চামচ করিয়া নাড়িলেই হইয়া যাইবে।—দেখিবে দুধ ক্রমেই গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। যখন চামচে করিয়া নাড়িতে থাকিবে বরাবর এক দিকে

* এই দেশীয় খাদ্যটী গ্রীষ্মকালে ইংরাজদের বড় প্রিয়। ইংরাজীতে নচরাচর ইহাকে 'ম্যাঙ্গো ফুল (Mango fool) বলিয়া থাকে।

হাত চালাইয়া নাড়িবে, অর্থাৎ যে দিকে নাড়িতেছ বরাবর সেই দিকেই নাড়িবে তাহার উল্টাদিকে নাড়িবে না।

কখনো আমরস বা দুধ গরম থাকে না যেন, তাহা হইলে দুধ দই হইয়া যাইবে।

গরমীকালে ইহা বরফ দিয়া খাইতে বড়ই তৃপ্তি জনক। বরফ কুঁচা ইহার উপরে দিয়া খাইবে। আইস্‌ক্রীম বা সরবতের পরিবর্ত্তে ম্যাঙ্গোফুল বা আমের ফুল খাইতে পার।

ব্যয়।—এক্ সের দুধ প্রায় চারি আনা, চিনি দু পয়সা, কাঁচা আম এক পয়সা, বরফ এক পয়সা। গড়ে পাঁচ আনা খরচ করিলেই হইবে। পল্লীগ্রামে যেখানে দুধ খুব সস্তা সেখানে এত খরচ লাগিবে না।

আমের ফুল (দ্বিতীয় প্রকার)

প্রণালী।—তিন পোয়া দুধকে জ্বাল দিয়া আধ সের কর। দুধে সর যেন কিছুতেই না পড়ে। দু তিনটা বড় দেখিয়া কাঁচা আম সিদ্ধ করিতে দাও; সিদ্ধ হইলে রসটা ছাঁকিয়া লও। এই ছাঁকা রসে আধপোয়াটাক মিছরি (দোবারা চিনি বা লোফ শুগার) ফেটাইয়া বেশ করিয়া মিশাও। এইবারে চিনি মেশান আমের রসটা দুধের সহিত মিশাইয়া, বরফ দিয়া খাও।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

অধ্যাত্মসঙ্গীত।

সাংখ্যস্বরলিপি।

রাগিণী পরজ তাল কাওয়ালী।

দীনদয়াময় ভুলনা এ অনাথে।

স্থান দিও প্রভু তবপদ কমলে মনে রেখো ভুলনা অনাথে।

ভ্রমি এ অরণ্যে হ'য়ে পথহারা, সত্বর লও তব সাথে।

কোন্ গুণ আছে হেন মন্দমতি মম, যাইবারে তব সন্নিধানে,

তুমি হে জ্যোতির জ্যোতি এ আঁখির কি শকতি,

তাকাইতে সে মিহির পানে।

নিরখি মনের প্রতি নাহি দেখি কোন গতি
ক্ষণে হই মগন নিরাশে।
স্মরি তব কৃপাগুণ, ভরসা হয় পুন
নিজগুণে তারিবে হে দাসে।

কথা—শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর স্থর—শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

তাল। ২ (স্থা, অ, ভো। ৩। ০। ১ ॥
মাত্রা। ৪ । ৪। ৪। ৪ ॥

২ ২
স্থাঃ— সা৷ নি৷ সা নি ধা। পা৷ ধা৷
স্থাঃ— দী — — ন দ। য়া —

পা পা। পা মা ধা ৮মা। "গা মা৷ মা গা৷ সা"
ম য়। ভু ল না অ। না — — — থে

অথবা "গা মা সা২"। সা২ সা সা।
অথবা না — থে। স্থা ন দি।

সা৷ গা৷ মা গা গা। মা ধা ধা ধা।
— — — প্র ভু। ত ব প দ।

২ [২
নি নি সা২। নি নি সা সা। সা সা
ক ম লে। ম নে রে খো। ভু লো

২
রেঁ২। গা রেঁ রেঁ৷ সাঁ৷ নি৷ সা৷ + সা। রেঁ৷
না। — অ না — — — —। —

২ ২
সা৷ নি৷ সা৷ নি ধা মা ধা। (স্থা-পু):— সা৷ নি৷
— — — থে — — —। (স্থা-পু):— দী —

২
সা নি ধাঁ । পাঃ ধাঁঃ পা পা । পা মা ধাঁ
— ন দ । য়া — ম য় । ভু লো না

মা । গা মাঃ গাঃ মা সা । (স্ত):— ধাঁ ধাঁ
অ । না — — — থে । (স্ত):— ভ্র মি

২...................... ২..................
নি নি । সা২ সা২ । সা নি সা সা । রেঁ
এ অ । র ণ্যে । হ য়ে প থ । হা

নি ধাঁ মাঃ ধাঁঃ । ধাঁ২ ধাঁ ধাঁ । পা মা পা
— রা — — । স ম্ব র । ল ও ত

২ ২..................................
ধাঁ । সা নি সা২ । রেঁঃ রেঁঃ সাঃ সাঃ নিঃ ধাঁ
ব । সা — — । — — — — থে —

২ ২
মাঃ ধাঁঃ । (স্থা-পু):— সাঃ নিঃ সা নি ধাঁ । পাঃ
-- । (স্থা-পু):— দী — — ন দ । য়া

ধাঁঃ পা পা । পা মা ধাঁ মা । গা মাঃ গাঃ মা
— ম য় । ভু লো না অ । না — — —

সা । (ভো):— সা২ মা গা । গা গা গা গা ।
থে । (ভো);— কোন্ গু ণ । আ ছে হে ন ।

মা ধাঁ ধাঁ ধাঁ । ধাঁঃ মাঃ ধাঁ ধাঁ ধাঁ । পাঁ ধাঁ
ম — ন্দ ম । তি — — ম ম । যাই বা

২.....................
ধাঁ । নি নি সাঁ সা । রেঁ নি ধাঁঃ মাঃ ধাঁ ।
রে । ত ব স ন্নি । ধা — — — — ।

মা গা রেঁ সা । ধাঁ ধাঁ সা নি । সা২ সা
— — — নৈ । তু মি হে জ্যো । তির্ম্ম জ্যো

২
সা । সা নি সা সা । রেঁ নি ধাঁ ধাঁ ।
তি । এ আঁ থি র । কি শ ক তি ।

ধাঁ ধাঁ ধাঁ ধাঁ । পা পা১/২ মা১/২ পা ধা । সা
তা কা ই তে । সে মি — হি র । পা

২
নি সা । রেঁ১/২ রেঁ সা১/২ সা১/২ নি১/২ ধাঁ১/২ মা১/২
— — । — — — — নে — —(এ)

২ ২
ধাঁ১/২ । (স্থা-পু):—সা১/২ নি১/২ সা ধাঁ ধাঁ । পা১/২
— । (স্থা-পু):—দী — — ন দ । রা

ধাঁ১/২ । পা পা । পা মা ধাঁ মা । গা
— । ম য় । স্তু লো না অ । না

মা১/২ গা১/২ মা সা । (ভো-দ্বি):—সা সা মা গা ।
— — — থে । (ভো দ্বি):—নি র থি ম ।

গা২ গা গা । মা ধাঁ ধাঁ ধাঁ । ধাঁ ধাঁ ধাঁ
নের্ প্র তি । না হি দে খি । কো ন গ

২
ধাঁ ধাঁ ধাঁ ধাঁ ধাঁ । নি নি সা সা । রেঁ নি
তি ক্ষ ণে হ ই । ম গ ন নি । রা —

২
ধাঁ১/২ মা১/২ ধাঁ । মা গা রে সা । ধাঁ ধা সা নি ।
— — — । — — — শে । স্ম রি ত ব ।

২.. ২...................................
সা সা সা সা । সা নি সা সা । রেঁ নি
কৃ পা গু ণ । ভ র সা হ য় পু

ধাঁ।২ । ধাঁ ধাঁ ধাঁ ধাঁ । পা পা$\frac{1}{2}$ মা$\frac{1}{2}$ পা
ন । নি জ গু ণে । তা রি — ষে

২ ২..
ধাঁ । সা নি২ সা । রেঁ$\frac{1}{2}$ রেঁ$\frac{1}{2}$ সা$\frac{1}{2}$ সা$\frac{1}{2}$ নি$\frac{1}{2}$ ধাঁ
হে । দা — — । — — — — সে —

২
মা$\frac{1}{2}$ ধাঁ$\frac{1}{2}$ ॥ সাঃ
—(এ) — ॥ দী

১। স্থা=আস্থাই। স্থা—পু=আস্থাই পুনরায়। অ=অন্তরা। ভোঁ—প্র=প্রথম আভোগ। ভো—দ্বি=দ্বিতীয় আভোগ।

২। সুরের পার্শ্বে সংখ্যা চিহ্ন=মাত্রাচিহ্ন যথা পা$\frac{1}{2}$=অর্দ্ধমাত্রিক পা, ধা$\frac{1}{2}$ ধা$\frac{1}{2}$+ধা=ধা$\frac{1}{2}$+ধা১=ধা১$\frac{1}{2}$=ধা$\frac{3}{2}$=দেড়মাত্রিক ধা।

৩। চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন=কোমলের চিহ্ন। সুরের উপর সংখ্যা-চিহ্ন=উচ্চসপ্তকের চিহ্ন। যথা সা (২)=দ্বিতীয় উচ্চ সপ্তক বা তারসপ্তকের সা।

৫। সমের চিহ্ন=সুরের পার্শ্বে বিসর্গ চিহ্ন। যদি একই উচ্চসপ্তকের কতকগুলি সুর পরে পরে থাকে, তাহাহইলে প্রথম সুটীর উপরস্থিত সপ্তক চিহ্ন হইতে ফুটকি বা ক্ষুদ্র কসি টানিয়া যাইতে হইবে। যথা

২................
সা সা সা সা।
কৃ পা গু ণ।

শ্রীপ্রতিভাসুন্দরী দেবী।

সমালোচনা।

১। নূতন ভূগোল প্রবেশ (প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য) শ্রীবগলারঞ্জন দাস প্রণীত।

২। ভূগোল শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, প্রণীত।

আমরা ভূগোলসম্বন্ধীয় উপরোক্ত দুইখানি পুস্তক পাইয়া সাদরে গ্রহণ করিতেছি। প্রথম খানিতে লেখা আছে "প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য", দ্বিতীয় খানিতে ঐ কয়েকটী কথা লিখিত না থাকিলেও রচনা প্রণালী হইতে বুঝিতে পারি যে এখানিও প্রথম শিক্ষার্থী কোমলমতি বালকদিগের জন্য রচিত হইয়াছে। বালকদিগের কোমল মস্তিষ্কের মধ্যে কঠিন বিষয় সকল প্রবেশ করাইবার জন্য যে এরূপ উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, ইহা কম আশাপ্রদ নহে। বালকবালিকার অভিভাবকদিগের মনে যে কঠিন বিষয় সকল তাহাদের কোমল মস্তিষ্কে সহজসাধ্যরূপে প্রবেশ করাইবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে, উপরোক্ত গ্রন্থসমূহের ন্যায় গ্রন্থপ্রকাশের চেষ্টা যত্ন তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র। তবে সকল গ্রন্থকার যে সেই অভীষ্ট বিষয়ে সম্যক্ কৃতকার্য্য হইবেন, এরূপ আশা করা যায় না; আশা এই টুকু হয় যে ভবিষ্যতে বালকদিগের মস্তক হইতে অনেকটা গুরুভার নামিয়া যাইবে।

প্রথমোক্ত পুস্তকখানি প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্য লিখিত হইলেও তাহাদিগের যে সম্যক্ উপযোগী হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। ইহা পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ভূগোলশিক্ষাপ্রণালীর আদর্শে লিখিত। প্রথমেই ছাত্রদিগের কণ্ঠস্থ করাইবার জন্য কতকগুলি ভৌগোলিক পরিভাষার সমাবেশ। ছাত্রেরা এইগুলি অক্ষরে অক্ষরে কণ্ঠস্থ করিতে পারে কিন্তু তাহারা যে ইহার এত টুকুও মর্ম্মগ্রহে সমর্থ হইবে, তাহা বলা দুরূহ। দুএকটী পরিভাষা বিষয়ে ছাত্রেরা যে কি ভাব সংগ্রহ করিয়া রাখিবে, আমরা তাহা আদৌ স্থির করিতে পারিতেছি না। যেমন, "মহাসাগর (Ocean)—লবণাক্ত প্রকাণ্ড জলরাশির নাম মহাসাগর। যথা;—ভারত মহাসাগর এসিয়ার দক্ষিণে।" এইরূপ আরও অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারিত, স্থানাভাবে

অসমর্থ। মহাসাগরের উক্ত সংজ্ঞা হইতে ছাত্রদিগের মনে একটা নুনগোলা জলে পরিপূর্ণ বৃহৎ পুষ্করিণীর অধিক যে ভাব আসিতে পারে তাহা আমাদের বোধ হয় না। এই পুস্তকের আর একটী দোষ রাশীকৃত নগর নদী প্রভৃতির উল্লেখ। এইগুলি কণ্ঠস্থ করিতে গিয়া ছাত্রদিগের অন্নপরিপাকের যে বিশেষ ব্যাঘাত হয়, এবং তাহারই ফলে আমরা যে দুর্ব্বল অস্থিসার ও সুতরাং কাপুরুষ বঙ্গসন্তান দেখিতে পাই তাহা বলাই বাহুল্য। এই দোষগুলি কেহ যেন গ্রন্থকারের বুদ্ধিহীনতার ফল বলিয়া বিবেচনা না করেন—ইহা পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির ফল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসাহদানের অভাবের ফল। বিশ্ববিদ্যালয় যাহা চাহেন, তাহার জন্য প্রস্তুত করিবার পক্ষে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি মন্দ হয় নাই। প্রশ্নাবলী দিয়া ছাত্রদিগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে সহায়তা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে উপরোল্লিখিত দোষসমূহের পরিহারের জন্য যে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। গ্রন্থকার যে এবিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাও বলা বাহুল্য; উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে উপযুক্ত ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। রামেন্দ্র বাবু যে বিজ্ঞানশাস্ত্র আপনার অস্থিমজ্জার অংশ করিয়া লইয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থখানিতেই সম্যক্ প্রকাশ পাইতেছে। অনেকের ধারণা এই যে বালকদিগের জন্য ভূগোল প্রণয়ন করিতে গেলে বিশেষ পরিশ্রমের ও বিস্তৃত অধ্যয়নের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত সত্য ঠিক ইহার বিপরীত। প্রথমেই বালকদিগের মানসিক ভাব, শক্তি প্রভৃতি সম্যক্ বুঝিবার জন্য মনোবিজ্ঞান আলোচনা করা বিশেষ আবশ্যক এবং আনুসঙ্গিক আলোচনার বিষয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি নানা বিজ্ঞানশাস্ত্র আসিয়া পড়ে। তাহার পরে বিষয়গুলিকে যথাযোগ্য সামঞ্জস্য সহকারে সজ্জিত করা প্রভৃতি বিষয়ে একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকাও আবশ্যক এবং তজ্জন্য উপযুক্ত যত্ন ও চিন্তা প্রয়োগ প্রয়োজনীয়। রামেন্দ্র বাবুর পুস্তকে এই সকলের বিশেষ পরিচয়ই পাওয়া যায়। বালকদিগের তরুণ মস্তকে যে ইষ্টক-কঠিন কতকগুলি নীরস ভৌগোলিক তত্ত্বের পরিবর্ত্তে সরস জ্ঞান প্রবেশ করাইবার পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বঙ্গবাসীমাত্রেরই

নিকট ধন্যবাদার্হ ও কৃতজ্ঞতাভাজন নিঃসন্দেহ। প্রথম পুস্তক হইতে মহাসাগরের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, এবারে দ্বিতীয় পুস্তক হইতে মহাসাগরের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করিতেছি—পাঠকগণ ইহার বিশেষত্ব সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। "ভারতবর্ষ হইতে সমুদ্রপথে জাহাজে ইংলণ্ডে যাইতে হয়। বাঙ্গালার দক্ষিণেই সমুদ্র। কলিকাতার গঙ্গায় নৌকা চাপিয়া দক্ষিণমুখে কিছুদূর গেলেই সমুদ্র। সমুদ্রপথে জাহাজে বিশদিনের মধ্যে ইংলণ্ড পৌঁছান চলে। মহাসাগরের উপর দিয়া জাহাজ চলে। আফগানিস্থান, পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশ চলিবার সময় ডাহিনে থাকে। উপরে কয়েকটা মহাদেশের নাম করিয়াছি। মহাদেশ কয়টি ছাড়িয়া দিলে পৃথিবীর আর প্রায় সমস্তই মহাসাগর। মহাদেশ পৃথিবীর স্থলভাগ, মহাসাগর জলভাগ।" উপরোক্ত বিবরণের একটি স্থলেও মহাসাগরের পরিভাষা বা সংজ্ঞা উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু সমস্তটুকু পড়িলে মহাসাগরের বিশাল জলরাশির ভাব কি সহজেই বালকগণের অন্তরে উদয় হইবে না? যে বিষয় আজকাল অধিকাংশ বাঙ্গালী জানে এবং যাহার জন্য বিদ্যালয়ের অনেক ভাল ছাত্রেরা উন্মুখ হইয়া থাকে, সেই বিলাতযাত্রা হইতে রামেন্দ্র বাবু মহাসাগরের কথা আনিয়া বুদ্ধিমান অধ্যাপকের কার্য্যই করিয়াছেন—ছাত্রদিগের নিকট মহাসাগরকে একটি মনোরঞ্জক জ্ঞাতব্য বিষয় করিতে পারিয়াছেন। আরও দুইটী বিষয় এই বিবরণে সংযুক্ত হইলে ভাল হইত বোধ হয়—সমুদ্রজল যে লবণাক্ত ইহা বলা আবশ্যক; দ্বিতীয় সাগর-সঙ্গম তীর্থযাত্রার উল্লেখ করিলে বোধ হয় বাঙ্গালীমাত্রেরই নিকট সাগরের বিষয় আরও মনোরঞ্জক হইত। রামেন্দ্র বাবুর পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে ইতিহাসকে ভূগোলের অংশ করিয়া লওয়া হইয়াছে। তিনি তাঁহার বিজ্ঞাপনেই বলিয়াছেন "দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত মনুষ্যের ইতিহাসের সম্বন্ধ দেখানই ভূগোলশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য; ইহাই মূলসূত্র ধরিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।" এশিয়ার ইতিহাস প্রভৃতি ঐতিহাসিক অংশ দুএকস্থলে আমাদের বোধ হয় যে কিছু সংহত করা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় আর একটু বিস্তৃত আকারে অর্থাৎ আর একটু গল্পের ভাবে বলিলে ভাল হয়। অবশ্য ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিবার আশা করি এবং দ্বিতীয় সংস্করণ যে আরও উৎকৃষ্ট হইবে,

সেবিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ আছি। এই পুস্তকের আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহাতে কণ্ঠস্থ করিবার জন্য রাশীকৃত নদনদী নগর উপনগর প্রভৃতির নাম পিণ্ডভাবে প্রদত্ত হয় নাই।

এইবার ইহার আর একটী বিশেষ ভাবের উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিব—তাহা জাতীয়তা। ভূগোলে জাতীয়তা নামক অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া অনেকেই যে উপহাস করিতে আসিবেন, তাহা জানি, কিন্তু যদি আমাদের প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষাতে জাতীয় ভাব অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে জাতীয় উন্নতির বিলম্ব হইবে না বলিয়া আমরা আশা করিতে পারি। রামেন্দ্র বাবু ভারতবর্ষের নগর উপনগর উল্লেখ করিতে গিয়া প্রাচীন গৌরবের আশ্রয়স্থল নানাস্থানের যে প্রকারে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই এই জাতীয়তা সম্যক্ প্রকাশ পাইয়াছে—এবং এইরূপ প্রত্যেক বিষয়ের পুস্তকে ও শিক্ষাদান-কালে আমাদের রক্তমাংস পরিপোষক বিষয় সকলের উল্লেখ থাকা আবশ্যক। রামেন্দ্র বাবু বাছিয়া বাছিয়া শান্তিপুর, ত্রিবেণী নবদ্বীপ প্রভৃতি যে সকল সকল স্থান যে ভাবে আমাদের হৃদয়ে রক্তমাংস আনিয়া দিতে পারে সেই সকল স্থানের সেই ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন; অনেকগুলির প্রাচীন মহিমা সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইয়াছে—ইহাতে ক্ষুদ্র বালকের ক্ষুদ্র হৃদয়কে অতীতের দিকে কতদূর বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ইংরাজী পুস্তকে এইরূপ জাতীয়তা রক্ষিত হয় বলিয়া ইংরাজজাতি বাল্যকাল হইতে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে শিক্ষা পাইয়া থাকে।

যাই হোক্, রামেন্দ্র বাবু "প্রকৃতি" পুস্তকের পর এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া বঙ্গসন্তানমাত্রকেই উপকৃত করিয়াছেন। তিনি যে ব্রাহ্মণের উপ-যুক্ত কার্য্য ব্রহ্মচারী বালকদিগের শিক্ষাদানে ব্রতী হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার প্রতি আমরা যে কি পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, তাহা একমুখে বলিতে পারি না।

নব্যভারত—চৈত্র, ১৩০৪।

"বঙ্গদেশে সঙ্গীতচর্চ্চার" প্রবন্ধের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এইখণ্ডে বিশেষ নূতন কোন কথা নাই, তবে লেখক বিভিন্ন স্বরলিপি প্রকাশকরূপে যে অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা স্বরলিপিকারদিগের

দৃষ্টিযোগ্য। তবে আমাদের বোধ হয় যে ইহাতে উন্নতি ব্যতীত অবনতি নাই। যদি বঙ্গসাহিত্যে টেকচাঁদঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রচলিত পথ হইতে নূতন পথ অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গভাষার এরূপ সৌষ্ঠববৃদ্ধি হইত কি না সন্দেহ। সেইরূপ আমাদের বিশ্বাস যে বিভিন্ন স্বরলিপি প্রচলিত হইতে থাকিলে স্বরলিপিকারগণ আপনার আপনার স্বরলিপির সৌষ্ঠবসাধনে যত্নবান্ হইবেন এবং ফলে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন হইবে। লেখক যদি বিভিন্ন স্বরলিপির উপযোগিতার পরিমাণ বারান্তরে প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়। যে স্বর-লিপি যতটুকু বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে দাঁড়াইবে, তাহার স্থায়িত্ব তত-টুকু আশা করা যাইতে পারে। আশা করি লেখক আলোচনাকালে এদিকটা ভুলিবেন না। শ্রীপতি বাবু অনেকদিবসাবধি থাকিয়া বিলাতীয় সমাজের ভিতরকার খবর পাইয়া তৎসম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে-ছেন, তাহা বড়ই চিত্তাকর্ষক। বর্ত্তমান সংখ্যায় ক্রিষ্টমাসের উল্লেখ করিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে আমাদের দেশের বিজয়ার অভিবাদন ও প্রেমালিঙ্গন অপেক্ষা বিলাতে ক্রিষ্টমাসের দিনে অভিবাদন ও প্রেমালিঙ্গন প্রাণখুলিয়া দেওয়া হয়। আমাদের বোধ হয় যে শ্রীপতি বাবু সহরের দুএকটী ঘরের বিজয়া ব্যাপার অথবা পল্লীগ্রামেরও দুএকটী দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা বাস্তবিক পল্লীগ্রামের মুক্তপ্রাণ ব্যক্তিদিগের বিজয়াসম্ভাষণ প্রভৃতি দেখিয়াছেন, তাঁহারা, তাঁহার একথার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন না; তবে বিলাতের সঙ্গে আমাদের তফাৎ আছে—আমরা দরিদ্র, আমাদের বিজয়ার উৎসবের দিনেও ঘরে ভাত আছে কিনা এচিন্তা আজকাল সহজে যাইতে চাহে না, বরঞ্চ দিন দিন বাড়িতেছে, কাজেই নিরাময় আনন্দ আমরা উপভোগ করিতে পারি না। কিন্তু তাহা হৃদয়ের সম্প্রীতির অভাবে নহে।

পূর্ণিমা—চৈত্র, ১৩০৪।

প্রথমেই "পাপের পরিণাম" গল্পের অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায় মাসিক পত্রিকার অর্দ্ধেকের অধিক পূর্ণ করিয়াছে। এরূপ গল্প প্রকাশ করিতে থাকিলে পাঠক-দিগের ধৈর্য্যচ্যুতির বিশেষ আশঙ্কা।

বর্ত্তমান সংখ্যার ৺সুরেন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের মৃত্যুপলক্ষে তাঁহার জীবনীর আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। স্থানীয় পত্রে যদি এইরূপ স্থানীয় খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের জীবনী প্রকাশিত হয়, তাহা হইলেই তাহার উপযুক্ত কার্য্যকরা হয়।

"বার্ষিক সমালোচনায়" সমালোচক মাসিক পত্র সম্পাদকদিগকে গুরু-গম্ভীর উপদেশ দিয়াছেন যে প্রত্যেক মাসিক পত্রের প্রত্যেক সংখ্যা যেন একএকটী বিশেষ সুরে বাঁধা হয়। অধিকাংশ পত্রেরই পক্ষে এই উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। প্রায় সকল মাসিক পত্রই নিজের আদর্শ স্থির রাখিয়া তাহারই পরিধিস্বরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে যত্নবান্। সুতরাং সেগুলির সুর সহজেই শোনা যায়। তিনি যে সকলগুলির সুর ধরিতে পারেন নাই, তাহার কারণ তিনি বর্ত্তমান কালের সুরের মধ্যে ভালরূপে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। আমাদের melody শোনা অভ্যাস আছে; সহসা বিদেশীয় harmony শুনিলে কেমন কর্কশ বোধ হয়। কিন্তু কিছুদিন শুনিতে শুনিতে এমনি চমৎকার লাগে যে তখন আর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। এই harmonyর লক্ষণ এই যে পাঁচরকম সুর মিলিয়া একটা স্বরচ্ছবি প্রস্তুত করিবে। সেইরূপ বৈচিত্রের মধ্যে একত্ব, অসামঞ্জস্যের মধ্যে সামঞ্জস্য অনুভব করিতে গেলে একটু পুরাতন গণ্ডী ছাড়িয়া আসিয়া নূতন পথে পদার্পণ করিতে হইবে, বর্ত্তমান যুগের নূতন বিক্ষুব্ধ ভাবের মধ্যে অন্তরের সহিত প্রবেশ করিয়া দেখিতে হইবে। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

ভ্রম সংশোধন।

২৪২ পৃষ্ঠায় "পটোলের দোল্মা"র শেষাংশে ভ্রমক্রমে "(ক্রমশঃ)" ছাপা হইয়াছে, ইহা ব্যতীত আরও দুএক স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুল আছে পাঠকগণ সংশোধন করিয়া লইবেন।

পুণ্য।

বীরেন্দ্র।

(ক্ষুদ্র উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যোদয়ে, সরযূর সুন্দর তীরে, অতুল বিক্রমশালী বাদশাহ সুলেমানের শিবির অতি রমণীয় দৃষ্ট হইতেছিল। সুবর্ণ-ধ্বজা ও পতাকাবলী প্রতিফলিত হইয়া দর্শকবৃন্দের নেত্র সঙ্কুচিত করিতেছিল। শিবির এরূপ প্রকারে রচিত হইয়াছিল যে, উহার এক কোণে বাদশাহের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা মুরাদের, দ্বিতীয় কোণে মুরাদের কনিষ্ঠভ্রাতা শাহজাদা খসরুর, তৃতীয় কোণে সৈন্যাধ্যক্ষ দিলারজঙ্গের ও চতুর্থ কোণে বাদশাহের বেগমগণের আবাসস্থান সন্নিবেশিত ছিল। এই চতুর্ভুজের মধ্যস্থলে রাজরাজেশ্বর বাদশাহ সুলেমানের পটমণ্ডপ সুশোভিত ছিল। আর এই শিবিরকে ঘিরিয়া, দশক্রোশ পর্য্যন্ত অগণনীয় ছোট বড় তাম্বু ও শামিয়ানা দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এই দৃশ্য সন্দর্শনে এরূপ প্রতীতি হইতেছিল যেন বনভূমি তৎকালে কি এক বিচিত্র নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে সিপাহী শান্ত্রীদিগের প্রমাণিত চরণ চালনের মৃদুমন্দ ধ্বনি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন শব্দ কর্ণগোচর হইতেছিল না। সূর্য্যকিরণে সমবেত রাজন্য-মণ্ডলীর রত্নজড়িত শিরোবেষ্টন, পদক, কবচ ও অস্ত্র সমূহ এরূপ ঝক্‌মক্ করিতেছিল যে, কেহই উহার উপর দৃষ্টি ক্ষণমাত্র স্থির রাখিতে পারিতেছিল না।

বাদশাহ সুলেমান স্বীয় পটমণ্ডপে এক মনোহর সিংহাসনে সমাসীন হইয়া ভাবীযুদ্ধ সম্বন্ধে চিন্তামগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময়ে এক স্বর্ণযষ্টিধারী

বালসেবক দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া করপুটে ও সবিনয়ে বাদশাহকে বিজ্ঞাপন করিল "জঁহাপনা! শত্রুপক্ষ হইতে জনৈক যুবক বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছে এবং মহানুভবের শ্রীচরণতলে স্বীয় প্রয়োজন নিবেদনার্থ অনুমতি অপেক্ষা করিতেছে।"

বাদশাহ আদেশ করিলেন "চিরপ্রথানুসারে বার্ত্তাবহের সম্মান রক্ষা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। শীঘ্র যুবককে মৎসমীপে আনয়ন কর।" শ্রীমুখ হইতে এই আজ্ঞা শ্রবণমাত্র চোপদার গৃহ হইতে বহির্গত হইল। বাদশাহের সম্মতি প্রাপ্ত্যনন্তর যুবক অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। দ্বারে আসিয়া স্বীয় সহচরদিগকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে সঙ্কেতপূর্ব্বক, আপনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন, এবং যথোচিত নম্রতাসহ বাদশাহকে অভিবাদন করতঃ সম্মুখীন হইলেন। বাদশাহ সুলেমান এই তরুণবয়স্ক নবাগন্তুককে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে তাঁহার সুন্দর কান্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে যুবক! তোমার নাম কি?"

যুবক বলিলেন—"বীরেন্দ্রসিংহ" বাদশাহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "এখানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ?"

যুবক উত্তর করিলেন "রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ মানসিংহ জঁহাপনার নিকট সন্ধির প্রস্তাব হেতু এ দাসকে প্রেরণ করিয়াছেন।

"মহারাজ বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন যে, আপনার সৈন্যসংখ্যা তাঁহার অপেক্ষা ন্যূন না হইলেও, রাজপুতদিগের স্বাভাবিক বীরত্ব ও রণকৌশলের সম্মুখে অনিপুণ মুসলমানগণের পরাভব অনায়াস-সাধ্য ও সুনিশ্চিত। পরন্তু মহারাজের ইচ্ছা নয় যে, বৃথা যুদ্ধে নিরর্থক নিজের নির্দ্দোষী প্রজামণ্ডলীর শোণিত প্রবাহিত হয়। অতএব তিনি মৎকর্ত্তৃক সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন।"

বাদশাহ এই স্পর্দ্ধাজনক কথা শুনিয়া ক্রোধসূচক গম্ভীরস্বরে বলিলেন "ওরে যুবক! তোর এ প্রস্তাব বাতুলের প্রলাপ মাত্র। মদীয় অধীনতা স্বীকার না করিয়া যে কেহ সন্ধির প্রস্তাব করিতে চায়, সুলেমান তাহাকে সতত ঘৃণার চক্ষে দর্শন করে।"

এই কথা শুনিয়া রাজপুত যুবক বলিয়া উঠিলেন "আমি যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি তাহাতে আপনার সৈন্যসামন্ত সমেত এ প্রদেশে আসা অধিকতর ধৃষ্টতার কার্য্য হইয়াছে।"

বাদশাহ ইহাতে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"তুই যদি অদূরদর্শী বালক না হইতিস্ ত এখনি স্বহস্তে তোর প্রাণবধ করিতাম। আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, তোর প্রভুকে গিয়া বল যে, বাদশাহ সুলেমান নিজ শত্রুকে শিক্ষা দিতে সম্যক্‌রূপে সমর্থ। তোকেত ক্ষমা করিলাম, কিন্তু তোর প্রভুর হস্তপদ লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাজধানীতে টানিয়া লইয়া যাইব। আর তুইও জানিস্—আমার শিবির অতিক্রম করিলেও, তুই সম্পূর্ণ নিরাপদ নহিস্। আরও জানিস—যদি তুই ধৃত হইয়া পুনরায় আমার নিকট আনীত হোস্, তা'হলে তোর অদৃষ্ট নিশ্চয় বড়ই নিগুণ।" এই কথা শুনিবামাত্র বীরেন্দ্র সিংহের ক্রোধাগ্নি একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রাজপুতোপচিত উত্তর দিতে উদ্যত হইতেছেন এমন সময়ে জনৈক উজীর (রাজসভাসদ্) সুলেমানের নিষ্ঠুর স্বভাব স্মরণ করিয়া এবং বীরেন্দ্র সিংহের নবযৌবন দর্শনে করুণচিত্ত হইয়া তড়িৎবেগে অগ্রসর হইলেন, ও তাঁহার হস্তধারণ করতঃ বলপূর্ব্বক বাদশাহের সম্মুখ হইতে অপসারিত করিলেন, এবং পটমণ্ডপের বহির্দেশে লইয়া গিয়া কহিলেন—"রে নির্বোধ যুবক! তুই বিবর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেশরীর কেশরোৎপাটন করিতে সাহসী হইয়াছিস্?" নির্ভীকচিত্তে বীরেন্দ্র উত্তর করিল—"বাদশাহ আমার যেরূপ ঘোর অবমাননা এবং তিরস্কার করিয়াছেন আজ পর্য্যন্ত কখন কোন রাজপুত তাহা সহ্য করে নাই। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি—ইহার প্রতিশোধ না লইয়া আমি কখনই ক্ষান্ত হইব না। রাজপুতের বাক্য অলঙ্ঘনীয়।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বীরেন্দ্রসিংহ অপন দলবল সমেত পুনরায় কানন পথে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং একবার নিজ অনুযাত্রিক বর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"ভীষণ সংগ্রাম অনিবার্য্য। মুসলমানেরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছে।

যদি পথিমধ্যে কোন মুসলমান অশ্বদলের সহিত সাক্ষাৎ হয়, সংখ্যাতে যত অধিক হউক না কেন, আমি কখনই তাহাদের সহিত সম্মুখযুদ্ধে পরাঙ্মুখ বা পশ্চাৎপদ হইব না।" তাঁহার রাজপুত সহচরগণ তাঁহার এই প্রস্তাব আনন্দের সহিত অনুমোদনপূর্ব্বক শত্রুদলের সহিত সংঘর্ষণাকাঙ্ক্ষায় হৃষ্টচিত্তে এবং সতর্ক পদক্ষেপে গমন করিতে লাগিল। বহুদূর যাইতে না যাইতেই উহাদের মধ্যে একব্যক্তি চীৎকার করিয়া উঠিল "শত্রু—শত্রু!"। বীরেন্দ্র অশ্ববল্গা সংযত করিয়া দৃষ্টি সঞ্চার পূর্ব্বক দেখিলেন বৈতরণীর তট শত্রুদলে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। তাহাদের অসংখ্য সৈন্য-দল সত্বেও, বীরেন্দ্র কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া স্বীয় সহচরবর্গকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন—"ভাই! সম্মুখে শীকার উপস্থিত; আগত শীকার পরিত্যাগ করা রাজপুতবীরের পক্ষে মাতৃদুগ্ধের অবমাননা এবং ক্ষত্রিয়কুলে কলঙ্কারোপ করা।"

রাজপুতবীর এই কথা বলিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং অশ্ব-রজ্জু শিথিল করিয়া অতুল সাহসের সহিত শত্রুদলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অল্প ক্ষণেই বৈতরণীর জল রক্তময় হইল। আর উহার সুন্দর তীর ভীষণ রণক্ষেত্রে পরিণত হইল। বলাবাহুল্য, মুসলমানেরা সংখ্যায় দ্বিগুণ হইলেও, রাজপুতযুবক স্বীয় স্বাভাবিক অটল বীরত্বের গুণে বিজয়ী হইলেন। মুসলমানের দল চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। শেষে রাজপুতের হস্তে অনেক কয়েদী নিপতিত হইল। বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় যে, কয়েদীদিগের মধ্যে বাদশাহ সুলেমানের পুত্রী শাহজাদী মাহরু বিবিও ঘটনাচক্রে বীরেন্দ্রের হস্তগত হইলেন। রাজকুমারীকে ভয়বিহ্বল দেখিয়া রাজপুতযুবক আশ্বাস-স্বরে বলিলেন,—"অয়ি সুন্দরি! কিছুমাত্র ভীত হইও না। তুমি দয়াশীল শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছ"। শাহজাদী মাহরু এই রাজপুতযুবকের আশাতীত সদ্ব্যবহারে এবং তাঁহার আশ্বাস বাক্যে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—"হে অপরিচিত যুবক! তুমি আমাকে বাদসাহ সুলেমানের পুত্রী মাহরু বলিয়া জানিও আর—" "মাহরু" নাম শ্রবণমাত্র বীরেন্দ্র চমকিত হইলেন। বলা বাহুল্য, তৎকালে ভূমণ্ডলে যত সুন্দরী ছিলেন, মাহরু তাঁহাদিগের মধ্যে রূপলাবণ্যে অগ্রগণ্যা বলিয়া

খ্যাত ছিলেন। সেই অদ্বিতীয় রমণীরত্ন ঘটনাচক্রে তাঁহার হস্তগত হইল। যাহাহউক এই অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী যুবতীর কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তাহাই তিনি এখন মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ক্ষত্রিয়দলের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মহারাজ অমরসিংহ সমীপে মাহরুকে লইয়া যাইবেন এবং তাঁহার মতামত জানিয়া কোন এক সুব্যবস্থা করিবেন। রাজকুমারীর মনে বিশ্বাস সঞ্চার পূর্ব্বক দিবাবসানপ্রায়কালে, বীরেন্দ্র সদলে মহারাজ অমরসিংহের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে রাজকুমারীর মুখাবরণ হঠাৎ স্খলিত হইল। অন্ধকার রজনীতে অকস্মাৎ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইল। মাহরুর মুখজ্যোতিতে বীরেন্দ্রের দৃষ্টি ক্ষণমাত্র নিমীলিত হইল। তিনি এই অলৌকিক সৌন্দর্য্যরাশি দর্শনে বিমুগ্ধ এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অতঃপর তিনি মহারাজ অমরসিংহ সমীপে পৌঁছিলেন এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে জ্ঞাত করাইলেন। মহারাজ অমরসিংহ কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনানন্তর বীরেন্দ্রকে বলিলেন—"মহারাজ মানসিংহ ক্ষত্রিয়দলের নেতা; মাহরু বিবরণ তাঁহারই কর্ণগোচর হওয়া শ্রেয়স্কর অতএব তুমি তাঁহার নিকট সত্বর গমন কর। তোমার প্রত্যাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত মাহরু এখানে নিরাপদে অবস্থিতি করিবে।" বীরেন্দ্র মহারাজ অমরসিংহের উপদেশানুসারে অনতিবিলম্বে মহারাজ মানসিংহের আলয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্ষত্রিয়বীর বীরেন্দ্র মহারাজ মানসিংহের সমীপে উপস্থিত হইয়া, সংক্ষেপে সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন। মহারাজ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন—"অগত্যা আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, হরেরিচ্ছাবলীয়সী—সুলেমানকে কেমন দেখিলে?"

বীরেন্দ্র উত্তর করিলেন—"সুলেমান সিংহসম অসীম পরাক্রমশালী। এদাস যদি মহানুভবের সেবায় নিযুক্ত না থাকিত, তাহা হইলে, জগতে সুলেমান ভিন্ন অন্য কাহারও দাসত্ব করিতে স্বীকৃত হইত না। মহারাজ মানসিংহ এই কথা শুনিয়া, এক বৃদ্ধ সচিবের সহিত নিভৃতে কিয়ৎক্ষণ

মন্ত্রণা করিয়া বীরেন্দ্রকে কহিলেন—"যুদ্ধ অনিবার্য্য, তুমি প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হও। ইতিমধ্যে মহারাজ অমরসিংহকে আমার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া দিতেছি। তিনিই মাহরুর বন্দোবস্ত করিবেন।" (হায়! হতভাগ্য বীরেন্দ্র! জাননা তোমাকে পত্রাকারে কালসর্প শিরে ধারণ করিয়া লইয়া যাইতে হইবে!)

কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ, বীরেন্দ্রের হস্তে পত্র দিয়া, বহুসন্মান এবং প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

তদনন্তর বীরেন্দ্র মহারাজ অমরসিংহের শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহারাজ ক্ষিপ্র-হস্তে পত্রাবরণ উন্মোচনপূর্ব্বক পাঠ করিতে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু পত্র-মর্ম্ম অবগত হইবামাত্র তাঁহার মুখকান্তি পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল এবং সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। বীরেন্দ্র পুত্তলিকাবৎ একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজ অমরসিংহের মুখ-বিকৃতি দেখিয়া মাহরু সম্বন্ধে যৎপরোনাস্তি ভীত ও সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন। তিনি পত্র-মর্ম্ম জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বীরেন্দ্রের অনুরোধে মহারাজ অমরসিংহ তাঁহাকে পত্রপাঠ করিয়া শুনাইলেন। পত্র এইরূপ লিখিত ছিল—"শাহজাদী মাহরুকে বিষয়মেঁ—জো কি হমারী কঁয়েদমেঁ হৈ—হমারে সহায়ক ঔর পরম মিত্রকো এসা কর্ত্তব্য হৈ। সমস্ত ক্ষত্রিয়োঁকে হিতার্থ সংগ্রাম কা নহী হোনাহী অভীষ্ট হৈ, পরন্তু রুধির পিপাসার্থী সুলেমান কিসী প্রকার নহীঁ মানতা। অতএব হমকো ভী অবসরানুসার বর্ত্তাব করণা আবশ্যক হৈ। ইস লিএ মাহরুকা উসকে পিতা সুলেমানকে সুব্যবহার কা বিশ্বাসস্থান বনাকরকে বাদশাহ কো হমারে বিচারোঁ সে সূচিত করেঁ, ঔর উসকে দুষ্টাচার কে সমাচার পাতেহী মাহরুকা মস্তক ধড়সে পৃথক করদেঁ। জব কি সুলেমান কিসী দশামেঁ সন্ধি গ্রহণ নহীঁ করতে তো, হমকোভী নম্রতা ধারণ করনা সর্ব্বথা অনুচিত হৈ।" অর্থাৎ—"বাদসাহ দুহিতা মাহরু সম্বন্ধে আমি যেরূপ আদেশ করিতেছি, আমার পরম মিত্র মহারাজ অমরসিংহের তদ্‌স্বরূপ কার্য্য করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। ক্ষত্রিয়দিগের হিতার্থে সংগ্রাম না হওয়া আমার অভীষ্ট। কিন্তু রুধির-পিপাসার্থী সুলেমান যুদ্ধ হইতে

নিবৃত্ত হইতে অনিচ্ছুক। অতএব আমারও অবসরানুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আমার বিচারে, মাহরুকে তাহার পিতা সুলেমানের সদ্ব্যবহারের বিশ্বাসস্থান করতঃ তাঁহাকে অবগত করা যাউক এবং তাঁহার প্রতিকূলাচরণের সংবাদ পাইবামাত্র মাহরুর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হউক। যখন দুষ্টমতি যবনগণ কোন প্রকারেই সন্ধির প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতেছে না, তখন আর অধিক নম্রতা ধারণ আমার পক্ষে সর্ব্বথা অনুচিত।"

মহারাজ অমরসিংহ পত্রপাঠ সমাপ্ত করিতে না করিতে একব্যক্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া নিবেদন করিল—"মহারাজ! বাদশাহ সুলেমান আসিয়া আপনার সৈন্যের অগ্রিমদলকে ঘিরিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্রী নিহত হইয়াছে স্থির করিয়া সমস্তদলের বিনাশ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। পরমেশ্বরের কৃপায় কেবল এই দাস জীবিত আছে। এই অশুভ সমাচার বীরেন্দ্রের সর্ব্বশরীর বিচলিত করিয়া দিল।

মহারাজ অমরসিংহ ঈষৎ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বীরেন্দ্রকে বলিলেন—"আমি মহারাজ মানসিংহের আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। অতএব আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তাঁহার আজ্ঞা পালন করা আমার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।"

বীরেন্দ্র—(অমর সিংহের চরণ ধরিয়া রোদন করিতে করিতে) "তথাপি, যদ্যপি মহানুভব মহারাজ মানসিংহের নিকট মাহরুর প্রাণবধ আজ্ঞা রহিত করিবার জন্য প্রার্থনা করা যায়, হয়ত আমরা সফলকাম হইতে পারি।"

অমরসিংহ—"উঠ! উঠ! এ আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। তোমার প্রার্থনা নিরর্থক।"

বীরেন্দ্র—"হে নাথ! কেবল একদিনের অবসর প্রদান করুন। আমি স্বয়ং মহারাজ মানসিংহের পদতলে লুণ্ঠনপূর্ব্বক এই নিরপরাধিনী শাহজাঁদীর প্রাণভিক্ষা চাহিব।"

অমরসিংহ—"ইহা অসম্ভব! এরূপ সুযোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে কোন সেনাপতি এই আজ্ঞার বিপরীতাচরণ কিম্বা বিপরীত উপদেশ দিতে সাহসী হইবেন, তাঁহার বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। হে বীরেন্দ্র! যদ্যপি মাহরু আমার ঔরসজাত পুত্রী হইত, তথাপি তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।"

বীরেন্দ্র—(সজলনয়নে এবং কাতরস্বরে) "নিহত হইবে? মাহরু নিহত হইবে? হা! না, না, না! কখনই হইতে পারে না! উহার পরিবর্ত্তে আমি স্বয়ং প্রাণ দিব। মাহরুর মৃত্যু!—হে মহানুভব! এরূপ কথা আপনার শোভা পায়না। হে নাথ! মাহরু সম্বন্ধে ওরূপ বীভৎস ও ভীষণ শব্দ—মৃত্যু—আপনার মুখারবিন্দে আনিবেন না। মৃত্যু আমার কাছে কল্পনামাত্র এক সাধারণ ও তুচ্ছ ব্যাপার—এক জগৎ হইতে অন্য জগতে যাইবার সেতুমাত্র। পরন্তু মাহরুর ওই মনোহর মূর্ত্তির সহিত সংযুক্ত করিলে এই ভীষণ শব্দ ভীষণতম হইয়া উঠে।"

অমরসিংহ—"বীরেন্দ্র! তোমার এই মৃত্যু-আজ্ঞা নিবারণ-প্রয়াস বৃথা। (বীরেন্দ্রের সম্মুখে মহারাজ মানসিংহ-প্রেরিত পত্র ধরিয়া) এই পত্র আমার প্রমাণপত্র—ইহার বিপরীত কার্য্য করিতে আমার অণুমাত্র শক্তি নাই।"

বীরেন্দ্র—"কি—আপনি এই আজ্ঞার অন্যথা করিবেন না? মনে করুন, আমি আপনাকে এ পত্র না দিতাম?"

অমরসিংহ—"তা'হলে মাহরুর প্রাণরক্ষা, এবং তোমার শিরশ্ছেদন হইত।"

বীরেন্দ্র—"এই পত্র কি নষ্ট করিতে পারা যায় না?"

অমরসিংহ—"না! আমার কার্য্যের প্রমাণ স্বরূপ ইহা সযত্নে রক্ষিত হইবে। ইহা ব্যতীত এই ভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আমি কখনই সাহস করিতে পারিব না।"

বীরেন্দ্র—"তবে আমি—" এই কথা বলিয়াই চিলের ন্যায় ছোঁ মারিয়া অমরসিংহের হস্ত হইতে পত্র তুলিয়া লইলেন এবং ক্ষণমাত্রে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া শতধা করিলেন।

অমরসিংহ—বীরেন্দ্রের হস্তগ্রহণ করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক কহিলেন—"ওরে মূঢ়! তুই কি দুষ্কর্ম্ম করিলি!

বীরেন্দ্র—(গম্ভীর স্বরে) "এখনতো আর আপনার হস্তে কোন আজ্ঞাপত্র রহিল না।"

অনন্তর মহারাজ অমরসিংহ মহাচিন্তাকুলচিত্তে তাঁহার পটমণ্ডপের মধ্যে পদনিক্ষেপসহ ঘুরিতে লাগিলেন এবং পরক্ষণেই সিপাহীদিগকে সঙ্কেত করি[illegible]। মুহূর্ত্তের মধ্যে গৃহ সিপাহী দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। মহা-

রাজ অমরসিংহ সিপাহীদিগকে বলিলেন "বীরেন্দ্রকে সতর্কের সহিত কারাগারে লইয়া যাও এবং ইহার সুরক্ষণে আপনাদের জীবন সুরক্ষিত ভাবিও।" তাঁহার আজ্ঞা পাইবামাত্র সিপাহীরা বীরেন্দ্রকে হস্তবদ্ধ করিয়া লইয়া গেল এবং কারাগারে নিক্ষেপ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মহারাজ অমরসিংহ, বীরেন্দ্রর তাদৃশ অনুচিত আচরণ, তৎক্ষণাৎ মহারাজ মানসিংহের কর্ণগোচর করণার্থ চর প্রেরণ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধের আয়োজনের গোলমালে তাঁহার আজ্ঞা পাইতে বিলম্ব হইতে লাগিল।

এদিকে মাহরু বীরেন্দ্র বিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু, হায়! আপনার ও বীরেন্দ্রের অদৃষ্টের ভবিতব্যতা সম্বন্ধে দারুণ সংশয় উপস্থিত হইয়া তাঁহার চিত্তকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিল।

তাঁহারই রক্ষার্থ বীরেন্দ্র ঈদৃশ অসম সাহসিক শ্লাঘনীয় ব্যাপার সাধন করিয়াছেন এবং কি প্রকারে এতাদৃশ মহোপকারীর প্রত্যুপকার করা যাইতে পারে—রাজকুমারীর চিত্তে ইহাই সতত আন্দোলিত হইতে লাগিলে। কিন্তু হায়! মুগ্ধে! জাননা যে তোমার হৃদয়ের নন্দনকাননে প্রণয়-পারিজাতের বীজ তুমি স্বহস্তে রোপণ করিতেছ!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজ ভীষণ সংগ্রামের পূর্ব্বরাত্রি। পরদিন রণভূমিতে রক্তনদী প্রবাহিত হইবে। মনুষ্যের মুণ্ড, হস্তপদাদি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল জলচর হইয়া সেই নদীতে সন্তরণ করিবে। হায়! সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই অসংখ্য মহম্মদীয় এবং রাজপুত সৈন্যের একত্র সমাবেশ হইয়াছে। রাজপুত শিবিরে আজ প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ একত্রিত হইয়া ষোড়শোপচারে সুরাদেবীর অর্চ্চনা করিতেছেন। আনন্দ স্রোত পূর্ণমাত্রায় প্রবাহিত। প্রভাতে যেন তাঁহাদিগকে ভীষণ রণের পরিবর্ত্তে আনন্দোৎসবে মগ্ন হইতে হইবে। সুরা-

পানে উন্মত্ত হইয়া মহারাজ মানসিংহ মহারাজ অমরসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল, তোমার যুবক বন্ধুর কি সংবাদ?"

অমরসিংহ উত্তর করিলেন—"অধীনের প্রার্থনা—আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক উহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিবেন না। এই যুবক প্রকৃতই একজন বীরপুরুষ। এতদূর আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, কামান্ধ না হইলে বীরেন্দ্রসিংহ কদাপি ঈদৃশ অসদাচরণে প্রবৃত্ত হইত না।

মহারাজ মানসিংহ বলিলেন—"বীরেন্দ্র সম্বন্ধে আমারও মত অনুরূপ, কিন্তু এই ঘোর সংগ্রামের সময় তুচ্ছ অপরাধও মহাপরাধের দণ্ডে দণ্ড-নীয়। অতএব তোমার এই প্রার্থনা যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেছি না।

অমরসিংহ প্রত্যুত্তরে বলিলেন—"মহারাজ! এ ঘোর যুদ্ধের সময়েও এ যুবকের প্রতি দয়াপ্রকাশ করিলে আমাদের লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না—কারণ এ একজন অতুল পরাক্রমী বীরপু—"। ইতিমধ্যে একজন সর্দ্দার বলিয়া উঠিল—"কল্য বীরেন্দ্রকে এক দুষ্কর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া উহার বীরত্ব এবং সত্যব্রতের পরীক্ষা করা হউক।"

মহারাজ মানসিংহ এই প্রস্তাব অনুমোদনপূর্ব্বক বীরেন্দ্রকে তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন।

বীরেন্দ্র তথায় উপস্থিত হইবামাত্র অমরসিংহ বলিলেন—'দেখ, রাজ-দ্রোহীদের এইরূপ দশাই হইয়া থাকে।"

বীরেন্দ্র মহারাজ মানসিংহ, অমরসিংহ এবং অন্যান্য সর্দ্দারগণকে দণ্ডবৎ করিয়া অধোবদনপূর্ব্বক মৌনাবলম্বী রহিলেন।

মহারাজ মানসিংহ বীরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"যুবক! তুমি কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ! ভাবিও না তদ্দারা মাহরুর জীবন রক্ষিত হইবে।"

বীরেন্দ্র (কাতরস্বরে)—"মহারাজ! মাহরু নিরপরাধিনী! তাহার পরিবর্ত্তে আমি প্রাণ দিব। তাহার প্রাণরক্ষার্থে অসাধ্যসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইব।

মহারাজ মানসিংহ—"আচ্ছা, তাহাই হইবে। তোমার দৃঢ়তার পরীক্ষা হউক। কল্য সূর্য্যোদয়ে অগণিত মুসলমান এবং ক্ষত্রিয় সৈন্য আপন আপন রুধির পিপাসা নিবারণার্থ পরস্পরের সম্মুখীন হইবে। শুন বীরেন্দ্র! যখন

ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় মানব কণ্ঠনিঃসৃত ঘোর নিনাদে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইবে, যখন রণবাদ্যের বিষম ঝঞ্ঝনায় আকাশ মেদিনী কম্পিত হইবে, যখন লক্ষ লক্ষ তীক্ষ্ণধার ঘূর্ণায়মান অসি হইতে বিদ্যুৎ ঝলসিবে—তুমি কি সেই সময় আমার আদেশ প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবে? আজ সর্ব্বসমক্ষে তাহা শপথ কর। আর ইহাও তোমার স্মরণ থাকে যেন—এই আদেশ পালনের উপর তোমার এবং মাহরুর জীবন সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।"

বীরেন্দ্রসিংহ অধীরভাবে কহিলেন—"মহারাজ! সত্বর দাসের প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করুন। আমি সর্ব্বসমক্ষে প্রতিশ্রুত হইতেছি যে কল্য প্রভুর আদেশ প্রতিপালনে বিন্দুমাত্র অবহেলা করিব না। রাজপুতদিগের বাক্যের অন্যথা হয় না, প্রতিজ্ঞা কদাচ স্খলন হয় না।"

মহারাজ মানসিংহ (গম্ভীরস্বরে) "কাল এই কর্ণাটভূমে ভীষণ সংগ্রাম হইবে। মুসলমানদের বিজয়াশা কেবল সুলেমানের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব তোমার কর্ত্তব্য এই নির্দ্দিষ্ট হইল যে, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই তুমি ছলে—বলে—কৌশলে মুসলমানদের ব্যূহভেদ করিয়া তাহার শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক দ্রুতবেগে মৎসমীপে প্রত্যাগমন করিবে। তুমি বাদশাহ-দুহিতা মাহরুর পূর্ণচন্দ্রনিভ মুখদর্শনে মুগ্ধ হইয়া রাজদ্রোহী হইয়াছ। অতএব এই অতুল সাহসিকতার কার্য্য দ্বারা তোমার কলঙ্ক বিমোচন কর।"

মহারাজের আজ্ঞা শ্রবণে সমগ্র সভা নিস্তব্ধ! একাকী অসংখ্য মুসলমানের ব্যূহভেদ করিয়া সুলেমানের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক নিরাপদে প্রত্যাগমন করা বীরেন্দ্রর পক্ষে সর্ব্বথা অসম্ভব। কালের করালকবলে পতিত হইয়া কে কোথায় পুনর্জীবন পাইয়া থাকে? অমরসিংহ আশা করিয়াছিলেন বীরেন্দ্রর জীবন রক্ষিত হইল, কিন্তু হায়! সে আশা এখন সমূলে উন্মূলিত হইল। বীরেন্দ্রও প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিশ্চল নিষ্পন্দ! কিন্তু পরক্ষণেই ক্ষত্রিয়বীর স্বীয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও বিষম শপথ স্মরণপূর্ব্বক সভ্যমণ্ডলীকে প্রণাম করতঃ রাজপুতরীত্যানুসারে পশ্চাদ্গমনে আপন শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

মানব অদৃষ্টের হস্তে ক্রীড়াকন্দুক! আজ বীরেন্দ্র সামান্য একজন সৈনিকমাত্র! আজ একজন মাত্রও সিপাই তাহার অনুসরণ করিতেছে না!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি অবসান হইয়াছে, কিন্তু অরুণ দেবের এখন প্রকাশ হয় নাই। তিনি আজকার নৃশংস ব্যাপার কি প্রকারে স্বচক্ষে দেখিবেন? মুসলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। বুঝি দেবগণ অদ্যকার অকালমৃত্যু স্মরণ করিয়া অজস্র-ধারে অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। দিঙমণ্ডল গাঢ় তমসাবৃত। বিভীষিকার প্রেতমূর্ত্তি সকল রণ প্রাঙ্গনে নৃত্য করিবে তাই দেখিবার ভয়ে যেন দিক্‌বালা-গণ দশনয়ন মুদিত করিয়াছেন।

হিন্দু সৈন্যগণ মহারাজ মানসিংহ অমরসিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুত বীরপুরুষদিগের অধীনে সজ্জিত। মুসলমান শ্রেণীর দক্ষিণ ভাগে শাহজাদা মুরাদ, এবং বামভাগে শাহজাঁদা খশরু অধিনায়ক, এবং চিরন্তন প্রথানুসারে মধ্যভাগ স্বয়ং বাদশাহ সুলেমান কর্ত্তৃক পরিচালিত।

বীর-পরাক্রমে রাজপুতগণ যবনচমূকে আক্রমণ করিল। বুঝি মুসলমান ব্যূহ সে খরস্রোত ভাঙ্গিয়া যায়। না না, না মুসলমানেরা টলিল না, রাজপুতেরা প্রতিঘাতের দুর্দ্দমনীয় বেগ বুঝি সহ্য করিতে পারিল না। তাহা-দিগের চির গর্ব্ব বুঝি আজ খর্ব্ব হয়। আজ বিজয় লক্ষ্মী বুঝি বাদশাহ সুলেমানের অঙ্কলক্ষ্মী হইল।

আবার এ কি? ঐ দেখ এক মনোহর-কান্তি তরুণ অশ্বারোহী রাজপুত-কটক হইতে তীরবেগে মুসলমান-বাহিনী অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। যুবক আর কেহই নয় পূর্ব্বরাত্রির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ক্ষত্রিয়-বীর বীরেন্দ্রসিংহ। দেখ কিরূপ অসমসাহসিকতা ও কৌশলের সহিত রাজপুত বীর একাকী শত্রুদলভেদ করিয়া—যেখানে বাদশাহ সুলেমান স্বীয় সৈন্যদলকে যুদ্ধক্রম আদেশ করিতেছেন—সেই দিকে বিদ্যুৎবেগে অশ্ব-তাড়িত করিতেছেন। ভ্রান্ত সুলেমান্! ভ্রান্ত যবনগণ! তোমরা কি ভাবিতেছ যে এই যুবক তাহার প্রভু মানসিংহের নিকট হইতে বশ্যতা-স্বীকার বার্ত্তা লইয়া আসিতেছে। তজ্জন্যই কি তোমরা উহার গতিরোধ

করিতে চেষ্টা করিতেছ না? ভ্রান্ত সৈন্যগণ! বীরেন্দ্র যে বিনা আয়াসে সুলেমানের পার্শ্ববর্ত্তী হইল! হায় বুঝি বাদসাহের পূর্ব্বকৃত অপমানের প্রতিহিংসানল ভীমবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে! দেখ দেখ নিমেষমধ্যে বীরেন্দ্রের অসি কোষ হইতে নিষ্কাশিত হইল—দেখ দেখ হায়! সুলেমানের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধরাশায়ী হইল। যবন সৈন্যগণ "কিং কর্ত্তব্য" বিমূঢ় হইয়া চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যেন কি মায়া মন্ত্রে তাহাদিগকে বদ্ধ করিয়াছে। আর এদিকে বীরেন্দ্র অবসর বুঝিয়া বায়ুবেগে, নিরাপদে এবং অক্ষত শরীরে স্ব-পক্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রণভূমির অনুমান অর্দ্ধক্রোশ দূরে মাহরুর শিবির সংস্থাপিত ছিল। শাহজাদার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কতই চিন্তার তরঙ্গ খেলিতেছিল। সুন্দরী স্বপ্নেও জানিত না, যে, তাহারই জন্য বীরেন্দ্র কি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছে। মাহরুর ভাবনা যে, আজিকার যুদ্ধে হিন্দুদিগের জয় পরাজয়ের উপর তাঁহার মরণ জীবন নির্ভর করিতেছে। কিন্তু প্রণয়ের কি আশ্চর্য্য শক্তি! যখন বীরেন্দ্রের মোহন মূর্ত্তি মাহরুর মানস চক্ষে প্রতিফলিত হইতেছিল, তখন পিতা সুলেমানের বিজয় কামনাও তাঁহার অন্তরে স্থান পাইতেছিল না। শাহজাদী স্বীয় শিবিরাভ্যন্তরে চিন্তামগ্ন হইয়া উপবিষ্টা এমন সময় আচম্বিতে অশ্ব-ক্ষুরধ্বনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। আপনারই দ্বারে শব্দ বিলুপ্ত হইল ভাবিয়া দ্বার-দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র দেখিলেন—বীরেন্দ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান! মাহরু হৃষ্টচিত্তে, শশব্যস্তে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

বীরেন্দ্র—"সুন্দরী! এখন আনন্দমনে তুমি আমার অভিনন্দন করিতেছ কিন্তু ক্ষণকালপরেই বিজাতীয় ঘৃণার সহিত আমাকে সম্মুখ হইতে অন্তরিত হইতে বলিবে।

মাহরু—"অসম্ভব! সম্পূর্ণ অসম্ভব! বীরেন্দ্র তুমি কি জাননা যে আমার জীবন তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছে। এই মহোপলক্ষের জন্য আমার ক্ষুদ্র হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ এতাদৃশ উপকারের কৃতজ্ঞতা ভিন্ন অন্য প্রত্যুপকার অসম্ভব। জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ করুন।

বীরেন্দ্র—(শোকোর্ত্ত হইয়া) আমি তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছি, সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে তোমার এক অত্যন্ত প্রিয়জনের প্রাণ হরণও করিয়াছি।

মাহরু—রণক্ষেত্রে ন্যায় সংগ্রামে যদি তুমি আমার কোন আত্মীয়কে হত্যা করিয়া থাক, তথাপিও এ দাসী তোমার প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবে।

বীরেন্দ্র—"আমি তোমার আত্মীয়কেই হত্যা করিয়াছি, কিন্তু অত্যন্ত নিকট আত্মীয়।

মাহরু—যদি ন্যায়যুদ্ধে আমার বীর পরাক্রমী ভ্রাতা খসরু কিংবা মুরাদের মধ্যে কাহাকেও নিধন করিয়া থাক তথাপি অধীনের কৃতজ্ঞতা ভিন্ন তোমার প্রতি অন্য কোন ভাব হইতে পারে না।

বীরেন্দ্র—"(বক্ষোপরি মুষ্ট্যাঘাত করতঃ) "না। তোমার ভ্রাতাদের মধ্যে কেহ নয়, এবং ন্যায় যুদ্ধেও নয়। দুর্লঙ্ঘ্য শপথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা আচরণ করিয়াছি।

মাহরু—(কাতরোৎকণ্ঠিতস্বরে) "তোমার শাণিত অসির লক্ষ্যভূতের নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সত্বর আমার সংশয় দূর কর।

বীরেন্দ্র—"তবে শুন, শাহজাদী! প্রবলপ্রতাপ সিংহতেজা বাদশাহ সুলেমান এক্ষণে জীবিত নাই!"

মাহরু—(উন্মত্তভাবে) "আমার পিতা নিহত!—অন্যায় যুদ্ধে!—আমারই হিতকারীর দ্বারা নিহত!! মৃত্যুই এখন আমার আশ্রয়।"

এই কথা বলিয়া মাহরু বীরেন্দ্রর কটিবদ্ধ, তীক্ষ্ণছুরিকা, পলক মধ্যে কোষমুক্ত করতঃ সবেগে আপন বক্ষে বিদ্ধ করিল! অহো! কি দুর্দ্দৈব! কণককলিকা কোরকাবস্থায় কীটদষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইল! বীরেন্দ্র চকিত, স্তম্ভিত জড়পদার্থবৎ! চৈতন্যোদয়ে দেখিল হায়! প্রাণ-পাখী সুবর্ণপিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া গিয়াছে।

এতাবৎকাল বাদশাহ সুলেমানের বুদ্ধিবলে মুসলমান সেনা বিজয়লাভ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর বাদশাহ জীবিত নাই। সুলেমান কণ্ঠগত প্রাণ—যবনবাহিনী নেতাশূন্য হইয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ক্রমে রাজপুতের দুর্দ্ধর্ষ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। কেহ

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ।

পলাইল, কেহ বা ছিন্নকণ্ঠ, ছিন্নহস্ত, ছিন্নপদ হইয়া বসুন্ধরাকে আলিঙ্গন করিল।

উপসংহার।

যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। সন্ধ্যা আগতা। রণক্ষেত্র মৃতদেহে আচ্ছাদিত। কতিপয় হিন্দুসৈন্য মশাল হস্তে রণভূমির চতুর্দ্দিকে কি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। ওই দেখ তাহারা রণস্থলের মধ্যভাগে অগণিত ধরাশায়িত মুসলমান সেনার মধ্যে এক তরুণ হিন্দু যুবকের মৃতদেহ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। পাঠক! চিনিতে পার দেহ কার? হতভাগ্য বীরেন্দ্র মাহরুর শোকে পাগল হইয়া রণক্ষেত্রে অসংখ্য শত্রুকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া সমরানলে বীরের মত নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে।

বীরেন্দ্রর মৃতদেহ হিন্দুসৈনিকগণ সযত্নে বহন করিয়া লইয়া গেল। সেই রাত্রেই মহারাজ মানসিংহের আদেশে মহারাজ অমরসিংহ ও অন্যান্য সর্দ্দারগণের সমক্ষে বীরেন্দ্রের ও মাহরুর মৃতদেহ মহাসমারোহে একচিতায় ভস্মীভূত হইল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

কোন্ ঋষিলোকে পূজ্য ভবিষ্যৎদর্শী
শুনিতেছ সুপুরুষ দেবর্ষির বীণ,
কোন্ তপোবনে শান্ত শুভ্রালোকবর্ষী
বেদগান সুমধুর শোন চিরদিন!
তোমার ললাট শুভ্র প্রস্বচ্ছ বিমল
হৃদয়ে হৃদয়ে এত পরিমলে আনে,

* এই কবিতাটি পূজ্যপাদ পিতামহদেবের প্রথম জন্মতিথির উৎসব উপলক্ষে তদীয় শ্রীচরণেঅর্পিত হইয়াছিল।

যে তেমন তৃপ্তি দিবা সুস্নিগ্ধ শীতল
পরিশুদ্ধ লভি নাই কোন প্রাতঃ স্নানে
আপনার প্রতিভায় বিরাজো অমল
দেবলোক আলো করি বিশুদ্ধ অন্তর;
জগতে উজলে কিবা ব্রহ্মতেজোবল,—
প্রবীণ মহর্ষি তপোনিষ্ঠ সুদুশ্চর।
শিরোপরি শোভমান চারি দিগ্বলয়,
তোমার আলোয় যেন আলোকেরি লয়।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্ত্রীশিক্ষা ও সম্প্রদায়িক বিরোধ।

মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ রমণীর মাতৃত্ব প্রস্ফুটিত করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করা প্রভৃতি স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন দেখিয়া আসিয়াছি; সেই সঙ্গে ইহাও দেখিলাম তাঁহাদিগের মতে স্ত্রীলোকের কোন্ বয়সে বিবাহ প্রশস্ত অর্থাৎ মাতৃত্ব বিকাশের সহায়। এই সকল কথাসূত্রে আমাদিগকে অনেক কথা প্রাসঙ্গিক হইলেও বিস্তৃতভাবে বলিয়া পাঠকবর্গের বিরক্তিভাজন হইবার আশঙ্কা করিতেছি কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হইয়া এত কথা বলিতে হইল, তজ্জন্য তাঁহারা যেন ক্ষমা করেন। এখন আমরা পূর্ব্বে যে বলিয়া আসিয়াছি, মনু স্ত্রীলোকের বেদাদি অধ্যয়ন এমন কি এমন কি সামান্য বিদ্যাশিক্ষার সম্বন্ধেও কোনই উল্লেখ করেন নাই, তাহারই সম্বন্ধে দুই চারিটী বক্তব্য প্রকাশ করিব এবং তৎসঙ্গে স্ত্রীলোকের বেদাদি অধ্যয়ন সম্বন্ধে শাস্ত্রমত আলোচনা করিব।

আমাদের অনুমান হয় যে, মনুসংহিতার সময়ে স্ত্রীলোকের বেদাদি অধ্যয়ন অথবা কোন প্রকার বিদ্যাশিক্ষারই উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়

নাই, তাই মনুসংহিতায় তাহার উল্লেখ নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে বিশেষ কোন প্রমাণ না পাওয়া অবধি বৈদিক কালের পরেই মনুসংহিতা-রচনার কাল ধরিয়া লইব। এই কাল নির্দ্দেশেই আমরা মনুসংহিতার সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। যেটা সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত তাহার বিষয়ে বিশেষ কারণ বিনা উল্লেখ বা আন্দোলন না হওয়াই স্বাভাবিক। মনুসংহিতায় যে স্ত্রীশিক্ষার (বর্ত্তমানে যে অর্থে স্ত্রীশিক্ষা ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে) কোনই উল্লেখ নাই, এবং অত্রিসংহিতার একস্থলে ব্যতিরেকীভাবে উক্ত হইয়াছে যে অধ্যায়ন অধ্যাপন প্রভৃতি স্ত্রীলোকের পাতিত্যের কারণ, এই দুইটীই কি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিতেছে না যে সংহিতারচনাকালের পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার প্রচলন ছিল—বিশেষ যখন বৈদিককালে স্ত্রীশিক্ষার ভূরি অনুশাসন ও নিদর্শন দেখা যায়? আর বাস্তবিক, যে ঋষিরা নারী জাতির মাতৃত্ব সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যাঁহারা রমণীর কমনীয় মূর্ত্তিতে দেবতা সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কি এতই মূর্খ ছিলেন যে, বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানধর্ম্মের আলোচনায় স্ত্রীপুরুষ সকলেরই অধিকার থাকা কর্ত্তব্য এই সামান্য কথাটী বুঝেন নাই? তাহা নহে। তাঁহারা জানিতেন যে এই অধিকার হইতে কাহারও বঞ্চিত থাকা কর্ত্তব্য নহে; সেই কারণে মহর্ষি মনু এবিষয়ে কোন নিষেধবিধি প্রচারিত করেন নাই। তাহার পরে যদি কতকগুলি স্ত্রীলোকের বিদ্যাগর্ব্ব দেখিয়া কোন সংহিতাকার স্ত্রীলোকমাত্রেরই বিদ্যাশিক্ষার অধিকার কাড়িয়া লইতে উদ্যত হয়েন, তবে তাহা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা, এমন কি বেদাধ্যয়ন প্রভৃতিও বহুকাল যাবৎ প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোকের মাতৃত্ববিকাশই যদি মুখ্য লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়, তবে আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে স্ত্রীলোকের কুরুচিপূর্ণ বটতলার নাটক নবেল হইতে বিদ্যাশিক্ষা না করিয়া বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতি সদ্বিদ্যা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য—বিদ্যাশিক্ষা না করিলে মাতৃত্ববিকাশের পথে অন্তরায় আনয়ন করা হয়, সুতরাং কর্ত্তব্যের হানি হয়। স্ত্রীলোকেরা ঈশ্বরের এই বৈচিত্র্যময় জগতে জন্মগ্রহণ করিবে অথচ সেই জগতের দিকে অন্ধভাবে তাকাইয়া থাকিবে; ঈশ্বরের বিষয় জানি-

বার জন্য তাহাদের গভীর আকাঙ্ক্ষা থাকিবে, অথচ তাহার তৃপ্তিকারণের দিকে মুক্তপ্রাণে চাহিতেও পারিবে না, এরূপ আশা করা কি ভয়ানক বিড়ম্বনা ও কি দারুণ অধঃপতনের কারণ!

স্ত্রীলোকের বেদাদি অধ্যয়নের কথা বলাতে হয়তো অনেক গতানুগতিক ব্যক্তি চমকাইয়া উঠিবেন। এই গতানুগতিক সম্প্রদায় বড়ই শান্তিপ্রয়াসী; ইহাঁরা নূতনের নামে সশঙ্কিত হইয়া উঠেন। ইহাঁরা কোন বিষয়েই বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা এতটুকুও আলোড়িত করিতে চাহেন না—সর্ব্বদাই ভয়, পাছে সমস্ত সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সমাজশরীরে যে ক্ষত আছে, তাহা তাঁহারা অস্বীকার করেন না; তাঁহারা সর্ব্বদাই এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন, পাছে সেই ক্ষত আরাম করিবার জন্য কোন অজ্ঞাতফল প্রক্রিয়া অবলম্বনে সেই ক্ষত পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমাজ-শরীরকে অধিকতর ক্লিষ্ট করিয়া তুলে। এইরূপ আশঙ্কা কিছু অস্বাভাবিক নহে। প্রাচীনের প্রতি অনুরাগমূলক এই আশঙ্কার ভাব বিদ্যমান না থাকিলে সমাজের সুদৃঢ় (solid) উন্নতি হইতেই পারিত না। এবং এই প্রাচীনের প্রতি অনুরাগ পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির রূপান্তর মাত্র। অনার্য্য জাতি অপেক্ষা আর্য্যজাতির মধ্যে এই ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই আর্য্যজাতির এত উন্নতি হইয়াছিল বোধ হয়। আবার অনার্য্যদিগের মধ্যে চীনজাতির মধ্যে এই ভাব থাকাতে তাহারাও যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল দেখা যায়। সামাজিক শান্তিলাভের প্রত্যাশা করিলে প্রাচীনের প্রতি অনুরাগমূলক এইরূপ আশঙ্কার ভাব জাগিয়া উঠিবেই এবং এইরূপ আশঙ্কা জাগ্রত থাকিলে শান্তিলাভের চেষ্টাও কিছু বেশীমাত্রায় আসিয়া পড়ে। শান্তির প্রত্যাশা এবং নূতনের প্রতি আশঙ্কা পরস্পর সম্বদ্ধ। ভারতবাসী আর্য্যদিগের মধ্যে উভয়েরই কার্য্য যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারই ফলে ভারতীয় আর্য্যগণ একদিকে অতিমাত্রায় শান্তিপ্রিয়, অপরদিকে নূতনের প্রতি অতিরিক্ত আশঙ্কাবিশিষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের পতনের ইহা অন্যতর প্রধান কারণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা প্রাচীনের প্রতি অতিমাত্র পক্ষপাত এবং নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনার ইষ্টানিষ্টবিষয়ে অতিমাত্র আশঙ্কা বশত, নূতন নূতন সময়, নূতন নূতন অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ

করিতে উদাসীন থাকিয়া আপনাদের অবনতির পথ আপনারাই প্রস্তুত করিলেন।

এই পক্ষপাত ও আশঙ্কা আর্য্যদের যেমন অবনতি আনয়ন করিয়াছিল, তেমনি ইহারই ফলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘোর বিবাদকলহজনিত অশান্তিও আসিয়াছিল। সমাজ সংগঠিত হইবার সূত্রপাত হইতেই প্রধানত দুই শ্রেণীর লোকের অভ্যুদয় দেখা যায়—এক, গতানুগতিক বা রক্ষণশীল এবং দ্বিতীয় উন্নতিশীল। সমাজে স্বভাবতই রক্ষণশীল লোকেরই সংখ্যা অধিক হয়। অধিকাংশ লোকেরই প্রাচীনের উপর কেমন একপ্রকার মমতা পড়িয়া যায়, সহজে নূতন কিছু অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে না। সমাজগঠনের প্রারম্ভে এই রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার মধ্যে সামঞ্জস্য অনেকটা স্বভাবতই রক্ষিত হয় বলিয়া শিশু সমাজগুলি শীঘ্র শীঘ্র উন্নতির পথে ধবেমান হইতে সক্ষম হয়। রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার গতি বিভিন্ন মুখে। রক্ষণশীলতা আপ্তবাক্যের দিকে অসহায় ভাবে বড়ই বেশী চাহিতে থাকে ; উন্নতিশীলতা গর্ব্বিতভাবে আপনার বুদ্ধির উপর, যুক্তিতর্কের উপর বড়ই বেশী নির্ভর করিয়া থাকে। রক্ষণশীলতার মস্তক অতিরিক্ত দুর্ব্বল ; উন্নতিশীলতার নির্ভবপদ বড়ই দুর্ব্বল। রক্ষণশীলতার জীবন সামাজিক পরাধীনতা ; উন্নতি-শীলতার জীবন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। সচরাচর দেখা যায় যে উন্নতিশীল ব্যক্তির হৃদয়ে রক্ষণশীলতার বড়ই অভাব, অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়ে প্রাচীন প্রথার ভাল অংশটুকুরও প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি নাই ; আবার রক্ষণশীল ব্যক্তির হৃদয়ে উন্নতিশীলতার বড়ই অভাব, অর্থাৎ তাঁহার মৃতপ্রায় হৃদয়ে উৎসাহের মৃতসঞ্জীবনী শক্তির বড়ই অভাব, তিনি নূতনের ভাল অংশ, সময় ও অবস্থার উপযোগী অংশটুকু গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু যে সকল মহাত্মার হৃদয়ে উন্নতিশীলতা ও রক্ষণশীলতা সমান আসন লাভ করিয়াছে ; সামাজিক পরাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যথাযোগ্য সম্মান লাভ করিয়াছে ; যাঁহারা আপ্তবাক্যকে বুদ্ধির সহায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ; তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাঁহারাই সমাজের রক্ষক এবং উন্নতির পথপ্রদর্শক। সমাজে রক্ষণশীলতার অতিরিক্ত প্রাদুর্ভাব হইলে সমাজ মৃত-প্রায় হইয়া উঠে ; সমাজে উন্নতিশীলতার অতিরিক্ত প্রাদুর্ভাব হইলে সমাজ

বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়। অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার ফল সমাজের জড়তা ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি প্রাচ্য দেশে উত্তম উপলব্ধ হয়; অতিরিক্ত উন্নতিশীলতার ফল বৈপ্লবিক অশান্তি ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের সমাজেই অধিকতর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বহুপূর্ব্বে ভারতের এরূপ দুর্ভাগ্য ছিল না। যখন এখানে ঋষিমুনি জন্মগ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহারা রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার মধ্যে কেমন এক সামঞ্জস্যধারা স্থাপন করিতেন। তখন যথাকালে ইন্দ্রদেব বারিধারা বর্ষণ করিতেন, বনদেবতারা ফুল ফুটাইয়া চারিদিক হাস্যময় করিয়া তুলিতেন; তাহার সৌগন্ধে দিগঙ্গনা প্রসন্নতা লাভ করিতেন। একটী দৃষ্টান্ত দিই। আর্য্যেরা যখন রাজ্যবিস্তার করিতে লাগিলেন, তখন অনেক আর্য্যই কতকগুলি নেতার অধীনে থাকিয়া রাজ্যরক্ষা ও বিস্তার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিল। কিন্তু কতকগুলি আর্য্য ঐ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শান্তিরসপ্রধান ধর্ম্মকর্ম্মে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপে কর্ম্মগুণে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইল। শান্তিরসাবলম্বী বশিষ্ঠপ্রমুখ ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধিবলে প্রাধান্য লাভ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহারা অতিমাত্র রক্ষণশীলতা বশতঃ তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত ক্ষত্রিয়বীরদিগকে গুণজন্য ব্রাহ্মণ্যের উপযুক্ত হইলেও ব্রাহ্মণের উপযুক্ত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হইলেন। ইহারই প্রতিযোগিতায় বিশ্বামিত্রপ্রমুখ উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইল। বিশ্বামিত্র তাঁহার বলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ্যগ্রহণের প্রথম উদ্যমে পুরাতনের সহিত সংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া সমস্তই নূতন করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন। এই সূত্রে বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের মধ্যে বহুদিন যাবৎ বিবাদকলহ চলিয়াছিল। অবশেষে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্যের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পূর্ব্বক প্রাচীনের সহিত যোগ অবিচ্ছিন্ন রাখিতে স্বীকৃত হইলেন এবং শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণ্যতেজঃপূর্ণ বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ্যের গুণজন্যতা স্বীকার পূর্ব্বক মানবহৃদয়ের স্বাধীনতার এবং সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন; তখনই বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের হৃদয়ে রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার এক নূতনতর সামঞ্জস্যধারা সংগঠিত হইল এবং তখন হইতেই তাঁহারা ভারতের প্রকৃত নেতা হইলেন। এই কারণে তাঁহাদেরই নাম সমগ্র ভারতে অধিকতর প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে।

ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার বিরোধ ও তজ্জন্য অশান্তির আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর এই শেষভাগ বিরোধ ও অশান্তির আধার হইয়া পড়িয়াছে। এখন রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতি নানাপ্রকার আন্দোলন ভারতকে, কেবল ভারত নহে, সমগ্র ভূমণ্ডলকে আন্দোলিত করিয়া তুলিতেছে—এখন আন্দোলনের কাল পড়িয়াছে। এই আন্দোলনসূত্রে শান্তিরসাস্পদ এই ভারতভূমিতে কেমন এক ঘোরতর মানসিক অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে ইহার সূত্রপাত হয়। ইংরাজগণ যখন ভারতবর্ষে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিলেন তখন হইতেই এই বিরোধের সূত্রপাত। একদিকে রক্ষণশীল হিন্দুরা সামাজিক বিষয়ে নিতান্তই নীরব হইয়া দর্শকমাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন; অপরদিকে উন্নতিশীল খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ খৃষ্টীয়ধর্ম্মের উন্নতভাব সকল আমাদিগের নির্জীব সমাজদেহে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের ভারতে সহসা অভ্যুন্নতি আনয়ন করিতে গিয়া সমাজবিপ্লব যে কতকপরিমাণে আনয়ন করেন নাই, তাহা নহে। এইরূপে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল; তখন ব্রাহ্মসমাজের হিন্দুমহাত্মাগণ শান্তিপতাকা হস্তে লইয়া সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মসমাজ নেতা হইয়া এক অভূতপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক কিছুকালের জন্য বিবাদকলহ নির্ব্বাপিত করিয়া সমগ্র ভারতের হৃদয়ে শান্তিজল প্রদান করিল। কিন্তু কিছুকাল পরে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই সেই রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার বিরোধ উপস্থিত হইয়া তাহার এক প্রধান ভিত্তি মৈত্রীকে শিথিলমূল করিয়া দিল এবং এখনও দিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ যে মহান্ আদর্শ লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। আশ্চর্য্য এই যে আজও কেহ এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে উত্থিত হইলেন না। ইহাতেই বোধ হয় যে বিরোধ মীমাংসার জন্য বাহ্যিক শতসহস্র চেষ্টা হইলেও প্রকৃতপক্ষে রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের অন্তঃকরণে এই বিরোধমীমাংসার ইচ্ছা জাগ্রত নাই; সকলের মনে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য কোন না কোন মহাপ্রাণ উত্থিত হইতেনই।

এবিষয়ে কাহারই নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে; সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে ভারতবাসী, বিশেষত ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেরই সচেষ্ট হইতে হইবে। যে ব্রাহ্মসমাজ এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষকে উন্নতির পথপ্রদর্শন করিয়া জাগ্রত করিতে পারিয়াছিল, এবং যে ব্রাহ্মসমাজে সাহিত্য দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে অন্যতম অগ্রণীগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, উপযুক্ত নেতা পাইলে এবং সামঞ্জস্যের পথে চলিলে তাহা যে ভারতের বিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারে, এ বিষয়ে কাহারই সংশয় হইতেই পারে না। তাই বলিয়া আমি কাহাকেও বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়া সামঞ্জস্যের পথে চলিতে অনুমোদন করিতেছি না। আমি বলি পক্ষপাতশূন্য হইয়া কোন বিষয় বিচার করিলে সম্মুখে যে সামঞ্জস্যের পথ দৃষ্ট হইবে, তাহাই সকলের অবলম্বন করা উচিত এবং তাহাতে ধর্ম্মহানি হইতেই পারে না। ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সকল বিষয় লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা তাহাদিগের অন্যতম। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা কেবল ব্রাহ্মসমাজে কেন, সমস্ত বঙ্গদেশেও বিবাদকলহের এবং সুতরাং ঘোরতর অশান্তির বীজ বপন করিয়াছে। এখানে পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে অর্থে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা ব্যবহার করেন আমিও সেই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি। এই বিষয়ে সামঞ্জস্যে উপনীত হইতে ইচ্ছা করিলে অপক্ষপাতে উভয় পক্ষেরই বক্তব্য বিচার করিতে হইবে। উন্নতিশীল ব্যক্তিরা প্রায়ই দেখা যায় যে এ বিষয়ে পাশ্চাত্য কতিপয় মহাত্মা ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া কিছু বেশীদূরে অগ্রসর হইতে চাহেন। পক্ষান্তরে, রক্ষণশীল সম্প্রদায় বহু পুরাকালের শাস্ত্রের দোহাই দিয়া একপদও অগ্রসর হইতে চাহেন না। স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত কি, তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি; এখন দেখিব যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত কি। আমাদিগের দেখিতে হইবে সত্যসত্যই শাস্ত্রসকল স্ত্রীশিক্ষা, উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য শিক্ষা বিষয়ে নিষেধবিধি দিয়াছেন কিনা। আমরা উভয়পক্ষের বক্তব্য অপক্ষপাতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব যে উভয়পক্ষই ভ্রমবশতঃ এরূপ বিবাদকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাকৃত মহারাষ্ট্র।

"মহারাষ্ট্রাভিধ্যো মধুর-জল-সান্দ্রো নিরুপমঃ
প্রকাশে দেশোয়ং সুরপুরনিকাশো বিজয়তে।"

বিশ্বগুণাদর্শ।

বিন্ধ্যগিরি ও নর্ম্মদা নদী ভারতবর্ষকে উত্তর ও দক্ষিণ দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে। বিন্ধ্যগিরি-শ্রেণীর উত্তরাংশ "আর্য্যাবর্ত্ত" ও উহার দক্ষিণাঞ্চল "দক্ষিণাবর্ত্ত," "দাক্ষিণাত্য" বা "দক্ষিণাপথ" নামে প্রসিদ্ধ। দেশীয় ভাষায় দক্ষিণাপথকে সংক্ষেপে "দক্ষিণ" বা "দক্‌খন" বলে। দেশীয় "দক্‌খন" শব্দ হইতে ইংরাজী ডেক্যান" (Deccan) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরাজী ভূগোল গ্রন্থে যদিও ডেক্যান শব্দের দ্বারা সমগ্র দাক্ষিণাত্য বোধিত হইয়া থাকে, তথাপি সরকারি কাগজ পত্রে ডেক্যান বলিলে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পুণা, সাতারা (Satara) ও অহম্মদনগর, এই প্রদেশত্রয় ও সোলাপুর জিলার পশ্চিমাঞ্চলমাত্র বুঝায়।

দাক্ষিণাত্যের যে অংশ মহারাষ্ট্র দেশ নামে পরিচিত, তাহার উত্তর দিকে সুরত প্রদেশ ও সাতপুড়া নামক গিরিশ্রেণী, পশ্চিমদিকে আরব সমুদ্র, দক্ষিণদিকে কর্ণাট প্রদেশ ও পূর্ব্বদিকে গোণ্ডবন (গণ্ডওয়ানা) ও তেলঙ্গণ (তেলিঙ্গানা) প্রদেশ অবস্থিত। সংক্ষেপত, গুজরাথ, রাজপুতানা, মালব, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, তেলঙ্গণ ও কর্ণাট—এই সপ্তদেশ পরিবেষ্টিত ভূমিখণ্ডকে মহারাষ্ট্রদেশ বলে। মহারাষ্ট্রদেশের উত্তর ও দক্ষিণসীমার ন্যায় তাহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণসীমা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট নহে। স্থূলতঃ ওয়েণগঙ্গা (Wine বা বেণগঙ্গা) ও ওয়ার্দ্ধা (Wardha বর্দ্ধা) নদী, মাণিক দুর্গ ও মাহুর নগর এবং নান্দেড়, বেদর ও তালিকোট নগর মহারাষ্ট্রদেশের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কৃষ্ণা ও মলপ্রভা নদী, এবং বেলগাঁও জিলার দক্ষিণাংশ ও সদাশিবগড় (গোয়ার দক্ষিণাঞ্চলস্থিত.

কারওয়াড় (Carwar) নামক বেলানগর) এই দেশের দক্ষিণ সীমারূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের পরিমাণ ন্যূনাধিক একলক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র বর্গ মাইল (১); অর্থাৎ ইহা আয়তনে ইংলণ্ডদেশের দ্বিগুণ অপেক্ষাও বৃহত্তর। এই দেশের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা দুইকোটী (২)। মহারাষ্ট্রদেশ সাধারণতঃ পর্ব্বতবহুল ও অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর। এই কারণে, এই প্রদেশ যেরূপ বিস্তৃতায়তন, ইহার লোক-সংখ্যা তদনুরূপ বহুল নহে। মহারাষ্ট্রদেশের জলবায়ু ভারতবর্ষের অনেক স্থানের জলবায়ু অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর।

সহ্যপর্ব্বত বা পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তরাংশ মহারাষ্ট্রদেশকে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে "কঙ্কণ" ও "দেশ" নামক অংশদ্বয়ে বিভক্ত করিয়াছে। কঙ্কণকে দেশীয় ভাষায় "কোঁকণ" বলে। এই প্রদেশ সহ্যপর্ব্বতশ্রেণী হইতে আরব সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তরে দমণগঙ্গা (Daman) হইতে দক্ষিণে সদাশিব গড়পর্য্যন্ত প্রায় চারিশত মাইল; এবং ইহার সর্ব্বাপেক্ষা আয়ত অংশের বিস্তার প্রায় ৫০ মাইল। এই প্রদেশ অতিশয় বন্ধুর, অনুর্ব্বর ও গিরিকাননাদিতে পরিপূর্ণ। কঙ্কণের যে অংশ পশ্চিমঘাট গিরিমালার সানু-দেশে অবস্থিত, তাহাকে "কঙ্কণ ঘাটমাথা" বলে। ঘাটমাথার পাদদেশস্থিত ভূমিভাগ দেশীয় ভাষায় "তল কোঁকণ" বা নিম্ন কঙ্কণ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শাসন শৃঙ্খলার জন্য কঙ্কণ প্রদেশ বর্ত্তমানকালে ছয় জিলায় বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কুলাবা, রত্নাগিরি, সাবন্তবাড়ী ও জঞ্জিরা, এই চারিটি প্রদেশ মহারাষ্ট্র ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানকালের সুপ্রসিদ্ধ মুম্বই বা বোম্বাই নগরী কঙ্কণের ঠাণা (Tana) জিলার অন্তর্গত।

---

১ গ্রাণ্টডফ সাহেবের নির্দ্দেশ মতে মহারাষ্ট্রদেশের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক একলক্ষ দুই সহস্র বর্গ মাইল। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণতীরবর্ত্তী যে ভূভাগকে দেশীয় ভাষায় দক্ষিণমহারাষ্ট্র বলে, গ্রাণ্ট ডফ সাহেব তাহা মহারাষ্ট্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। প্রকৃত, ঐ প্রদেশ মহারাষ্ট্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী।

২ যে সময়ে মহারাষ্ট্ররাজ্য কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হয়, সে সময়ে অর্থাৎ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদেশে প্রতি বর্গ মাইলে গড়ে ৫১ জন লোকের বাস ছিল (Grant duff)। এখন ঐ দেশে প্রতি বর্গ মাইলে গড়ে ১৬০ জন লোক বাস করিতেছে।

কঙ্কণপ্রদেশ প্রকৃতির শান্তিময় ক্রোড় হইতে বহুদূরে—অতীব সঙ্কটময় স্থানে অবস্থিত। ইহা একদিকে নিয়ত গর্জ্জনশীল সমুদ্রের ঝটিকাবর্ত্তময় ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে কম্পিত, এবং অপরদিকে করাল হিংস্রজন্তু-সমাকুল, গগনস্পর্দ্ধী অদ্রিশ্রেণীর অন্ধকারময় ক্রোড়ে ও প্রকাণ্ডোন্নত শিখরাবলীতে উন্মত্ত প্রকৃতির তাণ্ডব-ক্রীড়া দর্শনে স্তম্ভিত। সমুদ্রতীরবর্ত্তী ভূমি বহুদূর পর্য্যন্ত জলধি-তরঙ্গ-প্লাবনে, গভীর, কর্দ্দমময়, অতীব অস্বাস্থ্যকর ও জীবজন্তু-বাসের অযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। তরঙ্গকল্লোলিত সাগরের ও ঝটিকা-পীড়িত বেলাভূমির ভীষণতা পশ্চাতে রাখিয়া জনপদে প্রবেশ করিলে, দিগন্তপ্রসারী সহস্র-শীর্ষ সহ্যাদ্রির অঙ্কদেশস্থিত তল-কঙ্কণের শৈলময়, অরণ্য-বহুল, সঙ্কীর্ণ প্রদেশ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কতিপয় শীর্ণকায়া গিরিনির্ঝরিণী ভিন্ন এই প্রদেশে উল্লেখযোগ্য কোনও নদী নাই। বর্ষার আধিক্যবশতঃ এখানকার ভূমি সর্ব্বদা সিক্ত থাকে বলিয়া ধান্য ব্যতীত অন্য কোনও শস্য এই দেশে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। ইহার সমুদ্রতীর-সন্নিহিত প্রদেশে নারিকেল, সুপারি, কদলী, ইক্ষু ও লবণ ভূরি পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুম্বই বা বোম্বাই প্রভৃতি দুই একটি বেলা-নগরী ভিন্ন এই অনুর্ব্বর, দরিদ্র দেশে কোনও সমৃদ্ধিশালী নগর নাই।

কঙ্কণের পূর্ব্বদিকে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর বিশালদেহ দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া প্রাচীরাকারে শূন্যে উত্থিত হইয়াছে। সেখানকার দৃশ্য অতি গম্ভীর, অতি ভয়ানক ও অনির্ব্বচনীয় সুন্দর। শৈলশ্রেণীর পর শৈলশ্রেণী ক্রমশঃ ৩৪ সহস্র হস্ত উর্দ্ধে উত্থান পূর্ব্বক গগন চুম্বনে প্রয়াস পাইতেছে। কোথাও সহ্যাদ্রির ওষধি-ভূয়িষ্ঠ, কিসলয়-সমাচ্ছাদিত চিরশ্যাম কলেবর নানা-জাতীয় বিহঙ্গের মঞ্জুল নিনাদে ঝঙ্কৃত হইতেছে। সুচ্ছায়-বৃক্ষতলবাহী বন্য-কুসুম-পরাগ-সম্পৃক্ত সুরভি-শীতল সমীরণের অযত্নোপবীজিত মন্দপ্রবাহ-সংস্পর্শে বনচ্ছবি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। গিরিবরের মেঘমালা-বিমণ্ডিত শিখরনিচয় কখনও অরুণ কিরণ সম্পাতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া শত শত ইন্দ্রধনুর বিকাশচ্ছলে হাস্য করিতেছে—বিবিধ মুহূর্ত্ত-পরিবর্ত্তনশীল বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত হইয়া সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। কখনও বা ঝটিকাগমে ঘোরান্ধকার-সমাবৃত হইয়া ভীমাকার গিরিশীর্ষ সকল মহাকালের ন্যায় অটল

গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রকৃতির ভীষণতা বর্দ্ধিত করিতেছে। কোনও স্থানে জীবোদ্ভিদ্-পরিশূন্য বিকট-কৃষ্ণ বন্ধুর শৈল-স্তূপসমূহ, সিংহ-শার্দ্দূল-নিনাদিত ভুজঙ্গ-নিষেবিত গহন কানন, সপ্তমাস-ব্যাপিনী গুরু বর্ষার চিরসহচারী নিবিড়কৃষ্ণ জলদ-জালের সহিত আবর্ত্তময়ী ঝটিকার নিত্য-ক্রীড়া, অদ্রির শৃঙ্গে শৃঙ্গে দামিনী-কুলের মুহুর্মুহুঃ চঞ্চল আবির্ভাব ও বিকট নৃত্য, গিরি চূড়ায় বজ্রনির্ঘোষ, তমোগর্ভ উপত্যকায় বন্যজন্তুর ভৈরব গর্জ্জন ও আকুল আর্ত্তনাদ, দিক্‌সমূহ তমিস্রাচ্ছন্ন করিয়া মুষল ধারায় অনবরত বারিপাত, শত সহস্র খর-স্রোতা নির্ঝরিণীর কূলপ্লাবন তরঙ্গ, পর্ব্বত-তলে তাহাদিগের সবেগ পতন ও অবিরল ধারা-সম্পাতে ক্লেদিতা মেদিনী জীবকুলের ত্রাসোৎপাদন করিতেছে।

এই সৌন্দর্য্য-সার, ভীষণতাপূর্ণ দুর্ভেদ্য প্রাচীরবৎ অচল শ্রেণীর স্থানে স্থানে মনুষ্যগণের গমনাগমনের জন্য কয়েকটি অতি সঙ্কীর্ণ পথ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল পার্ব্বত্য পথ এরূপ বিঘ্নসঙ্কুল ও দুরারোহ যে, স্থানীয় লোক ভিন্ন অপর কেহ এই পথে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় না। অধুনা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যত্নে এই গিরিসঙ্কটসমূহ স্থানে স্থানে সংস্কৃত হওয়ায় কিয়ৎ পরিমাণে সাধারণের সহজগম্য হইয়াছে। কিন্তু কোনও কোনও স্থানে এই সকল গিরি-পথ এখনও এরূপ বিপজ্জনক ও স্থান বিশেষে এরূপ সরলভাবে ঊর্দ্ধদিকে পর্ব্বত গাত্রে উত্থিত হইয়াছে, যে অতি সুশিক্ষিত অশ্বারোহীকেও জীবনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই পথে গমনাগমন করিতে হয়।

এই সঙ্কটময় দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া সহ্যাদ্রির সানুদেশে উপস্থিত হইলে, শৈল-শৃঙ্গনিকরে পরিবেষ্টিত বহুজনপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম দৃষ্টিগোচর হয়। এই পল্লীনিচয়সমন্বিত ভূমিখণ্ড "কঙ্কণ-ঘাট মাথা" নামে পরিচিত ও অবস্থান ভেদে "মাওয়ল" "মুসে" ও 'খোরে' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত। এই প্রদেশ উত্তরে জুন্নর নগর হইতে দক্ষিণে কোহ্লাপুর পর্য্যন্ত প্রায় দেড়শত মাইল দীর্ঘ। ইহার পরিসর কোনও স্থানেই ২০।২৫ মাইলের অধিক নহে। ঘাটমাথা প্রদেশ মনুষ্যের বাসযোগ্য হইলেও উহার অধিকাংশ স্থান বন্ধুর, পর্ব্বত-সঙ্কুল, গভীর অরণ্যময় ও শার্দ্দূলাদি হিংস্রজীবগণে পরিপূরিত। বর্ষা-কালে সহ্যাদ্রির অপরাপর অংশের ন্যায় এই প্রদেশও অতীব ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করে। বরং সময়ে সময়ে ঘাটমাথার অংশ বিশেষে ঝঞ্জাবাত ও বজ্রা-

ঘাতের প্রকোপ সহ্যাদ্রির অন্যান্য স্থান অপেক্ষা দশগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সেই সময়ে ইহার অধিকাংশ স্থান এরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে যে, অন্য কোনও দেশের লোক তৎকালে এই প্রদেশে অল্পদিনের জন্যও বাস করিতে পারে না। বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস ভিন্ন অপর সময়ে এই স্থানে কুজ্ঝটীকার বাষ্প-প্রসরাবরণে প্রকৃতির বদনমণ্ডল সর্ব্বদা অবগুণ্ঠিত থাকে।

একদিকে সহস্রাধিক-হস্ত উচ্চ গিরিশৃঙ্গ ও গম্ভীর উপত্যকাসমূহ এবং অপর দিকে নিবিড় অরণ্যানী ও পর্ব্বতপার্শ্ববাহিনী বেগবতী স্রোতস্বতীগণ এই প্রদেশকে অতিশয় দুর্গম ও শক্রগণের দুরাক্রম্য করিয়া রাখিয়াছে। এখানকার গিরি-শিখর-মালা এরূপ ভাবে অবস্থিত, এরূপ ত্রিকোণাকার শৈল-প্রাচীরে বেষ্টিত যে, স্বল্পায়াসেই সেগুলিকে অতি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিতে পারা যায়। ঘাটমাথার শিখরাবলীতে অদ্যাপি মহাত্মা শিবাজী কর্ত্তৃক মুসলমান-গণের আক্রমণ হইতে আত্মদেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত "সিংহগড়", "রায়গড়" প্রভৃতি শতাধিক দুর্গের অবশেষ নেত্রপথে পতিত হয়। পার্ব্বত্য প্রদেশের এই সকল দুর্গশ্রেণীর ও পূর্ব্ববর্ণিত প্রাকৃত বাধাসমূহের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া সমরনীতি-বিশারদ ঐতিহাসিক গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব বলিয়াছেন, "In short, in a military point of view, there is probably no stronger country in the world." (page 7.) অর্থাৎ সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে এই প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত।

কঙ্কণ ঘাটমাথা হইতে অবতরণ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইলে ক্রমশঃ পর্ব্বতবিরল, নদনদী-সরোবরাদি সমন্বিত সুবিশাল সমতল ক্ষেত্রে উপনীত হওয়া যায়। এই প্রদেশকে মহারাষ্ট্রীয় জনসাধারণ "দেশ" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। "দেশ" বা পূর্ব্ব মহারাষ্ট্র কঙ্কণ প্রদেশের ন্যায় নিতান্ত অনুর্ব্বর ও হিংস্রজন্তু সমাশ্রিত নহে। বিচিত্র কেতনাবলী শোভিত অসংখ্য বাণিজ্য-পোত-সংকুলা পশ্চিমবাহিনী তাপী (তাপ্তী) নদী, দাক্ষিণাত্য-গঙ্গা গদ্‌-গদ্ ভাষিণী গোদাবরী ও পুণ্যতোয়া কৃষ্ণানদী এবং তাহাদিগের শাখানদীসমূহ এই প্রদেশকে "মধুর-জল-সান্দ্র" করিয়া রাখিয়াছে। গোদা ও কৃষ্ণার উপ-নদী ও শাখা প্রশাখার সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। তন্মধ্যে ওয়েণ গঙ্গা (বেণ গঙ্গা), ভীমা, নীরা, মাণ্ডরা ও ইন্দ্রায়ণী প্রভৃতি কয়েকটি উপনদীই সমধিক

প্রসিদ্ধা। এই সকল নদী ও উপনদীর গুণেই পূর্ব্ব মহারাষ্ট্র প্রদেশের কথঞ্চিৎ উর্ব্বরতা সম্পাদিত ও উহার অধিবাসিবৃন্দের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত হয়। নদীতীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ সচরাচর ফলশস্যাদি-সমন্বিত চির-হরিৎ-তরুপুঞ্জে পরিশোভিত থাকে। তদ্ভিন্ন সাধারণতঃ বর্ষা ভিন্ন অপর কালে এই প্রদেশের অধিকাংশ প্রান্তর মরুবৎ উদ্ভিজ্জশূন্য থাকে। প্রাবৃট কালে, নব বারিদসমাগমে মহারাষ্ট্র ভূমি শ্যামল বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া "নিরুপম" রমণীয় মূর্ত্তিধারণ করে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে বহু উচ্চে অবস্থিত বলিয়া বর্ষার আধিক্য এদেশের পক্ষে তাদৃশ কষ্টকর নহে। এখানে শীত গ্রীষ্ম ও ঝঞ্ঝাবাতের প্রকোপও অপেক্ষাকৃত অল্প। ধান্য, গোধূম, জওয়ারি ও বাজরী এ দেশের প্রধান শস্য।

পূর্ব্ব মহারাষ্ট্র প্রদেশ বহু পরিমাণে সমতল হইলেও একেবারে পর্ব্বত-বিবর্জ্জিত নহে। চারিটি প্রসিদ্ধ অনুচ্চ গিরিশ্রেণী পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া প্রাকারাকারে ইহার দুর্ভেদ্যতা সম্পাদন করিতেছে। মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে, এই গিরিশ্রেণীগুলি মহারাষ্ট্র বক্ষে অঙ্কিত চারিটী সমান্তরাল বিভূতি-রেখার ন্যায় প্রতিভাত হয়। ইহার প্রথম রেখার নাম "চান্দোর গিরিশ্রেণী"। ইহা সহ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত "রাহুরা" হইতে বিদর্ভদেশের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দক্ষিণে "অহম্মদনগর শৈলমালা" পশ্চিমে জুন্নর নগর হইতে পূর্ব্বদিকে 'বীড়' প্রদেশ পর্য্যন্ত ভুজঙ্গগতিতে ধাবিত হইয়াছে। তৃতীয় পর্ব্বতমালা পুণাপ্রদেশের দক্ষিণসীমা স্বরূপে অবস্থিত। "শম্ভুশিখরাবলী" নামক চতুর্থ শৈলপংক্তি সাতারা প্রদেশের উত্তরাঞ্চল পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। উদীচ্য শত্রুর আক্রমণে বাধা প্রদান বিষয়ে এই সকল শৈলপ্রাচীরের কার্য্যকারিতা নিতান্ত অল্প নহে। পূর্ব্ব মহারাষ্ট্রের প্রাকৃত শোভাবর্দ্ধন বিষয়েও ইহারা সহায়তা করিয়া থাকে। এই প্রাকৃত বিভাগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ভারতের বর্ত্তমান শাসকগণ পূর্ব্ব মহারাষ্ট্র প্রদেশকে দশ জিলায় বিভক্ত করিয়া শাসনকার্য্যের সৌকর্য্য বিধান করিয়াছেন। তন্মধ্যে মহারাষ্ট্র ইতিহাসে পুণা, সাতারা, খানদেশ, সোলাপুর, বহ্বাড় (বিদর্ভ বা বেরার), নাশিক ও অহম্মদনগর প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশের উল্লেখই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। খানদেশের ও কঙ্কণের অন্তর্গত রত্না-

গিরি ও ঠাণা জিলার উষ্ণ প্রস্রবণসমূহ এবং গোদাবরী ও ঘটপ্রভা-নদীর জলপ্রপাত পরম রমণীয় ও প্রত্যেক মহারাষ্ট্র-ভ্রমণকারীর দর্শনীয়।

কঙ্কণের ন্যায় পূর্ব্বমহারাষ্ট্র প্রদেশে সমৃদ্ধিশালী নগরের বিশেষ অসদ্ভাব নাই। মহারাষ্ট্রীয়গণের "স্ব-রাজ্য"কালে তাঁহাদিগের অধিষ্ঠানভূতা ভূমি ভারতবর্ষের অপর সর্ব্ব প্রদেশ অপেক্ষা সমৃদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের ধনসম্পত্তি যে বহু পরিমাণে মহারাষ্ট্রীয়গণেরই করতলগত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের পরাক্রমে পার্থিব অমরাবতী দিল্লীর রাজসম্পদ, বিলাসাড়ম্বরপ্রিয় দাক্ষিণাত্য নবাবগণের বিপুল ঐশ্বর্য্য ও উত্তর ভারতের যাবতীয় ধনরত্ন পুঞ্জীকৃত-পুষ্পরাশির ন্যায় মহারাষ্ট্র রাজলক্ষ্মীর চরণতলে স্তূপাকারে সজ্জিত হইয়াছিল। মুসলমানদিগের শাসন-সময়ে যাঁহারা সামান্য কৃষিকার্য্য করিয়া কালাতিপাত ও জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, এরূপ শত শত মহারাষ্ট্র-পরিবার স্বরাজ্যকালে ক্ষমতাশালী সর্দ্দার, জাই-গীরদার ও সামন্তের পদে উন্নীত হইয়া আপনাদিগের নিবাসস্থান-সমূহকে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজধানীতে পরিণত করিয়াছিলেন। সুতরাং সেকালের রাজশ্রী-বিভূষিত স্বাধীন মহারাষ্ট্র যে, দাক্ষিণাত্য কবির চক্ষে "অমরাবতীর তুল্য নিরূপম' বলিয়া প্রতিভাত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? অধুনা অদৃষ্টের নিদারুণ ঝটিকাঘাতে মহারাষ্ট্রদেশের পূর্ব্বগৌরব বিনষ্ট হইলেও নানা-স্থানে তাহার প্রাচীন শ্রীসম্পদের শেষ নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। পুণা, কোহ্লাপুর, সাতারা প্রভৃতি নগর এখনও প্রাচীন সম্পদের স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া মহারাষ্ট্র সৌভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইলোরা বা বেরুলের পর্ব্বতগুহাগত মন্দিরসমূহ প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় জাতির স্থাপত্য-শিল্পের ঔৎকর্ষের ও সৌন্দর্য্য-শিল্পানুরাগের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মহারাষ্ট্রদেশের প্রাকৃত শোভা বর্ণন প্রসঙ্গে ইলোরার ভাস্কর-শিল্পের উল্লেখ অনিবার্য্য।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

কর্ম্মবীর গ্ল্যাডষ্টোন।

এই জনবিপুল পৃথিবীর অগণ্য জন-সঙ্ঘের অভ্যন্তরে অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বকালে সকল সুসভ্য দেশেই আমরা এমন সকল মহাপুরুষের কথা জানিতে পারি, যাঁহারা সেই সকল দেশের জীবনীশক্তি স্বরূপ হইয়া বর্ত্তমান থাকেন; তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসই দেশের তাৎকালিক ইতিহাস, তাঁহাদের মহৎ চিন্তা সেই সকল দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতির পরিচায়ক। *নিশান্তে দিবাকর যথানিয়মে জগৎ আলোকিত করিয়া পূর্ব্বগগনে সমুদিত হইলে, শুভ্র শুক্র-কিরীটিনী উষার সীমন্ত মূলে তাঁহার লোহিতরাগ সুপ্রকাশিত হইবামাত্র যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের কুহকদণ্ডস্পর্শে যেমন ধরণীর শ্যামাঙ্গ হইতে নৈশ অন্ধকারের কৃষ্ণাবগুণ্ঠন খসিয়া পড়ে, সেইরূপ কোন দেশে কোন মহাপুরুষের অভ্যুদয় হইলে সেখান হইতে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া জ্ঞানের দীপ্ত সূর্য্যালোক বিকীর্ণ হইতে থাকে; জ্ঞানের সেই মহান্ সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক এবং অখণ্ড উত্তাপে পৃথিবীর মৃতকল্প নরনারীহৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার হয়, অজ্ঞাত বিশুষ্ক কর্ত্তব্যজ্ঞান বিকাশ লাভ করে, জীবনের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা পৃথিবীর জীবিত মনুষ্য সমাজের নয়ন সমক্ষে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং উদার মনুষ্যত্ব আমাদের পুরাতন, প্রীতিহীনের অত্যন্ত দুর্ব্বল বক্ষের জীর্ণ কোটর হইতে বহির্গত হইয়া একটি নিবিড় আত্মীয়তা-বন্ধনে পৃথিবীর মানব সমাজকে একত্র সম্বদ্ধ করিয়া ফেলে।

তাই কোন মহাপুরুষের জন্ম বা মৃত্যু সুসভ্য মানবমণ্ডলীর পক্ষে শুভ বা অশুভ সূচনা করে। জন্মকালে কেহ তাঁহাদের কথা জানিতে পারে না, এবং তাঁহারা আপনাদিগের শুভাগমনের মহীয়সী বার্ত্তা সে কালের মত দৈববাণী দ্বারা সাধারণের নিকট বিজ্ঞাপিত করেন না। প্রথমে তাঁহাদের শান্তিময় শৈশব এবং নিরুদ্বেগ কৈশোর পিতামাতার অকৃত্রিম উদ্বেলিত স্নেহে, কিম্বা বিদ্যালয়ে জ্ঞানানুসরণে ও পুস্তকালয়ে মহৎচরিত্র ব্যক্তি-

* মিঃ গ্লাডষ্টোনের পরলোক গমনোপলক্ষে কোন শোক সভায় প্রপঠিত।

কর্ম্মবীর গ্ল্যাডষ্টোন।

গণের জীবনেতিহাসপাঠে, কর্ত্তব্যনীতিশিক্ষায় ব্যয়িত হয় এবং যাঁহারা প্রতিকূল ঘটনাবৈচিত্র্যের সদাকল্লোলিত উর্ম্মিমুখর সংসারসাগর-পাদ-চুম্বিত নিত্য পরিবর্ত্তনীয় বেলাভূমে কর্ম্মজীবনের অবসানে কঠিন পদাঙ্ক অঙ্কিত রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সেই পদাঙ্ক-লেখা অনুসরণ পূর্ব্বক অক্ষুন্ন মানসিক শক্তি ও দুর্জ্জয় সামর্থ্য-সঞ্চয়ে অতিবাহিত হয়। তাহার পর তাঁহাদের কি কঠোর সাধনা! কি ভীষণ সংগ্রাম!—দিগন্তবিস্তৃত বিশাল মরুভূমে বিরাট বট বৃক্ষের ন্যায় তাঁহারা অটলভাবে অবস্থান করেন। মস্তকের উপর প্রচণ্ডসূর্য্য আপনার জ্বলন্ত ময়ূখমালা দ্বারা তাহাকে উত্তপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, পদতলের ক্ষুদ্র বালুকারাশি তাহাকে দগ্ধ করিবার প্রত্যাশায় তাহার ছায়ায় আসিয়া দীপ্তিহীন ও মলিন হইয়া যাইতেছে, সে কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া অটল ধৈর্য্যসহকারে সকল উৎপীড়ন সহ্য করিয়া সহস্র বিহঙ্গের, শতশত শ্রান্ত পথিকের আশ্রয়-স্থান হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহার পর যখন প্রবল প্রভঞ্জন তাহার মূলদেশ পর্য্যন্ত উৎপাটন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া বিপুল বেগে ভৈরব হুঙ্কারে তাহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হয় তখন জগৎ এই বিশাল মহীরুহের অস্তিত্ব জানিতে পারে,—তাহার পত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হউক, শাখা পল্লব ভাঙ্গিয়া খণ্ডখণ্ড হইয়া যাউক, তথাপি তাহার উদ্দেশে পৃথিবীর প্রীতি বর্দ্ধিত হয়। আবার এই প্রকার প্রকৃতি বিশিষ্ট অটল কর্ত্তব্যপরায়ণ কোন মহাপুরুষ যখন প্রেম ও দয়ায়, চরিত্র ও শিক্ষায়, জ্ঞান এবং বিনয়ে অনেক মনুষ্যের হৃদয় হরণ পূর্ব্বক বিজয়ী বীরের ন্যায় তাঁহাদের প্রেমের বরমাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া চিরদিনের জন্য ইহজীবনের পরপারে মহাযাত্রা করেন তখন তাঁহার জীবিতাবশিষ্ট ভক্ত সম্প্রদায় তাঁহার জন্য শোকাশ্রু পরিত্যাগ করিয়াও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন না; জাতিধর্ম্ম ও সমাজ নির্ব্বিশেষে সমস্ত সুসভ্য দেশে তাঁহার জন্য শোক-কল্লোল সমুত্থিত হয় এবং তাঁহার অভাবে সহসা দেশের কর্ম্মোজ্জ্বল প্রফুল্ল মুখের উপর নিরানন্দ ও বিষাদান্ধকারের ম্লান যবনিকা বিস্তীর্ণ হইয়া তাহা বর্ষার ঘনবর্ষণ-ক্লান্ত অশ্রুসজল ম্লান মুখের মত নিতান্ত বিষণ্ণ ভাব ধারণ করে।

মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের মৃত্যুতে সমগ্র সভ্য জগৎ শোক প্রকাশ করিতেছেন,

কোথায় সুদূরবর্ত্তী, সাগর উপসাগর-পারস্থিত স্বাধীনচিন্তা ও প্রমত্ত কল্পনার লীলাক্ষেত্র, জ্ঞানবিজ্ঞানের পুষ্পিত মোহনকুঞ্জ, এবং কুবেরের কাঞ্চন রত্ন-ভাস্বর অলকা—আর কোথায় এই অজ্ঞতা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য-সমাচ্ছন্ন হীনতা-বিমলিন ভারতভূমি! এই ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে বঙ্গদেশের একটি অখ্যাত ক্ষুদ্র পল্লীর কেন্দ্রস্থলে কয়েকটি শোককাতর ব্যক্তি সমাগত হইয়া আজ যে সেই মৃতমহাত্মার উদ্দেশে অশ্রু উপহার বর্ষণ করিতেছেন, ইহাতে তাঁহারই মহত্ব, তাঁহার আলোকমণ্ডিত অম্লান কর্ম্মজীবনের মহিমা দীপ্যমান হইয়া উঠিতেছে।

মিঃ গ্লাডষ্টোন ইংলণ্ডের রাজনীতিক বীর। রাজনীতিবিশারদ কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের পরলোক গমনে আর কখন্ কোন জাতি এরূপ জাতীয় ক্ষতি উপলব্ধি করে নাই। ইহার কারণ মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের সুগভীর রাজনীতিজ্ঞান, তাঁহার বিপুল জনহিতৈষণা শুদ্ধ বৃটিশ জাতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না; সমগ্র পৃথিবীর তিনি হিতৈষী ছিলেন, সমস্ত মানব-সমাজের তিনি বন্ধু ছিলেন, ন্যায় ও সত্য তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের অভ্যস্ত ধর্ম্ম ছিল। ক্ষুদ্র তরঙ্গিনী প্রথমে সামান্য নির্ঝরিণীরূপে গিরিকন্দর হইতে বহির্গত হয়, ক্রমে সে পর্ব্বতবক্ষ ভেদ করিয়া সমতল ক্ষেত্রে যত নামিয়া আসে ততই সে বিস্তৃত, বেগবতী বহুমুখী ও তরঙ্গভঙ্গ সঙ্কুলা হইয়া ধরণীর শোভা, মানবের সুখ, বহুলক্ষ জীবের আশার ধনধান্য-পূর্ণ তরণী বক্ষে বহনপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া অবশেষে মহাসাগরের সুনীল অনন্ত বারিরাশিতে আপনার দেহ সম্প্রসারিত করিয়া দেয়, এবং এইরূপে অজ্ঞাত পিতৃগৃহের স্নেহ-পালিত ক্ষুদ্র মানব শিশু পৃথিবীর সর্ব্বত্র শান্তি ও প্রেমবর্ষণ করিয়া অবশেষে বার্দ্ধক্যে অনন্ত প্রেমময়ের প্রশান্ত ক্রোড়ে আত্ম সমর্পণ করেন। এই জন্যই ইংলণ্ডের রাজনীতিজ্ঞ গ্লাডষ্টোন পৃথিবীর মানব সমাজে প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষার গুরু হইবার যোগ্য। আমরা ভারতেশ্বরীর অনুরক্ত প্রজা মহামতি গ্ল্যাডষ্টোন একাধিকবার আমাদের রাজরাজেশ্বরীর সাম্রাজ্যতরণীর কর্ণধার পদে নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহার সেই সফলতাপূর্ণ মন্ত্রিত্বকালে আমরা কিরূপ সুখে ছিলাম, এবং তাঁহার সুগভীর রাজনীতিজ্ঞানে বৃটনজাতির কি পরিমাণ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে তাহার

পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে আজ আমরা তাঁহার অশরীরী আত্মার উদ্দেশে আমাদের কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য অর্পণ করিতেছি না,—তিনি কিরূপ মানবহিতৈষী কর্ত্তব্যপরায়ণ মনুষ্য ছিলেন, বার্দ্ধক্যে জীবনের সীমান্ত রেখায় দণ্ডায়মান হইয়াও অসাধারণ উৎসাহে, অলোকসামান্য পরিশ্রমে, অক্লান্ত চেষ্টায় এবং প্রবল ন্যায়নিষ্ঠার সাহায্যে তিনি কিরূপে কর্ম্মশীল মানবগণের পরিচালনোপযোগী কর্ম্মময় জীবনের জ্যোতির্ম্ময় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছেন আজ তাহাই প্রধানত আলোচ্য।

মহাপুরুষদিগের জন্মস্থান লইয়া পৃথিবীর অনেক দেশে মতভেদ লক্ষিত হয়। মহাত্মা খৃষ্ট ও বুদ্ধের জন্মস্থানরূপে পরিগণিত হইবার গৌরবলাভের উদ্দেশ্যে বহুদেশ লালায়িত। প্রাচীন যুনানীর অন্ধকবি হোমারের জন্মস্থান বলিয়া প্রমাণিত হইবার জন্য অনেকগুলি দেশ যুক্তিতর্ক সহকারে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে; আর গ্রেট বৃটনের বিভিন্ন অংশ আজ মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের জন্মস্থান হইবার অধিকার প্রার্থনা করিতেছে। যাহা হউক তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যে স্কটলণ্ডে আসিয়া শতাব্দী ধরিয়া বাস করিতেছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তাঁহার পিতা সার জন গ্ল্যাডষ্টোন বাণিজ্যসূত্রে লিভারপুলে আসিয়া প্রবাস করেন, এইস্থানে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২৯এ ডিসেম্বর সার জনের দ্বিতীয় পুত্র মহামতি উইলিয়ম ইউয়ার্ট গ্ল্যাডষ্টোনের জন্ম হয়।

দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁহাকে ইটনে পাঠাইয়া দেন, এখানে তিনি ছয় বৎসরকাল বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ডের 'ক্রাইষ্টচর্চ্চ' বিদ্যামন্দিরে অধ্যয়ন কার্য্যে নিযুক্ত হন, এই সময়েই তাঁহার উন্নত চিন্তাশীল হৃদয়ে সুশিক্ষার বীজ উপ্ত হয়, তাঁহার ভবিষ্যতের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের এখানেই স্ফুরণারম্ভ হইয়াছিল। যে শিক্ষা ও অনুশীলন প্রাচীন ইংলণ্ডে আদর্শরূপে গৃহীত হইত, মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের জীবন সেই শিক্ষা ও অনুশীলনের অব্যর্থ ফলমাত্র। যুগান্তকাল হইতে যে ইংলণ্ডের ধর্ম্ম ও নীতির সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল প্রস্রবণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া ইংরাজজাতি আপনাদিগের গৌরবপূর্ণ প্রাণহিল্লোলিত জাতীয় উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন, সেই প্রাচীন ইংলণ্ডের নীতি ও ধর্ম্ম মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের হৃদয়ে মনুষ্যত্বের উন্নত আসন সংস্থাপিত করিয়াছিল। সৌভাগ্য-

ক্রমে মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনকে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কিম্বা দয়ার সাগর পণ্ডিত প্রবর বিদ্যাসাগরের মত কর্ম্মহীন হতভাগ্য দেশে মহত্ত্ববিবর্জ্জিত মনুষ্যত্ববিচ্যুত মৃত মানবসমাজের মধ্যে নির্ব্বাসিত থাকিয়া জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয় নাই, তথাপি তিনি স্বদেশে সহস্র গিরিশৃঙ্গশোভিত নাগরাজের শ্রেষ্ঠতম শৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাদ বিসম্বাদ, সামাজিক অনৈক্য ও রাজনৈতিক মতামতের তুচ্ছ আস্ফালন তাঁহার পাদ-দেশে ঘনান্ধকারসমাচ্ছন্ন প্রসারিত বনভূমির ন্যায় নিপতিত থাকিত কিন্তু তাঁহার সমুন্নত সবল মস্তক বিধাতার শুভ্র আশীর্ব্বাদপূর্ণ মঙ্গলজ্যোতিতে সম-লঙ্কৃত এবং তাঁহার সুপ্রসন্ন উদার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল প্রতিভাকিরণে ভাস্বর হইয়া দেদীপ্যমান রহিত।

শুদ্ধ নিদ্রার সাহায্যে পৃথিবীতে কেহ কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। পরনিন্দা ও অনধিকার চর্চ্চাদ্বারা যে পরিমাণেই মানসিক আনন্দ লাভ হউক, তদ্দ্বারা মানসিক উন্নতি একান্ত দুর্ল্লভ; মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন আমাদের মত একথা জানিতেন কিন্তু আমাদের মত ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে কোনদিন উদাসীন ছিলেন না। যে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত তিনি পাঠ করিতেন সে সময়ে তাঁহার সহিত আলাপ করা কিম্বা তাঁহাকে কার্য্যান্তরে নিয়োগ করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত ছিল না। গৃহেই হোক আর পুস্তকালয়েই হউক বেলা দশটা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত কেহ গ্ল্যাডষ্টোনকে দেখিতে পাইত না, এসময় তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া অধ্যয়ন কার্য্যে রত থাকিতেন। আবার রাত্রি আটটা হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাকে আরিষ্টটলের দর্শন কিম্বা থুসিদাই-দিসের গ্রীককাব্যে সমাহিত থাকিতে দেখা যাইত। আঠার হইতে একুশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এই নিয়মে পাঠ করিয়া ১৮৩২খৃষ্টাব্দে অতি যোগ্য-তার সহিত উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা শুনিয়া ইংলণ্ডের লোক বুঝিয়াছিল, মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন বৃটনের বাগ্মী-মণ্ডলীর মধ্যে শীঘ্রই অতি উচ্চস্থান অধিকার করিবেন। অতঃপর তিনি স্বদেশের অভাব দূরীকরণে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন।

রচনাকার্য্যে মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের অসাধারণ অনুরাগ ছিল, তাঁহার প্রতিভা এ বিষয়ে তাঁহাকে বিফলমনোরথ করে নাই। প্রথম বয়সে তিনি

কবিতা রচনার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং 'ঈটন মিস্‌লেনী' নামক পত্রিকা সম্পাদনে সহাযোগিতা করিতেন। এই সকল কবিতার কোন কোনটিতে তাঁহার মহৎ কামনা ও ভবিষ্যৎ গৌরবের ছায়া সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

আমাদের দেশে গীতার সংস্করণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, অন্য কোন জাতির মধ্যে কি না জানিনা, কিন্তু আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে একটা কর্ম্মহীন বৈরাগ্যের বাতাস উঠিয়াছে; গীতার সুলভ সংস্করণগুলির ন্যায় এই প্রকৃতির লোকও আমাদের মধ্যে অত্যন্ত সুলভ দেখা যাইতেছে,। এই সকল ব্যক্তির মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় সংসার মায়াময় ও জীবন স্বপ্নমাত্র, তাঁহারা জীবনের পরিমিত কাল সংসার অসার এই চিন্তাতেই অতিবাহিত করেন এবং তাঁহাদের দ্বারা কোন কাজই সুসম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। এই প্রকার বৈরাগ্য-মূলক মায়াবাদের উপর গ্ল্যাডষ্টোনের সুতীব্র ঘৃণা ছিল। তিনি আদর্শ গৃহী ছিলেন নিষ্কাম ধর্ম্ম তিনি কোন দিন প্রচার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার কামনা মহৎ এবং মনুষ্যোচিত ছিল। কি স্বদেশে, কি প্রবাসে, কি অন্তঃপুরের আরামশয্যায় কি মহাসভার মহাবিতর্ক-ক্ষেত্রে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তিনি কার্য্য-মগ্ন থাকিতেন। ক্ষুদ্র হৌক বৃহৎ হৌক সকল কার্য্যের উপর তাঁহার সমান অনুরাগ ছিল, এবং সমান যত্নে তিনি সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন; বৃটীশ মহাসভায় অগ্নিময় জ্বলন্ত ভাষায় হৃদয়প্রমাথী অজস্র বক্তৃতাস্রোতে যখন তিনি শত শত শ্রোতার হৃদয় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেন তখন তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে যেমন মনোযোগী, গৃহে শান্তিপূর্ণ অবসরের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৌত্র পৌত্রী গুলিকে লইয়া আমোদ করিবার সময়েও তিনি সেই প্রকার মনোযোগী হইতেন। একদিন একজন দর্শক তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখেন, তিনি সেই মহারাজ-নীতিজ্ঞ পণ্ডিত কর্ম্মযোগী বৃদ্ধ গ্ল্যাডষ্টোন, সখের ঘোড়া হইয়া উভয় হস্তে ভর দিয়া অবনত জানুতে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন আর তাঁহার আদরের পৌত্র তাঁহার পৃষ্ঠে সওয়ার হইয়া হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছে! এই আমোদে তিনি এরূপ ব্যস্ত ছিলেন যে কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত সেই দর্শকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয় নাই। অথচ এই গ্ল্যাডষ্টোনের সময়ের মূল্যের প্রতি কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল! একবার সুযোগ্য বক্তা ব্যারিষ্টার মিঃ

লালমোহন ঘোষ মহাশয় মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় করিলে তিনি একটি সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেন, কোন অনিবার্য্য কারণে মিঃ ঘোষের সেখানে যাইতে দুই মিনিট কাল বিলম্ব হইয়াছিল, মিঃ ঘোষ মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইলে তাঁহার একজন সহকারী সহাস্যে বলিলেন "Mr. Ghose you are late by two minutes, Mr. Gladstone is otherwise engaged."—দুই মিনিট বিলম্ব আমাদের নিকট গণনীয় নহে, কিন্তু কাজ করিতে হইলে সময়ের প্রতি এই প্রকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক। আমাদের কাজ নাই; অথচ সময়াভাবের অনুযোগ আমাদের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের পারিবারিক জীবন সুখের ছিল; এই সুখ ছিল বলিয়াই এই বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; তাঁহার পারিবারিক শান্তি এবং দাম্পত্য প্রেম দুর্ভেদ্য-কবচের ন্যায় তাঁহাকে কর্ম্মজীবনের তীক্ষ্ণ নৈরাশ্যময় শায়ক সমূহের আঘাত হইতে নিরন্তর রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সার ষ্টীফেন রিচার্ড গ্লীণির কন্যা কুমারী কাথেরাইনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার চারিপুত্র ও চারি কন্যা; অনেকদিন হইল তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার মৃত্যু হইয়াছে এবং তাঁহার তৃতীয় ও চতুর্থ কন্যা মেরি ও হেলেন অদ্যাবধি কুমারী জীবন বহন করিতেছেন।

কার্য্যক্ষেত্রে যেমন মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের অগণ্য ভক্ত ছিল, গৃহে পরিমিত পরিজন ও দাসদাসীর মধ্যেও তেমনি তাঁহার ভক্তের অভাব ছিল না। দাসদাসীগণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় সম্মান ও ভক্তি করিত; স্বার্থত্যাগ দূরের কথা—তাঁহার জন্য তাহারা কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারেই কুণ্ঠিত ছিল না; এই দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায় তাঁহার অপক্ষপাত ব্যবহার, অকুণ্ঠিত দয়া এবং উদার সুশাসন গুণে গৃহের শৃঙ্খলা ও পারিবারিক শান্তি কেমন অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। যাঁহারা কোন ক্রমে নিজগৃহে শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করিতে অক্ষম তাঁহারা একটী বিস্তীর্ণ দেশের শাসন সংস্করণ কার্য্যে উপযুক্ত নৈপুণ্য দেখাইতে পারিবেন এরূপ আশা দুরাশা মাত্র।

মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের উদারতা মনের বল, এবং স্বাভাবিক স্থৈর্য্য অসাধারণ ছিল। সকলে তাঁহার ন্যায় দয়াপ্রবণ হৃদয় পাইলে পৃথিবীর দুরবস্থা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারিত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পূর্ণ ব্যয়ে পরিচালিত অনাথ আশ্রমে বহুসংখ্যক অনাথ ও অনাথা প্রতিপালিত হইয়া শিক্ষালাভ করিতেছে। এমন দিন ছিল না যে দিন কোন না কোন দুর্ভাগিনী প্রবঞ্চিতা নারী আপনার বিষাদ-পূর্ণ কাহিনী পরিব্যক্ত করিয়া এবং অবশেষে কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা পূর্ব্বক তাঁহাকে পত্র না লিখিত; এই সকল পতিতা রমণীর খেদের কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় দুঃখে ও ক্ষোভে পূর্ণ হইয়া উঠিত, তিনি তাহাদের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, সাধ্যানুসারে তাহাদের সাহায্য করিতে ক্রটী করিতেন না। পতিতের প্রতি এমন করুণা, পাপের প্রতি হৃদয়ের অকৃত্রিম ঘৃণাসত্বেও পাপীর সহিত এত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পূর্ব্বের বিদ্যাসাগর এবং পশ্চিমের গ্ল্যাডষ্টোন উভয়েই অদ্বিতীয় ছিলেন।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে রাজনৈতিক জীবন বহন করা প্রীতিকর কিম্বা আরামপ্রদ নহে; একেত দুষ্কর কর্ত্তব্য সাধন করিতে প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া উঠে, তাহার উপর দৈবাৎ তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিলেও অব্যাহতি নাই, প্রতিদ্বন্দ্বীগণের তিরস্কারপূর্ণ পত্র, ভীতিপ্রদর্শক অনুষ্ঠান, ভীষণ প্রতি-হিংসাগ্রহণের প্রস্তাব প্রতিনিয়ত তাঁহাদের উপর অবিরল ধারে বর্ষিত হইতে থাকে। অন্তঃকরণ অটল এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান সুদৃঢ় না হইলে সাধারণের এই অসন্তোষ-কল্লোল প্রতিহত করিয়া, সাধারণের তুচ্ছ মতামতের উচ্ছ্বসিত উচ্চ তরঙ্গরাশিকে বিদীর্ণ করিয়া প্রতিকূল স্রোতে কেহ সঙ্কল্প-তরণীকে সিদ্ধির হিরণ্ময় উপকূলে লইয়া যাইতে সক্ষম হন না। একবার মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের হীনচেতা প্রতিদ্বন্দ্বীগণ তাঁহার প্রতি মৌখিক নিস্ফল আক্রোশ প্রকাশে সন্তুষ্ট না হইয়া একখানি বিদ্রূপপূর্ণ চিত্র প্রকাশ করিয়াছিল, এই চিত্রখানির নাম "নরকে গ্ল্যাডষ্টোনের অভ্যর্থনা"— মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন এবং তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় সুযোগ্য বন্ধু মহামতি ব্রাইট এই দুইজনকে নরকের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দগ্ধ করা হইতেছে, এবং তিনটী মস্তকবিশিষ্ট কৃষ্ণভল্লুক দ্বারপ্রান্তে বসিয়া প্রহরীর কার্য্য

করিতেছে। অনর্থক যুদ্ধানল প্রজ্জলিত করিতে মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন এবং তদীয় সহযোগীর আন্তরিক বিরাগ সমরপিপাসু, অধীর, বীরদিগকে এই প্রকার কাপুরুষোচিত হীন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিয়াছিল।—অপদস্থ করিবার এইরূপ অশ্রান্ত চেষ্টা, ক্রোধভ্রূকুটী, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রতিদ্বন্দী-গণের অসামান্য যত্ন ও চেষ্টার প্রতি এমন উদ্বেগহীন, অচঞ্চল উপেক্ষা প্রকাশ পূর্ব্বক অবিচলিত চিত্তে কর্ত্তব্যের কঠিন পথে অগ্রসর হওয়া কিরূপ দুরূহ তাহা আমাদের এই ছায়াচ্ছন্ন নেপথ্যবর্ত্তী নিদ্রামগ্ন সুখসুপ্তি-লোলুপ ভারতবাসী কদাচ অনুভব করিতে পারেন না।

মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের স্বাভাবিক বিনয় অতি প্রশংসনীয় ছিল। ফলবান বৃক্ষের ন্যায় বিনয়ভরে তিনি সর্ব্বদা অবনত রহিতেন, কিন্তু সেই বিনয় কখন তাঁহার আত্মসম্মান কিম্বা সুদৃঢ় সঙ্কল্পকে অতিক্রম করিতে পারিত না। তাঁহার কিছুমাত্র বাহ্যিক সাজসজ্জা ছিল না, সভাসমিতিতে গিয়া তিনি সর্ব্বদাই পশ্চাতের আসন গ্রহণের চেষ্টা করিতেন এবং কোন আলোচনার মধ্যস্থলে সহসা উপস্থিত হইয়া একটা আন্দোলনের সৃষ্টি আবশ্যক বোধ করিতেন না। এত অধিক জানিয়া এত সংযতবাক্ হওয়া আমাদের ন্যায় চটুলভাষী অনভিজ্ঞের নিকট আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়।

মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের যে শুধু অসাধারণ বাগ্মিতা ছিল তাহা নহে, চিত্তা-কর্ষক গল্পে তাঁহার অত্যন্ত দক্ষতা ছিল, তিনি বন্ধুবান্ধবগণের সহিত উপ-বেশন করিয়া একসময়ে এত বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করিতে পারিতেন যে সাধারণের নিকট তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে। তাঁহার উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চক্ষু শুধু যে প্রতিভার আলোকে সর্ব্বদা আলোকিত থাকিত এমন নহে, সেই চক্ষে একটি দীপ্তিমান বহ্নি বর্ত্তমান ছিল, দৈবাৎ কোন হতভাগ্য ব্যক্তি তাঁহার সহিত অন্যায় তর্ক আরম্ভ করিয়া পরাস্ত হইলে তিনি বুঝিতে পারিতেন সেই পরিহাসদীপ্ত নয়ন-বহ্নি কিরূপ অন্তর্ভেদী এবং তীব্র। একবার একজন ইংরাজ কথাপ্রসঙ্গে মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনকে লিখিয়াছিলেন, "আপনি হয়ত আমাকে চিনিবেন না, আমাদের যে কোন-দিন পরস্পর সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহাও হয়ত আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন,

কিন্তু আমি আপনার কথা বিস্মৃত হয় নাই, আপনার সেই অন্তর্ভেদী নয়নবহ্নি জীবনে ভুলিতে পারা যায় না।"

কিছুদিন পূর্ব্বে 'নিউইয়র্ক ষ্টার' নামক বিখ্যাত বিলাতী পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, যে মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন দীর্ঘকাল ধরিয়া বক্তৃতা করিবার পর 'ডিনার,টেবিলে' আসিলে তাঁহাকে কিছুমাত্র পরিশ্রান্ত বলিয়া বোধ হইত না। হাউস্ অব কমন্সে সাধারণের দৃষ্টি ও কর্ণ যেমন মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের ভাবভঙ্গী ও প্রত্যেক কথার অনুসরণ করিত, 'সোসাইটী'-তেও তাঁহার ভক্তবৃন্দ তেমনি অদম্য উৎসাহের সহিত তাঁহার প্রত্যেক বাক্য ও মুখভাবের স্ফুরণ লক্ষ্য করিতেন। কথা কহিতে কহিতে তাঁহার তেজপ্রতিভা-প্রদীপ্ত চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, তাঁহার সরল উদার মুখমণ্ডলে চিত্তের সমস্ত ভাব প্রস্ফুটিত হইত এবং তিনি শিশুর মত অকুণ্ঠিত, মুক্ত উচ্চহাস্যে আপনার সরল চিত্তের পরিচয় প্রদান করিতেন। কোন ব্যক্তি গ্ল্যাডষ্টোনের হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তিকে শীতের পিয়ারের সহিত তুলনা করিয়াছেন, কারণ "বিলাতের পিয়ার প্রসূন দুঃসহ তুষার বর্ষণের মধ্যে মুকুলিত ও ফলবান হয় এবং তুহিন ধারাপাতে পরিপক্ক হইয়া উঠে।"

স্বাস্থ্যের প্রতি মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, তিনি পরিমিতাহারী ছিলেন, এবং তাম্রকুটের প্রতি তাঁহার যৎপরোনাস্তি বিরাগ লক্ষিত হইত। তাঁহার বন্ধু মহাত্মা ব্রাইট স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন বলিয়া তিনি অনেক সময় অনুযোগ করিতেন, ব্রাইটের মৃত্যুর পরও তিনি আক্ষেপ করিয়া কতবার বলিয়াছেন, "স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকিলে এতদিন তিনি সুস্থ ও বলবান দেহ লইয়া আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিতে পারিতেন।" ব্রাইটের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের অনুরোধেই সুবিখ্যাত চিকিৎসক সার এনড্রু ক্লার্কের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন, এই সময় মিঃ ব্রাইট বলিয়াছিলেন, "গ্ল্যাডষ্টোন আমাকে বিশ্রাম করিতে দিবে না।"

মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন প্রত্যহ সাতঘণ্টা নিদ্রা যাইতেন, নিদ্রাকালে তিনি তাঁহার মন হইতে সমস্ত চিন্তা বিসর্জ্জন দিতেন, এই কথা শুনিয়া তাঁহার বন্ধু মিঃ ব্রাইট্ বলিয়াছিলেন, "আমার ব্যবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত, আমি শুইয়া

শুইয়া অনেক বক্তৃতার বিষয় ঠিক করিয়া লই।" তাঁহার শয্যাত্যাগ করিতে কিছু বেলা হইত, কিন্তু সেজন্য তাঁহার কোন ক্ষতি হইত না, এত কাজ সত্বেও তিনি তাঁহার নিদ্রার পরিমাণ সঙ্কুচিত করেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে দেহই তাঁহার প্রধান সহায়। তাঁহার স্মরণশক্তি অসাধারণ ছিল, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের সামান্য কথাও তিনি মনে করিয়া বলিতে পারিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য এরূপ সুন্দর ছিল যে এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি কুঠার দ্বারা সুবৃহৎ বৃক্ষচ্ছেদনে ক্লান্ত হইতেন না, এই বৃক্ষকর্ত্তন কার্য্যে মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের অসাধারণ অনুরাগ ছিল। যে বয়সে আমাদের আর্য্য ঋষিগণ সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যগমনের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহার দেড় গুণেরও অধিক বয়সে মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনকে দেশের উন্নতির জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিতে, সযত্নে বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিতে, দর্শন ও ধর্ম্মঘটিত কুটতত্ব লইয়া আন্দোলন পূর্ব্বক জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইতে এবং অবশেষে বিশ্রাম কালে কুঠারহস্তে বৃক্ষধ্বংসরূপ কঠিন শ্রমসাধ্য ব্যায়ামে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া মনে হয় চিন্তা ও পরিশ্রম বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য খণ্ডের মানব সমাজের মধ্যে কি প্রভেদ!

মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন অতি বিশ্বাসী খৃষ্টান ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ তাঁহার দেশানুরাগ অপেক্ষা অল্প ছিল না; এই ধর্ম্মানুরাগের জন্য মানবের নৈতিক দুর্গতি এবং দুর্নীতি দেখিয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইত, তাঁহার দেশানুরাগও পতিত, পরপীড়িত, পরাধীন মানব সমাজের প্রতি সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিয়া তুলিত, এবং উভয়ে মিলিয়া তাঁহাকে সমগ্র মানবমণ্ডলীর হিতের জন্য উন্মুখ করিয়াছিল।

সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারেও মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। তাঁহার বাসস্থান হাউয়ার্ডেনে তাঁহার লাইব্রেরী সেই অঞ্চলের একটি প্রধান পুস্তকালয়, এখানে বিশসহস্রেরও অধিক পুস্তক সংগৃহীত আছে, তাঁহার প্রতিবেশীবর্গের মধ্যে যে কেহ জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি সেই পুস্তকালয় হইতে আবশ্যকীয় পুস্তক চাহিয়া লইয়া পড়িতে পারিত, তাঁহাকে পরমানন্দে পুস্তক দিতেন, এবং সকলের অবসর কিম্বা ধারণাশক্তি সমান নহে বলিয়া তিনি কাহারো নিকট কোন পুস্তক রাখিবার একটা সময়

নির্দ্দিষ্ট করেন নাই; রসিদ দিয়া পুস্তক লইয়া সকলেই তাহা অনির্দ্দিষ্ট কাল নিজের কাছে রাখিতে পারিত। এই লাইব্রেরী হইতে কত লোকের যে কত উপকার হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই প্রসঙ্গে যদি আমরা মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের গুণবতী সহধর্ম্মিণীর সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ না করি তাহা হইলে আমাদের প্রস্তাব অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। গ্ল্যাডষ্টোনপত্নী সুশীলা এবং সুন্দরী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার পিতা সার ষ্টিফেন গ্লিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি ছিলেন। সমযোগ্য সম্ভ্রান্ত বংশ ভিন্ন কোন ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিতে সার ষ্টিফেন ও তাঁহার বন্ধুবর্গের আপত্তি ছিল, কারণ প্রায় যাঠ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বঙ্গদেশের ন্যায় ইংলণ্ডীয় সামাজিক জীবনেও আভিজাত সম্প্রদায়ের সুদৃঢ় বন্ধনের অভ্যন্তরে সাধারণের রক্তস্রোত প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, সুতরাং কুমারী ক্যাথেরাইন যদি তাঁহার প্রতি নিরতিশয় অনুরাগিণী না হইতেন তাহা হইলে এই বিবাহ দুর্ঘট হইত। মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের প্রতি গ্লিনীকুমারীর প্রথম প্রেমাভিব্যক্তির বিবরণ অতি বিচিত্র।

একবার একটা ডিনার পার্টিতে অন্যান্য লোকের মধ্যে মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন এবং কুমারী ক্যাথেরাইন উভয়েই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তখন কেহ কাহাকেও জানিতেন না, মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন তাহার অল্পদিন পূর্ব্বে পার্লিয়ামেণ্টে প্রথম প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিভাজ্যোতি তখন অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠিতেছে, সেই ভোজন সমিতিতে তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট একজন ধর্ম্মযাজক মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনকে লক্ষ্য করিয়া সমাগত বন্ধুবর্গকে বলিলেন, "এই যুবকের প্রতি আপনারা দৃষ্টি রাখিবেন, কালে ইনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইবেন।"—গ্লিনীকুমারীর দৃষ্টি যুবক গ্ল্যাডষ্টোনের প্রতি আকৃষ্ট হইলে, তাঁহার মহত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী, প্রতিভাপ্রদীপ্ত চক্ষুদ্বয় এবং উদার ব্যবহার তাঁহাকে সেই দিন হইতে মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের পক্ষপাতিনী করিয়া তুলিল, পরবৎসর ইটালীতে তাঁহাদের প্রথম পরিচয় হয়, ক্রমে তাঁহাদের পরস্পরের গুণগ্রাহিতা প্রেমে পরিণত হইল এবং কোন বাহ্যিক বাধাবিঘ্ন তাঁহাদের মিলনের পথরোধ করিতে সক্ষম হইল না। যেখানে তাঁহাদের প্রথম প্রণয় পরিস্ফুট হইয়াছিল, কবিতা ও সৌন্দর্য্যের চিরবাসভূমি প্রকৃতির রম্য

উদ্যান নন্দনকল্প সেই ইটালীকে গ্ল্যাডষ্টোন অত্যন্ত ভালবাসিতেন; আজ এই দুর্দ্দিনে ইটালী তাঁহার বিয়োগে আপনার গুপ্তহৃদয়ের প্রেমোচ্ছ্বাসে তাঁহার সমগ্র গুণরাজী-বিজড়িত স্মৃতির আরাধনা করিতেছে।

মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন সমাজের যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার যে অসাধারণ দক্ষতা ছিল, তাহার সহিত তুলনায় তাঁহার পত্নীর যোগ্যতা তেমন অধিক ছিল না, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর ন্যায় মনস্বিনী নারী সর্ব্বত্র দেখা যায় না, তিনি সর্ব্বশুভকার্য্যে স্বামীর চিরউৎসাহদাত্রী, "বিপদে সম্পদে মন্ত্রী, শান্তি মর্ম্মবেদনার" হইয়া বিরাজ করিতেন। তিনি স্বামীর স্বাস্থ্যকে নিজের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম পদার্থ বলিয়া জানিতেন, তাই আজীবন কাল সেই মধুরহৃদয়া সাধ্বী স্বামী-সেবায় রত থাকিয়া গত ১৯ এ মে প্রত্যুষে পাঁচ ঘটিকায় সময় তাঁহার সেই পুরুষ-সিংহ দেশপূজ্য স্বামীকে বিধাতার ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়া শূন্যহৃদয়ে জীবনান্ত-কালের প্রতিক্ষা করিতেছেন। প্রায় নবতি বৎসর বয়সে সেই দুর্দ্দিনের ঊষালোকে নিশাপগমের সহিত রোগকাতর কর্ম্মশ্রান্ত মহাত্মা গ্ল্যাডষ্টোন প্রশান্ত মনে ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে জীর্ণ দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিধাতার দিব্যালোক সমুজ্জ্বল প্রেমোদ্ভাসিত মহাসিংহাসন-ছায়ায় চির-বিরাম লাভ করিয়াছেন, সেজন্য আক্ষেপের কোন কারণ নাই, তাঁহার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া যথাকালে তিনি তাঁহার প্রভুর নিকট প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

আজ মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের মৃত্যুকে সমগ্র বৃটনজাতি আপনাদিগের জাতীয় ক্ষতি বলিয়া মনে করিলেও এবং তাঁহাদের শোকাচ্ছন্ন দেশে সর্ব্বগুণসম্পন্ন নেতার অভাব অনুভূত হইলেও আমরা ভারতবাসী তাঁহার অভাব অল্প মাত্রায় অনুভব করিতেছি না। তিনি এংলোসাক্সন জাতির স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, সেই স্তম্ভ চূর্ণ হইয়াছে; আমরা এই জাতির নিকট কি পরিমাণে ঋণী এবং ইঁহাদের মহত্ত্বের আদর্শ আমাদের নিকট কিরূপ উচ্চ সে কথা চিন্তা করিলেই মিঃ গ্ল্যাডষ্টোনের সহিত আমাদের সম্বন্ধ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

মিঃ গ্যাডষ্টোনের স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনের জন্য তাঁহার স্বদেশে আজ বিপুল

আয়োজন চলিতেছে, এমন মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা দীন দরিদ্র, আমাদের অর্থব্যয়ের সমর্থ নাই উপযুক্ত অর্থের অভাবে আমরা আমাদের দেশের মহাপুরুষদিগের স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনে পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা আমাদের হৃদয়ে কি সেই মহিমান্বিত কর্ম্মযোগীর সম্মানস্মৃতি সংস্থাপন করিতে পারি না? তিনি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যে সুনাম, যে মহৎ আদর্শ, যে উন্নত চরিত্র আমাদের সম্মুখে অক্ষত রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই তাঁহাকে লোকের মনোমন্দিরে চির অমরতা দান করিবে। ইচ্ছা করিলে তিনি রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ উপাধিভূষণে ভূষিত হইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রবৃত্তি ছিল না, তিনি মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন নামেই আজীবন খাটিয়া গেলেন। রাজপ্রসাদে তাঁহার অনুরাগ বা স্পৃহা ছিল না বলিয়া যে তিনি উচ্চ উপাধি গ্রহণ করেন নাই তাহা নহে, সর্ব্ব প্রকার বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রতি তাঁহার কিরূপ অবিচল ঔদাসিন্য ছিল, তাঁহার এই ব্যবহারে তাহাই প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু কোন উপাধি না থাকিলেও মহাত্মা উইলিয়ম ইউয়ার্ট গ্ল্যাডষ্টোন মানব সমাজের ভবিষ্য পরিচালকগণের অগ্রগণ্যরূপে বরণীয় হইবেন, এবং আমরা ভরসা করি অনেক উপাধিভূষিত পরলোকগত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অপেক্ষা বিধাতা তাঁহার এই কর্ত্তব্যপরায়ণ ন্যায়নিষ্ঠ ভৃত্যটিকে অধিক সমাদরের সহিত আপনার ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার স্বর্গীয় আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

মালা।

প্রতিবিম্ব।

যবে হ'তে বুঝিয়াছি হৃদে
প্রতিবিম্ব প'ড়েছে তোমার
কত চেষ্টা করেছি মুছিতে—
হৃদয় করেছি চুরমার;
তবু সখা পারিনে মুছিতে
সব চেষ্টা হয়েছে বিফল,
যত চেষ্টা ক'রেছি মুছিতে
আরো তাহা হ'য়েছে উজ্জ্বল।
প্রতিবিম্ব ভাঙ্গিয়া ফেলিতে
চূর্ণ করি ভেঙ্গেছি এ হিয়া,
এক একটী চূর্ণ মাঝে তার
প্রতিবিম্ব উঠেছে জাগিয়া।
এ চেষ্টায় হইয়া নিরাশ
দূরে যবে গেছি পলাইয়া
কি জানি কি আকর্ষণ বলে
পুনঃ মোরে এনেছো টানিয়া।

দেবতা।

স্বরগের দেবতা গো তুমি
পাশে মোর দাঁড়ালে যখন
ভক্তিভরে এ ক্ষুদ্র হৃদয়
হইল তোমারি সিংহাসন।
সুপবিত্র আমার হৃদয়
দেবতার সুযোগ্য আসন,
তব সম উদার চরিত্র
কেন না পাইবে সে আসন?
দেবতার সহবাসে থাকি
হইল এ চরিত্র উন্নত
দেবতার যতনেতে ক্রমে
দেবীরূপে আমি পরিণত॥

প্রেমবল।

একদিন উঠেছিল ঝড়
হয়েছিল ঘোর অন্ধকার
ভীষণ সে আঁধারের মাঝে
ডুবেছিল দেবতা আমার।
অতল আঁধার ভেদ করি
এ প্রেমের আলো গিয়াছিল
আঁধারেতে পথ দেখাইয়া
দেবতারে তুলিয়া আনিল।
বহুদিন গিয়াছে কাটিয়া
অবশিষ্ট আছে কিছুদিন—
ভীষণ এ সংসার সংগ্রামে
আজ হইয়াছি বলহীন।
হৃদয়েতে নাই আজ বল
চারিদিকে ঘিরেছে আঁধার
আশা আছে ওই প্রেমবলে
কেটে যাবে এই অন্ধকার।
এস দেব এস স্বামী মোর
ঢাল তব প্রেম নিরমল
পবিত্র তোমার ওই প্রেমে
জুড়াইব পাব নব বল।

শ্রীভুপেন্দ্রবালা দেবী।

প্রতিবিম্ব।

আমিষ ভোজন।

আমিষ ভোজনের কর্ত্তব্যতা লইয়া অনেক বিচার হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও যে মীমাংসা হইবে লেখকের এরূপ দুরাশা নাই।

তিন দিক্ হইতে এই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। শরীর রক্ষার কথা,

---

* আমরা রামেন্দ্র বাবুর গবেষণাপূর্ণ আমিষ ভোজন নামক প্রবন্ধ পাইয়া আনন্দ সহকারে পত্রস্থ করিলাম। আমাদিগের এই পত্রে সামিষখাদ্য-প্রস্তুত-প্রণালীর প্রকাশকরণ কিছু অসঙ্গত বলিয়া কাহারও কাহারও ধারণা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে, তজ্জন্য আমরা আমাদিগের এতৎসম্বন্ধে বক্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি।

আত্মার পুষ্টির জন্য যেমন মনুষ্য চিরকাল নিরাকার ও সাকার উপাসনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞানীরা নিরাকারের ও দুর্ব্বল অজ্ঞানীরা সাকার পূজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে সেইরূপ দেহরক্ষার্থ মানব চিরকাল নিরামিষ ও আমিষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সাধারণতঃ অনেকেই জীবনরক্ষার্থ সাকার পূজার ন্যায় আমিষে রত এবং অহিংসা-পরায়ণ প্রশস্তচেতা অল্পলোকেই নিরামিষে রত। নিরামিষাহার কঠোর ও দুঃসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহা আদর্শ হওয়া উচিত; নিরামিষ আহারকে মুখ্য আসন দিয়া আমিষাহারকে গৌণ আসন দেওয়া কর্ত্তব্য।

এই পুণ্য পত্রে "রামমোহন পলান্ন" নামক নিরামিষ পলান্নটি এবং অন্যান্য নিরামিষ খাদ্য আমরা নিরামিষের প্রতি স্বাভাবিক আস্থাব বশীভূত হইয়াই প্রকাশ করিয়াছি। পোলাও মাংসেরই উপকরণে প্রধানত প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু যত্ন ও চেষ্টার ফলে আমরা উপরোক্ত পলান্নটীকে সম্পূর্ণ আমিষ বিবর্জ্জিত এবং আমিষ পলান্ন অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি।

এই পৃথিবীতে শত সহস্র ওষধি, লতা, ফলমূল হইতে প্রাপ্ত ঔষধের অতিরিক্ত ঋষিরা যেমন আয়ুরক্ষার্থ আমিষ হইতেও তাহার উপকরণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন সেইরূপ নিরামিষ আহারের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শরীরের উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া আমরাও আমিষাহারকে বর্জ্জন করিয়া যাইতে পারি নাই। সুলভে রুচিকর খাদ্য সকল প্রস্তুত করিয়া যাহাতে সকলে আপনাদিগের স্বাস্থ্যলাভ এবং আত্মীয় স্বজনের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারেন তাহারই উদ্দেশ্যে আমরা পুণ্যে আহার প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিপিবদ্ধ করিতেছি। পুঃ সং

বিজ্ঞানের বিষয়; খরচের কথা অর্থ শাস্ত্রের বিষয়; তার পর ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা।

বিজ্ঞানের কথাটা আগে শেষ করা যাক্। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে মনুষ্য শরীরের উপাদান অনেকটা কয়লা, অনেকটা জল, খানিকটা ছাই। কাজেই খাদ্য সামগ্রীতে এই তিন পদার্থ থাকা দরকার। তিন উপাদানের মধ্যে কয়লাটা এক অর্থে প্রধান। শরীরের তাপ রক্ষার জন্য কয়লা পোড়াইতে হয়; কাজ কর্ম্ম করিতে হইলে কয়লা পোড়াইতে হয়; সেই জন্য শরীরের মধ্যে প্রতিনিয়ত কয়লা পোড়ে। শরীর একটা এঞ্জিন সদৃশ। সেই এঞ্জিনটা গঠন করিতে খানিকটা কয়লা ও ছাই ও জলের প্রয়োজন। এই তিন সামগ্রী একত্রযোগে মনুষ্যশরীর নির্ম্মাণে লাগে।

দুঃখের বিষয় আমরা কয়লা ও ছাই এই দুই পদার্থ হজম করিতে পারি না অন্য উপায়ে শরীর মধ্যে গ্রহণ করি। উদ্ভিদেরা বায়ু হইতে কয়লা সংগ্রহ করে, মাটি হইতে ছাই ও জল সংগ্রহ করে। এই তিন পদার্থ মিশিয়া জটিল উদ্ভিদ-দেহ নির্ম্মিত হয়। প্রাণী আবার উদ্ভিদ্-দেহ আত্মসাৎ করিয়া ঐ তিন পদার্থকে আরও জটিলতর করিয়া মিশাইয়া ফেলে ও আপন শরীর নির্ম্মাণ করে। সামান্য কয়লা, ছাই ও জলকে উদ্ভিজ্জে পরিণত করিতে বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক, স্বয়ং সূর্য্যদেব ইহাতে সহায়। উদ্ভিদ্ দেহকে প্রাণিদেহে পরিণত করিতেও প্রয়াসের দরকার; কিন্তু প্রাণিদেহকে প্রাণিদেহে পরিণত করিতে তত প্রয়াস লাগে না। প্রাণীরা দুই শ্রেণী। এক শ্রেণী নিরুপায় ও নির্ব্বোধ; ইহারা কায়ক্লেশে উদ্ভিজ্জ আহার করিয়া উদ্ভিদ্-দেহকে প্রাণিদেহে পরিণত করে। আর এক শ্রেণী চালাক; ইহারা বিনা আয়াসে বা অনায়াসে অন্য প্রাণীর দেহকে আত্মসাৎ করিয়া নিজদেহে পরিণত করে। ফল কথা উদ্ভিজ্জ হইতে প্রাণিদেহ নির্ম্মাণে যতটা কষ্ট, এক প্রাণীর দেহ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া অন্য প্রাণীর দেহে পরিণতি পাইতে তত কষ্ট নাই। মোটের উপর মাংস হজম সহজ; উদ্ভিদ্ হজম করা কষ্ট সাধ্য। উদ্ভিজ্জাশী মাটি হইতে খরচ করিয়া ইট তৈয়ার করিয়া ঘর বানান; মাংসাশী একেবারে তৈয়ারি ইট সংগ্রহ করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করেন। উপমাটা অবশ্যই অত্যন্ত মোটা গোছের হইল।

ফলে উদ্ভিজ্জ-খাদ্যের অনেকটা বর্জ্জন করিতে হয়; বাকীটাকেও প্রয়াস সহকারে রক্তমাংসাদিতে পরিণত করিতে হয়। প্রাণিজ খাদ্যে ততটা বর্জ্জনীয় অংশও নাই; পরিণতির প্রয়াসটাও কম। এ সকল শরীর বিজ্ঞান সম্মত স্থূল কথা; ইহা লইয়া বিবাদ করিলে চলিবে না। সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে এক রাশি উদ্ভিজ্জ ভোজনে যে ফল, অল্পমাত্র মাংস ভোজনেও সেই ফল। রাশি রাশি পদার্থ ভোজন করিতে হয় বলিয়াই প্রধান প্রধান উদ্ভিজ্জাশী জন্তুর পাকযন্ত্রও প্রকাণ্ড, সমস্ত শরীরে আয়তনও মোটের উপর প্রকাণ্ড। গোরু, মহিষ, ঘোড়া, উট, হাতী প্রভৃতি উদাহরণ। প্রধান প্রধান মাংসাশী জীবের পাকযন্ত্রও ছোট শরীরও ছোট। সিংহ ব্যঘ্রাদি উদাহরণ। এই হিসাবে আমিষ ভোজনে লাভ; উদ্ভিজ্জ ভোজনে লোকসান।

কোন কোন উদ্ভিদের কোন কোন অংশ প্রায় মাংসের মতই পুষ্টিকর হইতে পারে। ছোলা, মুগ, মসুরী, কলাই প্রভৃতি পদার্থ উদাহরণ। কৃষি দ্বারা এই সকল পুষ্টিকর উদ্ভিজ্জ কতক পাওয়া যায়। আবার রসায়নসম্মত উপায়ে সাধারণ উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে মাংসের মত বা মাংসের অপেক্ষাও পুষ্টিকর পদার্থ তৈয়ার করা না যাইতে পারে এমন নহে। কিন্তু কৃষিলব্ধ ও রাসায়নিক উপায়লব্ধ পুষ্টিকর খাদ্য সম্প্রতি তেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। কাজেই সে উপদেশ নিষ্ফল।

মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য কি? উদ্ভিজ্জের মধ্যে ধান, গম, প্রভৃতি শস্য, ছোলা মুগ প্রভৃতি কলাই, ও নানাবিধ ফলমূল সম্প্রতি মনুষ্যের খাদ্য। এই সমস্ত দ্রব্য কৃষিলব্ধ। মনুষ্যের আদিম অবস্থায় এ সকল দ্রব্য পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল না; মনুষ্য কৃষিবিদ্যাদ্বারা এসকলের এক রকম সৃষ্টি করিয়াছে বলা যাইতে পারে। উদ্ভিজ্জাশী ইতর জন্তু ঘাস পাতা খায়, তাহা মনুষ্যের পাকযন্ত্রের উপযোগী নহে। কাজেই মনুষ্যের আদিম কালে প্রাণিজ খাদ্যই প্রধান ছিল সন্দেহ নাই, একালেও অসভ্য ও বন্য মনুষ্য মৃগয়াজীবী। যাহাদের পশুপালন জীবিকা, তাহাদেরও প্রধান খাদ্য পশুমাংস। পশুহত্যায় সাহায্যের জন্যই আরণ্য বৃকের কুকুরত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ভোজনার্থই গোমেষাদি পশু গ্রাম্যত্ব লাভ করিয়াছে। ফলে মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য প্রাণিমাংস। প্রাণিমাংস যেখানে কুলায় নাই,

যেখানে ভূমি উর্ব্বরা ও প্রকৃতি অনুকূল, সেইখানে মনুষ্য বুদ্ধির জোরে কৃষি বিদ্যা সৃষ্টি করিয়া বিবিধ আরণ্য অখাদ্য উদ্ভিজ্জকে মনুষ্যোপযোগী খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে সমর্থ করিয়া লইয়াছে।

তথাপি কৃষিজীবী সভ্যতম সমাজেও মনুষ্য অদ্যাপি বহুলপরিমাণে মাংস-ভোজী তাহার কারণ কি?

সভ্য সমাজে মনুষ্য সংখ্যা এত বেশী যে কৃষিজাত দ্রব্যে কুলায় না। সেই জন্য ঘাস পাতা প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিজ্জ মানুষের অখাদ্য, তাহাকে পশু-সাহায্যে পশুমাংসে পরিণত করিয়া মনুষ্য কাজে লাগায়। সভ্য সমাজে মানুষ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ খাদ্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতেছে, তথাপি কুলাই-তেছে না সভ্যতম সমাজেও বিস্তর লোক অর্দ্ধাশনে বা অনশনে থাকে। তাহার মূল কারণ আহার সামগ্রীর অপ্রাচুর্য্য।

তিনটা কথা পাওয়া গেল। মাংস উদ্ভিজ্জের অপেক্ষা পুষ্টিকর; মাংস মনুষ্যের নির্দ্দিষ্ট খাদ্য; কৃষি জাত উদ্ভিজ্জ কোন সমাজের পক্ষে যথেষ্ট ও প্রচুর নহে। সুতরাং মনুষ্যের প্রবৃত্তি মাংসের দিকে। মনুষ্য প্রাকৃত নিয়মে জীবনরক্ষার জন্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মাংস ভোজনে বাধ্য।

এই কয়টি কথার প্রতিকূলে বিরোধ উত্থাপন ভ্রম। তথাপি কেহ কেহ বিবাদ তুলেন।

কেহ বলেন, অনেক নিরামিষাশী ব্যক্তিকে সুস্থ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী দেখা যায়। এটা কোন কাজের কথা নহে। মনুষ্যের দীর্ঘজীবিত্ব ও স্বাস্থ্য এত বিভিন্ন কারণে নিয়মিত হয়, যে ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষের উদাহরণ দ্বারা ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা চলে না।

কেহ দেখান, উদ্ভিজ্জাশী জীবজন্তু দীর্ঘজীবী; যেমন হাতী ঘোড়া ইত্যাদি। এ কথাটাও বিজ্ঞানসম্মত নহে। জীববিজ্ঞান অন্যরূপ ব্যাখ্যা দেয়। আহার ও পরমায়ুর মধ্যে সম্বন্ধ আছে সন্দেহ নাই। উপরেই বলি-য়াছি উদ্ভিদ্‌জীবী জীবের কলেবরও বৃহৎ হয়; বৃহৎ কলেবরের সহিত দীর্ঘ পরমায়ুরও একটা সম্বন্ধ আছে, তাহা জীববিজ্ঞান স্বীকার করে। ইহার ব্যাখ্যা হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থে আছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ফলে কোন জাতির পরমায়ুর পরিমাণ একেবারে নির্দ্ধারিত হইয়া গেলে আর

খাদ্য নির্ব্বাচন দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। সংক্ষেপে এ তত্ত্ব বুঝান চলে না; ইহার ভিতরে অনেক কথা আছে।

এই পর্য্যন্ত গেল বিজ্ঞানের কথা। অর্থশাস্ত্র কি বলে দেখা যাউক। জীবনরক্ষা অত্যন্ত আবশ্যক ব্যাপার, উদরের জ্বালার মত জ্বালা নাই। স্বাভাবিক কারণে মনুষ্যের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র, কারণ যত মানুষ আছে, তত খাদ্য নাই। মাংস যেখানে শস্তা, মনুষ্য সেখানে মাংসই খাহিবে; ইহাতে আপত্তি নিরর্থক।

নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী পাঠক এতক্ষণ আমার উপর খড়্গ-হস্ত হইয়াছেন। কিন্তু মাভৈঃ। এখনও আশা আছে। এখনও ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা আছে। আমিষ আহার ধর্ম্মসঙ্গত কি না এ প্রশ্নের উত্তর আবশ্যক। সচরাচর এইরূপ উত্তর দেওয়া হয়।

মাংস ভোজনে স্বভাব হিংস্র হইয়া থাকে। মাংসভোজী পশু হিংস্র, ক্রূর, নিষ্ঠুর।

কথাটা ঠিক নহে। মাংস খাইয়া খাইয়া সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র স্বভাব পাইয়াছে বলা সঙ্গত নহে। বয়স বাড়িলে ব্যাঘ্রের হিংস্রত্ব বাড়ে তাহার প্রমাণ নাই। পুরুষানুক্রমে তাহাদের নিষ্ঠুরতা বাড়িতেছে তাহাও নহে। হিংস্র না হইলে ব্যাঘ্রের চলে না সেই জন্য ব্যাঘ্র হিংস্র। নিরীহ স্বভাব ব্যাঘ্রের এ জগতে স্থান নাই। প্রকৃতি ঠাকুরাণী যেদিন খর নখর ও খরতর দন্ত দ্বারা ব্যাঘ্রাবয়বকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, ও তাহার পাকযন্ত্রকে উদ্ভিজ্জ-পরিপাকে সম্পূর্ণ অশক্ত করিয়াছেন, ঠিক সেই ক্ষণেই তাহার স্বভাবকেও নিষ্ঠুর করিয়া দিয়াছেন। মাংসাশী জন্তুর হিংস্র স্বভাব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল, মাংস ভোজনের আনুষঙ্গিক হইলেও মাংস ভোজনের ফল নহে। মাংস খাইলেই মাথা গরম ও রক্ত গরম হইবে এমন কোন প্রমাণ নাই। তবে মাংস আহরণের সময় মাথা গরম ও রক্ত গরম হওয়া আবশ্যক নতুবা মাংস সংগ্রহ চলে না।

মনুষ্যের পক্ষেও তাহাই। মাংস খাইলেই যে প্রকৃতি ক্রূর হইবে তাহা নহে; তবে যাহাদের মাংস না হইলে চলেনা, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ক্রূর হইতে হয়। কেননা মাংস সংগ্রহ ব্যাপারটাই নিষ্ঠুর কাজ। মাংস

একবার উদরগত হইলে আর যে ক্রূরতা বাড়াইবে তাহার কোন কথা নাই। যাহার মাংসই প্রধান খাদ্য, মাংস যাহাকে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে, তাহার ব্যবসায় নিষ্ঠুর না হইলে চলিবে না। মাংস ভোজনের ফলে মনুষ্য নিষ্ঠুর হয় না, উগ্র স্বভাব হয় না। শরীরবিজ্ঞান কিছুই বলে-না। হয় কি না বিনা পরীক্ষায় প্রমাণেরও আশা নাই। সেরূপ পরীক্ষা হইয়াছে কিনা জানিনা।

হিন্দুর ন্যায় কৃষিজীবী জাতি নিরীহ স্বভাব; কেননা হিন্দুর দেশে কৃষিলব্ধ খাদ্য এত জন্মিয়া থাকে, যে মাংস সংগ্রহের তেমন প্রয়োজন নাই। ইংরাজ প্রভৃতি উগ্রস্বভাব; কেননা তাহাদের দেশে যে পরিমাণ শস্য জন্মে, তাহাতে সকলের উদরের জ্বালা থামে না। কাজেই উহাদিগকে নিষ্ঠুর পশুহত্যা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আজ কাল স্বদেশ জাত উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ একত্র করিলেও উহাদের আহার সঙ্কুলান হয় না; সেই জন্য উহারা স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইতেছে ও বিদেশের লোককে ঠেঙ্গাইয়া তাহাদের মুখের আহার কাড়িয়া লইতেছে। এই ব্যবসায়টাই নিষ্ঠুর; উদরের জ্বালায় তাহাদিগকে নিষ্ঠুর হইতে হয়। অনেকে বলেন শীতপ্রধান দেশে অধিক মাংস আবশ্যক। একথার মূল কি তাহা জানিনা। কথাটা বোধ হয় বিজ্ঞানসম্মত নহে। ইউরোপীয়ের মাংসাহারের সহিত তাহাদের দেশের শীতাধিক্যের মুখ্য সম্বন্ধ নাই। মাংস শীত নিবারণে সাহায্য করে না। উদ্ভিজ্জের অভাবে উহারা মাংস খায়; সেই মাংস সংগ্রহের জন্য তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ক্রূর স্বভাব হইতে হইয়াছে। মাংস ভোজন করিয়া উহারা ক্রূর স্বভাব হয় নাই। সংগ্রহ ও ভোজন দুইটা পৃথক ব্যাপার। সংগ্রহকারী নিষ্ঠুর; ভোজনকারী নিষ্ঠুর না হইতেও পারে। তবে যিনি ভোজন করেন, তাঁহাকেই অনেক সময় সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, আবার স্বয়ং সংগ্রহ না করিতে পারিলে অপরের দ্বারা সংগ্রহ করিতে হয়; স্বয়ং অন্তরালে থাকিয়া সংগ্রহ কার্য্যের অনুমোদন ও সাহায্য করিতে হয়। সুতরাং তিনি গৌণভাবে এই নিষ্ঠুর ব্যবসারের জন্য দায়ী।

কথাটা দাঁড়াইল এই। মাংসভোজনে মানসিক বৃত্তি সকল উত্তেজিত

হয়, তাহার সম্যক্ প্রমাণ নাই, তবে মাংস আহরণে নিষ্ঠুরতা আবশ্যক। এবং যিনি স্বয়ং মাংস আহরণ করেন না, অন্যের আহৃত মাংস ভোজন করেন, তিনিও গৌণভাবে নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। নিষ্ঠুরতা যদি অধর্ম্ম হয় তিনি এই অধর্ম্মের অংশতঃ ভাগী তাহার সন্দেহ নাই।

আমরা উপরে বলিয়াছি, মাংস ভোজনে শরীরের বৃদ্ধি আছে; স্বাস্থ্যের উন্নতি আছে; দেশকাল ভেদে মাংস নহিলে জীবন রক্ষাই চলে না। এমন আহার মাংসভোজনে অধর্ম্ম আছে কি না? উত্তর দেওয়া তত সহজ নহে। 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।' নতুবা মনুষ্য সমাজে এ বিষয়ে এত মতভেদ কেন?

ইউটিলিটি ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে; লোকহিতই ধর্ম্ম। কিন্তু কোন একটা কার্য্য ধর্ম্মসঙ্গত স্থির করিতে গিয়া যিনি ক্ষতিলাভ গণনার হিসাব করিতে বসেন, এই কার্য্যে লোকহিত হইবে কি না বিবিধ যুক্তি ও বিবিধ বিজ্ঞানের সাহায্যে অঙ্কপাত করিয়া গণনা করিতে বসেন তাঁহার মত নির্ব্বোধ দ্বিতীয় নাই। এরূপ গণনা অসম্ভব। এই বিচারে গণনার আয় না লইয়া আমাদের সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কি বলে তাহার সন্ধান লওয়াই বিধেয়। ইংরাজিতে যাহাকে কন্‌শেন্‌স্ বলে আমি তাহাকেই সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলিতেছি। এ প্রবৃত্তিই যে আবার সকল লোকের পক্ষে একই রকম ও এই প্রণালীতেই যে সর্ব্বত্র খাঁটি উত্তর পাওয়া যাইবে, কোথাও ঠকিতে হইবে না, তাহাও আমি বিশ্বাস করি না। চোরের সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে আমার সাহস হয় না। তবে ধর্ম্ম নিরূপণের সময় মোটের উপর ইউটিলিটির হিসাব ও ক্ষতি লাভ গণনা অপেক্ষা ইহার উপর নির্ভরই শ্রেয়ঃ।

নিষ্ঠুরতা যতই আবশ্যক হউকনা কেন, সাধুলোকের সম্বন্ধে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিষ্ঠুরতার প্রতিকূল। নিষ্ঠুরতার দিকে সাধুলোকের অনুরাগ হইতে পারে না। অথবা নিষ্ঠুরতায় যার যত বিরাগ সে তেমনি সাধু। মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুরতা সর্ব্বতোভাবে সাধু প্রকৃতির পক্ষে কষ্টকর; ইতর জীবের প্রতি দয়াও সংসম্মত। এমন কি সাদা চামড়ার মধ্যেও সময়ে সময়ে পশুপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঠক মহাশয় ক্ষমা করিবেন, শ্বেত চর্ম্মের অভ্যন্তরে যে বিশুদ্ধ মানব প্রেম বর্ত্তমান থাকিতে পারে, সহস্র ঐতিহাসিক উদাহরণ সত্ত্বেও আমি ইহা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে পারি না। এই ভয়ানক অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার হইতে মুক্তিলাভ আমার পক্ষে একরকম অসম্ভব। ইতিহাস ও কোন একটা পাশ্চাত্য ফিলানথ্রপির প্রকৃত উদাহরণ সম্মুখে ধরিলেই সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ মধ্যে উনিশশত বৎসরের খ্রীষ্টানির ধারাবাহিক রক্তাঙ্কিত চিত্রপট সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলে।

মানবপ্রেম সম্বন্ধে যাহাই হউক, ইউরোপের লোকেও পশুক্লেশ নিবারিণী সভা স্থাপন দ্বারা এবং পাস্তুর-প্রবর্ত্তিত চিকিৎসাপ্রণালীর বিরোধাচরণ করিয়া পশুপ্রেমের পরিচয় দেন; কেহ কেহ বা আমিষাহার বর্জ্জনের ফ্যাশন তুলিয়া ইন্দ্রিয়সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখান। সুতরাং জীবহিংসা ও জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতা যে সাধুজনের সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে পীড়া দেয় তাহাতে সংশয় নাই। ইউটিলিটির হিসাব ত্যাগ করিয়া এই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিলে ধর্ম্মমীমাংসা যদি সুকর হয়, তবে জীবহিংসা অধর্ম্ম। মাংস ভোজনে জীবহিংসার প্রশ্রয় দেয়, সুতরাং জীবহিংসা অধর্ম্ম। জীবের মাংস সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হইতে পারে; তথাপি জীব-হত্যা অধর্ম্ম।

আমাদের হিন্দু সমাজের এ বিষয়ে মত কি তাহা বিবেচ্য। অহিংসা পরম ধর্ম্ম এই মত এই দেশেই প্রচারিত হইয়াছিল; খ্রীষ্টানের দেশে নহে। ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের উচ্চতর স্তরে হিংসার প্রতি যতটা বিরাগ আছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও ততটা আছে কিনা জানিনা। অন্ততঃ এদেশের বৃহৎ মানবসম্প্রদায় যে ভাবে জীবহিংসা ও আমিষাহার বর্জ্জন করিয়াছে পৃথিবীর অন্য কোথাও তেমন দেখা যায় না। অথচ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত অহিংসাধর্ম্মের স্থানে স্থানে বিরোধ দেখা যায়। এই ঘটনাটার আর একটু বিচার আবশ্যক।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূল বেদ। বেদ পশু হিংসার বিরোধী নহে। বৈদিক যজ্ঞে পশুহত্যার ব্যবস্থা ছিল। ঋষিরা মাংসভোজী ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, একালে যে মাংস হিন্দুর পাতিত্য জনক, ঋষিদের নিকট তাহাও

উপাদেয় ছিল। একালে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক উপাসনা বৈদিক যজ্ঞের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। দেবোদ্দেশে পশুহত্যা এই সকল উপাসনাতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একালে অনেক ব্রাহ্মণসম্প্রদায় মাংস বর্জ্জন করিয়াছেন, অনেকে দেবোদ্দিষ্ট মাংস ভিন্ন অন্য মাংস খান না, তথাপি মাংসভোজন হিন্দুর বর্জ্জনীয় এরূপ ব্যবহার নাই। পিতৃশ্রাদ্ধে মাংস ব্যবহার অদ্যাপি প্রচলিত। আয়ুর্ব্বেদ ও বৈদিকশাস্ত্রে বিবিধ মাংসের গুণকীর্ত্তন ও ব্যখ্যা আছে। বলা বাহুল্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলে আয়ুর্ব্বেদ এরূপ বিধানে সাহসী হইতেন না। শাস্ত্রে স্পষ্ট নিষেধ নাই, স্থানবিশেষে স্পষ্ট ব্যবস্থা আছে; অথচ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মাংসভোজনের বিরোধী; এস্থলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত অহিংসা-ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে খট্‌কা উপস্থিত হয়।

এই খট্‌কা বহুদিন পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিল। অন্ততঃ মনুসংহিতা ও মহাভারত রচনার সময় শাস্ত্রের সহিত সহজ ধর্ম্মের এই বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। অহিংসাধর্ম্ম বৌদ্ধগণের প্রবর্ত্তিত মনে করিবার সম্যক্ কারণ নাই। বুদ্ধদেব স্বয়ং মাংসভোজন একেবারে নিষেধ করিয়া যান নাই। শ্রমন সম্প্রদায়মধ্যে মাংসভোজন প্রথা ছিল। একালের বৈদেশিক বৌদ্ধেরা মাংসভোজনে কুণ্ঠিত নহেন। তবে করুণাসিন্ধু ভগবান শাক্যমুনি বৈদিকযজ্ঞে পশুহত্যার নিন্দা করিয়াছিলেন; এদেশে অহিংসা ধর্ম্মপ্রচলনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অস্বীকার করিলে চলিবেনা।

মনুসংহিতাকার বড়ই গোলে পড়িয়াছিলেন। তিনি বৈদিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী; বৈদিক আচার অব্যাহত রাখিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা; অথচ তাঁহার মনে বলিতেছে জীবহত্যা কাজটা ভাল নাহ। বৈদিক ব্যবহার লোপে তিনি সাহসী হয়েন নাই; যজ্ঞানুষ্ঠান ভিন্ন অন্যত্র জীবহত্যার তিনি নিন্দা করিয়াছেন; শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন "প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'

এই মীমাংসা একালের লোকের পছন্দ হইবে না। একালের লোকে বলিবেন মনুসংহিতাকার ভীরুতার পরিচয় দিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আদেশ সত্ত্বেও তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘনে সাহসী হয়েন নাই। এ কালের যুক্তি যে ধর্ম্মনির্ণয়ে শাস্ত্রের ব্যবস্থা গ্রাহ্য নহে। সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি

বা কন্‌শেন্স যাহা অনুমোদন করিবে তাহাই গ্রাহ্য। সমস্ত সমাজ সংস্কারকের মুখে এই এক কথা। হিন্দু সমাজ শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘনে সাহসী হয় না; কাজেই সংস্কারকগণ হিন্দুসমাজের নিপাত কামনা করেন।

আমরা হিন্দু সমাজের ওকালতিতে প্রবৃত্ত হইব না। তবে এই বিবাদটার সমালোচনা করিব! বিষয়টা আলোচ্য; কেননা কেবল হিন্দু সমাজ কেন সকল সমাজেই শাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির এই বিরোধ দেখা যায়।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূল বেদ। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম শব্দটা ইচ্ছা পূর্ব্বক ব্যবহার করিতেছি। কেননা আধুনিক হিন্দুধর্ম্মে বেদবিরোধী অনেক উপাদান প্রবেশ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূল বেদ। 'ধর্ম্ম' শব্দ ও 'বেদ' শব্দের একটু ব্যাখা আবশ্যক। ধর্ম্ম বলিলে ঠিক্ রিলিজন বুঝায় না। রিলিজনের মুখ্য সম্বন্ধ ঈশ্বর, পরকাল, ও অতিপ্রাকৃতের সহিত। ধর্ম্মের সম্বন্ধ মনুষ্যের সমগ্র জীবনের সহিত। আমরা সম্পূর্ণ ঐহিক স্বার্থের জন্য আহার বিষয়ে ডাক্তারের ব্যবস্থা লই, রাজাকে নির্দ্দিষ্ট খাজানা দিয়া থাকি; সম্পত্তিতে সত্ব লইয়া প্রতিবাদীর সহিত মোকদ্দামা করি। এ সকল কার্য্য রিলিজনের অন্তর্গত নহে। কিন্তু ইহা খাঁটি ধর্ম্মের অন্তর্গত। এই সকল কার্য্য যথা বিধানে সম্পাদন না করিলে অধর্ম্ম হয়। ডাক্তার ও উকীল ও মাজিষ্ট্রেট ব্রাহ্মণের শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মব্যবস্থাপক। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মশাস্ত্রের কিয়দংশ ডাক্তারী ও কিয়দংশ আইন। অনেকে এজন্য বিস্মিত হন, অনেকে গালি দেন। আমরা বিস্ময়ের বা গালি দেওয়ার কারণ দেখিনা। ব্যবহার সঙ্গত হইতেছে কিনা সে কথা স্বতন্ত্র। ধর্ম্ম শব্দটা রিলিজন অর্থেই ব্যবহার করিতে হইবে এমন কোন আইন নাই। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম মনুষ্যের সমগ্র কর্ত্তব্য সমষ্টি।

বেদ শব্দে সঙ্কীর্ণ অর্থে কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ বুঝায়। প্রশস্ত অর্থে বেদ শব্দ গ্রহণ করা আবশ্যক। ইংরাজি প্রতিশব্দ tradition অনেকটা কাছাকাছি আসিতে পারে। আরও প্রশস্ত করিয়া মনুষ্যজাতির অথবা আর্য্যজাতির ধর্ম্মমার্গে ও কর্ম্মমার্গে সমগ্র অতীতকাল ধরিয়া উপার্জ্জিত অভিজ্ঞতার নাম বেদ। এই বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য, অনাদি। ইহার আদি

পাওয়া যায় না। অন্ততঃ মনুষ্যজাতির যেদিন আরম্ভ, এই অভিজ্ঞতার সেই দিন আরম্ভ। কিংবা ইহার আরম্ভ আরও পূর্ব্বে। ব্রাহ্মণের শাস্ত্র খুঁজিলে ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনতত্ত্ব মিলিতে পারে এরূপ আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু প্রাকৃতিক অভিব্যক্তিতে ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পৃথিবীর অন্য কোন মনুষ্য সম্প্রদায়ের এই বিশ্বাস নাই। ব্রাহ্মণের ইহাই প্রধান গৌরব। ব্রাহ্মণের মতে মনুষ্যের একদিনে সহসা সৃষ্টি হয় নাই। মনুষ্যের অভিজ্ঞতাও এক দিনে জন্মে নাই। কোন্ তারিখে এই অভিজ্ঞতার বীজ বপন হইয়াছিল তাহার নির্ণয় নাই। হয়ত জগতের যে দিন আদি, এই অভিজ্ঞতারও সেই দিন আরম্ভ। কাজেই বেদ অনাদি; ঋষিগণ বেদের দ্রষ্টা বা শ্রোতা; স্বয়ং জগন্নিয়ন্তা ব্রহ্মাও বেদের স্রষ্টা নহেন। খ্রীষ্টানি হিসাবের সৃষ্টি ব্রাহ্মণ মানিতেন না। জগতের সৃষ্টি হয় নাই; বেদেরও সৃষ্টি হয় নাই। বেদ অপৌরুষেয়।

মনুষ্য তাহার প্রাচীন বহুকালের উপার্জ্জিত অভিজ্ঞতার ফলে কতকগুলি সামাজিক নিয়মের অধীন হইয়া সমাজ বাঁধিয়া বাস করে। এই সকল নিয়মের পরিচালনার ভার কতক রাজার উপর, কতক যাজকের উপর, কতক জনসাধারণের উপর। কিন্তু তাহারা নিয়ন্তা ও পরিচালক; কেহই স্রষ্টা নহেন। এই সকল নিয়ম প্রকৃতির অঙ্গীভূত; প্রাকৃতিক নিয়মে বিকাশ পাইয়াছে, বিকৃত হইতেছে, লয় পাইবে। কাজেই ব্রাহ্মণের চক্ষে এই সকল সামাজিক নিয়ম অর্থপূর্ণ ও মাহাত্ম্যে মণ্ডিত। সহস্র যুগের অতীত ইতিহাস এই সকল সামাজিক নিয়মের শনৈঃ শনৈঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সকল নিয়মের সমষ্টি ধর্ম্ম। প্রকৃতির মহাযন্ত্রে যে নিয়ম, যে শৃঙ্খলা, যে ব্যবস্থা আছে, মানব সমাজের অন্তর্গত নিয়ম সমষ্টি তাহার অন্তর্গত। ধর্ম্ম জগদ্বিধানের একটা ভাগ। মাধ্যাকর্ষণের উপর তোমার আমার হাত নাই; সামাজিক নিয়মের উপর আমাদের হাত নাই; ধর্ম্ম অনাদি ও সনাতন ও পুরাতন।

আচার অনুষ্ঠান পরিবর্ত্তনশীল, ধর্ম্মের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ধর্ম্ম পুরাতন। মাধ্যাকর্ষণে ব্যভিচার নাই, তথাপি পৃথিবী একত্র স্থির নাই। প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যভিচার নাই তথাপি ধরাপৃষ্ঠ যুগ ব্যাপিয়া বিবিধ বিকারে

বিকৃত হইয়াছে। সামাজিক নিয়মের ব্যভিচার নাই, ধর্ম্ম সনাতন, তথাপি আচার অনুষ্ঠান পরিবর্ত্তনশীল, ধর্ম্মের মূর্ত্তি মনুষ্যের নিকট দেশকালভেদে বিভিন্ন। দেশকালভেদে নীতি, ইংরাজিতে যাহাকে মরালিটি বলে, তাহাও পরিবর্ত্তিত হয়; দেশকালভেদে আচারও পরিবর্ত্তিত হয়। মনুসন্তানের পুরাতন জ্ঞানসমষ্টিরূপী বেদ মধ্যে ধর্ম্ম নিহিত আছে; অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি সহকারে ধর্ম্মের পরিসর বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্রাহ্মণ একাধারে রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল। অতীতের প্রতি ভক্তি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কর্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট ফলপ্রসূ হইয়াছে। কিন্তু সেই ভক্তি সমাজের গতি রুদ্ধ করে নাই। মনুর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ সনাতন ধর্ম্মের মার্গে অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে; বিনা রক্তপাতে বিনা কোলাহলে প্রাচীন আচার প্রাচীন অনুষ্ঠান ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। যে ব্রাহ্মণকে উন্নতির বিরোধী বলে, সে ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্যয়ন করে নাই; সে পৃথিবীর অন্যদেশের ইতিহাস পড়ে নাই; সে চক্ষু সত্বে অন্ধ।

কথাপ্রসঙ্গে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। মনুষ্য অভাবে প্রকৃতির নিয়োগে জীবনরক্ষার জন্য চিরকাল পশুমাংস ভোজন করিয়া আসিতেছে। ইহাতে এক হিসাবে অধর্ম্ম নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সকল মনুষ্যের মতই নির্ব্বিকার চিত্তে মাংস ভোজন করিতেন; কেননা তাহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা, তাহাই মানবের প্রাচীন ধর্ম্ম। দেবতার প্রীতির জন্য পশুবলি হইত; পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই ইতিহাস; একেশ্বরবাদী ইহুদীরাও জেহোবার মন্দিরে বিবিধ প্রাণী হত্যা করিত। এই কারণে বৈদিক যজ্ঞে হিংসার ব্যবস্থা। শস্যপূর্ণ ভারতভূমিতে কৃষিবৃত্তিপরায়ণ আর্য্য সন্তানের আর তেমন জীবহিংসার প্রয়োজন হয় নাই; জীবের প্রতি দয়াবৃত্তির স্বাভাবিক নিয়মে বিকাশ হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অন্তঃকরণে নূতন ভাবের উদ্বোধন করিল। আশা করিতে পার মনুষ্য বিজ্ঞানবলে একদিন এমন বলিষ্ঠ হইবে যেদিন আর নিষ্ঠুর হিংসার প্রয়োজন হইবে না, সেদিন সমগ্র পৃথিবীতে অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে। এখনও মনুষ্যের সে অবস্থা হয় নাই। মনুষ্যকে জ্ঞানাভাবে ও শক্তির অভাবে

অদ্যাপি প্রাচীন হিংস্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইয়াছে। অতীতের প্রতি ভক্তিপরায়ণ মনুসংহিতাকার মনুষ্যের প্রাচীন ধর্ম্মের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। নূতন ধর্ম্মকে আগ্রহের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রকৃতিকর্ত্তৃক বঞ্চিত দুর্ব্বল ক্ষুধার্ত্ত মানবকে এই পরম ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল। অগত্যা মনুসংহিতাকারের সহিতই বলিতে হয়।

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

কাদম্বরী

কাদম্বরী সংস্কৃত সাহিত্যে একটী প্রাচীন উপন্যাস; বলা বাহুল্য পরবর্ত্তী সংস্কৃত উপন্যাসাবলী ইহার কৌশলে, ইহার ভাবে, ইহার শব্দাড়ম্বরে, বিশেষতঃ ইহার নীতিতে পরিপূর্ণ। কাদম্বরী একটী মূল হ্রদস্বরূপ,—বিভিন্ন কবি ইহার বিভিন্নমুখে উৎসারিত হইয়া প্রবাহিত স্রোত-ধারায় আপন আপন যশের তরণী ভাসাইয়াছেন। বস্তুতঃ সংস্কৃত উপন্যাসে রূপেগুণে অতুলনীয়া কাদম্বরীর উচ্চাসন ন্যায্য ও যোগ্য।

কাদম্বরী সংস্কৃতে আদি উপন্যাস না হইলেও প্রথম বৃহদায়তন উৎকৃষ্ট উপন্যাস। অনেক সময়ে ইহা দেখা যায় যে যাহাই আপন শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাগ্রে গুণে প্রাধান্য লাভ করে, তাহাই জগতে চিরকাল শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হয়,—অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই প্রাচীন কবি, প্রাচীন শিল্পী, প্রাচীন শাস্ত্রকার, প্রাচীন বীর চিরকাল জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রাচীন কবি, কবিতার ক্রমিক বিলোপ বশতঃ, উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছেন। উপন্যাসও কবিতা বটে, কিন্তু গদ্য কবিতা; সুতরাং প্রাচীন কবিতার সঙ্গে সঙ্গে, প্রাচীন উপন্যাসেরও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়া বরং দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। কাদম্বরী প্রাচীন প্রশংসনীয় উপন্যাসসমূহের প্রাচীনতম; সুতরাং ইহার আদর অধিকতম ও অধিককাল স্থায়ী হইবে সন্দেহ নাই।

কাদম্বরীর আরম্ভ অতিবিস্ময়জনক ও কৌশলময়। গ্রন্থকার ক্রমে ক্রমে পাঠকের মন প্রস্তুত করিয়া বিস্ময়রস ঢালিয়া দেন নাই; গ্রন্থকার পক্ষান্তরে সহসা ও অতর্কিতে বিস্ময়াপ্লুত পাঠককে স্তম্ভিত ও বিমোহিত করিয়া এক অশ্রুতপূর্ব্ব, আশ্চর্য্য কুতূহলময় প্রেমের কাহিনী শুনাইতেছেন। কবি অকস্মাৎ একটি মনুষ্যভাষী মনুষ্যেতর জন্তুকে প্রাণীশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট লোকসংগঠিত সর্ব্বপ্রধান রাজসভায় নিক্ষেপ করিলেন। অবশ্যই বাকৃশক্তির একাধিকারী মনুষ্যের দর্প এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে ক্ষুণ্ণ হইল; কিন্তু বিস্ময় ও কুতূহল অন্যান্য বৃত্তি অপদস্থ করতঃ মনকে অভিভূত করিল। বিশেষতঃ সে মনুষ্যবাক্ ইতর প্রাণী জগতে সৌন্দর্য্যে ও সুকণ্ঠে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকপ্রিয় বিহঙ্গ। সভাসদ্‌গণ চকিতচিত্তে এই সুন্দর প্রাণীর সুমধুর কণ্ঠে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবভাষায় ললিতরসপূর্ণ এক অশ্রুতপূর্ব্ব প্রেমকাহিনী সাবেগে ও উৎকর্ণে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকার মধ্যস্থলে সহসা কাব্যের বা উপন্যাসের অবতারণা সকল দেশে সকল কালে আদৃত। হোমার ও মিল্টন তাঁহাদিগের জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্য ঠিক এই ধরণে মধ্যস্থলে আরম্ভ করিয়া পাঠকদিগকে চমকিত করিয়াছেন। এই বিমোহন কৌশল বাণভট্টের সৃষ্টি কিনা জানি না। কিন্তু ইহা সুরস গ্রন্থারম্ভের এক প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। ইহাই কাদম্বরীর একমাত্র কৌশল নহে। ইহার আদ্যন্ত ঘটনাবলী বিচিত্র কৌশলময়,—বিশেষতঃ শুক ও শূদ্রকরূপী বন্ধুযুগলের আকস্মিক মিলন অতি মধুর,—অতিসুখে শূদ্রকের তৎক্ষণাৎ প্রাণবিয়োগ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

কাদম্বরী ভাবের মনোহারিত্বে ও চমৎকারিত্বে এক ভাব প্রধান জাতির ভাবময় ভাষায়ও অপরাজিত—অনতিক্রান্ত—এমন কি অতুলনীয়। ইহার অধিকাংশ ভাবের উচ্ছাস যেমন মাধুর্য্যে ও মৌলিকতায় পূর্ণ তেমনই স্বাভাবিক। পুণ্ডরীক নবযুবক; যৌবনজোয়ারে হৃদয়-সাগর প্লাবিত—প্রেমলহরীর উচ্ছাসসকল উচ্ছৃঙ্খল, ইতস্ততঃ অপ্রতিহত উদ্দামবেগে ছুটীতেছে,—অনন্ত অগাধ এ সাগরে বেলা নাই, কূল নাই—যাহাতে বিলীন হইবে! যৌবন বসন্তে পুণ্ডরীক-কলি মধুরে বিকসিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অলি বা মলয়ানিল উহার সৌরভ এখনও লুটিয়া লয় নাই!—যৌবনে তাঁহার বৃত্তি সকল

প্রকৃতির অসংযত স্ফূর্ত্তিতে প্রবলরূপে মাতিয়াছ বটে, কিন্তু কদাচ মুক্তভাবে খেলা করিতে পায় নাই, সুতরাং উদ্দাম ভাবের শান্তি হয় নাই। তাহার প্রবৃত্তি সম্যক স্বাভাবিক উদ্দাম তেজের অবস্থায় ছিল। পুণ্ডরীক ঋষিকুমার—এবং স্বয়ংও তত্বচিন্তায় দীক্ষিত, সুতরাং ধর্ম্মারণ্যেই তাঁহার জন্ম, বৃদ্ধি ও অবস্থিতি; অরণ্যে সদাকাল থাকিয়া হয়ত জীবনে কখনো রমণীমুখ দেখেন নাই। এই অবস্থায় পুণ্ডরীক অচ্ছোদতীরে;—একেত অচ্ছোদ সরোবর পরম রমণীয় সুতরাং প্রবৃত্তি উদ্দীপনের অনুকূল, তাহার উপর আবার বিদ্যাধরী রাজনন্দিনী কাদম্বরী দিব্যাঙ্গনা পরমা সুন্দরী। কি অপূর্ব্ব মিলন! কি কঠোর পরীক্ষা! কি ভীষণ সঙ্কট! এমন চিত্র জগতে দুর্লভ; পুণ্ডরীক সংসারত্যাগী কাননবাসী, কিন্তু তাঁহার মনোবৃত্তি সকল সংসারত্যাগের দুর্জ্জয় শত্রু। পুণ্ডরীক এই দারুণ শত্রুতা অনুভব করিতে পারে নাই; কেন না প্রবল পরাক্রান্ত হইলেও, তাঁহার মনোবৃত্তি তপোবনে এ পর্য্যন্ত স্বমূর্ত্তি ধারণ করে নাই। এই বিরোধী অন্তর্বৃত্তি লইয়া ঋষিকুমার ঘোর সংসারী রাজকন্যার বিলাসমঞ্চে অকস্মাৎ পতিত হইল,—যেন বিদ্রোহী সৈন্য লইয়া শত্রুব্যূহে অতর্কিতে প্রবেশ করিল! সুতরাং নীতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেও, সংসারানভিজ্ঞ লৌকিক শিক্ষারহিত পুণ্ডরীকের পরাজয় ও পতন অবশ্যম্ভাবী। সান্ধ্য গগনে যখন ঈষৎ অস্তগত সূর্য্যের তির্য্যক ছটায় গোধূলির রমণীয়তা মধুরতর হইল, যখন অচ্ছোদসরোবর-স্নাত মলয়ানিল কাননকুঞ্জের পরিমল বিকীর্ণ করিয়া মন্দ মন্দ সুখস্পর্শ বহিতে লাগিল, যখন চন্দ্রমা জ্যোৎস্নায় তারকাখচিত অনন্তাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া অচ্ছোদের বিমল সলিলে প্রতিফলিত হইল, তখন সেই মোহন প্রমোদ উদ্যান আরও উন্মাদ ভাব ধারণ করিল! তখন নিরুপায় ভগ্নহৃদয় পুণ্ডরীকের ধমনীতে ধমনীতে যেন অমৃতায়মান হলাহল প্রবেশ করিল!—প্রাণবায়ু অসহ্য মধুর যাতনায় বহির্গত হইল।

প্রাচীন ভাষাসমূহই শব্দাড়ম্বরের নিমিত্ত বিখ্যাত। কি সংস্কৃত, কি পারসী, কি গ্রীক্, কি লাটিন—সকল ভাষাই ললিত, মধুর ও দীর্ঘ শব্দে বিশেষ ধনী। আধুনিক ভাষা সকল ইহার ঠিক বিপরীত, শব্দের জাঁকজমক ও গভীরতা পছন্দ করা দূরে থাকুক বরং ঘৃণা করে। বর্ত্তমানে

শব্দাড়ম্বর ঘৃণিত হয় বটে, পক্ষান্তরে সত্য আদৃত হয়; সত্য কিন্তু সাধারণ-প্রচলিত সরল কথায় যেমন সম্যক ও শীঘ্র বোধগম্য হয় তেমন সুদীর্ঘ চাকচিক্যশালী আকাশপাতালভেদী শব্দে হয় না। “সংক্ষিপ্ততাই জ্ঞানের সার” এবং “সত্যং হি কেবলং” এই দুই মূলমন্ত্র অবলম্বনে নব্য ভাষা সকল অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু শব্দাড়ম্বর কবিতার অন্যতর সম্মোহন যন্ত্র; কেননা কবিতা সঙ্গীত মাত্র; সুমধুর শব্দে শ্রুতিকে বিমোহিত করিয়া সঙ্গীত অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভাবের তরঙ্গ না তুলিতে পারিলে প্রাণ মাতে না, প্রাণ আত্মহারা হয় না। কবিতা মনোহর প্রতারণা মাত্র; সম্মোহন বাক্যে শ্রোতাকে ভুলাইতে না পারিলে সে কেন প্রতারিত হইবে? কিন্তু আধুনিক ভাষা যেমন কবিতার রূপলাবণ্য নষ্ট করিয়াছে, আধুনিক বিজ্ঞান তেমন শ্রোতার প্রতারিত হইবার বাসনাও হ্রাস করিয়াছে। এই ভাষার বিকলত্ব ও সত্যপ্রিয়তাহেতুই বর্ত্তমানকালে পুরাকালের মত মনপ্রাণ উন্মাদিনী কবিতা জন্মে না, এখন কাব্যের স্থান ইতিহাস অধিকার করিয়াছে। যাহা হউক সংস্কৃত, এক প্রাচীন শব্দালঙ্কারপূর্ণ ভাষা এবং কাদম্বরী সেই ভাষার এক অতুলনীয় গদ্য কাব্য। ইহার প্রত্যেক অংশ শব্দের আড়ম্বরে, অলঙ্কারের ছটায় বর্ণনাবিন্যাসের চাতুর্য্যে বিমোহন। শ্রোতাকে একটীর পর আর একটির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না,—তিনি আদ্যন্ত এক আনন্দের তানে বিভোর রহিবেন।

কাদম্বরীর উচ্চাসন কেবল শব্দালঙ্কারে বা ভাবের চমৎকারিত্বে নহে; ইহার প্রকৃত গৌরব নীতিশিক্ষায়। কাদম্বরীর মূলনীতি পাপের পরিণাম; পাপের ক্ষমা নাই, পাপ করিলেই যথোচিত শাস্তি হইবে, দশটি পুণ্য একটি পাপ ক্ষালিত করিতে পারে না। সমধিক পুণ্যকারী ব্যক্তি অল্পমাত্রায় পাপ করিলে, তাঁহারও অব্যাহতি নাই;—সংক্ষেপতঃ পাপ ও পুণ্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভোগ। পুণ্ডরীক ঋষির পুত্র, ঋষির যত্নে লালিত পালিত, ঋষির শিষ্য, ঋষিসহবাসী, স্বয়ং ঋষি। পুণ্ডরীক চিরপুণ্যবান; কিন্তু অচ্ছোদ সরোবরে তাঁহার এই প্রথম পতন হইল; তাঁহার চিরকালের সঞ্চিত পুণ্য এই নব প্রথম পাপেরও নিরাকরণে সমর্থ হইল না, তাঁহাকে পাপের ভোগ ভুগিতে হইল। তাঁহার এই পতনের হেতুও তাঁহার মাতা লক্ষ্মী দেবী; লক্ষ্মী

দেবী হইতেই নৈতিক দুর্ব্বলতা পুণ্ডরীকে সংক্রামিত হইয়াছে; সন্তান মাতাপিতার কেবল দেহেরই উত্তরাধিকারী হয় না, তাঁহাদিগের চরিত্র-ও প্রাপ্ত হয়। বাইবেলে আছে জগন্মাতা ইবার গুণে মানবে পাপ সঞ্চা-রিত হইয়াছে; আর কাদম্বরী শিক্ষা দিতেছে মাতার দোষ সন্তানে অব্যাহত ভাবে সংক্রামিত হয়, কেবল শিক্ষার উৎকর্ষে সহজ দোষ দূরীকৃত হয় না। পুণ্ডরীক পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিকৃষ্ট মনুষ্যে পরিণত হইল; চন্দ্রাপীড়রূপী পুণ্ডরীক পুন. বিচলিত হইল; পুনঃকৃত পাপের দণ্ডস্বরূপ ইতর প্রাণীতে পরিণত হইল। পুনস্খলনের উপক্রমে, তাহার তীব্র অনু-তাপ হইল; অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপে পুণ্ডরীকের মুক্তির সোপান প্রস্তুত হইল। সুতরাং কাদম্বরী সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের সার তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছে যে পাপের ক্ষমা নাই। ইহার শাস্তি হইতে পরিত্রাণ নাই, অনুতাপই পাপীর ভবিষ্যৎ উন্নতির একমাত্র উপায়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে কাদম্বরী দোষশূন্য নহে; কিন্তু উৎকর্ষতার তুলনায় দোষগুলি যৎসামান্য সুতরাং উপেক্ষনীয়। প্রথমতঃ ইহার নাম-করণেই ভ্রম; এই গ্রন্থের নাম কদাচও "কাদম্বরী" হইতে পারে না, ইহার নাম হওয়া উচিত ছিল "পুণ্ডরীক"। ইহা নায়িকাপ্রধান নহে, ইহা নায়কপ্রধান উপন্যাস। এই গ্রন্থে কেবল পুণ্ডরীকের জন্মত্রয়ের ঘটনাবলী এবং সেই সকল ঘটনাবলীর সহিত সম্বদ্ধ অন্যান্য ঘটনাবলীই বিবৃত হই-য়াছে; কেবল পুণ্ডরীকেরই তিন জন্মের সমস্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ আখ্যাত হইয়াছে, অন্য কাহারও একজীবনের সমগ্র ঘটনাও প্রদত্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে পুণ্ডরীকের সহিত সম্যক অসংলগ্ন অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা একটিও বিবৃত হয় নাই; পরন্তু অন্যান্য চরিত্র সকলের অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর বিষয় গ্রন্থে বহুল স্থান পাইয়াছে। পুণ্ডরীকের ন্যায় আর কোন চরিত্রেই শ্রোতার মন এত অভিভূত হয় না,—শ্রোতার হৃদয়ে নানাবিধ রসের এত উৎকট উদ্রেক হয় না, সুতরাং শ্রোতার অন্তঃকরণ অন্য কাহারও ঘটনার পর ঘটনা জানিতে এত উৎসুক ও ব্যাকুল হয় না, অন্য কাহারও জন্য শ্রোতা এত অশ্রু বিসর্জ্জন করে না, পুণ্ডরীকের অনুতাপ ব্যতীত অন্য কোন ঘটনাতেই শ্রোতা অধিকতর আনন্দিত হয় না। বিশেষতঃ গ্রন্থকার পুণ্ডরীকের

চরিত্রেই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নীতিশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ এক অমূল্য রত্নহার, পুণ্ডরীক সে মণিমালিকার মধ্যমণি হীরকখণ্ড! এই গ্রন্থ এক পরিষ্কার নভোমণ্ডল, পুণ্ডরীক সে নীলাকাশে তারারাজি-শোভিত পূর্ণিমার চন্দ্র! ইহা একটী মোহন চিত্র, পুণ্ডরীক সে আলেখ্যের প্রধান বিষয়! এই গ্রন্থের বীর যদিও ব্যসনবীর পুণ্ডরীক, তথাপি এই গ্রন্থ "পুণ্ডরীক" নামে অভিহিত হওয়াই উচিত ছিল; সম্ভবতঃ বিহঙ্গসম্ভূত না হইলে "পুণ্ডরীক" নামেই প্রচারিত হইত। দ্বিতীয়তঃ বাক্‌বিন্যাসে সমলঙ্কৃত হইলেও কিঞ্চিৎ বাহুল্য দোষে দূষিত। গ্রন্থে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অধিকাংশ ভাগেই এই দোষ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইবে। তৃতীয়তঃ কাদম্বরী স্থানে স্থানে অশ্লীলতায় অপবিত্র; গ্রন্থকার জাজ্বল্যমান চিত্র আঁকিতে যাইয়া নানা-স্থানে বিশেষতঃ কাদম্বরী পুণ্ডরীকের পুনর্মিলনে নিতান্ত জঘন্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু অশ্লীলতাদোষ সংস্কৃতকবিদিগের মধ্যে সাধারণ;—কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের গ্রন্থাবলীও স্থানে স্থানে অশ্লীলতাকলঙ্কিত। মূল কথা, তৎকালে লোকের রুচি তত পরিমার্জ্জিত ছিল না,—অন্ততঃ ঠিক আমাদিগের অনুরূপ ছিল না; সেকালের লোক অশ্লীলতাকে রসিকতা মনে করিতেন। অবশ্যই এই বিকৃত রুচি তৎসময়ের সামাজিক অবস্থার একটী প্রধান লক্ষণ।

উপরোক্ত দোষগুলি ব্যতীত কাদম্বরীতে অন্যান্য সামান্য সামান্যদোষ গুণ আছে। কিন্তু সেগুলি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে স্থানাভাবে আলোচিত হইল না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র দাস।

যোগীবর পবহারী বাবা।

(গাজীপুরের সুপ্রসিদ্ধ গুহাবাসী সাধু)

খৃষ্টীয় ১৮৪০ সনে, জোনপুর জেলার অন্তর্গত প্রেমাপুর গ্রামে মহাত্মা পওহারী বাবা জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম অযোধ্যা তেওয়ারী। অযোধ্যা তেওয়ারী পরম ধার্ম্মিক নিষ্ঠাবান ও শুদ্ধ চরিত্র ছিলেন। অযোধ্যা তেওয়ারীরা দুই ভ্রাতা—জ্যেষ্ঠ লছমীনারায়ণ সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারী হইয়া

গাজীপুর জেলার কুর্থা নামক গ্রামে ভাগীরথীর তীরে বৃক্ষলতাপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র বনের মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ সাধন ভজন ও যোগাভ্যাসে নিরত থাকিতেন।

প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায় সুমাতা ব্যতীত সুসন্তান দুর্লভ। পওহারী বাবার মাতৃদেবী অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ও পরমা সাধ্বী ছিলেন। পওহারী বাবারা তিন সহোদর—জ্যেষ্ঠ গঙ্গা তেওয়ারী, কনিষ্ঠ বলরাম তেওয়ারী। ইঁহাদিগের একটি ভগিনী ছিলেন, তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে।

ভ্রাতাদিগের মধ্যে পওহারী বাবা মধ্যম। ইঁহার পিতা ইঁহার নাম রামভজন দাস রাখেন। শিশু রাম ভজন দাস গৌরবর্ণ, পুষ্টদেহ, পরম সুন্দর বালক ছিলেন। অতি শৈশব হইতেই তাঁহার স্বভাব শান্ত, কথা কোমল ও মধুর ছিল। এই শান্তস্বভাব মধুরভাষী সুন্দর শিশুকে মাতা অতিশয় স্নেহ করিতেন, ইনিও সর্ব্বাপেক্ষা মাতার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। অন্যান্য বালকের ন্যায়, সমবয়স্কদিগের সহিত ইনি কখন বিবাদ বা উৎপাত করিতেন না। এই কারণে ধীরস্বভাব মধুরপ্রকৃতি বালককে আদর করিয়া পিতামাতা শুক্রাচার্য্য বলিয়া ডাকিতেন।

শান্ত স্বভাব ঋষি শুক্রাচার্য্যের ন্যায় হইয়াও, শৈশবে রামভজন দাস একটু আবদার প্রিয় ছিলেন—যাহা জিদ্ করিতেন তাহা হইতে কেহ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন না। পরিবারবর্গের মধ্যে অন্য কেহ তাঁহার আবদার না শুনিলেও এবং তাহা আয়াসসাধ্য হইলেও তাঁহার জননী যে কোন উপায়ে হউক তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেন।

এই শৈশবাবস্থায় কঠিন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া বালক রামভজন দাসের দক্ষিণ চক্ষু বিনষ্ট হইয়া যায়—তাঁহার অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হইতে আরম্ভ হয়।

পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইঁহার যজ্ঞোপবীত হয়।

১৮৫০ সনে রামভজন দাসের ১০ম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্দর্শনার্থে একবার গাজীপুরে আগমন করেন; তখন গাজীপুরের অন্তর্গত কুর্থা গ্রামে অতি অল্প লোকের বাস ছিল; ভাগীরথী কূলে—যেখানে সাধু লছমী নারায়ণের আশ্রম ছিল—সেস্থান নিবিড় বনে সমাবৃত

থাকিত, লোক জনের যাতায়াত প্রায় ছিল না ;—সেই তটবাহিনী জাহ্নবীর তীরে নির্জ্জন বনের মধ্যে সাধু লছমী নারায়ণ ভগবচ্চিন্তায় নিরত থাকিতেন। এই সময় তাঁহার শরীর পীড়িত হয় এবং চক্ষুদ্বয় দৃষ্টিহীন হইয়া যায়।

অযোধ্যা তেওয়ারী,আশ্রমে আসিয়া,জ্যেষ্ঠের শারীরিক কষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হন, এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র গঙ্গা তেওয়ারীকে ভ্রাতার সেবায় নিযুক্ত করিতে অনুমতি চাহেন ; কিন্তু সাধু লছমী নারায়ণ কাহলেন যে "যদি তোমার মধ্যম পুত্র শুক্রাচার্য্যেকে পাঠাইতে পার, তবে আমার কাছে পাঠাইয়া দিও, অন্য কাহাকেও পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।"

জ্যেষ্ঠের অনুমতিক্রমে অযোধ্যা তেওয়ারী গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দশম বর্ষীয় বালক শুক্রাচার্য্যকে অগ্রজের আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন।

দশম বর্ষীয় সুন্দর সুকুমার বালক জনক জননীর ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গানদীকুলে কুর্থা গ্রামের এক নির্জ্জন বনের মধ্যে জ্যেষ্ঠতাতের আশ্রমকুটীরে থাকিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন, সেই জনশূন্য অরণ্যে শিশু শুক্রাচার্য্য ধ্রুবের ন্যায় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এখন যেমন গ্রাম হইতে গঙ্গা দূরে চলিয়া যাওয়াতে আশ্রমসম্মুখে বিস্তীর্ণ বালুকাভূমি দৃষ্ট হয়, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তেমন ছিল না, পুণ্যস্রোতা ভাগীরথী সেই বনভূমির প্রান্তদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত ; দশম বর্ষীয় বালক অধিকাংশ সময় একাকী কূলে বসিয়া নদীর তরঙ্গ দেখিতেন।

এই সময় তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়, কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত শিশুর প্রতি কখনও কঠোর আচরণ করিতেন না, সর্ব্বদা সুন্দর বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া অতি যত্নের সহিত তাঁহার পালন ও শিক্ষা বিধান করিতেন।

গাজীপুরস্থ তিনজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও একজন পরম হংসের নিকট শুক্রাচার্য্য উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া বেদান্ত প্রভৃতি মহাগ্রন্থ সকল পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, ছয় বৎসর কাল শিক্ষায় অতিবাহিত হয়।

এই তরুণ বয়সে শুক্রাচার্য্যের যেমন অসাধারণ প্রতিভা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তেমনি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও অসামান্য জ্যোতি অঙ্গে প্রকাশিত হয়। সূর্য্যো-

দয়ে পূর্ব্বে যখন তিনি স্নান সমাপনান্তে জলের উপর দাঁড়াইয়া জোড়হস্তে স্তোত্র পাঠ করিতেন, তখন তাঁহার অঙ্গ হইতে জ্যোতি বাহির হইত, মনে হইত কোন জ্যোতির্ম্ময় দেবকুমার স্তুতি পাঠ করিতেছেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সাধু লছমী নারায়ণ পরলোক গমন করিলেন. যথারীতি আশ্রমস্থ কুটীরে জ্যেষ্ঠ তাতের সমাধি দিয়া শুক্রাচার্য্য "ভাণ্ডারা" দিলেন, এবং সকল কাজ শেষ হইলে একাকী কেবল জ্যেষ্ঠতাতের একজন মন্ত্রশিষ্যের সহিত আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এক্ষণে দেব দেবীর পূজা ও শাস্ত্রপাঠ করিয়া শুক্রাচার্য্য দিনযাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার হৃদয় শান্তি লাভ করিত না, এই সময় তাঁহাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখা যাইত। প্রায় রন্ধন করিতেন না, একপোয়া কি অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধ পান কিম্বা নিরম্বু উপবাসে তিন চারি দিন কাটাইয়া দিতেন, দিবা দ্বিপ্রহরে ঘন বনের অন্তরালে একাকী বসিয়া চিন্তামগ্ন থাকিতেন, নিশীথে নদীসৈকতে বসিয়া জলকলকলধ্বনি শুনিতেন একবারও চক্ষু মুদ্রিত করিতে না, যদি একটু ঘুমাইয়া পড়িতেন, অমনি চমকিয়া উঠিয়া বসিতেন।

পূর্ণষোড়ষ বর্ষ বয়ক্রম কালে দেব দেবীর পূজা ও আশ্রমের ভার স্বীয় জ্যেষ্ঠতাতের মন্ত্রশিষ্যের উপর সমর্পণ করিয়া তরুণ যুবক শুক্রাচার্য্য তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে বহির্গত হইলেন. কোথায় চলিয়া গেলেন কেহ জানিলনা।

প্রায় দুই বৎসর পরে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শুক্রাচার্য্য সহসা একদিন আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই নবীন যুবকের দীনভাব, অশ্রুপূর্ণ নয়ন, ও গম্ভীর আনন দেখিয়া সাধারণ গ্রামবাসীরা দলে দলে আসিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল, শৈশব সঙ্গীদের অন্তরে তাঁহার প্রতি সম্ভ্রমের ভাব আসিয়া তাঁহার নিকটে প্রণত করিল. তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা আসিয়া তাঁহাকে দেখিল যে তরুণ যুবকের হৃদয়ে মহাবিপ্লব ঘটিয়াছে।

এই সময় হইতে চতুর্দ্দিকের গ্রামবাসীরা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিল। শুক্রাচার্য্য বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া, বহুজ্ঞান সঞ্চয় করিয়া আসিলেন, বদরিকাশ্রম, জগন্নাথক্ষেত্র, ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্র সেতুবন্ধ রামেশ্বর এবং

অন্যান্য মহাতীর্থস্থান পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে দ্বারকায় যান, সেখান হইতে গিরণার পাহাড়ে গমন করেন, ঐ পর্ব্বতে এক মহাপুরুষের দর্শন লাভ করেন, সেই সিদ্ধ পুরুষ ইঁহাকে যোগ শিক্ষা দেন। তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া শুক্রাচার্য্য অন্নাহার ত্যাগ করেন, তখন হইতে অশ্বত্থ আমলকী বিল্বপত্র প্রভৃতি বাঁটিয়া তাহার রস ও অল্প দুগ্ধ পান করিতেন, এই সময়ে সাধারণে তাঁহাকে "পওহারী" (অর্থাৎ "পবনাহারী") নামে অভিহিত করিতে লাগিল। তিনচারি মাস বৃক্ষরস পানের পরে, তাহাও ত্যাগ করিয়া প্রতিদিন বড় বড় ৫০টি লঙ্কা বাটিয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া এক ঘটি সেই লঙ্কার রস পান করিতেন, এই সময়ে তিনি আশ্রম কুটীরের অভ্যন্তরে গুহা নির্ম্মাণ করান। * গুহা নির্ম্মিত হইলে প্রথমে এক ঘণ্টা পরে একদিন, শেষে সপ্তাহ অবধি গুহা মধ্যে যোগমগ্ন থাকিতেন। এই সময়ে পূজার্চ্চনা পানাহার কিছুই করিতেন না। সাধন পূর্ণ করিয়া যখন দ্বার খুলিতেন, তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ অঙ্গ হইতে যেন জ্যোতি নির্গত হইত, সুপুষ্ট উন্নত দেহ যেন অসীম বল ধারণ করিত।

পওহারী বাবা উপনয়নের সময় ভিন্ন কখনও মস্তক মুণ্ডন করেন নাই, ঘন মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সুদীর্ঘ কেশরাশি তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আচ্ছাদিত করিয়া থাকিত, পূর্ণযৌবনে ঘন শ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডলের শোভা ও গাম্ভীর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি সাধারণ সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় অঙ্গে ভস্ম ধূলি লেপন এবং মস্তকে জটাভার ধারণ করিতেন না, অত্যন্ত শুদ্ধভাবে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিতেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে পওহারী বাবা গুহা নির্ম্মাণ করান, গুহা নির্ম্মাণের পর বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি প্রতি একাদশী রাম নবমী পর্ব্বাহ দিবসে কুটীরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কুটীর মধ্যে বসিয়া থাকিতেন, দলে দলে নগরবাসীগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইত। কত সাধু সন্ন্যাসী, কত কত সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মপিপাসুগণ বহুদূর হইতে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে আসিতেন।

* কথিত আছে যে গুহার অভ্যন্তর হইতে গঙ্গার জল পর্য্যন্ত একটী সুড়ঙ্গ ছিল। এই সুড়ঙ্গ দিয়া তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন।

পরে প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে একেবারে দ্বার উন্মুক্ত করিতেন না, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। চার বৎসর চার মাস পরে ১৮৮৮ সনের জুলাই মাসে সহসা তিনি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রকাশ হ'ন এবং এক মহা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় তীর্থ হইতে সকল সাধু সন্ন্যাসীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহা সমারোহ যজ্ঞপূর্ণ করেন। প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের সমাগম হয়; যজ্ঞের পরে যে দ্বার রোধ করেন তাহা আর কখন খোলেন নাই, কিন্তু কুটীরের মধ্যে রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে বসিয়া সময়ে সময়ে ধর্ম্মপিপাসুদিগের সহিত সদালাপ করিতেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এই গুহাবাসী যোগীর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সরল মধুময় ধর্ম্মকথা শুনিয়া মোহিত হন। জহরী দেখিবামাত্র জহর চিনিতে পারেন, পওহারী বাবাও তাঁহার সরলান্তকরণ ও সুগভীর ধর্ম্মজ্ঞান দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে "জগৎগুরু" নামে অভিহিত করিলেন।

এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প শোনা যায়। একদা এক চোর তাঁহার লোটা বাসন প্রভৃতি পুঁটলীতে লইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে পওহারী বাবা আশ্রমদ্বার খুলিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র চোর দ্রুত বেগে পালাইতে লাগিল। তিনি চীৎকার করিয়া তাহাকে বলিলেন— "তোমার বাঞ্ছিত দ্রব্য লইয়া যাও আমি আনন্দে উহা তোমাকে দিতেছি লইয়া যাও, পলাইবার প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তিনি তাঁহার জনৈক শিষ্যকে ওই দ্রব্যসকল চোরকে দিতে তাহার পশ্চাতে প্রেরণ করিলেন। এই ঘটনার পর ওই চোরের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল। সেই দিন হইতেই সে চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাবাজীর সেবায় নিযুক্ত হইল ও ধর্ম্মে ও ভক্তিতে তাঁহার অন্য শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইল। শুক্রাচার্য্য পওহারী বাবা রামানুজ সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন। ইঁহারা রামোপাসক। এই কারণ বশতঃ বোধ হয় পিতামাতারা পওহারী বাবাজীর 'রামভজন' নাম রাখিয়াছিলেন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারে পওহারী বাবা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও প্রিয় শিষ্য বলরাম তেওয়ারীকে ডাকিয়া বলিলেন "বলরাম, এই ঘোর কলিযুগে আর

আমার প্রাণধারণ করা শ্রেয়স্কর বোধ করি না। আমার আত্মা আর এই নশ্বর দেহপিঞ্জরে বদ্ধ থাকিতে ইচ্ছুক নহে।” পর দিবস বলরাম তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলেন। বিগত ৭ই জ্যৈষ্ঠ (১৮৯৮) শুক্রবার প্রত্যুষে অন্যূন সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় পওহারী বাবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও দু তিন জন গ্রাম্য জমিদার আশ্রম প্রাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন, সহসা তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে আশ্রমের দ্বিতল কুটীরের ছাদ হইতে অল্প অল্প ধূম নির্গত হইতেছে, কিন্তু হোমের ধূম মনে করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন, অল্পক্ষণ পরেই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে শুভ্র মেঘের ন্যায় ধূমরাশি কুটীরের সমস্ত ছাদ ব্যাপিয়া উঠিয়াছে, তখন বহিঃ প্রাঙ্গন হইতে সকলে চীৎকার করিয়া বলিলেন—“মহারাজ এঅগ্নি যদি আপনার অভিপ্রেত না হয়, তবে আজ্ঞা করুন আমরা নিবাইয়া ফেলি” কিন্তু কেহ কোন উত্তর পাইল না। নিমেষের মধ্যে অতি প্রবল বেগে কুটীরের সমস্ত ছাদ একেবারে জ্বলিয়া উঠিল তখন সভয়ে একজন লোক একদিকের কুটীরের ছাদে উঠিয়া আশ্রমের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গনের দিকে চাহিয়া দেখিল যে সহস্রশিখা তুলিয়া প্রবল বহ্নি জ্বলিতেছে. পওহারী বাবা তাঁহার পূজার ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া আকাশের পানে চাহিয়া আছেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে কমণ্ডলু, পরিধান কৌপিন এবং স্কন্ধদেশ হইতে চরণ পর্য্যন্ত বিলম্বিত যে কম্বলের “ঝুল” পরিধান করিতেন সেইখানি বাম স্কন্ধে স্থাপিত রহিয়াছে. তাঁহার উন্নত গৌরদেহ ঘৃতে বিলেপিত—এই দৃশ্য দেখিবামাত্র তাহার কণ্ঠ হইতে ভীতিবিহ্বল চীৎকার নিঃসারিত হইতে না হইতে পওহারী বাবা শান্তভাবে ধীর পদক্ষেপে অকম্পিত অঙ্গে জ্বলন্ত বহ্নি মধ্যে প্রবেশ করিয়া হোমকুণ্ডের নিকট পদ্মাসনে বসিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী নাসিকার উপর বিন্যস্ত করিয়া সম্মুখে যোগ দণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক প্রাণায়াম যোগে নিমগ্ন হইলেন। সেখানে হোমের জন্য ঘৃতের কলসসকল, ধূপ ধুনা কর্পূর প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে সজ্জিত ছিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার ঘৃতবিলেপিত জ্যোতির্ম্ময় দেহ প্রবল অগ্নিরাশিতে ভস্ম হইয়া গেল।

পরদিবস প্রাতঃকালে গ্রামবাসী ও অন্যান্য বহুলোক সমবেত হইয়া

পওহারী বাবার ভস্মাবশিষ্ট অস্থি পবিত্র ভাগীরথীর বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন এবং যেখানে বসিয়া তিনি দেহত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ মোক্ষ প্রাপ্ত হন, সেই স্থানে তাঁহার একটি সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে।

শ্রীউমাশশী দেবী।

উত্থান সঙ্গীত।

চারিধারে শুনি ওই গভীর প্রেমের গান,
জীবন্ত ধর্ম্মের বল লইয়া উদার প্রাণ
জগতের নরনারী তাঁরে আরাধনা করে
সকল সমাজ জাগে তাঁহারি কোলের পরে।
শোনো শোনো জনগণ চলিয়াছ কোথা সব
জাগাইতে চরাচরে স্বদেশের গৌরব,
ভেঙে ফেল কর দূর মলিনতা অন্ধকার,
অনন্ত আকাশ তলে হোক্ চিত্ত একাকার,
পরব্রহ্ম একলক্ষ্য গান কর দেশে দেশে,
রহিতে হবে না আর—আর এ অধীন বেশে;
তখন বুঝিবে বিশ্বে প্রাণে প্রাণে কি অভেদ,
তখন হিমাদ্রি মাঝে আবার ধ্বনিবে বেদ;—
আবার উঠিবে ঋষি ভারতের নদীসিন্ধু
দেখিব জাগিবে কি না ভারতের এই হিন্দু।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(১২৯৩ সাল)

কামার।

একদিন ছিল বটে এ সব আমার,
ছিল ছিল কি হইবে, এখনতো নাই—
এখন গিয়াছে সব ; হয়েছি কামার,
লৌহ অগ্নি ল'য়ে প্রাণে পিটাই সদাই,
পিটায়ে পিটায়ে করি পরাণ ইস্পাত,
সহিতে বিপ্লব ঘোর জগতের মাঝে,
অগ্নিফিঙ্ক ঝরে যেন,—জ্বলন্ত শিশ্পাত্ ;
প্রাণে নব বল পাই নব দীপ্তি রাজে,
উঠিরে বলিষ্ঠ হয়ে যেনরে দানব,
সাথে, দিব্য প্রতিভায় হই প্রতিভাত ;—
সুরাসুর বাঁধি সুরে হইয়া মানব,
জাগে রে বর্ত্তমানের জীবন প্রভাত ;
একদিন ছিল বলে কেন করি ক্ষোভ
এ জীবনে সে অতীতে কেন করি লোভ।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(১৩০৩ সাল)

গলতা বা গালবাশ্রম।

জয় নগরের পূর্ব্বসীমায় 'গলতা' নামে এক পর্ব্বত আছে। সাবিত্রীর পাহাড়ের ন্যায় গলতাও অতি পবিত্র। পাহাড়ের পাদতলে একটী সুন্দর উপত্যকা আছে। পাহাড়ের অত্যুচ্চ চূড়ার উপর সূর্য্য দেবের এক মন্দির আছে। 'কছবাহ' রাজাগণ সূর্য্য বংশোদ্ভব, সুতরাং সূর্য্যমূর্ত্তি-উপাসক। কথিত আছে কছবাহরাজ-শিরোমণি মহারাজ 'সবাই' জয়সিংহজী প্রথম এই

মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দিল্লীর সুবাদার হইয়া রাজস্থানের সমগ্র রাজন্য-মণ্ডলীর মধ্যে মহা পরাক্রমী হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞপ্রারম্ভে গণেশ ও সূর্য্য মূর্ত্তির উপাসনা করিতে হয়। তদুপলক্ষে তিনি নাহাড় পর্ব্বতে গণেশ ও 'গলতা' পর্ব্বতে সূর্য্যদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সার্দ্ধ এক শত বৎসর মন্দিরদ্বয় বিদ্যমান আছে। প্রতি বৎসর "সূরযসপ্তমী তিথিতে" মহাধূমধামে গলতার সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা হয়। মহারাজা মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গের সহিত মহাদোলে আরোহণ করিয়া নগর পরিভ্রমণ করেন। রাশি রাশি সুসজ্জিত ও সুচিত্রিত রথ, উঠ, ঘোড়া ও হাতি এক অনির্ব্বচনীয় মনোহর দৃশ্য উৎপাদন করে। সমন্ত্রী মহারাজা 'গলতা' হইতে মহাআড়ম্বরে সূর্য্যমূর্ত্তি আনয়ন করিয়া সর্ব্ব প্রজাসমক্ষে পূজা করেন। এই পূজা উপলক্ষে এক মহা মেলার অধিবেশন হয়। এই মেলাকে অত্রত্য লোকে "সূরয সপ্তমীর মেলা" বলে। পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় রাজাগণ সূর্য্যরথে (আটঘোড়ার গাড়িতে) চড়িয়া মহাসমারোহে রাজধানী প্রদক্ষিণ করিতেন। আজকাল মহাদোলেরই আদর অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

মহারাজ পৃথ্বীরাজজীর রাজত্বকালে * কৃষ্ণদাস নামক জনৈক যোগী 'গলতা' পর্ব্বতে যোগারাধনা করিতেন। পৃথ্বীরাজজী তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসজী পবনাহারী ছিলেন, সুতরাং সাধারণ লোক-সমাজে "পবারী বাবা" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসজী রামানুজ সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন। 'গলতা' ঘাটীতে অদ্যাপিও তাঁহার 'ধূনী' বর্ত্তমান আছে। কথিত আছ যে তাঁহার 'ধূনী' প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য প্রত্যহ চারিজন যোগী নিযুক্ত ছিল। জয়পুর রাজবংশাবলীতে কৃষ্ণদাসজীর কাহিনী বিবৃত আছে। তন্মধ্যে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে যে একদা তাঁহার যোগী-শিষ্যেরা বিদ্বেষবশতঃ একটী বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া কৃষ্ণদাসজীর দিকে ফেলিল। তিনি মধ্যপথে প্রস্তরটীর গতি নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। আবার একদিন এই দুষ্ট যোগীদিগের দলপতি

* পৃথ্বীরাজজীর রাজত্বকাল ১৫৫৯—১৫৮৪ সম্বৎ।

সিংহ সাজিয়া কৃষ্ণদাসজীকে ভয় প্রদর্শন করিতে গিয়াছিল. কিন্তু তিনি কিছু-তেই বিচলিত হন নাই। এইরূপ যোগবিঘ্ন করিতে লাগিলে একদিন রাত্রিযোগে কৃষ্ণদাসজী যোগবলে তাহাদিগের কর্ণমুদ্রা কাড়িয়া লই-লেন। পরে তিনি তাহাদিগকে ধূনী প্রত্যহ প্রজ্বলিত রাখিতে প্রতিশ্রুত করাইয়া কর্ণ মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিলেন। কৃষ্ণদাসজী যখন গলতায় যোগারাধনা করিতে আসেন, তৎকালে পৃথ্বিরাজজীর গুরু গলতায় বাস করিতেন। প্রবাদ আছে যে তিনি কৃষ্ণদাসজীর প্রতি বিদ্বেষবশতঃই তাঁহাকে স্থানান্তর যাইতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাসজী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গাধা বানাইয়া দিলেন।

অবশেষে মহারাজা স্বয়ং কৃষ্ণদাসজীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব গুরুকে মানবাকার প্রদান করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণদাসজী পাহাড়ের উপর হইতে তাঁহার কমণ্ডলু গড়াইয়া দিলেন। পর্ব্বত হইতে তৎক্ষণাৎ জলধারা নিঃসৃত হইয়া পাদতলস্থিত উপত্যকার মধ্যে একটী কুণ্ডরূপে পরিণত হইল। এই কুণ্ডের জলে স্নান করিয়া গর্দ্দভরূপী রাজগুরু স্বমূর্ত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। অদ্যাপিও গলতার পর্ব্বত হইতে জল নিঃসৃত হইয়া নিম্নস্থিত কুণ্ডে পতিত হইতেছে। কৃষ্ণদাসজীর জন্য গলতা পবিত্র নহে! কৃষ্ণদাসজীর যুগযুগান্তর পূর্ব্বে গলতা ঘাটী গালব ঋষির আশ্রমস্থান ছিল। 'গলতা' গালব নামের অপভ্রংশ। মহাভারতে গালব ঋষির নামের উল্লেখ আছে। পাণিনির ব্যাকরণে গালব ঋষিকৃত একটি লুপ্ত ব্যাকরণেরও উল্লেখ আছে।

গালব ঋষিকৃত একটি স্মৃতিগ্রন্থও অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এক্ষণে যুগ-যুগান্তরের পর বলা সুকঠিন—এক বা বহু গালব ঋষি ছিলেন। বৃদ্ধ শাতাতপ ও আপস্তম্ব দৃষ্ট হয়। অনুমান হয়, গালব নামধারী একাধিক ঋষি ছিলেন। অত্রত্য পণ্ডিতদিগের মত যে বর্ত্তমান প্রবন্ধের ও মহাভারতের গালব ঋষি একই ব্যক্তি। মহাত্মা গালব ঋষি সম্বন্ধে অত্যল্পই বিদিত আছে। গালব-ঋষি গলুঋষির পুত্র ছিলেন—

"পিতা তস্য গলুর্যযৌ পুত্রে সমাদিশ্য স্বর্গে ধর্ম্ম সনাতনং॥"

(গালবাশ্রম মাহাত্ম্যং)

"আসীদ্গালবর্মহাযোগী বেদবেদাঙ্গ-পারগঃ।
জিতে ন্দ্রয়ো মিতাশীচ দেবপিতৃ পরায়ণঃ॥
উদারোদারকৃদ্ধীরো ধীমান্ধর্ম্ম সনাতনঃ।
শান্তোদান্তো দয়াসিন্ধু দীনবন্ধু র্দয়াশ্রয়ঃ॥

(গালবাশ্রম মাহাত্ম্যং)

কথিত আছে গালবঋষি প্রথমে পুষ্করে তপস্যা করিতেন, পরে জয়-পুরস্থিত গলতা পর্ব্বতে আশ্রম স্থাপন করিলেন। তাঁহার আশ্রমের চিহ্ন অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে—তাঁহার সাতটী পবিত্র কুণ্ড অদ্যাপিও আছে।

গালব ঋষি জলতত্বের পক্ষপাতী ছিলেন—

"জলাজ্জাতং জগত্সর্ব্বং জলেনৈবোপজীবতি॥"

(গালবাশ্রম মাহাত্ম্যং)

এই কারণ বশতঃ তিনি ঘৃত না দিয়া জলদ্বারা হোম করিতেন। ইহাতে দেবলোকের মহাকষ্ট হইয়াছিল, কারণ তাঁহারা ভাল খাদ্য পাইতেন না। অগ্নিদেবের অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়াছিল। তিনি ব্রহ্মার নিকট আবেদন করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর তপস্যা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তপে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর মাগিতে বলিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—"গালবঋষি জলদ্বারা হোম করেন, তাহাতে দেবগণের কষ্ট হয়, আপনি তাঁহাকে জল দিয়া হোম করিতে নিষেধ করুন। বিষ্ণু দেবগণের সহিত গালবঋষির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। গালবঋষি বলিলেন—"প্রভো! আপনার শ্রীচরণ প্রাপ্তির জন্য ঋষিগণ যুগযুগান্তর তপস্যা করেন। আপনার দর্শন লাভ হইল, আমি আর কি মাগিব?" ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, "ঋষিবর তুমি জলদ্বারা হোম করিও না ইহাতে অগ্নির ক্লেশ ও অন্যান্য দেবগণের আহার বিঘ্ন ঘটে।" গালবমুনি কহিলেন—প্রভো আমি ঘৃত কোথায় পাইব?" বিষ্ণু তাঁহাকে একটী কামধেনু দিয়া বলিলেন—তোমাকে এই কামধেনু প্রদান করিলাম, তুমি যথেচ্ছানুরূপ দুগ্ধ ও ঘৃত পাইবে। তিনি তথাস্তু বলিয়া দণ্ডবৎ করিলেন। দেবগণ তাঁহার প্রশংসা ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এবং গালবাশ্রমকে তীর্থপ্রধান বলিয়া ত্রিভুবনে প্রচার করতঃ প্রত্যাগমন করিলেন।

"গঙ্গায়াং শতশঃ পুণ্যাত্তর্পণাজ্জায়তে নৃণাং।
পিতৃণাং চ ততঃ কোটিগুণাধিক শতং বিদুঃ॥
পুষ্করেকৃত্তিকাযোগে প্রযাগে মকরেরবৌ
কুম্ভে কেদারকে সিংহে গৌতম্যাং চ নরেশ্বর॥
তৎফলং বিধিনা প্রোক্তং প্রাপ্নুয়ান্মানবোভুবি
সোমবত্যাং নরোভক্ত্যাস্নায়ান্মহাশ্রমে মুনেঃ॥

(গালবাশ্রম মাহাত্ম্যং)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

চৌক গজা।

উপকরণ।—ময়দা আধসের, খাসা ময়দা আধপোয়া, ঘি দুসের, দোবারা চিনি একসের, শাদা তিল দেড় কাঁচ্চা, জল দেড়পোয়া।

প্রণালী—তিলগুলির বালি ইত্যাদি বাছিয়া ফেল।

ময়দাতে তিল ও খাসা ময়দা মিশাইয়া, প্রায় তিন ছটাক্ ঘিয়ের ময়ান মাখ। বেশ ভাল করিয়া ময়দাতে ঘি মাখা হইলে পর, সব ময়দাটা একত্র লইয়া যদি দেখ বেশ নাড়ু বাঁধা যাইতেছে তখন বুঝিবে ময়ান ঠিক হইয়াছে, তখন আর ঘি দিবার আবশ্যক নাই। এইবারে আধপোয়া জল একটি বাটিতে রাখিয়া দু তিন বারে ময়দাতে এই জল ঢালিয়া ময়দা মাখ। একেবারে জল বেশী মাত্রায় ঢালিয়া দিবে না। যখন দেখিবে ময়দার ঝুরঝুরে ভাব গিয়া বেশ তাল বাঁধা গিয়াছে তখন জলে হাত ডুবাইয়া সেই জল-হাতে ময়দা তিন চারিবার থেসিয়া লইবে। গজার ময়দা খুব মোলায়েম করিয়া থেসিবার আবশ্যক নাই। এই গজার ময়দা আধ-থেসা করিয়া থেসিতে হইবে। তাহা হইলে ঠিক ভাঁজ ভাঁজ পড়িবে।

এই প্রকার মাখা হইলে পর একটি বড় চাকিতে বা কাঠের পিঁড়া অথবা তক্তাতে ময়দা রাখিয়া বেলুন দিয়া বেল। বেলা ময়দা প্রায় আধ ইঞ্চি পুরু

থাকিবে। এইবারে এই ময়দা থেকে গজার জন্য প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা চওড়া চতুষ্কোণাকার অংশগুলি কাট। একখানি ছুরি দিয়া প্রথমে ময়দার চারিদিকের অসমান অংশ কাটিয়া ফেল। তারপরে চারকোণা অংশগুলি কাট। আবার অসমান অংশগুলি একত্র করিয়া বেল। ইহার থেকে আবার গজার জন্য চৌক অংশগুলি কাটিবে। এই প্রকারে যতক্ষণ ময়দা থাকিবে বেলিয়া চৌক চৌক করিয়া কাটিতে হইবে। সর্ব্বশুদ্ধ চল্লিশ খানা গজা হইবে।

একখানি বড় কড়ায় একেবারে প্রায় ছসের ঘি চড়াইয়া দাও। একেবারে বেশী ঘি চড়াইয়া দিলে গজা গুলি অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া যাইবে আর ঘিও কম খরচ হইবে। প্রায় মিনিট দশ পরে ঘিয়ের বেশ ধোঁয়া উঠিলে; কড়া নামাইয়া একখানি ছখানি করিয়া সব গজা গুলি একেবারে ছাড়। উনানে এখন আর বাতাস দিয়া অধিক আঁচ করিয়া দিও না। প্রথমে নরম আঁচে পাকিলে গজার ভিতর পর্য্যন্ত বেশ শক্ত হইয়া যাইবে। জলন্ত আঁচ পাইলে উপরেই লাল হইয়া রং ধরিবে কিন্তু ভিতর কাঁচা থাকিবে। প্রায় মিনিট দশ এই নরম আঁচে পাকিলে পর উনানে বাতাস দিয়া আঁচের তেজ করিয়া দাও। মিনিট পাঁচ এই তেজ আঁচে পাকিলে দেখিবে ক্রমে ক্রমে লাল রং ধরিয়া আসিতেছে তারপরে আর বাতাস দিবে না। আর মিনিট তিন চার একটু নরম আঁচে রাখিয়া কড়া নামাইবে। খুন্তি দিয়া নাড়া চাড়া করিয়া ঝাঁঝরি করিয়া ছাঁকিয়া উঠাও। গজা ঘিয়ে পাকিবার কালে মধ্যে মধ্যে খুন্তি দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। গজার ঘি চড়ান হইতে ভাজা হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ মিনিট সময় লাগিবে।

এইবারে রস চাপাও। তিনপোয়া চিনিতে একপোয়া জল দিয়া আগুনে চড়াইয়া দাও। প্রায় দশ মিনিট পরে ইহার গাদ উঠিলে ঝাঁঝরি করিয়া গাদ তুলিয়া ফেল। তার পরে আর মিনিট দশ পাকিলে হাত দিয়া দেখিবে যখন রসটা খুব গাঢ় হইয়াছে তখন কড়া নামাইয়া বিচ মার। খুন্তি দিয়া ঘষড়াইতে থাক, যেখানে ঘষড়াইবে সেখানে খুন্তি করিয়া লাগাইয়া দিয়া আবার ঘষড়াইবে. এই প্রকারে যখন রস করিতে চড়াইয়া আসিবে তখন দু তিনবারে গজা গুলা ঢালিয়া উঠাও। নরম রাখিবার জন্য, হাতে করিয়া এক

—————

...বে দেশীয় সূপকারেরা সচরাচর

তিনবার ছিটা দাও। তারপরে এক মুঠা চিনি লইয়া ইহার উপরে ছড়াইয়া দাও। শুধু জলের ছিটার বদলে এক ছটাক গোলাপ জলের ছিটা দিতে পার। তাহা হইলে বেশ সুগন্ধও হইবে এবং নরমও থাকিবে।

ব্যয়।—ময়দা আধসের চার পয়সা, খাসা ময়দা আধপোয়া দুই পয়সা, ঘি দুই সের দুই টাকা, দোবারা চিনি একসের চৌদ্দ পয়সা, শাদা তিল এক পয়সা। ইহার ব্যয় ধরিতে গেলে দুই টাকা পাঁচ আনা এক পয়সা ধরিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। ভাসা ঘিয়ে ভাজিলে বেশ সুবিধা হইবে বলিয়া একেবারে দুসের ঘি চড়ান হইয়াছে। কিন্তু একপোয়া কি দেড় পোয়া ঘি মাত্র খরচ হইবে। অবশিষ্ট সব ঘি টুকু একটি কাপড়ে করিয়া ছাঁকিয়া রাখিবে। এক পোয়া কি দেড় পোয়া ঘিয়ের মূল্য চারি আনা কি ছয় আনা। তাহা হইলে গজা করিতে বাস্তবিক খরচ প্রায় বা০ আনা লাগিবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

আদার চাট্‌নি।

উপকরণ;—আদা আধ পোয়া, কিসমিস আধ ছটাক, গোলমরিচ এক-কাঁচ্চা, কালজীরা আধ কাঁচ্চা, নুন প্রায় সওয়া তোলা, কাগজী নেবু পাঁচ ছটাক (নয়টা দশটা), কাঁচা লঙ্কা চার পাঁচটা।

প্রণালী—আদার খোলা ছাড়াইয়া ধুইয়া কুঁচাও। কিসমিসগুলি বাছিয়া ধোও। গোলমরিচগুলি একটি কাপড়ে রগড়াইয়া মুছিয়া রাখ। কাঁচা লঙ্কা কুঁচাইয়া রাখ। কালজীরা জলে ফেলিয়া ছাঁকিয়া লও। নেবুর রস করিয়া রাখ।

একটি পাথরের বাটীতে নেবুর রস রাখিয়া তাহাতে ক্রমশঃ আদা, কিসমিস গোলমরিচ, কালজীরা, কাঁচা লঙ্কা সব একত্রে রাখিয়া নুন মিশাও। এবারে চাট্‌নি সমেত পাথরের বাটী রৌদ্রে রাখিয়া দাও। যদি রৌদ্র না থাকে উনানের পার্শ্বে রাখিলেও হইবে। উত্তাপে ক্রমশঃ দেখিবে আদার

রং লাল হইয়া আসিয়াছে। ইহাই আদার চাটনি। ইহা যেমন হজমী থাইতেও সেইরূপ মুখরোচক। দুই তিন দিন থাকিলেও থারাপ হয় না।

ভোজনবিধি।—লুচি থাইবারকালে আদার চাটুনি পাতে সাজাইয়া দিবে।

ব্যয়।—আদার চাটুনিতে মোট পাঁচ ছয় পয়সা থরচ হইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

কাঁকড়ার খোলাপিটে বা হট্ ক্র্যাব্।*

উপকরণ।—খোলাশুদ্ধ কাঁকড়া আড়াইপোয়া (ছয়টা), পেঁয়াজ এক-ছটাক, আদা একতোলা, কাঁচালঙ্কা পাঁচ ছটাক, পার্শ্লি ও সেলেরির পাঁচ ছয়টা পাতা (অভাবে পুদিনার পাতা চার পাঁচটা), ঘি পাঁচ কাঁচ্চা, সুজি দেড় ছটাক, ছোট এলাচ একটা, জায়ফল সিকিথানা, দারুচিনি ছয়ানি ভর, লঙ্গ তিনটী, গোলমরিচ গুঁড়া ছয়ানি ভর, নুন ছয় আনি ভর, বিস্কুটের গুঁড়া বা বাসি পাঁউরুটীর গুঁড়া আধ ছটাক, জল সাড়ে তিন পোয়া, নুন ছয় আনি ভর।

প্রণালী।—আদার খোসা ছাড়াইয়া রাথ। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াও। কাঁচা লঙ্কার বোঁটা ছাড়াও। সবগুলি ধুইয়া লও। এবারে আদা, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, পার্শ্লিও সেলেরিরপাতা বা পুদিনা পাতা এই সব গুলি কিমা কর অর্থাৎ খুব ছোট ছোট করিয়া কুচি কুচি কর। ছোট এলাচ, দারুচিনি, জায়ফল, লঙ্গ একত্রে কুটীয়া গুঁড়া করিয়া রাথ। গোলমরিচ গুঁড়া না থাকে তো তাহাও একটু গুঁড়াইয়া রাথ।

বিস্কুট বা পাঁউরুটী গুঁড়া করিয়া রাথ। পাউরুটী নরম থাকিলে তাওয়ায় করিয়া আগুনে সেঁকিয়া তারপরে গুঁড়াইতে হইবে।

তিন পোয়া জল দিয়া খোলাশুদ্ধ কাঁকড়া গুলি সিদ্ধ করিতে চড়াইয়া

* এই খাদ্যটী ইংরাজদিগের বড় প্রিয়। এই কারণে দেশীয় সুপকারেরা সচরাচর ইহাকে "হটক্র্যাব" এই ইংরাজী নামে অভিহিত করে।

দাও। প্রায় তিন কোয়ার্টার কি এক ঘণ্টা পরে সিদ্ধ হইলে নামাইয়া জল ঝরাইয়া ঠাণ্ডা হইতে দাও। ঠাণ্ডা হইলে পর ইহার শাঁস অর্থাৎ মাংস বাহির কর। খোলাটা ধারে ধারে খুলিয়া আলাদা রাখিয়া দাও, ইহা পরে কাজে লাগিবে। কাঁকড়ার ডিম ও শাঁস সব বাহির কর। খোলার ভিতরে যে ডিম থাকিবে তাহাও খুলিয়া লইবে। একদফা শাঁস অর্থাৎ মাংস ভাগ বাহির করিয়া শাঁসের ভিতরে আবার যে ছোট ছোট খোলা থাকিবে সেগুলিও বাছিয়া ফেলিবে। ছুরি দিয়া কাঁকড়ার শাঁস বা মাংসভাগ কিমা বা থুড়িয়া রাখ। ইহাতে নুন, গোলমরিচগুঁড়া, এবং গরম মশলার গুঁড়া মাখ।

কাঁকড়ার খোলার চোখ শুঁয়াআদি যাহা থাকিবে, কাটিয়া ফেলিয়া ঝামা দ্বারা অথবা শুধুই ঘসড়াইয়া পরিষ্কার কর। খোলার রং সিদ্ধ হইয়া লাল হইয়া যায়; এই প্রকার রগড়াইয়া ধুইলে যে অল্প স্বল্প কাল দাগ থাকে সব উঠিয়া গিয়া খোলাগুলি আরো বেশ পরিষ্কার লাল হইবে। দেখিতে আরো ভাল হইবে।

ঘি চড়াও; ঘিয়ের ধোঁয়া বাহির হইলে কুঁচান আদা পেঁয়াজাদি ছাড়। একটু ভাজা ভাজা হইলেই অর্থাৎ প্রায় মিনিট দুই পরে সুজি ছাড়িবে। নাড়িতে থাক। মিনিট চার পরে যখন সুজির কাঁচাটে ভাব এবং হালসে গন্ধ চলিয়া গিয়াছে দেখিবে তখন কাঁকড়ার শাঁস ছাড়িবে। খুন্তি দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাক। সুজির সহিত কাঁকড়ার শাঁস বেশ মিশিয়া গেলে এবং ইহার রং ঘোর হলুদে হইয়া আসিলে পর (প্রায় মিনিট পাঁচ পরে) দেড় ছটাক জল দাও, এবং নাড়িয়া দাও। মিনিট দুই পরে নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া ফেলিবে। কাঁকড়ার খোলার জন্য ইহাই পুর প্রস্তুত হইল। এইবারে খোলার ভিতরে চেপটাইয়া চেপটাইয়া পুর ভর।

তাওয়া চড়াইয়া বিস্কুট বা পাউরুটির গুঁড়া ঈষৎ লাল করিয়া সেঁকিয়া লও। দু এক মিনট তাওয়া উনানের উপরে রাখিলেই সেঁকা হইয়া যাইবে। কাঁকড়ার খোলার ভিতরে যে শাঁস পোরা হইয়াছে তাহার উপরে এই ভাজা রুটীর গুঁড়া অল্প অল্প ছড়াইয়া দাও।

কাঁকড়ার খোলাপিটে একটু নেবুর রস দিয়াও খাইতে পার।

ভোজনবিধি।—ভোজের সময় ইহাকে কাট্‌লেট্ জাতীয় খাদ্যের স্থানে ব্যবহার করা যাইতে পারে। আমাদের লুচির সঙ্গেও বেশ খাওয়া চলে।

গুণাগুণ।—কর্কটঃ সৃষ্টবিন্মুত্রঃ সন্ধাতানিলপিত্তজিৎ।

(রাজবল্লভ)

কাঁকড়ার মাংস মলমূত্রবিরেচক, ভগ্নসন্ধানকারী এবং বাতপিত্তনাশক।

কুলীরকস্য মাংসন্তু শীতং ধাতুবিবর্দ্ধকং।
বৃষ্যং রক্তপ্রবাহঞ্চ স্ত্রীণাং শময়ন্তি ক্ষণাৎ॥

(বৈদ্যক নিঘণ্টু)

কাঁকড়ার মাংস শীতল, ধাতুপোষক বলকর ও স্ত্রীদিগের রক্তপ্রবাহের প্রশমনকারী।

ব্যয়।—কাঁকড়া দুই আনা, ঘি পাঁচ পয়সা, সুজি দুই পয়সা, বিস্কুট দুই পয়সা, পেঁয়াজাদি মশলা আন্দাজ দুই পয়সা ধরা গেল। সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ আনার ভিতরে হইয়া যাইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

হিন্দুস্থানী শিবসঙ্গীত।

রাগিণী লচ্ছাসার—তাল চপক। *

শিব শিব শম্ভো শম্ভো মহাদেব মহাদেব ভোলা ভোলা ঈসর ঈসর।

গঙ্গাজটা বরথবান বরথবান বরবান বরবান্ ত্রিসিলক পর লিয়ে লিয়ে লিয়ে তুঁই তুঁই শঙ্কর শঙ্কর।

---

* চপক তালটি অনেকটা সুরফাঁকতালের মত। সুরফাঁকতাল তিনটি তালিতে বিভক্ত। তাহার প্রথম এবং সর্ব্বশেষ তালি প্রত্যেকে চারিমাত্রা এবং মধ্যের তালি দুই মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে। এই সুরফাঁকতালের প্রথম তালি বিভাগটী ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট তালিবিভাগ রাখিয়া দিলেই তাহা চপক তালের তালিবিভাগ হইল। সুরফাঁকতালের যেমন প্রথম তালিতে সম্ চপকতালেরও সেইরূপ প্রথম তালিতে সম্ পড়ে।

তালি। ১ঃ (স্থা, স্তু আরম্ভ)। ২ ॥
মাত্রা। ২ । ৪ ॥

(স্থা)ঃ—সা মা। মা সা ২রে। গা২। গা৪। গা
(স্থা)ঃ—শি ব। শি ব শ। ম্ভো। —। শ

মা। পা৪। মা মা। মা ২মা মা। মা মা। মা
—ম্। ভো। ম হা। — দে ব। ম হা। —

২মা গা। ২মা। ২সা সা নি। ধা নি। সা রে
দে ব। ভো। ল ভো —। লা —। ঈ স

সা সা। সা সা। সা৪ ॥
র ঈ। স র। —॥

(স্থা-পু)। সা সা। সা সা ২রে। ২গা। ৪গা। (স্তু)ঃ০—
(স্থা-পু)। শি ব। শি ব শম্। ভো। —। (স্তু)ঃ০—

পা পা। ধা নি সা রে। নি সা। ৪সা। পা পা।
গ ঙ্গা। জ টা ব র। প্র বা। —ন্। ব র।

৫মা ৩পা। পা ৫মা। ৪পা। গা রে। ৪গা। পা পা।
থ বান্। ব র। বান্। ব র। বান্। ত্রি সি।

ধা নি সা সা। রে রে। নি সা ধা পা। ধা নি। ধা
ল ক প র। লি য়ে। লি য়ে লি য়ে। তুঁ হি। তুঁ

৩পা। ধা নি। ধা পা মা গা।
হি। শ ঙ্ক। র শ ঙ্ক র।

(স্থা-পু)। গা রে। সা সা রে২। গাঃ ॥
(স্থা-পু)। শি ব। শি ব শম্। ভো ॥

১। স্থা=আস্থাই। স্থ'-পু=আস্থাই পুনরায়। অ=অন্তরা।

২। সুরের পার্শ্বে সংখ্যাচিহ্ন=মাত্রাচিহ্ন। যথা ২পা বা পা২=দ্বি মাত্রিক পা।

৩। ৺ চন্দ্রবিন্দুচিহ্ন=কোমলের চিহ্ন। যথা নিঁ=কোমল নিখাদ। ^ উল্টা চন্দ্রবিন্দুর চিহ্ন=কড়ির চিহ্ন। যথা ^ মা=কড়ি মধ্যম।

৪। সুরের উপরে ২সংখ্যাচিহ্ন=দ্বিতীয় উচ্চসপ্তকের চিহ্ন অথবা তার-সপ্তকের চিহ্ন। যথা সা (উপরে ২)=দ্বিতীয় উচ্চসপ্তকের অথবা তারসপ্তকের সা। যদি একই উচ্চসপ্তকের কতকগুলি সুর পরে পরে থাকে, তাহাহইলে প্রথম সুরটীর উপরস্থিত সপ্তকচিহ্ন হইতে ফুট্‌কি বা ক্ষুদ্র কসি টানিয়া যাইতে হইবে যথা।

২.....................
সা সা। রে রে।
প র। লি য়ে।

৫। সমের চিহ্ন=সুরের পার্শ্বে বিসর্গ চিহ্ন।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা।

এবারকার সাহিত্যপরিষদপত্রিকায় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রবন্ধ 'শীতলামঙ্গল'। এক শীতলামঙ্গলই পরিষদপত্রিকার ৮০ পৃষ্ঠার ৪০ পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে। ইহার লেখক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি। শীতলা মঙ্গলের প্রথমেই শীতলার শাস্ত্রীয় বিবরণ দিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে, লেখক ইহাতে লিখিতেছেন—"সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০২ সালের দুই খণ্ড সমীরণের ১০৫ পৃষ্ঠায় 'শীতলা পূজা প্রকৃত কি ?' ইতি শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখেন। বহু গবেষণায় ক্ষিতীন্দ্রবাবু শীতলার মার্জ্জনীকলসোপেতা, সূর্পালঙ্কৃতমস্তকা মূর্ত্তির রূপক ভেদ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শীতলাদেবী পরিচ্ছন্নতার আধার। তিনি

শীতলার মৃণালতন্তুসদৃশী সূক্ষ্মমূর্ত্তি ও জলমধ্যে পূজার বিশেষত্ব হইতে ক্রমশঃ আলোচনা করিয়া এবং তৎসঙ্গে আপোমার্জ্জনের মন্ত্রগুলি ব্যাখ্যাপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে বৈদিক শাস্ত্রে যিনি "অপদেবী" নামে স্তুতা হইতেন, তিনিই পুরাণকারের হস্তে শীতলা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।" 'শীতলা পূজা প্রকৃত কি ?' প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত নহে, শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার লেখক, সমীরণে তিনিই লিখিয়াছিলেন, এবং তাঁহারি নাম আছে। আশা করি ব্যোমকেশ বাবু আগামীবারের "সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়" তাঁহার ভ্রম উল্লেখ করিবেন। এই সংখ্যার পরিষদ পত্রিকা পড়িয়া মনে হয় ক্রমশঃ যেন বিশ্বকোষের ন্যায় সংগ্রহপুস্তকে রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান সাহিত্যজীবনের বড়ই অভাব অনুভূত হইতেছে।

সাহিত্য।

'পিতৃহীন' কবিতাটীতে পিতার মৃত্যুকালে শোককাতর পুত্রের শোক-ব্যঞ্জক ভাবসমূহের ছবি বেশ ফুটিয়াছে। "সামাজিক সুশিক্ষা ও প্রাকৃতিক কুশিক্ষা" নামক প্রবন্ধে অনেক অনাবশ্যক স্থলেও গুচ্ছ গুচ্ছ ইংরাজী শব্দ ও উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। লেখকের মতামত লইয়া আলোচনার ইহা ঠিক স্থান নহে। সেজন্য আর একটী প্রবন্ধের আবশ্যক হইয়া পড়ে। লেখকের মতে মানব সন্তানকে প্রকৃতিমাতা নানা উপায়ে কেবলই কুশিক্ষা দিতেছেন। মৌলিকতা দেখাইবার জন্য কি লেখক এই মত প্রচার করিতেছেন ? লেখক তাঁহার মতের নির্ভরস্বরূপ যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার পদভর বড়ই দুর্ব্বল। "মগধের পুরাতত্ত্ব" পড়িয়া যদিও আমাদিগের কান পচিয়া উঠিয়াছে তথাপি যদি কিছু নূতন কথা পাই এই আশায় পুনরায় পড়িতে প্রলুব্ধ হই। এইরূপ পুরাতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধগুলির একটী প্রধান দোষ এই যে কেবল তারিখে তারিখে ইহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধটীর প্রতি লাইনে বোধ হয় খৃঃপুঃ চলিয়াছে। পুরাতত্ত্বের প্রবন্ধগুলি কি চিত্তাকর্ষক করিয়া লেখা যায় না ? য়ুরোপীয় লেখকদিগের প্রবন্ধে বাঙ্গালী লেখকদিগের ন্যায় তারিখের এত বাড়াবাড়ি নাই। মালবিকাগ্নিমিত্রের ঐতিহাসিক ঘটনার বিষয় এই প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন ইহার বহুপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত

তাঁহার "পাণিনি" নামক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। 'রত্নাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ষ' এইরূপ প্রবন্ধের অধুনা বড়ই আবশ্যক। আজ কাল অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যপাঠের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তাদিগের বিষয় জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সে কৌতূহল মিটাইবার কোন উপায় নাই। সতীশ বাবু যদি এইরূপে অন্যান্য সংস্কৃত কবিদিগের বিষয় লিখিয়া বঙ্গ সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্টি করেন তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা বাস্তবিকই একটা মহৎ কার্য্য সাধিত হয়। "মক্ষিকার সমাচার" নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটীতে মক্ষিকা সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক কথা জানা যায়। কিন্তু লেখক এই সঙ্গে যদি মক্ষিকার দ্বারা মানব শরীরের কি হিতাহিত সাধিত হয় সে বিষয় কিছু আলোচনা করিতেন তাহা হইলে পাঠকের অধিকতর উপকারে আসিত। প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ অধ্যাপক কথ্ মশকের সহিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধ লইয়া আজ কাল খুব আলোচনা করিতেছেন।

উৎসাহ।

কয়েকটী সুলেখক উৎসাহের উন্নতির জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইহাদের হস্তে উৎসাহ ক্রমশই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। উৎসাহের প্রবন্ধগুলি মনোযোগ সহকারে পড়িবার জিনিষ। বৈশাখ সংখ্যার উৎসাহের 'পুণ্যাহ' নামক প্রবন্ধে অক্ষয় বাবুর নাম দেখিয়া যতটা আমরা আশান্বিত হইয়াছিলাম, পড়িয়া কিন্তু পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তি হইল না। অক্ষয় বাবু লিখিতেছেন "মুর্শিদকুলিখাঁর আদেশে শুভ পুণ্যাহের সূচনা হয়," এই উক্তির উপর আমরা নির্ভর করিতে পারি না, কারণ আমাদের মনে খট্‌কা উপস্থিত হয় এই, যে মুর্শিদ কুলিখাঁ 'পুণ্যাহ' নামে ইহার সূচনা করিলেন কেন? কি সূত্রে 'পুণ্যাহ' নাম হইল? অন্য কোন নাম হইল না কেন? এসকল বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করা উচিত ছিল। নবাব মুর্শিদ কুলিখাঁ পুণ্যাহের পরিবর্ত্তে অন্য কোন মুসলমানী নাম দিতে পারিতেন, তাহা দেন নাই কেন? এমন হইতে পারে না কি যে মুর্শিদ কুলিখাঁর পূর্ব্বাবধি 'পুণ্যাহ' বঙ্গে প্রচলিত ছিল, মুর্শিদ কুলিখাঁ সেই হিন্দু প্রথাকে নবজীবন দিয়াছেন মাত্র। সকল জমীদারীতেই আজ কাল 'পুণ্যাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু কিরূপে উহার কার্য্যপ্রণালী নিষ্পন্ন হয়, বর্ত্তমান প্রণালীর সহিত মুসলমান আমলের প্রণালীর কতটা

প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে, এ সকল বিষয় লিখিলে তবে প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ হইত। এক্ষণে প্রবন্ধটী পাঠ করিলে কতকটা অঙ্গহীন বলিয়া মনে হয়।

প্রদীপ।

'নবদ্বীপ' কবিতাটীর পার্শ্বে দ্বিজ বাবুর কোট, প্যাণ্টলুন ও নেকটাই পরিহিত নিছক সাহেবী চিত্রটী কেমন বিসদৃশ লাগে। এ চিত্রটী অন্যত্র দিলে ক্ষতি ছিল না। 'নবদ্বীপে' কবিতাটীর সঙ্গে শুভ্র উত্তরীয়শোভিত চিত্র সন্নিবিষ্ট হইলে বড়ই মিল খাইত। কবিতাটীর আরম্ভ গুরু গম্ভীর বটে কিন্তু তৎপরে যে সকল কথার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা সত্য হইলেও আমাদের বিশ্বাস তাহাতে কবিতাটীর সৌন্দর্য্য কতকাংশে কলুষিত হইয়াছে। "অবিশ্বাস করিতেছ" হইতে "মুরগীও চরে" পর্য্যন্ত প্যারাগ্রাফটী লিখিয়া আমাদিগের মনে হয় যে তিনি দুগ্ধের ন্যায় এমন পবিত্র কবিতাটীকে একটুকু অম্লরসের দ্বারা যেন কতকটা বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। উপরোক্ত প্যারাটী না থাকিলে কবিতাটীর সাত্ত্বিকতা বোধ হয় পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকিত। দ্বিজ বাবুর কবিতায় অনেকটা কবি ঈশ্বর গুপ্তের ছায়া আছে দেখিতে পাই। "আজকালকার স্কুলের ছেলেরা" প্রবন্ধে লেখিকা যাহা লিখিয়াছেন তাহার সহিত আমাদিগের ঐকমত্য আছে। সংযম, শাসন, ন্যায় বিচার ও স্নেহ প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণে অভিভাবকেরা পরিচালনা না করিলে ছাত্রদিগের মঙ্গলের আশা নাই। এক কথায় পুত্রের সমক্ষে পিতার 'ভীমকান্ত' হওয়া আবশ্যক। "ওয়েলস্ কাহিনী" পড়িয়া ওয়েলস্ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গেল। প্রবন্ধটী সুখপাঠ্য। "মেয়েলী সাহিত্য" অতি অল্প অংশই বাহির হইয়াছে। আরো চাই। ছড়াগুলি পড়িতে বেশ মিষ্টি লাগে অথচ সেকালের ইতিহাস, আচার প্রথা প্রভৃতি অনেক বিষয় জ্ঞান লাভ করা যায়। আশা করি প্রদীপ 'মেয়েলী সাহিত্যের' প্রদীপ ধরিয়া প্রাচীন বঙ্গের অন্ধকার গৃহ অনেকটা আলোকিত করিবে। বাঙ্গলা মাসিকপত্রে সার সৈয়দ আহমদ খাঁর ন্যায় মুসলমান বড়লোকদিগের জীবনীপ্রকাশ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতিসম্বর্দ্ধনের অন্যতম উপায়।

পুণ্য।

শাস্ত্রে রমণীর উচ্চশিক্ষার বিধি।

হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায়েই এমন অনেক সাধু মহাত্মা আছেন, যাঁহারা দেশাচার বশতঃ ধারণা করিয়া আছেন যে, শাস্ত্রমতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা, বিশেষত বেদাদি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা এবং ওঙ্কার উচ্চারণাদি দ্বারা ঈশ্বরারাধনা প্রভৃতি কার্য্য নিষিদ্ধ। আমি জানি যে অনেকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য মনে করিয়া তাঁহাদিগের স্ত্রীকন্যাদিগকে ভালরূপ শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন না। কিন্তু যদি তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে শাস্ত্রমতে স্ত্রীলোকদিগের বেদাদি পঠনপাঠনে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তাহা হইলে তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হন না। বর্ত্তমানে অনেকেই স্ত্রীকন্যাদিগকে শ্বশুর বাড়ী হইতে বাপের বাড়ীতে পত্রলেখা প্রভৃতি নিতান্ত অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক যতটুকু, ততটুকুই শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ গুরুবংশীয় মদীয় বন্ধুবর কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তখন তিনি তাঁহার পত্নীকে সামান্য সামান্য বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর উভয়েরই ইচ্ছা থাকিলেও শাস্ত্রের নিষেধ ভাবিয়া তিনি তাঁহার সহধর্ম্মচারিণীকে উপনিষদাদি শিক্ষা দিতে পারিতেছিলেন না। অনন্তর আমার সহিত আলোচনায় যখন বুঝিলেন যে স্ত্রীলোকের বেদাদি পঠনপাঠন শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে, বরঞ্চ শাস্ত্রসম্মত, তখন তিনি সহস্র লোকাপবাদ সহ্য করিতে প্রস্তুত

থাকিয়াও তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চশিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। সুখের বিষয় যে তাঁহাদের বংশ প্রকৃত ব্রাহ্মণের বংশ; সেই বংশে ব্রাহ্মণোচিত উদারতা যথেষ্ট আছে, তাই তাঁহাকে জ্ঞাতিবিরোধ এবং তদানুসঙ্গিক লোকাপবাদও সহ্য করিতে হয় নাই।

শাস্ত্রাদি আলোচনা যতদূর করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে কোন প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ স্ত্রীলোককে বেদাদি পঠনপাঠনের, সুতরাং উচ্চশিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করে নাই। আদিশাস্ত্র বেদ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে বৈদিককালে স্ত্রীশিক্ষা বিশেষরূপ অনুমোদিত ছিল। অথর্ব্ববেদে আছে "ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিং" কন্যা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই যুবা পতি প্রাপ্ত হয়েন। কন্যা যদি উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া বিদ্যাভ্যাসে প্রযত্ন করেন, তবে তিনি যে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পতিলাভ করিবেন, তদ্বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? এই ব্রহ্ম-চর্য্য অর্থে যে ইন্দ্রিয়সংযমের সহিত বিদ্যাভ্যাস, বিশেষত বেদবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যাস, তাহা শ্রুতিস্মৃতি, মহাভারত প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। স্ত্রালোকের ব্রহ্মচর্য্য পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য হইতে বস্তুত পৃথক্ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে আছে "সমানং ব্রহ্ম-চর্য্যং" (পট ৪, কং ১৫) স্ত্রী ও পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য একই প্রকার হইবে। ঋগ্বেদেও দেখা যায় যে পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষে মিলিতভাবে যজ্ঞ সম্পাদন করি-তেন। কেবল তাহাই নহে, বিশ্ববারা প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রীলোক মন্ত্র-দ্রষ্টী ঋষি ছিলেন এবং ঋত্বিকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যজ্ঞ সম্পাদন প্রভৃতি কার্য্যে যে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত, তাহা বলা নিষ্প্র-য়োজন। স্ত্রীলোকদিগের যখন ঋত্বিকের কর্ম্ম করিতেও কোন বাধা ছিল না, তখন বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি জ্ঞানার্জ্জনের কার্য্যে যে তাঁহাদিগের কোনই বাধা ছিল না, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তাই গোভিলগৃহ্যসূত্রে যে মন্ত্র আছে যে "সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে পত্নী গৃহ্য অগ্নিতে ইচ্ছা করিলে হোম করিবে," সেই মন্ত্রের টীকাকার লিখিতেছেন যে "পত্নীকে বেদ অধ্যয়ন করাইবে, কারণ পত্নী হোম করিবে এই বচ-নের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পত্নী বেদ না অধ্যয়ন করিয়া হোম

করিতে সক্ষম হয় না।" ১ গৃহ্যসূত্র, শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্রপাঠের বিস্তর উপদেশ ও অনুশাসন দৃষ্ট হইয়া থাকে। গোভিল দর্শপৌর্ণমাস ব্রতবিষয়ে মানতন্তব্য নামক আচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়া স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা বিষয়ে আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সে মতটী এই যে, গৃহকর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে গৃহে অবস্থিত গৃহকর্ত্রীর দ্বারাও উক্ত ব্রত নিষ্পন্ন হইতে পারিবে—এই ব্রতের পূর্ব্বদিবসে উপবাস করিতে হয়, (নির্জ্জলা উপবাস বিশেষরূপে নিষিদ্ধ), এবং সেই উপবাস দিবসের রাত্রিকালে বৈদিক ইতিবৃত্ত (যথা, ব্রহ্মহ বা ইদমেকমগ্রআসীৎ ইত্যাদি) আলোচনা করিয়া অথবা সাধারণতঃ ধর্ম্মালোচনায় যাপন করিতে হয়। বিবাহের প্রারম্ভভাগেই কন্যাকে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইত। গৃহ্যসূত্রাদির অনেক স্থলেই দেখা যায় যে নানা কার্য্যোপলক্ষেই স্ত্রীলোকদিগের বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হইত। কেবল গৃহকর্ত্রীই যে বেদমন্ত্র পড়িয়া ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, গৃহের স্ত্রীনাপিত পরিচারিকা ইহাদিগকেও অবস্থাবিশেষে বেদমন্ত্র পড়িতে হইত। এখনও হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানের বিধি আছে তৎসমুদায়, বিশেষত বিবাহবিধি আলোচনা করিলেই দেখা যাইতে পারে যে, স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার আজ পর্য্যন্ত কেহই বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। তবে অধুনা উপযুক্ত পুরোহিত এবং স্ত্রীশিক্ষার অভাবে সেগুলি প্রায়ই কন্যাকে উচ্চারণ করিতে হয় না। একটী দৃষ্টান্ত দিই—শ্রৌতসূত্রে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, "বেদ পত্নীকে প্রদান করিয়া তাহা পাঠ করাইবে।" ২ ইহার উপর অন্য স্পষ্টতর কোন প্রমাণ আবশ্যক হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। আজও সেই অনুশাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিবাহকালে কন্যার হস্তে সচরাচর চণ্ডীগ্রন্থ রক্ষিত হয়। কিন্তু দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় যখন দেখি যে, স্ত্রীলোকদিগকে বেদাধ্যয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য কোন কোন

---

১ পুরুষার্থপ্রকাশ গ্রন্থে স্বামী-বিশ্বেশ্বরানন্দ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত—"পত্নীমধ্যাপয়েৎ কস্মাৎ পত্নী জুহুয়াদিতি বচনাৎ নহি খল্বনধীত্য শক্নোতি পত্নী হোতুমিতি।" পৃঃ ৬৭

২ বেদং পত্ন্যৈ প্রদায় বাচয়েৎ।

নবীন আচার্য্য উপরোক্ত সরল মন্ত্রের সরল ব্যাখ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক "বেদ" শব্দের অর্থে "কুশ" অর্থ করিয়া বলিয়াছেন যে কন্যার হস্তে কুশ অর্পণ করিয়া পাঠ করাইবে। পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে এই শেষোক্ত অর্থ কেমন যেন একটু অসঙ্গত বলিয়া কি বোধ হয় না?

বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকদিগকে বেদাধ্যয়নের যেমন সম্পূর্ণ অধিকার দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহাদিগকে তাহার উপযুক্ত পাত্র করিতেও বিরত হন নাই। তখন বাল্যকালে উপনয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করা যেমন পুরুষের অধিকার ও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত, সেইরূপ স্ত্রীলোকেরও পক্ষে উপনয়ন এবং তৎসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন একটী গুরুতর অধিকার ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। গোভিল তাঁহার গৃহ্যসূত্রে বলিতেছেন যে, বিবাহের প্রারম্ভেই "বস্ত্রাচ্ছাদিত, যজ্ঞোপবীতযুক্ত কন্যাকে (ভাবীপতি) নিজাভিমুখ করত সমীপে আনাইয়া 'প্রমে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করাইবে।" ১ ইহা হইতেই আমরা বুঝিতেছি যে তখন স্ত্রীলোকের যজ্ঞোপবীত ধারণ এবং কুমারী অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা অসামাজিক ছিল না, প্রত্যুত এসম্বন্ধে সামাজিক বিধিই ছিল। এই মতের সপক্ষে গোভিল যে একরথী ছিলেন তাহা নহে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রেও উপনীত ও অনুপনীত স্ত্রীলোকের স্পষ্টই উল্লেখ আছে "স্ত্রিয় উপনীতা অনুপনীতাশ্চ।" এই সকল সূত্র অবলম্বন করিয়া পারাশর স্মৃতির মাধব্যভাষ্যে লিখিত হইয়াছে যে পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের দুইপ্রকার শ্রেণীবিভাগ ছিল ব্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যোবধূ; তন্মধ্যে ব্রহ্মবাদিনীদিগের রীতিমত উপনয়ন, অগ্ন্যাধান, বেদাধ্যয়ন ও স্বগৃহে ভিক্ষা প্রভৃতি অবলম্বনীয় এবং যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী না হইয়া গৃহলক্ষ্মী হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদিগের যে সে রকমে নামে মাত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়া বিবাহ করাই কর্ত্তব্য। ২ ভাষ্যকার শাস্ত্র হইতে স্ত্রীলোকের উপনয়ন দিবার প্রথা পাই-

---

১ প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীমভ্যুদানয়ন্ * * * বাচয়েৎ প্রমে পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতামিতি।

২ "দ্বিবিধা স্ত্রিয়োব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাং উপনয়নং অগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষা ইতি বধূনাং তূপস্থিতে বিবাহে কথঞ্চিদুপনয়নং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্যঃ।"

য়াছেন, কিন্তু দেশাচার বশত সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের বিবাহকালে যে সে রকমে উপনয়ন দিবার কথা নিজের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন। এইরূপে ভাষ্যকারদিগের মতামতের জ্বালায় এত সম্প্রদায়ের এবং এত বিবাদকলহের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতেই আমরা দেখিতেছি যে বৈদিক কালে স্ত্রীলোকের উপনয়ন ধারণ এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা একটি নিয়মিত প্রথা ছিল। এরূপ নিয়মিত প্রথা বৈদিক কালের শেষ ভাগেও প্রচলিত ছিল, তাহার ফলে বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী এবং যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী সম্বাদ। এই দুইটি সম্বাদ এত প্রচলিত যে তাহার বিস্তৃত উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করি না। যাই হৌক্, আমরা বেদের মধ্যে স্ত্রীলোকের যেরূপ শিক্ষার এবং যে সকল অবস্থায় স্বাধীনতা প্রদান করিবার ব্যবস্থা দেখিলাম, তাহা একটু অনুধাবন পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে, জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারে মনের স্বাভাবিক গতি অনুসারেই হউক, বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকের মাতৃত্বের দিকে, গৃহস্থের গার্হস্থ্য সুখশান্তির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।

এইবারে স্মৃতিগ্রন্থসমূহে, বিশেষতঃ মনুসংহিতায় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ পাওয়া যায় দেখা যাউক। পূর্ব্বেই আভাস দিয়া আসিয়াছি যে মনুসংহিতায় স্ত্রীশিক্ষার বিধিনিষেধ কিছুই দেখা যায় না; সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে বৈদিক কাল হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে মত চলিয়া আসিতেছিল, মনু তাহার বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু মনুসংহিতা যে সকল উপায়ে গার্হস্থ্য সুখশান্তির বৃদ্ধি হইতে পারে সেই সকলের দিকেই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া সেই সকল উপায়কে বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। স্ত্রীলোকের বেদবেদাঙ্গ শিক্ষা করিয়া পণ্ডিতা হইবার অপেক্ষা পতিসেবা, গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি যে গৃহের সুখশান্তির অধিকতর অনুকূল, মহর্ষি মনু তাহা বুঝিয়া তাহারই জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥ ২অ, ৬৭

স্ত্রীলোকদিগের বৈবাহিক বিধি বৈদিক সংস্কার, পতিসেবা গুরুকুলে বাস,

এবং গৃহকর্ম্ম অগ্নিপরিচর্য্যারূপে স্মৃত হয়। এই শ্লোক হইতেই কেহ যেন ইহা না বুঝেন যে মনু স্ত্রীলোকের উপনয়ন নিষেধ করিয়া বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন। ১ এই শ্লোকটী আমাদের যেন কতকটা অর্থবাদ বলিয়াই বোধ হয়। আমাদের বোধ হয়, মনুর মতে গুরুকুলে বাস করিয়া একটা লোকদেখান ব্রহ্মচর্য্যের ভাব অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পতিসেবাতেই বাস্তবিক ধর্ম্মবৃত্তির সমূহ চর্চ্চা হয় এবং বিশেষ কঠোর পরীক্ষা হয়—পতিসেবাতেই স্ত্রীলোকের প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের ফললাভ হয়। মনু স্ত্রীজাতির শিক্ষা, দীক্ষা ও ধর্ম্মের কথা বর্ণন করিতে গিয়া বলিতেছেন "গৃহকর্ম্মে নিপুণ থাকিয়া স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবেন, গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন, এবং ব্যয় করিবার সময় মুক্তহস্ত হইবেন।" অন্যান্য সংহিতাকারেরা স্ত্রীলোকের ইহাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বৈদিককালে যেরূপ স্ত্রীলোকের বাল্যকালে উপনয়ন এবং তৎসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা প্রথা ছিল, তাহাও যে মনুর সময়ে অনুপযোগী ও অপ্রচলিত বোধ হইয়াছিল তাহা নহে; মনুর সময়েও এই প্রথা সম্পূর্ণই প্রচলিত ছিল। তবে, মনুসংহিতার একটী শ্লোকে জাতকর্ম্ম অবধি উপনয়ন ও কেশান্ত পর্য্যন্ত সংস্কারগুলি স্ত্রীলোকের পক্ষে অমন্ত্রক করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ২ আমরা যখন দেখিতেছি যে গৃহ্যসূত্রাদি বৈদিকগ্রন্থে স্ত্রীলোকের উপনয়ন সংস্কার অমন্ত্রক করিবার বিধি নাই ৩ এবং বিষ্ণুসংহিতার ন্যায় প্রাচীন সংহিতাতেও মাত্র চূড়াকার্য্য পর্য্যন্ত বৈদিক বিধির অনুসরণে স্ত্রীলোকের পক্ষে অমন্ত্রক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ৪ তখন মনুসংহিতার উক্ত

১ মনুসংহিতার ভাষ্যকার প্রভৃতি কর্ত্তৃক এই শ্লোকটী স্ত্রীলোকের উপনয়ন দিবার নিষেধজ্ঞাপক বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে।

২ অমন্ত্রিকাতু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমং॥ ২অ, ৬৬

৩ গোভিলগৃহ্যসূত্রে কন্যার চূড়াকার্য্য অমন্ত্রক করিবার বিধি দেখা যায়। ২প্র, ১অ, ২২-২৪

৪ এইখানে বিষ্ণুসংহিতায় একটু কৌশল দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুঋষি চূড়াকার্য্য পর্য্যন্ত সাধারণভাবে বর্ণন করিয়া বলিলেন "এতাএব ক্রিয়াঃ স্ত্রীণামমন্ত্রকাঃ" অর্থাৎ স্ত্রীলোকের এই কার্য্য-

শ্লোকটী বেদবিরুদ্ধ এবং প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়। মনুসংহিতায় যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে, একথা অতি পক্ষপাতী, নিতান্ত orthodox লোক-দিগেরও স্বীকার করিতে হইবে। মনুসংহিতার অতি প্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি স্বয়ং নবম অধ্যায়ের একটী শ্লোককে[১] অমানব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া সে কথা স্বীকার করিয়াছেন এবং সুতরাং আমাদিগকেও মনুসংহি-তার প্রক্ষিপ্তশ্লোক স্বাধীনভাবে বিচার করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। যাই হৌক, যদি বা উক্ত শ্লোক প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলেও আমরা সেই শ্লোকের প্রমাণেই জানিতে পারিতেছি যে মনুসংহিতার সময়েও সমন্ত্র-কই হউক অথবা অমন্ত্রকই হউক, স্ত্রীলোকের উপনয়ন প্রথা এবং সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য ব্রতও অবলম্বনীয় ছিল। কেবল একমাত্র অত্রিসংহিতায় দেখি যে, স্ত্রীলোকের অধ্যয়ন, অধ্যাপন প্রভৃতি পাতিত্যজনক। হইতে পারে যে অত্রির মত এইরূপ ছিল; হয়তো তিনি কোন বিশেষ কারণে ঐরূপ মত স্থির করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া বেদের বিরুদ্ধে, মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতাসমূহের বিরুদ্ধে ঐ মতকে সর্ব্বগ্রাহ্য বলিয়া ধরিবার কোনই কারণ দেখিতে পাই না।

সংহিতাগ্রন্থ ছাড়িয়া দিয়া আমরা যদি পুরাণের মধ্যে অবগাহন করি, সেখানেও দেখি যে, স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার বিরোধী কোন কথাই নাই। পুরাণের মধ্যে মহাভারতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ বলিয়া সর্ব্ববাদীসম্মত। সক-লেই জানেন বোধ হয় যে, বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ স্ত্রীশূদ্র প্রভৃতি আপামর সাধা-রণের সহজবোধগম্য নহে বলিয়া ব্যাসদেব অতি বিদ্বান্ হইতে অতি মূর্খ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার জন্য এই মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি বেদাদিশাস্ত্রসমূহের মধ্যস্থিত নানাবিধ শিক্ষণীয় বিষয় সকল এই মহাভারতীয় ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া গল্পচ্ছলে শিক্ষার সুগম

গুলিমাত্র (এব নিশ্চয়ার্থে; এতাএব অর্থাৎ এইগুলিই) অমন্ত্রক অনুষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহার পরেই তিনি স্ত্রীলোকের বিবাহ বিষয়ে বলিলেন "তাসাং সমন্ত্রকো বিবাহ." অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বিবাহ সমন্ত্রক। ইহার পরে তিনি পুনরায় সাধারণ ভাবে ব্রাহ্মণাদির উপনয়ন প্রভৃতির বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

[১] ৯ অ, ৯৩

পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহাভারতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন বিধি-নিষেধ নাই; কিন্তু ইহাতে মহামতি ব্যাসদেব দৃষ্টান্তের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার উপদেশ দিয়াছেন। মহাভারতের দ্রৌপদী চরিত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে তিনি অতিশয় বিদুষী রমণী ছিলেন। দ্রৌপদী একাধিক স্থলে পণ্ডিতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বনপর্ব্বের একস্থানে আছে, "অত্র শর্ব্বা শিবা নাম ব্রাহ্মণী বেদপারগা" ইত্যাদি। শান্তি পর্ব্বের অষ্টাদশ অধ্যায়ে জনকরাজকে সন্ন্যাসগ্রহণ হইতে তাঁহার পত্নীর নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা নিবৃত্ত করিবার কথা উল্লিখিত আছে। মহাভারতের সময় যে কিরূপ স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহা সমগ্র মহাভারতের স্ত্রীচরিত্র আলোচনা না করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে না। কিন্তু অতি বিদুষী হইবার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পতিশুশ্রূষা ও গৃহকর্ম্ম সুনিপুণভাবে সম্পাদন করা যে সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট ও পরম ধর্ম্মজনক, তাহা ব্যাসদেব স্পষ্ট করিয়া অনেকস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে যদি গৃহকে শ্রীমান্ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের পতিপরায়ণা এবং গৃহকর্ম্ম-নিপুণা হইতে হইবে। মহাভারতের সময়েও বোধ হয় যে লোকেরা স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, তবে স্ত্রীলোকের গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষার দিকেই সর্ব্বসাধারণের স্বভাবতই অধিক আগ্রহ ছিল দৃষ্ট হয়।

আমরা বেদ অবধি পুরাণ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, সকলেতেই স্ত্রীশিক্ষার পরোক্ষ বিধি ও উপদেশ দৃষ্ট হয়; কিন্তু একটীতেও স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুশাসন দেখা যায় না। তন্ত্রশাস্ত্র সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণতন্ত্রই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একথা হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, জ্ঞানার্জ্জনবিষয়ে স্ত্রীলোকের পুরুষের সহিত সাধারণ অধিকার আছে, এবং দুএকটী স্মৃতি ভিন্ন বেদ অবধি পুরাণ পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্র গ্রন্থেই সেই সকল অধিকার বিলুপ্ত করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা হয় নাই, বরঞ্চ সমর্থনই পাওয়া যায়। কিন্তু কোথায়ও সেই অধিকার সুব্যক্ত হয় নাই। তন্ত্রশাস্ত্র সেই অব্যক্ত অধিকারকে সুব্যক্ত করিলেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্র পুত্রকেও যে ভাবে শিক্ষা দিতে উপদেশ দিয়াছেন, কন্যাকে তদপেক্ষা এতটুকু ন্যূন করিয়া

শিক্ষা দিতে উপদেশ দেন নাই। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আছে "পিতা চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রের লালনপালন করিবে, তাহার পর ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যা ও সকল গুণ শিক্ষা করাইবে। বিংশতি বৎসরাধিক বয়স্ক পুত্রদিগকে গৃহকর্ম্মে নিয়োজিত করিবে।" * ইহার পরেই সেই স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক সুবিখ্যাত অনুশাসন "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" অর্থাৎ কন্যাকেও অতি যত্নসহকারে এই প্রকার অর্থাৎ পুত্রদিগের ন্যায় পালন করিতে ও শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। আমাদের বোধ হয় যে তন্ত্রের কিছু পূর্ব্বে জনসাধারণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছিল, তাই তন্ত্রকারগণ তাহার সপক্ষে এই অনুশাসন করিয়া দিলেন। তন্ত্রের পূর্ব্বে অথবা সমসময়ে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন হউক বা নাই হউক, নানা কারণে, সম্ভবতঃ রাজনৈতিক বিপ্লবাদির কারণে, স্ত্রীশিক্ষার যে অপ্রচলন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আমরা কিছু পরেই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী পক্ষের কথা আলোচনা করিবার কালে দেখিতে পাইব। তৎপূর্ব্বে আমরা দেখিয়া লই যে ব্যাকরণ প্রভৃতিতেও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ সমর্থন প্রাপ্ত হই। পাণিনিকৃত ব্যাকরণের পাতঞ্জল ভাষ্যে আছে "কাশকৃৎস্নি কর্ত্তৃক প্রোক্ত মীমাংসাকে কাশকৃৎস্নী বলা যায় এবং যে ব্রাহ্মণী তাহা অধ্যয়ন করে তাঁহাকে কাশকৃৎস্না ব্রাহ্মণী বলা যায়।" আরও "যে স্ত্রীলোকের কাছে আসিয়া লোকে অধ্যয়ন করে, তাহাকে উপাধ্যায়ী ও উপাধ্যায়া বলা যায়।" হেমাদ্রিকৃত চতুর্বর্গচিন্তামণি নামক একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে আছে "কুমারী কন্যাকে বিদ্যা ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে শিক্ষা দিবে। যে কন্যা বিদ্যাশিক্ষা করেন তিনি পতি তথা পিতৃ উভয় কুলেরই কল্যাণদায়িকা হয়েন। উপযুক্তা কন্যাকে বিদ্বান্ বরের সহিত বিবাহ দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য ও ইহাই পুরাতন ঋষিদিগের মত। যাবৎ কন্যা পতিমর্য্যাদা, পতিসেবা এবং ধর্ম্মশাসন অজ্ঞাত থাকিবে, তাবৎ পিতা সেই কন্যার বিবাহ দিবেক না।"

এতদূর পর্য্যন্ত আমরা স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষ শাস্ত্রমত আলোচনা করিয়া আসিলাম। ইহাতেও হিন্দু সাধারণে যে কিরূপে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হন,

---

* ৮উ, ৪৫—৪৬

তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম। স্ত্রীশিক্ষার কথা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক-দিগকে বেদবেদান্তাদি উচ্চঅঙ্গের শিক্ষা দিবার কথা উত্থাপিত হইলেই বিরোধী পক্ষ "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাংত্রয়ীন শ্রুতিগোচরা" এই শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগকে নীরব করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। তাঁহারা ইহার অর্থ করেন যে স্ত্রীলোক, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদিগের বেদপাঠে অধিকার নাই। উপরোক্ত শ্লোকার্দ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকের[১] অর্দ্ধাংশ মাত্র। আপাতত আমরা ধরিয়া লইলাম যে এই শ্লোকাংশের তাঁহারা যেরূপ অর্থ করেন তাহাই ঠিক। এখন, ভাগবত যে আমাদের অতি মান্য ও আদৃত শাস্ত্রগ্রন্থ তাহা স্বীকার করিলেও নানা কারণে ইহার আর্ষেয়ত্ব বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ করিবার অধিকার আছে। ভাগবত যদি মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক লিখিত হইত, তাহা হইলে মহাভারতের সহিত ইহার বিষম বিরোধ দেখা যাইত না। আমরা বিরোধের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখাইব।

সর্ব্বসাধারণের মতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের নিজেরও মতে ইহা মহাভারতের পরে রচিত। এই বিষয়ে একেবারে কাহারও দ্বিধা নাই। এই মহা-ভারতের শান্তিপর্ব্বে[২] লিখিত আছে যে, যখন ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান, তখন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মোপদেশ লাভের নিমিত্ত তাঁহার নিকটে গমন করিয়া অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে শুকদেবের জন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে ভীষ্ম তাঁহার জন্মা-বধি ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পর্য্যন্ত আমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন যে "পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ এবং মহাযোগী ব্যাসদেব কথাপ্রসঙ্গ বশত এই বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।" ইহার পর যুধিষ্ঠির ২৬ বৎসর[৩] রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর পরীক্ষিৎ ৬০ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া তক্ষকদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এদিকে, ভাগবতে উল্লিখিত হইতেছে যে, পরীক্ষিতের মৃত্যুর সাতদিন পূর্ব্ব হইতে শুকদেব এই ভাগ-বতাখ্যান বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে— এই সময়ে শুকদেবের বয়স সবেমাত্র ১৬ বৎসর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারতের মতে পরীক্ষিতের মৃত্যুর অন্তত ৮৬ বৎসর পূর্ব্বে শুকদেব

১। ১স্ক, ৪অ, ২৫

২। ৩৩৩—৩৪ অধ্যায়।

৩। কাহারো কাহারো মতে ৩৬ বৎসর।

ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন, কিন্তু ভাগবতের মতে পরীক্ষিতের মৃত্যু-কালে শুকদেবের বয়স সর্ব্বমাত্র ১৬ বৎসর। ইহার উপর আরও একটু গোলযোগ আছে। ইতিপূর্ব্বেই দেখিলাম যে মহাভারতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে ভীষ্মের শরশয্যায় শয়নের পূর্ব্বেই শুকদেবের দেহান্তর ঘটিয়াছিল, কিন্তু ভাগবতে উল্লেখ আছে যে ভীষ্মের মৃত্যুকালে শুকদেব তথায় উপস্থিত ছিলেন। একই ব্যক্তি, বিশেষত একই ঋষি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক দুইখানি গ্রন্থ লিখিত হইলে এরূপ গুরুতর বিরোধের সম্ভাবনা থাকিত না বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখি যে অন্যান্য পুরাণমাত্রে যেখানে মহাভারত সম্বন্ধীয় কোন উল্লেখ আছে, সেইখানেই তাহা ঋষি ব্যাসদেবকৃত বলিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু স্কন্দপুরাণে এই ভাগবত-পুরাণ অতি তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সহিত উক্ত হইয়াছে দেখা যায়। দেবীভাগবতেরও টীকাকার স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে ভাগবত বোপদেব-লিখিত। বোধ হয় তিনি এবিষয়ে ভোজপ্রবন্ধ নামক একখানি পুস্তকের অনুসরণ করিয়াছেন। ভাগবত যে বোপদেবকৃত, তাহা এই ভোজপ্রবন্ধ গ্রন্থেও লিখিত আছে। মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে আরও একটী বিরোধ দেখিতে পাই। ভাগবতে পরীক্ষিৎ এই নামের উৎপত্তি বিষয়ে আছে যে "এই প্রভাবশীল বালক, মাতৃগর্ভে যে পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া যে মনুষ্যকে সম্মুখে দর্শন করিতেন, তাহাকেই 'এই ব্যক্তি কি সেই পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষ' এই প্রকার পরীক্ষা করিতেন বলিয়া প্রথম হইতেই পরীক্ষিৎ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।" * কিন্তু মহাভারতের সৌপ্তিকপর্ব্বে (১৬ অ,) স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে ব্রহ্মাস্ত্রের আঘাতে পরিক্ষীণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই জাত বালকের নাম পরীক্ষিৎ হইল। প্রকৃতই যদি ভাগবত বোপদেবকৃত হয়, তাহা হইলে বোধ হয় যেন তাহাতে বোপদেবের হাত দেখিতে পাই। মুগ্ধবোধে বোপদেব যেমন কারণের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছেন, ভাগবতেও সেইরূপ

* স্ক ১২অ ৩০

কারণশৃঙ্খলা রক্ষিত দেখিতে পাই। অনেক স্থলেই এটী কেন হইল, ওটী কেন হইল, এইরূপ প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

যাইহোক্ এই সকল কারণে আমরা শ্রীমৎভাগবতের প্রতি যথেষ্ট আদর ও সম্মান দিতে প্রস্তুত থাকিলেও ইহার আর্ষেয়ত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ইহার আর্ষেয়ত্ব অস্বীকৃত হইলে আমরা ইহাকে পুরাণের আদর্শে রচিত একখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া ধরিতে পারি, কিন্তু ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রগ্রন্থের ন্যায় ইহাকে ব্যবহারের নিয়ামক বলিয়া গ্রহণ করিতে অক্ষম। সুতরাং যদিবা ইহাতে স্ত্রীশূদ্রাদির বেদাদি পঠনপাঠনে অধিকার অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও ঘোর শাস্ত্রবাদীও তাহা ঋষিবাক্যের ন্যায় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন না।

এখন, ভাগবত আর্ষেয় গ্রন্থ হউক বা না হউক, ইহা যখন সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে আর্ষেয় গ্রন্থ এবং কার্য্যত সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, তখন আমাদের দেখা কর্ত্তব্য যে ভাগবতের প্রকৃত মতই বা কি। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী পক্ষ যে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়া নিজমত সমর্থন করিতে প্রয়াস পান, সেই শ্লোকটী সম্পূর্ণ এইঃ—

"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং॥

এই শ্লোকটীর প্রথম দুই চরণের অর্থে তাঁহারা যে স্ত্রী, শূদ্র ও অধম দ্বিজদিগকে বেদাদির পঠনপাঠনে অনধিকারী বলেন, তাহা আমাদিগের সঙ্গত বোধ হয় না। ইহার বিপরীতে আমাদিগের এই বোধ হয় যে গ্রন্থকার দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন যে "পূর্ব্বে স্ত্রীশূদ্রাদি বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যার সুশোভন সাজে সজ্জিত হইত, কিন্তু হায়! এখন তাহারা বেদাদি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছে!' সমস্ত শ্লোকটীর অর্থ আমাদের এইরূপ মনে হয়—কর্ম্মই শ্রেয়স্কর এইরূপ বিবেচনাবিমূঢ় স্ত্রী, শূদ্র এবং অধম দ্বিজদিগের বেদত্রয় (ঋক্, যজু এবং সাম) শ্রুতিগোচর হয় না; এই মহাভারতের দ্বারা ইহাদিগেরও মঙ্গল হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া মুনি (ব্যাসদেব) কর্ত্তৃক কৃপাবশত এই মহাভারত বিরচিত হইয়াছে। সম্ভবত রাজ-

নৈতিক বিপ্লব প্রভৃতি নানা কারণে ভাগবত রচনার কালে অধিকাংশ দ্বিজ, (স্ত্রী ও শূদ্রদিগের তো কথাই নাই) বৈষয়িক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া বেদাদি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়াছিল ; তাহাদিগের মনোযোগের অভাবেই বেদাদি শ্রুতিগোচর হইবার অভাব হইয়াছিল। ভাগবতকার সেই কারণেই দুঃখের সহিত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী বলিয়াছেন এবং সেই কারণেই সম্ভবত মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র পুত্রকন্যাদিগকে নির্বিশেষে ভালরকম শিক্ষা দিতে আদেশ করিয়াছেন।

ভাগবতের উপরোদ্ধৃত শ্লোকে বেদাদিতে স্ত্রীশূদ্রাদির অনধিকার বিষয়ে কোনই উল্লেখ নাই ; তবে যে সকল স্ত্রীলোক বা শূদ্র অথবা কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন দ্বিজ কর্ম্মকাণ্ডে বিমূঢ় হইয়া বেদাদি পঠনপাঠন পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ ঘোর বিষয়াসক্ত ও স্বর্গাদিকামী কর্ম্মনিমগ্ন, তাহাদিগেরও মঙ্গল যে ব্যাসদেবের অন্তরে মহাভারতরচনাকালে নিহিত ছিল, তাহাই এখানে উক্ত হইয়াছে। এখানে বরঞ্চ পরোক্ষভাবে যেমন দ্বিজদিগের, তেমনি স্ত্রীশূদ্রাদিরও বেদাদি পঠনপাঠনে চির অধিকারই ব্যক্ত হইতেছে। ভাগবতকারের যদি স্ত্রীশূদ্রাদিকে বেদাদিতে অধিকার না দেওয়াই অভিমত হইত, তাহা হইলে তিনি চতুর্ব্বেদের কথা না বলিয়া ত্রয়ী অথবা তিনবেদের কথা উল্লেখ করিবেন কেন ? উপরোক্ত শ্লোকের দুই তিনটী শ্লোকের পূর্ব্বেই তিনি চতুর্ব্বেদ এবং পঞ্চমবেদস্বরূপ ইতিহাসপুরাণাদির উদ্ধারের বিষয়, এবং কোন্ কোন্ বেদে কোন্ কোন্ ঋষি পারদর্শী হইয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমরা দেখি, "দারুণ" সুমন্ত মুনি অভিচারাদি কর্ম্মপ্রধান অথর্ব্ববেদে এবং রোমহর্ষণ ইতি-হাস পুরাণাদিতে পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাহার পরে, যাহাতে অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরাও সেই চতুর্বেদ ধারণা করিতে পারে, তাহাই বেদব্যাস কর্ত্তৃক বেদবিভাগের কারণ, ভাগবতকার ইহা উল্লেখ করিয়া পরেই বলিলেন যে- 'এত সুবিধা করিয়া দিবার পরেও যে সকল কর্ম্মসমূঢ় স্ত্রী, শূদ্র ও অধম দ্বিজ উত্তম বেদত্রয় শিক্ষা করে না, তাহাদিগকে বেদের প্রকৃত মর্ম্ম জ্ঞাত করিবার এবং সাধুশিক্ষা প্রদান করিবার কারণেই মহাভারত রচিত হইয়াছে।' এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভাগবত রচনার কালে স্ত্রীশূদ্রাদি অথর্ব্ববেদ অথবা ইতিহাস পুরাণাদি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে নাই, সুতরাং সেবিষয়ে ভাগবতকারের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। আজকাল যেমন

অনেকেই সহস্র বিষয়কর্ম্মের মধ্যেও নাটক নবেল পড়িবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন, ভাগবতের সময়েও সেইরূপ অধিকাংশ লোকেই মনোরঞ্জক ইতিহাস, পৌরাণিক গল্প পড়িবার অবকাশ পাইতেন বলিয়া বোধ হয়। তাই বলিয়া তখন যে কোনই স্ত্রীলোক বেদাদি অধ্যয়ন করিতেন না তাহা নহে। এই ভাগবতেরই প্রথম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, "শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর হইতে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন কালে এক স্ত্রীলোক অপরের নিকটে বলিতেছেন যে "সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী অথচ তদ্বিষয়ে অনাসক্ত যে সনাতন ঈশ্বরের বিষয় বেদ এবং গভীর তত্ত্ববিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থে উক্ত হয়, ইনিই তিনি।" ইহাতে বোধ হয় যে তখন স্ত্রীলোকের বেদাদি অধ্যয়ন এবং ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাস একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। এইরূপে আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, যে ভাগবতের শ্লোকাংশ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে বলবৎ শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়া সদাসর্ব্বদা উদ্ধৃত হয়, সেই ভাগবত আর্ষেয় গ্রন্থ হউক বা না হউক, তাহাতেও স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী কোন কথা নাই এবং উপরোক্ত শ্লোকাংশ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার পরিবর্ত্তে সপক্ষেই সাক্ষ্য দিতেছে। সংস্কৃত কাব্য নাটক আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে তদুল্লিখিত অধিকাংশ স্ত্রীলোকই কোন না কোন প্রকার বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকলেতেই দেখা যায় যে গ্রন্থকারদিগের দৃষ্টি স্ত্রীলোকের মাতৃভাব অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই; সংস্কৃত কাব্য নাটকের, বোধ করি. সকল স্ত্রীচরিত্রেই গার্হস্থ্য সুখশান্তির আকাঙ্খা চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়।—এই কারণেই সংস্কৃত সাহিত্যে লেডি ম্যাকবেথের ন্যায় স্ত্রীলোকের ভীষণ চরিত্র দুর্ল্লভ—বোধ হয় একেবারেই নাই।

আমরা এত বিস্তৃতরূপে হিন্দুমহিলার প্রাচীন অবস্থা বিষয়ে আলোচনা করিলাম ইহাই দেখাইবার জন্য যে, ভারতের ঋষিমুনিরা অতি উদারহৃদয় মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহাদের সদুপদেশ সকল অগ্রাহ্য করিয়াই আমরা এত হীন অবস্থায় নিপতিত হইতেছি। আশা হইতেছে যে, ভারতের হিন্দুজাতির উন্নতি সম্মুখে—হিন্দুজাতির দৃষ্টি প্রাচীনের প্রতি অল্পে অল্পে পড়িতেছে। সচরাচর দেখা যায় যে, যে জাতি অবনত হইয়া প্রাচীনের প্রতি যথাযোগ্য অনুরাগের সহিত দৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে, সেই জাতির উন্নতি

ঘটিতে অধিক বিলম্ব ঘটে না। অধ্যাপক মোক্ষমূলরও বলিয়াছেন "যে জাতি তাহাদিগের প্রাচীন মহিমা, পুরাবৃত্ত ও প্রাচীন সাহিত্য লইয়া গৌরব করে না সে জাতি তাহাদিগের জাতীয় প্রতিষ্ঠার একটী প্রধান সেতু হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। জর্ম্মনিদেশ যখন রাজ্য সম্বন্ধে অনুন্নতির গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত ছিল, তখন তাহা তাহার প্রাচীন সাহিত্যের মুখের দিকে চাহিয়াছিল এবং পুরাকাল আলোচনা করিয়া ভাবীকাল সম্বন্ধে আশান্বিত হইতে পারিয়াছিল। এক্ষণে ভারতবর্ষে কতকটা এইরূপ হইয়াছে।"

এক্ষণেই যে ভারতবর্ষে এইরূপ হইয়াছে তাহা নহে—ভারতে চিরকালই প্রাচীনের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টি চলিয়াছে, তাই হিন্দু ভারত আজ পর্য্যন্ত নানা অত্যাচার, নানা নির্যাতন সহ্য করিয়াও নিজের জীবনীশক্তি হারাইতে পারে নাই; আজ পর্য্যন্ত ভারতের হিন্দুজাতি জগতের ইতিহাসে নিজ নাম অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইতেছে। শ্রুতির কালের পর যখন ভারতের অবনতি ঘটিল, অমনি স্মৃতিসমূহ অভ্যুদিত হইয়া আদর্শ দেখাইবার জন্য প্রাচীন শ্রুতির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল; স্মৃতির পর যখন অবনতির কাল আসিল, তখন পুরাণ সকল অভ্যুদিত হইয়া শ্রুতিস্মৃতির দিকে লোকের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিল; তাহার পরে তন্ত্রশাস্ত্র যদিও নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল, তথাপি তাহা শ্রুতিস্মৃতির দিকে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পরে আবার অবনতির কাল আসিল, আমরা এখন শ্রুতি স্মৃতি পুরাণতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র সকলের দিকে, তৎপ্রবর্ত্তিত প্রাচীন পন্থা সকলের অনুসন্ধানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি। হিন্দুজাতির এইরূপ প্রাচীনের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টির কারণ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্রসকলেই যথার্থত উন্নততর আর্য্যসভ্যতার চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং আধুনিক শাস্ত্র সকলে সেই সভ্যতার সহিত অনার্য্যদিগের অনুন্নত আচার ব্যবহারের সম্মিলন দেখা যায়; এই কারণে ভারতের সমাজ সংস্কারক যে প্রত্যেক সংস্কারচেষ্টায় প্রাচীন প্রথা ও শাস্ত্রের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করেন, তাহা কিছু অন্যায় নহে। * হণ্টার সাহেব এই যে কথা বলিয়াছেন,

"The reformer in India has to say, the existing law is

তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে; বৈদিক কালে যে উচ্চতর আর্য্য সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়, একথা একেবারে মিথ্যা নহে। বেদবেদান্তে যে সকল কথা আছে, সেই সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে সেই সময়ে ভারতে একটা গভীর উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। আমি এপর্য্যন্ত যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি এই টুকু বুঝেন যে বৈদিক কাল কেবল কতকগুলি পার্ব্বতীয় কৃষকদিগের ভারতাক্রমণের কাল ছিল না, ঋক্ সমূহও তাহাদিগের "কৃষাণসঙ্গীত" ছিল না এবং স্মৃতিপুরাণতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহ কেবল মাত্র লক্ষটাকার ধূলিরাশি নহে, এবং যদি তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে শাস্ত্রবাক্যে কিঞ্চিৎ কর্ণপাত করেন তাহা হইলেই আমরা শ্রম সার্থক বোধ করিব।

---

unjust or no longer suitable, therefore we shall (not make a new law, but) go back to an older law. And there is historical reasonableness in this curious method. The most ancient scriptures of India represent the higher Aryan civilization, the more recent ones embody the compromises with lower types to which that higher civilization had to submit. The orthodox Hindu, indeed, rests the superiority of the ancient law on a different ground. He believes the oldest of his sacred texts to have been directly inspired by God, and that this inspiration was only vouchsafed in a diminishing degree to subsequent scriptures." The Hindu Child-Widow, Asiatic Quartely Review. October, 1886

নদীতীরস্থ কাননে।

১

গাছপালা অন্ধকার,
ছায়াময় ধবলতা আকাশের মাঝে,
সন্ধ্যায় চৌদিকে গৃহে শাঁখ ঘণ্টা বাজে,
যায় ঘরে যে যাহার।

২

ব'সে একাকী কুটীরে,
কাননের চারিধার ভরা ফুলবাসে,
ব'সে আছি মাঝে তার কত ভাব আসে,—
কুলু কুলু নদীতীরে।

৩

থাকিয়া আকাশে চাহি,
একে একে ফোটে তারা নীলশুভ্রাকাশে
হেরিতেছি নিরজনে কেহ নাহি পাশে ;
তরী যায় দাঁড় বাহি।

৪

দাঁড় পড়ে ছন্দে ছন্দে,
দেখিতে দেখিতে তরী চ'লে যায় দূরে ;
ওপারে নদীর কোলে শতদীপ স্ফুরে,
হেরি শোভা কি আনন্দে।

৫

নদীতীরে কে, পথিক
গাহিছে, ঔদাস্যময় জাগে ভাব তাহে,
মেশে তায় কলরব নদীর প্রবাহে ;
কোথা ডেকে উঠে পিক।

৬

সম্মুখে প্রকাণ্ড বট
দণ্ডায়মান বিস্তারি শাখা প্রশাখায়,
বায়সেরা থেকে ডাকে বটের মাথায়,
নিম্নে শিকড়ের জট।

৭

ল'য়ে রাশি রাশি মাল
দলে দলে ভেসে যায় কত পালোয়াল,
পাল ওঠে ফুলে, বেশ পাইয়াছে পাল,
চালে মাঝি ধ'রে হাল।

৮

কিছু পরে আর নাই,
সব ভেসে চ'লে গেল তাহারা কোথায়,–
দেখিতেছি ভাবিতেছি বসিয়া হেথায়
মনে হয় ভেসে যাই।

৯

ধীরে ভেসে যাই চ'লে
সন্ধ্যাস্নিগ্ধ এ সলিলে যাই ভেসে জলে,
মৃদুরবে ঊর্ম্মিগুলি উছলিছে কূলে
স্তব্ধ কাননের কোলে।

১০

কুলু কুলু কুলু কুলু,
কি মধুর শুনিতে গো গীতধ্বনি এই,
প্রাণে স্বপ্ন জেগে ওঠে, কোলাহল নেই
আঁখি করে ঢুলু ঢুলু।

১১

মলয় বহিয়া যায়,
ঝর ঝর ঝর ঝর করে পাতাগুলি,

লতাপাতা ফলফুলে করে কোলাকুলি,
সুমধুর কি শোভায়।

১২

ব'সে ব'সে এ সন্ধ্যায়
হেরি শোভা মনোলোভা, কত ফুলগন্ধ
ব'সে ব'সে লভিতেছি আহা কি আনন্দ—
কি আনন্দে মন ধ্যায়
সেই অনন্ত অধ্যায়।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দক্ষিণায়ন ও পিতৃপক্ষ।

(তর্পণতত্ত্ব)

পিতৃস্থানের সহিত দক্ষিণদিকের যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পিতৃকালেরও সহিত সেইরূপ উহার অতি নিকট সম্বন্ধ। যেমন প্রতি দিবস দিবা ও রাত্রি এই দুই ভাগে বিভক্ত, যেমন প্রতিমাস শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পক্ষে বিভক্ত, সেইরূপ প্রতি বৎসর উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এই ভাগদ্বয়ে বিভক্ত। উত্তরায়ণের প্রথম ছয়মাস বৎসরের শুক্লপক্ষ বা দেবপক্ষ এবং দক্ষিণায়নের ছয়মাস পিতৃপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষ বলিয়া কথিত হয়। যে কালে আলোকের প্রভাব অধিক সেই কাল দেব কাল, এবং যে কালে আলোকের প্রভাব কম, অন্ধকারময় বা ধূমাচ্ছন্ন তাহাই পিতৃকাল। তাই গীতাকার দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণকালকে এক শ্রেণীর মধ্যে ধরিয়াছেন এবং রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নকে অপর শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণং।
তত্র প্রয়াতাগচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদোজনাঃ॥
ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নং।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥

"অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ কাল, এতদুপলক্ষিত পথে গমনশীল ব্রহ্মবিদ ব্যক্তিরা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন এবং ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন, এতদুপলক্ষিত পথে গমনশীল যোগী চান্দ্রমস জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া এই সংসারেতেই পুনরাগমন করেন।" এই শ্লোকটীতে 'চান্দ্রমস জ্যোতির' কথার উল্লেখ করিয়া গীতাকার সংক্ষেপে দক্ষিণদিকের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধের কথা সূচিত করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন পিতৃগণের দিবস অর্থাৎ পিতৃকাল বলিয়াই হরিবংশে লিখিত হইয়াছে। "কৃষ্ণপক্ষ পিতৃগণের দিবস শুক্লপক্ষ তাঁহাদিগের রাত্রি। মহারাজ! কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। * * * উত্তরায়ণ দেবগণের দিবা। তত্ত্বার্থকোবিৎ প্রাণীগণ দক্ষিণায়ণকে দেবগণের রাত্রিরূপে স্মরণ করেন।" ভীষ্ম ভীষণ শরশয্যায় শয়ন করিয়াও উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় কোন ক্রমে প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন। ভীষ্ম পর্ব্বে বর্ণিত আছে—"মনীষি মহর্ষিগণ সেই মহাত্মাকে প্রদক্ষিণ করতঃ তৎকালে ভাস্করকে দক্ষিণায়নগামী ভাবিয়া পরস্পর মন্ত্রণা পূর্ব্বক বলাবলি করিতে লাগিলেন, ভীষ্ম মহাত্মা হইয়া দক্ষিণায়নে কেন প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন * * * * মহাবুদ্ধি শান্তনুনন্দন তাঁহাদিগের কথোপকথন জ্ঞাত হইয়া চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি দক্ষিণায়ন সত্ত্বে কোন প্রকারে পরলোক গমন করিব না, ইহা মানস করিয়াছি। আমি তোমাদিগের সমীপে সত্য বলিতেছি, আদিত্য উত্তরদিকে গমন করিলে, আমার পূর্ব্বতম স্বকীয় স্থানে গমন করিব, এক্ষণে উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব। * * * শরশয্যাগত ভীষ্ম এই কথা বলিয়া শয়ন করিলেন"[১] মহাভারতের এই কথা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে দক্ষিণায়নে অর্থাৎ বৎসরের পিতৃপক্ষে মৃত্যু সেকালে "মহাত্মাদিগের যোগ্য নহে" বলিয়া ধারণা ছিল। পিতৃপক্ষে মৃত্যু কেন শ্রেয়স্কর নহে তাহার উত্তরে গীতা বলিতেছেন যে

শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥

"শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই গতি নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে শুক্লগতি দ্বারা সংসারে

১। ভীষ্মপর্ব্ব, বর্দ্ধমান সংস্করণ।

অনাবৃত্তি ও কৃষ্ণগতির দ্বারা পুনরাবর্ত্তন লাভ হয়। ২ সংসারে এই পুনরাবর্ত্তনের ভয়েই মহাত্মা ভীষ্ম কৃষ্ণপক্ষরূপ দক্ষিণায়নে মৃত্যু দ্বারা কৃষ্ণগতি লাভ অপেক্ষা উত্তরায়ণের অপেক্ষায় শরশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেও কিছু মাত্র ক্লেশ বোধ করেন নাই। দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে বাস্তবিক সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয় কি না সে বিষয় বিচারের ঠিক ইহা স্থল নহে। এবিষয় পরে আলোচিত হইবে। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে প্রাচীন কালে হিন্দুদিগের ইহা একরূপ সর্ব্ববাদী সম্মত বিশ্বাস ছিল যে উত্তরায়ণে মৃত্যু হইলে মানবাত্মা দেবপথ দিয়া উন্নত লোকে চলিয়া যায় এবং দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইলে অধোগতির দ্বারা পুনরায় এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করে।

দক্ষিণায়নকে শাস্ত্রকারেরা যে কেন পিতৃদিবস বা পিতৃকাল আখ্যা দিলেন, এক্ষণে আমরা তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমরা পূর্ব্ববারে দেখাইয়া আসিয়াছি যে পিতৃলোক শব্দের এক অর্থ যেমন শ্মশানলোক সেইরূপ আরেক অর্থ অন্নপতি বা পালক। পিতৃকালও সেইরূপ যেমন একদিকে শ্মশান কাল বা মৃত কাল তেমনি অন্যদিকে অন্নপালনের কাল। প্রথমে দেখা যাউক বৎসরের পিতৃপক্ষ অর্থাৎ দক্ষিণায়নের ছয়মাস শ্মশান কাল কি হিসাবে। সূর্য্যদেবের দক্ষিণে যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী শুষ্ক শ্মশানে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। সূর্য্যের দক্ষিণায়নে অবস্থান কালে শীতকালের অবসান ভাব আসিয়া পৃথিবীকে মৃতপ্রায় করিয়া তুলে। শীতের প্রভাবে পৃথিবী প্রাণহীন শ্মশানে পরিণত হয়। বৃক্ষলতা, পশু-পক্ষী সকলই মৃতবৎ হইয়া পড়ে। বৃক্ষ প্রভৃতি উদ্ভিদেরা পুষ্প পল্লব-বিহীন হইয়া শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় অবস্থান করে। জীবজন্তুরা মৃতপ্রায় হইয়া গর্ত্ত মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। অনেক প্রাণীই এই কালে অচেতন অবস্থায় অনাহারে জীবন অতিবাহিত করে। এককথায় দক্ষিণায়নের কাল প্রাণহীনতার কাল বা মৃত কাল, যে জন্য ঋষিরা ইহাকে পিতৃদিবস অর্থাৎ বৎসরের পিতৃপক্ষ নাম দিয়াছেন।

২। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকটিতেও গীতাকার একই কথা বলিয়াছেন, যথা—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণ পক্ষ ও দক্ষিণায়ণ এতদুপলক্ষিত পথে গমনশীল যোগী অর্থাৎ এক কথায় কৃষ্ণগতি প্রাপ্ত যোগী চান্দ্রমস জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া সংসারে পুনরাগমন করেন।

দক্ষিণায়ন মারীমরকের কাল বলিয়াও পিতৃকাল বা শ্মশান কাল। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই তিন মাস অতি ভীষণ কাল। সকল দেশে এবং সকল যুগেই লোকে এই মাসত্রয়ের ভীষণত্ব অনুভব করিয়া আসিয়াছে। এই কারণে এই সময়ে "যমের দুয়ার খোলা" বলিয়া আমাদের দেশে প্রসিদ্ধি আছে। কার্ত্তিক মাসে ভাই ফোঁটায় "যমের দুয়ারে পড়ুক কাঁটা" বলিয়া যে কোমলহৃদয়া ভগ্নীরা ভ্রাতার দীর্ঘায়ু কামনা করেন, তাহাতেই অনেকটা সূচিত হইতেছে যে শরৎকাল বড়ই মারাত্মক কাল। "জীবামি শরদঃ শতং" প্রভৃতি বৈদিক মন্ত্রোক্ত প্রার্থনার অনেকে ব্যাখ্যা করেন যে বৈদিক কালে শরৎকাল হইতে বৎসর গণনা হইত বলিয়াই "শত বৎসরের স্থলে "শত শরত" উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কারণ উহা নয়। শরত কাল ভীষণ মারাত্মক কাল বলিয়াই এইরূপ প্রার্থনা। শরতকাল রূপ বৎসরের ফাঁড়াটা (Critical time) উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই বৎসরটা নিরাপদে যাপন করা সম্ভব, এই কারণেই বৈদিক মন্ত্রের অনেকস্থলে "বৎসরের" স্থানে "শরত" শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

শরতকালে যে হিন্দুরা পূজা অর্চ্চনার এত ঘটা করিয়াছেন, তাহার কারণ যাহাতে লোকের মন ধর্ম্মের দিকে গিয়া ঈশ্বর বা দেবতার কৃপায় মারী প্রভৃতি নানা বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। এক্ষণে যেমন আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা আছে, বৈদিক কালে সেইরূপ "আশ্বযুজী কর্ম্ম" ছিল। এক্ষণে দুর্গাপূজায় সমস্তই যেমন শিব লইয়া ব্যাপার, সেইরূপ বৈদিক কালে রুদ্র শিবের স্থান অধিকার করিয়া ছিল।

"আশ্বযুজ্যাং পৌর্ণমাস্যাং পৃষাতকে পায়সশ্চরু রৌদ্রঃ "(গোভিল)

"আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় পৃষাতক অর্থাৎ ঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধ সম্পাদন পূর্ব্বক রুদ্রদেবতাকে তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে পায়স চরু পাক করিয়া হোম করিবে।" ইহাতে স্পষ্টই অনুমান হইতেছে যে আধুনিক দুর্গাপূজা বৈদিক রুদ্রপূজারই নবসংস্করণ মাত্র। কার্ত্তিক মাসে হিন্দুরা যে মুণ্ডমালিনী কালীর পূজা করেন তাহাও রূপকচ্ছলে মারীমরকের কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেছে। কালী অর্থাৎ স্ত্রী মূর্ত্তিধারী কাল বা অন্তক নরমুণ্ডের মালা পরিয়া যেন শ্মশানে উন্মাদ নৃত্য করিতেছে। এক্ষণে

পাঠক বুঝিতে পারিলেন যে শরত ও হেমন্ত মারী মরকের কাল বলিয়া এবং শীতকাল মৃতকাল বলিয়া, শাস্ত্রকারেরা দক্ষিণায়নের ছয়মাসকে শ্মশান-কাল হিসারে পিতৃকাল বা পিতৃগণের দিবস নামে অভিহিত করিয়াছেন।

হিন্দুরা কেবল যে নামে দক্ষিণায়নকে মৃতকাল বা পিতৃকাল বলিয়াছেন, তাহা নয়, তাঁহারা মৃতকালকে মৃতব্যক্তির চক্ষে দেখিয়াছেন। কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে যেমন অশৌচ হিসাবে হিন্দুগৃহে পুরাতন হাঁড়ি কুঁড়ি ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং বিদেশযাত্রা ও পারিবারিক ক্রিয়া কর্ম্ম স্থগিত থাকে, সেইরূপ মৃতকালের প্রারম্ভে ভাদ্র মাসে যখন সূর্য্যদেব প্রথম যমের দক্ষিণদ্বারে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন, সেই কালে হিন্দু-গৃহে পুরাতন হাঁড়ি কুঁড়ি প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া নূতন আয়োজনের বন্দোবস্ত করা হয় এবং বিদেশ যাত্রা ও পারিবারিক ক্রিয়া কর্ম্ম সকলি রহিত থাকে। শরতের মারীমরকের কালে হিন্দুরা যে পুরাতন হাঁড়ি কুঁড়ি ও পুরাণ বসন প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া নববস্ত্র পরিধান করে তাহার বিশেষ উপকারিতা আছে। মরকের কালে গৃহের পুরাতন জঞ্জাল ফেলিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে ততই মঙ্গল। আজকাল মহামারীর কালে য়ুরোপীয়েরা স্বাস্থ্যের জন্য যে সকল নিয়ম আইনের বলে প্রচলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, প্রাচীন কালে হিন্দুরা কর্ত্তব্য বা ধর্ম্মের নামে সেই সকল নিয়ম এমনি বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন যে তাহা আজও সকলে অক্লেশে পালন করিতেছে।

এইস্থলে একটী কথা বোধ করি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "ভাদ্রমাসে অযাত্রা" অর্থাৎ বিদেশযাত্রা নিষিদ্ধ এই কথাটীর পশ্চাতে একটী পৌরাণিক আখ্যানও আছে। মহামুনি অগস্ত্য এই কালে যাত্রা করিয়া স্বদেশে আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। অগস্ত্য ঋষির আখ্যান হইতে আমরা নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক আভাস প্রাপ্ত হই। খুব সম্ভবতঃ মহামুনি অগস্ত্য দক্ষিণসমুদ্রে যাত্রা করিয়া, মধ্যপথে জলমগ্ন হইয়া সমুদ্র-জল পান করিয়াছিলেন—ইহাই কবির রূপকোক্তিতে দাঁড়াইয়াছে যে অগস্ত্য সমুদ্র পান করিয়াছিলেন। জলমগ্ন অগস্ত্য ঋষির নাম চিরস্মরণীয় করি-বার জন্যই দক্ষিণায়নগামী ভাদ্রমাসের নক্ষত্রের নাম হিন্দুরা অগস্ত্য রাখিয়া-

ছেন। অগস্ত্য ঋষি জলমগ্ন হইবার কালে সমুদ্রজল পান করিয়াছিলেন আর আগস্ত্য মাস বা ভাদ্রমাস 'কাঠফাটা' রৌদ্রে সমুদ্রপান অর্থাৎ সমুদ্র-জল শোষণ করে। শরতের নবাগমে একেত ভীষণ ব্যাধি প্রভৃতির জন্য ভাদ্রমাসে যাত্রা শুভ নয় বলিয়াই লোকের বিশ্বাস ছিল, ইহার উপর আবার অগস্ত্যের দুর্ঘটনা এবিষয়ে আরো সহায়তা করিয়াছে। 'ভাদ্রমাসে অযাত্রা' এ বিশ্বাস লোকের মনে আরো দৃঢ়মূল করিয়াছে। আরেকটী বিস্ময়কর বিষয় এই যে আমাদিগের আগস্ত্য মাস যে সময়ে, য়ুরোপীয়দিগেরও অগষ্ট (August) মাস সেই একই সময়ে। অগষ্ট (August) নাম সংস্কৃত অগস্ত্য নাম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ আমরা দেখি যে ইংরাজী 'অগষ্ট' শব্দের অর্থই ভদ্র (Impressing reverence)। আমাদেরও ভাদ্রমাসের 'ভাদ্র' নাম 'ভদ্র' শব্দ হইতে উদ্ভূত। আমাদিগের মনে হয় অগস্ত্য ঋষির আখ্যানের প্রভাব য়ুরোপেও পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।৩

এই অগষ্ট মাসের শরদাকাশে এক তারকার আবির্ভাব হয় যাহাকে ইংরাজেরা কুক্কুর তারকা (Dogstar) নামে অভিহিত করেন। রোমীয়েরা ইহাকে canicula (canis = শুনক) বলিত। এই কুক্কুর তারকার জন্যই অগষ্ট মাসের দিনকে ইংরাজেরা Dog days of August, বলিয়া থাকেন। দিনান্তে ও নিশান্তে দুইবার এই তারকা দেখা দেয়। বেদে যে দুই কুক্কুরকে যমের প্রহরী বলা হইয়াছে, তাহারা এই কুক্কুরতারকা ভিন্ন আর কেহই নহে। সূর্য্যদেব যমালয় দক্ষিণে প্রবেশ করিবার দ্বারে অর্থাৎ শরতের প্রারম্ভে এই তারকার আবির্ভাব হয় বলিয়া ঋগ্বেদে যমের প্রহরীরূপে সারমেয়দ্বয় উক্ত হইয়াছে। গ্রীসীয় যমদেব প্লুটোরও এক তিন মুখো কুক্কুর প্রহরী আছে। কুক্কুরগ্রহ দিনান্তে ও নিশান্তে দুইবার আবির্ভাব হয়, সেই কারণে সারমেয় দ্বয়ের কথা বেদে দেখা যায়। ঋগ্বেদে এই সারমেয় দ্বয়ের বিষয় বর্ণিত আছে—

সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ

৩। সম্রাট অগষ্টসের নাম হইতে 'অগষ্ট' নাম আসা সম্ভব অনেকে এই মত পোষণ করেন; আমাদিগের কিন্তু তাহা প্রকৃত কারণ বলিয়া মনে হয় না।

'এই দুই কুক্কুর সরমার অপত্য, চারি চক্ষুবিশিষ্ট ও বিচিত্রবর্ণ'। ১

আবার অন্যত্র "যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ, পথিরক্ষৌ নৃচক্ষসৌ।" ২

"হে যম তোমার প্রহরীস্বরূপ যে দুই কুক্কুর আছে যাহাদিগের চারি চক্ষু, যাহারা পথরক্ষাকারী ও মনুষ্যের অনুসন্ধানকারী অর্থাৎ যাহারা মনুষ্যদিগকে যমপথের পথিক করিবার জন্য সর্ব্বদা অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।"

এই যমের প্রহরী কুক্কুর দ্বয়ের জননী সরমার পরিচয় এইবারে দিব। কুক্কুরী সরমা শরৎকালের নামান্তর মাত্র। রমণীয় কাল বলিয়াই শরৎকালের সরমা (স+রমা) নাম। শরতে কুক্কুরগ্রহের আবির্ভাব হয় বলিয়া উহারা সরমার বা শরতের পুত্র সারমেয়রূপে উক্ত হইয়াছে। শরতকাল একদিকে যেমন রমণীয় কাল অন্যদিকে সেইরূপ কুক্কুরীর ন্যায় হিংস্রস্বভাবও বটে। মহাভারতে স্পষ্টই সরমাকে নরখাদক বলা হইয়াছে, "হে জনাধিপ সরমা নাম্নী যে দেবী কুক্কুরগণের জননী তিনিও সর্ব্বদা মানুষীদিগের গর্ভ সমস্ত গ্রহণ করেন।" ৩ মারীমড়কের কাল বলিয়া সরমা বা শরৎকাল নরখাদক কুক্কুরী। এই সারমেয়দ্বয় ক্রমে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে বালগ্রহে পরিণত হইয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ কারণও আছে। শরৎ কালের ব্যাধি ও রোগের ভীষণ প্রভাব শিশু ও কুমারদিগের উপরই বিশেষ উপদ্রব বিস্তার করে। কার্ত্তিকমাসে যে হিন্দুরা কার্ত্তিক পূজা করিয়া থাকেন তাহা কুমারগ্রহ পূজা; কুমারগ্রহ হইতেই কার্ত্তিকের আরেক নাম কুমার হইয়াছে। মহাভারতে লিখিত আছে "স্কন্দসম্ভূত যে সমস্ত কুমার ও কুমারীগণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারাও সকলে সুমহাগ্রহ ও গর্ভভোজী"। ৪ মহাভারতে অন্যত্র কার্ত্তিক মাতৃকাগণকে কিরূপ ভয়ানক নরখাদক হইতে উপদেশ দিতেছেন দেখুন—"মনুষ্যদিগের প্রজাগণ পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া যে পর্য্যন্ত তরুণ বয়স্ক না হইবে সে পর্য্যন্ত আপনারা বিভিন্ন প্রকার

১। ঋগ্বেদের ৭অঃ ১০ম ১৪ সূক্ত দেখ।

২। ঋগ্বেদের ৭অ, ১০ম ১৪ সূক্ত দেখ

৩ মহাভারত বনপর্ব্ব একোনত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়, বর্দ্ধমান সংস্করণ দেখ।

৪ মহাভারত বনপর্ব্ব।

রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে প্রবাধিত করিতে থাকুন। ১ স্কন্দ ঠাকুরের এই উপদেশ হইতেই বুঝা যাইতেছে না কি যে স্কন্দ সুকুমার বালকদিগকে গ্রাস করিতে পারিলে আর ছাড়েন না। স্কন্দ অর্থাৎ কার্ত্তিক পূজা করিলে অনেক অজ্ঞানী হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে সুপুত্রলাভ হয়, তাহা কতদূর সত্য তাহা পাঠক দেখিতে পাইলেন। স্কন্দ পুত্রদান করা দূরে থাকুক জীবিত পুত্রকে ভক্ষণ করিতে পারিলে ছাড়েন না। তবুও হিন্দুরা কার্ত্তিক পূজা করেন কেন? সে কেবল নরখাদক স্কন্দের ভয়ে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য হিন্দুরা যে ভক্ষক তাহাকেই রক্ষক বলিয়া পূজা করে। এই কারণেই আমরা দেখি শনিগ্রহ অনিষ্ট আচরণ করিলে হিন্দু আচার্য্য শনি-গ্রহেরই স্তবস্তুতি করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। যেমন কোন ব্যক্তি আঘাত করিতে উদ্যত হইলে আমরা ভীত চিত্তে তাহারি নিকটে কৃপার ভিখারী হইয়া বলিতে থাকি "রক্ষা কর মারিও না" ইহাও কতকটা সেইরূপ বটে। কিন্তু ভেক ভক্ষক সর্পের নিকট ভীত চিত্ত ভেকের "তুমিই রক্ষক" বলিয়া কাতর প্রার্থনায় ফল কি? ভেকের সর্পস্তুতি শুনিয়া সর্প কিছু আর ভেককে ছাড়িয়া দিবে না।

এই গর্ভভোজী বালগ্রহ সমূহ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বৈদিক মন্ত্রও আছে। এই মন্ত্র বালগ্রহ বা বালোপদ্রব শান্তির জন্য পাঠ করিতে হয়। এই শান্তিমন্ত্রেও সেই যমপ্রহরী কুকুরের কথা না থাকিয়া যায় নাই। পারস্কর ঋষি বলিতেছেন "যদি কুমারমুপদ্রবেজ্জালেনাচ্ছাদ্যোত্তরীয়েণ বা পিতাঙ্ক-মাধায় জপতি কুর্কুর ইত্যাদি।" অর্থাৎ যদি বালককে বালগ্রহ উপদ্রব করে তাহা হইলে উত্তরীয়ের দ্বারা বালকের শরীর আচ্ছাদন করিয়া বালককে ক্রোড়ে রাখিয়া পিতা নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিবেন। মন্ত্রটীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

ওঁ কুর্কুরঃ সুকুর্কুরঃ কুর্কুরো বালবন্ধনশ্চেচ্ছুনক সৃজ নমস্তেস্তু।" কুর্কুর, সুকুর্কুর, কুর্কুর, এই গ্রহদিগের মধ্যে যে কেহ বালগ্রহরূপে বালককে পীড়া দিতেছে তাহাকে নমস্কার। সেই কুকুর বালককে ত্যাগ করিয়া যাউক।

১ মহাভারত বনপর্ব্ব।

উপরোক্ত মন্ত্রটীতেও বালগ্রহের মাতা সরমা উক্ত হইয়াছে,—"যস্ত্রে সরমা মাতা" ইত্যাদি।

কেবল আমাদের দেশে নয়, চীন দেশেও বালগ্রহ কুক্কুরের ভীতি বিশেষ-রূপে বিদ্যমান দেখা যায়। আমরা বালগ্রহ কুক্কুর শীকারের ছবিটী একটী চীন দেশীয় ইতিবৃত্ত হইতে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। কোন মন্ত্রজ্ঞ চীন-বাসী বালগ্রহ কুক্কুরকে লক্ষ্য করিয়া আকাশে তীর ছুড়িতেছে—

আমরা এতক্ষণ দেখাইয়া আসিলাম যে দক্ষিণায়নকাল মারীমড়কের কাল এবং অব-সান বা মৃতকাল বলিয়াই ইহা পিতৃগণের দিবস অর্থাৎ বৎসরের কৃষ্ণপক্ষ বা পিতৃ-পক্ষ। এক্ষণে দেখাইব অন্ন পালনের কাল হিসাবেও দক্ষিণায়ন পিতৃকাল। দক্ষি-ণায়নের সহিত দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারের ঘনিষ্ট যোগ।

জনকো জন্মদানত্বাৎ
পালনাচ্চ পিতাস্মৃতঃ।
গরীয়ান্ জন্মদাতুশ্চ
সোন্নদাতা পিতা মুনে॥

জন্মদাতা যিনি তিনিও পিতা অন্নদাতা বা পালক যিনি তিনিও পিতা, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে যিনি অন্নদাতা তিনিই শ্রেষ্ঠ পিতা।" দক্ষিণায়ন এই হিসাবে অন্নপালনের কাল বলিয়া শ্রেষ্ঠ পিতৃকাল। সূর্য্যদেবের দক্ষিণে যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ধান্যাদি ফলপাকনিষ্ঠ ওষধিকুল ফলপ্রসূ হয়। ধান্য, গোধূম ছোলা, মটর প্রভৃতি নানাবিধ ওষধি ও নানাবিধ শাকশবজী এই সময়ে উৎপন্ন হয় এবং দক্ষিণায়নের তিরোধানের সঙ্গে তাহারাও চলিয়া যায়।

প্রকৃতিদেবী দক্ষিণায়নে বাস্তবিকই দক্ষিণ হস্ত উন্মুক্ত করিয়া দিয়া মানবের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটার বড়ই সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এই ভারতের চব্বিশ কোটী লোকের মধ্যে উত্তরায়ণ কালপ্রসূত আম্র প্রভৃতি ফলের দ্বারা কয়টা লোকেরই বা জীবন ধারণ হয়? কিন্তু ধান্য, গোধূম ইত্যাদি দক্ষিণায়ন কালের উৎপন্ন দ্রব্য সমূহই সকলের প্রাণ ধারণের কারণ। আমরা একদিন অন্ন না পাইলে কাতর হইয়া পড়ি, কিন্তু বারমাস আম্র প্রভৃতি ফল না খাইয়াও থাকা যায়। দক্ষিণায়নগামী শরতের সঙ্গে অন্নের এতটা ঘনিষ্ঠতা যে, বৈদিক ঋষিরা পিতৃউদ্দিষ্ট স্বধা নামেই শরতের নামকরণ না করিয়া যাইতে পারেন নাই। যজুর্ব্বেদোক্ত ষড়ঋতু দৈবতমন্ত্রে স্বধা নামেই শরতের আবাহন করা হইয়াছে। "স্বধায়ৈ বঃ নমঃ" টীকাকার এস্থলে স্পষ্টই লিখিয়াছেন "স্বধাবৈ শরৎ"। স্বধা, দক্ষিণদিক, শরত এই তিনটী যেন একপ্রাণ। স্বধার এক অর্থ শরৎকাল তাহাও দক্ষিণায়ন কাল। স্বধার প্রধান অর্থ পিতৃ-উদ্দিষ্ট অন্ন, তাহা দক্ষিণদিকেই উৎসর্গ করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণদিক ভিন্ন স্বধার গতি নাই। এই কারণে, দক্ষিণ দিকের সহিত স্বধার ঘনিষ্ঠযোগ বলিয়াই, আমাদিগের বিশ্বাস ইংরাজী সাউদ (South) প্রভৃতি দক্ষিণ বাচক য়ুরোপীয় শব্দগুলি স্বধাশব্দপ্রসূত।[১] কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা (South) শব্দের মূল সংস্কৃত 'স্বেদ' শব্দে নিহিত মনে করেন। কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক।

শরতের দুর্গাপূজা প্রভৃতি তান্ত্রিক পূজায় যে দেবীদিগের এত প্রাচুর্য্য তাহার অন্যতম কারণ অন্নবিতরণে প্রধানতঃ দেবীরাই সিদ্ধহস্ত। দক্ষিণায়-নোৎপন্ন অন্নাদিদ্বারা জগতের লোক পালিত হয় বলিয়া, দক্ষিণায়ন প্রাণধারণের কাল বলিয়া, অন্নপতি বা পালক হিসাবেও পিতৃদিবস বা পিতৃকাল নামের যোগ্য।

ফলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, প্রত্যেক দিন যেমন দিবা ও রাত্রিতে, প্রত্যেক মাস যেমন শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে বিভক্ত, সেইরূপ প্রত্যেক বৎসরও উত্তরায়ণরূপ দিবাভাগে ও দক্ষিণায়নরূপ রাত্রিভাগে বিভক্ত। উত্তরায়ণ বৎসরের দিবাভাগ, দক্ষিণায়ন রাত্রিভাগ। উত্তরায়ণ সরসভাগ, দক্ষি-

১ দক্ষিণকে স্যাক্সন ভাষায় Suth, ফরাসী ভাষায় Sud ও জর্ম্মণ ভাষায় Sud বলে।

ণায়ন শুষ্ক ভাগ। উত্তরায়ণ জীবিত ভাগ দক্ষিণায়ন মৃতভাগ। মোটামুটি বৎসরে এই দুই ভাগ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক তান্ত্রিকেরা ইহার উপর আবার কতকগুলি উপবিভাগের সৃষ্টি করিয়াছেন, যেমন দক্ষিণায়নকে তাঁহারা পিতৃপক্ষ, দেবীপক্ষ, প্রভৃতি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রতি বৎসর যেমন দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণে বিভক্ত দেখা গেল সেইরূপ প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ যুগও দিবা ও রাত্রি অথবা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে অর্থাৎ দেবপক্ষ ও পিতৃপক্ষে বিভক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল হইতে যদি ইংরাজ আমলের এই ক্ষুদ্র নবযুগের সূত্রপাত ধরা যায়, তাহা হইলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই যুগের উত্তরায়ণ অর্থাৎ দিবাভাগের বা দেবপক্ষের অবসান হইয়াছে। ভীষণ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূকম্প প্রভৃতি ভয়াবহ নৈসর্গিক দুর্ঘটনা সমূহ যেন দেবদেবের আদেশে দক্ষিণায়ন অর্থাৎ রাত্রিভাগের বা পিতৃপক্ষের আবাহন করিয়া গেল। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতভূমির শ্মশানে পরিণত হইবার আর বিশেষ কিছুই বাকী নাই। গৃহে গৃহে অকাল মৃত্যু, শোকসম্বাদ, অন্নাভাব, অশান্তি ও বিপদ যেন মহাকালের জয়ঘোষণা করিতেছে। পাপের স্রোতে হয়ত বা দেশ প্লাবিত হইয়াছে তাই আমাদের উপর রুদ্রকোপানল পতিত হইয়া দগ্ধ করিতেছে। কে রক্ষা করিবে? আইস এই বিপদে সকলে মিলিয়া যোড়হস্তে প্রার্থনা করি হে ঈশ্বর, "হে ভগবন তোমার ক্রোধ সম্বরণ কর, আমাদিগকে ক্ষমা কর। আমরা দুর্ব্বল অসহায়। হে রুদ্র তোমার যে দক্ষিণ মুখ তাহার দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। বেদ বচনে দেবদেব রুদ্রের স্তব করিয়া আইস সকলে বলি—

"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।" ১

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আগামীবারে পিতৃগণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ছত্রী।

জয়নগর বা জয়পুরের একক্রোশ পূর্ব্বদিকে "গেটোর ঘাটী" ১ নামে এক উপত্যকা আছে। পূর্ব্বে এইস্থানে "নান্দলামীনা" নামক এক পার্ব্বতীয় জাতি বাস করিত। মীনাজাতি জয়পুরের আদিম নিবাসী। "নান্দলা মীনা" মীনা জাতির শাখাবিশেষ। মীনা জাতিরা অত্যন্ত প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী। তাহাদিগের প্রভুভক্তি সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র গল্প শোনা যায়। আমেরের (অম্বরের) শ্যামবাগের জনৈক মীনা রক্ষক ছিল। তাহার পুত্র একদিন একটী ফল পড়িয়া খায়। এই অপরাধে মীনা রক্ষকটী আপনিই তাহার শিরশ্ছেদন করে। এই অসাধারণ প্রভুভক্তি দেখিয়া মহাসন্তুষ্ট হইয়া অম্বরেশ্বর (জয়পুর নগর তখন নির্ম্মিত হয় নাই) তাহাকে দ্বাদশগ্রাম দান করেন এবং খাজনা ও ধনশালার তত্ত্বাবধারণ কার্য্যের ভার দেন। অদ্যাপিও তৎবংশীয় মীনারা রাজকোষের রক্ষক। মহারাজ জগৎ সিংহজী "জয়মন্দিরের" ধন অন্যথা ব্যবহার করাতে অনেক মীনা রক্ষক মনোদুঃখে আত্মহত্যা করিয়াছিল।

ধুঁঢাড় রাজ্য স্থাপয়িতা রঘুপরাক্রমী মহারাজ ধূলেরায়জীর পুত্র কাকিলজী (সম্বৎ ১০১৩—১০৯৬) স্বীয় বাহুবলে 'গেটোর ঘাটী' স্বরাজ্য ভুক্ত করেন। কেহ কেহ বলেন কাকিলজীর এক পুত্র মেদলজী কর্ত্তৃক 'গেটোর ঘাটী' অধিকৃত হয়। কিন্তু বংশাবলী দেখিলে এরূপ প্রতীত হয় যে, মেদলজী কাকিলজীর পুত্র নহে, নামান্তর মাত্র।

ধুঁঢাড় জয়পুররাজ্যের প্রাচীনতম নাম। ধুঁঢাড় নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র গল্প আছে। বীশিল দেব নামক জনৈক আজমীরের রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রজাপীড়ন করিতেন। তজ্জন্য মরণান্তে রাক্ষস যোনি প্রাপ্ত হইলেন, "দুন্দুভি রাক্ষস" নামে অভিহিত হইলেন। জয়পুর রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত যোবনের প্রদেশে এক পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতে

---

১ গেটোর শব্দ 'গোত্রাবর' শব্দের অপভ্রংশ। গোত্র—পর্ব্বত; অবর—পশ্চাদ্বর্ত্তী ভূমি নিম্নভূমি।

একটী বৃহদাকার গুহা আছে। তিনি এই গুহায় বাস করিয়া পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ তিনি তাঁহার পূর্ব্বজন্মের পরিচিত প্রজাদি-গকে ধরিয়া ধরিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহার পৌত্র প্রজাদিগের উৎপীড়ন দেখিতে না পারিয়া তাঁহার নিকট নিজ দেহ উৎসর্গ করিতে গেলেন। তাঁহার রাক্ষস পিতামহ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি নিজ পৌত্রকে ভক্ষণ করিলেন না। সেই. দিন হইতেই তিনি তাঁহার দুষ্কৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যমুনার জলে অন্তর্হিত হইলেন। এই দুন্দুভি রাক্ষসের নাম হইতে পর্ব্বতটী "ধূণ্ড"নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

কুশের বংশধরেরা প্রথমে অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। পরে কুশবংশীয় রাজাগণ শোননদীতীরস্থ "রোহতাস" প্রদেশ এবং তৎপরে গয়ালীয়রে রাজ্য স্থাপন করেন। খৃঃ ১১২৮ অব্দে সোড়দেবজীর পুত্র তেজকর্ণ বা ধূলেরায়জী গয়ালীয়র রাজ্য তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্রের হস্তে অর্পণ করিয়া জয়পুর্ রাজ্যের অন্তর্গত ঘোসা প্রদেশের রাজা রণমলের দুহিতা মেরুলীর পাণি-গ্রহণ করিতে গেলেন। বিবাহান্তে তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র তাঁহাকে গয়ালীয়রে প্রবেশ করিতে দিলেন না। অনন্যোপায় হইয়া তিনি প্রথমে "ধূণ্ড' পর্ব্বতের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি মীনা জাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া অধিকার করিলেন। তাঁহার নবস্থাপিত রাজ্য 'ধূণ্ড' পর্ব্বতের নামে ধুঁঢাড় আখ্যা প্রাপ্ত হইল।

'গেটোর" "নাহাড়" গিরির পাদতলে অবস্থিত। নাহাড় গিরি অর্ব্বুদ গিরির শাখা বিশেষ। 'নাহাড়' শব্দ যাবনিক। 'নাহাড়' অর্থ ব্যাঘ্র। পূর্ব্বে এই পর্ব্বত ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। কেহ কেহ বলেন এখানে শীকারের জন্য প্রথম ব্যাঘ্র ছাড়া হইয়াছিল। উপত্যকাটী যুগপৎ শান্তি ও রুদ্রভাবের উদ্রেক করে। উপরে পাহাড় নীচে শ্মশান। মহা আশা ও তৎ পরিণাম মৃত্যুর একত্র মিলন।

"উদ্যম ফুরায়ে যায় ভাঙ্গে আশা, ঘুচে সুখ।
প্রভাত অধরে হাসি সন্ধ্যার মলিনমুখ।"

"গেটোর" কছবাহ' রাজাদিগের সমাধিভূমি।

ভ্রাজন্তে নাহরগড় নগোপত্যকাভোগভাগে।
গর্ত্তাবর্ত্তে নৃপতিকরিণাং যে সমাধিপ্রদেশাঃ।

তৈরুত্তুঙ্গস্থল কলনয়াস্ত্য প্রমীতাভিসংস্থা।
নিম্নোদ্দেশপ্রকটঘটনাস্তীতি সংসূচ্যতে হো॥

'কছবাহ' রাজাগণ লবানুজ কুশ হইতে উৎপন্ন। প্রাকৃত ভাষায় কৌশব শব্দ 'কছবাহ' শব্দে পরিণত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন 'কছবাহ' শব্দ 'কৎসবাদ' নামের অপভ্রংশ। 'কৎসবাদ' কুশের অনেক পরবর্ত্তী রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কূর্ম্ম ছিল, তজ্জন্য কছবাহগণ 'কূর্ম্ম' বা কূর্ম্মাজী নামেও আপনাদিগকেও পরিচয় দেন। গেটোরে অনেক শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত সমাধিছত্রী আছে, তজ্জন্য সাধারণ লোকেরা এই স্থানটীকে 'ছত্রী' বলে। 'ছত্রী' বা সমাধিভূমির প্রবেশ পথের সম্মুখেই মহারাজ 'সবাই' জয়সিংহজীর ছত্রী। ইনিই খৃঃ ১৭২৮ অব্দে বিদ্যাধর নামক অনৈক পূর্ব্ববঙ্গবাসীর সাহায্যে স্বনাম খ্যাত নগর স্থাপন করেন। *

"জয়সিংহপুরী জয়পুর চারুদেশ
যার শোভা মনোলোভা বৈকুণ্ঠ বিশেষ!"

মহারাজ জয়সিংহজী দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বাদসাহ অরঙ্গজীবের যুদ্ধে সুযশ লাভ করিয়া "সবাই" উপাধি পাইয়াছিলেন। "গদী বৈঠনে কে সময় জয়সিংহ কি অবস্থা কেবল গ্যারহ বর্ষ কী থী. দক্ষিণকী লড়াইয়োঁ মেঁ ঔরঙ্গজেব কে সাথ রহ কর অচ্ছা নাম পায়া জিস সে সবাই কী পদবী মিলে।" (ইতিহাস রাজস্থান)। এখানে এরূপ প্রবাদও প্রচলিত আছে যে, একদা কুমারাবস্থায় জয়সিংহজী দিল্লীর প্রাসাদে গিয়াছিলেন। বাদশাহ তাঁহার দুই হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "কুমারজী, এখন তুমি কি করিবে? তোমার হস্ত বন্ধন করিলাম। তিনি কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বাল স্বভাব বশতঃ হাসিতে

---

* Sawai Jeysingh was the founder of the newcapital named after him Jeypur or Jeynugger, which became the seat of science and art, and eclipsed the more ancient Amber. Jeypur is the only city in India built upon a regular plan with streets bisecting each other at right angles. The merit of the design and execution is assigned to Vidyadhore a native of Bengal one of the most eminent coadjutors of the prince in all his scientific pursuits both astronomical and historical. Lieut. col. James. Todd.

লাগিলেন। বাদসাহ তাঁহাকে কহিলেন "কুমারজী তুমি ভয় করিতেছ না, হাসিতেছ? "কুমারজী উত্তর করিলেন—জাঁহাপনা হস্ত বন্ধনে কিসের ভয়? বিবাহকালে বর ও কন্যার এইরূপ হস্ত বন্ধন করা হয়। অতএব হস্ত বন্ধন সৌহৃদ্যের সূত্রপাতের লক্ষণ, ভয়ের কারণ নহে। বিবাহকালে বর কন্যার এক হাত ধারণ করিয়া তাহার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করে, আপনি আমার দুই হস্ত ধারণ করিয়াছেন অতএব আপনি আমার তদধিক যাবজ্জীবনের ভার গ্রহণ করিলেন।" বাদশাহ তাঁহার এই বিজ্ঞোচিত প্রত্যুত্তরে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"কুমারজী, তুমি বুদ্ধিতে অন্য সকল রাজা অপেক্ষা 'সওয়া' অর্থাৎ এক ও চতুর্থাংশ পরিমাণ শ্রেষ্ঠ। অতএব আজ হইতে তোমার 'সবাই' (সওয়াই) উপাধি হইল।

মহারাজ সবাই জয়সিংহ জগৎবিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন। জয়পুর, দিল্লী, মথুরা, উজ্জেন ও কাশীতে তাঁহার গ্রহবেধশালা বা মানমন্দির[১] অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। সবাই জয়সিংহ অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি কাশী মথুরা প্রভৃতি হিন্দুতীর্থস্থান সকল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ও সর্ব্বত্র স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছেন। কাশী ও মথুরায় তাঁহার যন্ত্রগৃহ ইহার প্রমাণ দিতেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্যস্থানেও জয়পুর নামক অনেক গ্রাম আছে। এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয় যে ভূমির উপর নির্ম্মিত উহা জয়পুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পেশোয়ারেও জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত জয়পুর নামক এক গ্রাম আছে। জয়সিংহজী নিয়ামত খাঁকে পরাস্ত করিয়া বাদশাহ অরঙ্গজীব কর্ত্তৃক উজ্জেন দেশের 'সুবাদার' নিযুক্ত হন; সুতরাং উজ্জেনেও তাঁহার কীর্ত্তিচিহ্ন (যন্ত্রগ্রহ বা মানমন্দির) বিদ্যমান আছে। তিনি নানাপ্রকার জ্যোতিষযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, তদানিন্তন প্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতির্ব্বেত্তা দে লা হায়র (De la Hire) এর জ্যোতিষ গণনার ভুল সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বাদশাহের আদেশানুসারে তৎকালীন ভ্রমপূর্ণ পঞ্জিকাও বিশুদ্ধ করিয়াছিলেন। কাশী ও জয়পুরের মানমন্দির বা তারাগ্রহ একই সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। কাশীর মানমিন্দির জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু জয়পুরের মানমন্দির সম্বন্ধে অল্প লোকেই জ্ঞাত। ইহার কারণ পূর্ব্ব-

১ মানমন্দিরকে জয়পুরে 'যন্ত্রগৃহ', মানমণ্ডল ও তারাকোটীও বলিয়া থাকে।

লিখিত মানমন্দির আর্য্যদিগের মহাতীর্থস্থান ও জগতের প্রাচীনতম নগরে অবস্থিত। যখন রোম নগর ও রোমান নামের অস্তিত্ব ছিলনা তখনও কাশী সমৃদ্ধিশালী ছিল। জয়পুর আধুনিক নগরী। জয়সিংহ্জী যে সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন নিম্নে তাহার কয়েকটীর মাত্র নামোল্লেখ করা গেল * এই সকল যন্ত্রের দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহাদির দূরতা এবং বৃক্ষ পর্ব্বতাদির উচ্চতা নিরূপিত হইত। এতদ্ভিন্ন চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের কাল, দিনক্ষণ ও দিক নির্ণয় প্রভৃতি জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় নানা বিষয় নিরূপিত হইত। জয়পুরের মানমন্দির প্রাসাদভূমির অভ্যন্তরে অবস্থিত। এক্ষণে ইহা চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ও অট্টালিকা সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মহারাজ জয়সিংহজীর রাজত্ব কালে এসকল ছিলনা।

(১) যন্ত্র সম্রাট—ইহা একটী পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম সূর্য্য ঘড়ী। ইহার কীলকের (Gnomon) উচ্চতা প্রায় ত্রিশ গজ।

(২) ভিত্তি যন্ত্র—ইহার দ্বারা সূর্য্যের উচ্চতা, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের নতভাগ, ক্রান্তি মণ্ডলের বক্রতা প্রভৃতি নানা বিষয় নির্ণয় করা যায়।

(৩) রাশিবলয়—ইহার দ্বারা বৎসরের যে কোন সময়ে হউক না কেন মধ্যাহ্নক্ষণ ঠিক জানা যায়।

(৪) যন্ত্র জয় প্রকাশ

(৫) ভিত্তিগোলনাড়িযন্ত্র—ইহার দ্বারা সূর্য্যের উত্তর গোলে এবং দক্ষিণ গোলে অবস্থান এবং সূর্য্যের অবপাত (Declination) নির্ণিত হয়। ইহা দ্বারা তারকা সম্বন্ধীয় ঐ সকল বিষয়ও নিরূপিত হয়।

(৬) যন্ত্ররাজ—ইহা দ্বারা গ্রহ তারকার অবপাত এবং অন্যান্য অনেক বিষয় নিরূপিত হয়।

(৭) কড়া যন্ত্র বা চক্র যন্ত্র—

(৮) কপাল যন্ত্র

(৯) গোল যন্ত্র—ইহার দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় নিরূপিত হয়।

---

১ এই যন্ত্রগুলির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ যাঁহারা দেখিতে চাহেন, তাঁহারা সর্জ্জন মেজর টী, এচ, হেণ্ডলি মহোদয়ের পুস্তক পাঠ করিবেন।

(১০) নাড়ী বলয়—ক্ষুদ্রাকার সূর্য্যঘড়ী।

(১১) ধ্রুব নল—সুমেরু নির্দ্দেশক যন্ত্র।

(১২) রাম যন্ত্র

(১৩) কৃষ্ণ যন্ত্র

(১৪) দিগংশ যন্ত্র বা সৌর যন্ত্র।

(১৫) অয়ন যন্ত্র

এতদ্ভিন্ন বহনীয় অন্যান্য যন্ত্র আছে যাহা দ্বারা বৃক্ষ অট্টালিকা প্রভৃতির উচ্চতা এবং সূর্য্য; চন্দ্র ও গ্রহ তারকার দূরত্ব পর্য্যন্ত নির্ণয় করা যায়।

'সবাই' জয়সিংহজী তৎকালীন সমগ্র রাজস্থানের নৃপতিগণ অপেক্ষা অধিকতর স্থিরবুদ্ধি, ওজঃসম্পন্ন ও উদারচেতা ছিলেন। তিনি একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি দোষ হয় না। তিনিই প্রথম স্বীয় রাজ্যমধ্যে শিশুবধ (Infanticide) প্রথা রহিত করিয়া দেন। পূর্ব্বে কোন সম্ভ্রান্ত রাজপুতগৃহে বিবাহ হইলে চারণ ও ভাটগণ প্রশংসা পূর্ণ শ্লোক রচনা করিয়া বর ও কন্যা পক্ষের নিকট গাহিয়া অর্থাদি পারিতোষিক লাভ করিত। এইরূপ পারিতোষিককে এখানে 'তিয়াগ' বলে। রাজপুতগণ অত্যন্ত জাত্যভিমানী, সুতরাং নির্ধনী হইলেও তাঁহারা চারণ ও ভাটগণ রচিত অমূলক বংশযশোগীত শ্রবণেচ্ছায় তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। এইরূপে প্রত্যেক রাজপুত বিবাহে অসংখ্য চারণগণকে "তিযাগ" দিতে হয়। সুতরাং নির্ধন রাজপুতগণ 'তিয়াগ' দান করিতে অসমর্থ হইয়া স্বজাতীয়বর্গের মধ্যে ঘৃণার পাত্র হইবার ভয়ে জন্মমাত্রেই সন্তান নাশ করিত। জয়সিংহজী এই নির্দ্দয় প্রথা রহিত করিয়া দেন। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে কোন রাজপুত জয়পুর নগরে আসিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিবেন ভাট ও চারণগণ তাঁহার নিকট 'তিয়াগের' জন্য পীড়াপীড়ি করিতে পারিবেনা। অদ্যাপিও জয়পুর নগরে 'তিয়াগের' উপদ্রব নাই। এই কারণ বশতঃই বোধ হয় জয়পুর বা জয়নগর মধ্যে অসংখ্য বিবাহের উৎসবধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

মহারাজ জয়সিংহজীর রাজত্ব কালে (সম্বৎ ১৭৬৮ অব্দে) সম্ভর ঝিল

বা হ্রদ প্রথম কছবাহদিগের অধিকারভুক্ত হয়। অম্বরেশ্বর জয়সিংহজী, যোধপুররাজ অজিত সিংহজীর পুত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া একতা পাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন। উভয়ে একত্রিত হইয়া আজমীরের সুবেদারকে আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া সম্ভর অধিকার করিলেন। আজমীরস্থিত বাদশাহসেনার অধ্যক্ষ সম্রাটের ক্রোধের পাত্র হইবার ভয়ে রাজদ্বয়ের বিপক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি পরাজিত ও আহত হইলেন এবং তাঁহার সৈনিকগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। রাজাদ্বয় অনায়াসে সম্ভর হ্রদ অধিকার করিলেন। অদ্যাপিও এই হ্রদটী উভয় রাজ্যের অধিকারে আছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে বাদশাহ স্বয়ং আজমীরে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। অতঃপর মাড়বারেশ্বর ও অম্বরেশ্বর দিল্লীতে বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। নানা কথার পর সম্ভর হ্রদের কথা আসিল। মহারাজ জয়সিংহজী গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন "সুবিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আমরা প্রাণপণে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতেছি, কিন্তু শান্তিকালে একটুকু লবণ অভাবে আমাদিগকে আস্বাদ বিহীন খাদ্য খাইতে হই-হইতেছে"। বাদশাহ এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া অজিত ও জয়সিংহজীকে বিধিমত (formally) সম্ভর হ্রদ প্রদান করিলেন। সম্বত ১৯২৭ অব্দে মহারাজ দ্বিতীয় রামসিংহজী কর্তৃক এই সম্ভর হ্রদ বার্ষিক আটলক্ষ টাকায় ইংরাজ সরকারকে পাট্টা দেওয়া হয়।

মহারাজ জয়সিংহজী মহা পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। বংশাবলীতে এরূপ লিখিত আছে যে, তাঁহার রাজত্বকালে যোধপুরাধিপতি মহারাজ অভয়সিংহজী বহুসৈন্য সহ বীকানির রাজ্য বেষ্টন করেন। বীকানির-রাজ জোরাবার সিংহজী মহারাজ 'সবাই' জয়সিংহজীর নিকট নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করিলেন—

'গ্রাহ অভো, বীকানগজ, মারু সমদ অথাহ।
ররঙ্কার রাঠোড়রী সহায়কর জয়শাহ॥'
"অভয় কচ্ছপ এ মরু সাগর মাঝে
ধরেছে সজোরে গর্জ্জি বীকানির গজে,

জয়ছত্রী।

চূর্ণ করি রাঠোড়ের তর্জ্জন গর্জ্জন,
কর মোরে জয়রাজা বিপদ মোচন।" ১

জয়পুররাজ সহায়তা করিলেন। অভয় সিংহজী বীকানির পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

এই জগদ্বিখ্যাত কছবাহরাজ শিরোমণি 'সবাই' জয়সিংহজীর সমাধি-'ছত্রী' বা সমাধি মণ্ডপ অত্যুৎকৃষ্ট দুগ্ধফেননিভ শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত ও সুচারু কারুকার্য্য সমন্বিত হইয়া জয়পুর দুর্গের পাদদেশে গেটোর উপত্যকার বিজন উদ্যানে বিরাজ করিতেছে। জয়ছত্রীর এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র দীপগৃহ আছে। ইহার মধ্যে একটী প্রদীপ দিবা রাত্রি জ্বলে। এই প্রদীপ মহারাজের সমাধিকালে জ্বালিত হইয়াছিল। মহারাজ জয়সিংহজী খৃঃ ১৭৪৪ অব্দে পরলোকগত হন, সুতরাং প্রদীপটী একাধিক্রমে সার্দ্ধ একশত বৎসর জ্বলিতেছে। জয়ছত্রীর দক্ষিণে মহারাজ 'আব্বল' (প্রথম) মাধোসিংহজীর ও বামে মহারাজ প্রতাপসিংহজীর 'ছত্রী।' সর্ব্বমধ্যস্থলে বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ "রাজ রাজেন্দ্র" সবাই দ্বিতীয় মাধোসিংহজীর পিতৃদেব মহারাজ 'সবাই' রাম সিংহজীর ছত্রী বিরাজমান আছে।

আব্বল মাধোসিংহজীর সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। সমগ্র রাজস্থানে জ্যেষ্ঠাধিকার (Primogeniture) চিরন্তন প্রথা। মাধোসিংহজীর সময়ে এই চির প্রথার ব্যতিক্রম ঘটে; রাজনৈতিক বহুবিবাহ তাহার কারণ। সম্বত ১৭৬৬ অব্দে বাদসাহ বাহাদুর শাহের অযথা আচরণে অপ্রীত হইয়া যোধপুরাধিপতি অজিতসিংহজী ও জয়পুররাজ সবাই জয়সিংহজী "উদিপুরে'র মহারাণা অমরসিংহের সহিত পরস্পরের রক্ষা হেতু সন্ধিস্থাপন করিলেন। জয়সিংহজী রাণার দুহিতা ও অজিতসিংহজী রাণার সহোদরার পাণিগ্রহণ করতঃ সন্ধি অধিকতর দৃঢ়ীভূত করিলেন। 'উদিপুর' রাজবংশ নিষ্কলঙ্ক। অন্যান্য রাজবংশ দিল্লীশ্বর আকবরের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়াতে কলঙ্কিত হইয়াছিল। সুতরাং অন্যান্য রাজপুত রাজাগণ উদিপুর বংশে বিবাহ করা মহাগৌরবের চিহ্ন বলিয়া অদ্যাপিও মনে করেন। এই কারণ বশতঃ উদিপুর-ভূপ মহারাণা অমরসিংহজী সন্ধিপত্রে ইহাও স্বীকার

১ এই শ্লোকটীতে পৌরাণিক গজকচ্ছপের যুদ্ধের উপমা দেওয়া হইয়াছে।

করিয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশজাত কোন কুমারীর গর্ভের সন্তান সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও জ্যেষ্ঠাধিকার প্রথা ব্যতিক্রম পূর্ব্বক সিংহাসনের অধিকারী হইবে।

এখানে জয়পুরে এরূপ প্রবাদও আছে যে, প্রকৃতপক্ষে কছবাহবংশজাত কোন রাজকুমারীর দিল্লীশ্বরের সহিত পরিণয় হয় নাই। বাদশাহের চক্ষে ধূলা দিয়া জনৈক দাসীপুত্রীকে রাজদুহিতা বলিয়া বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। প্রবাদটী সম্পূর্ণ অমূলক নহে। প্রথমতঃ যদি দিল্লীশ্বরের সহিত অত্রত্য রাজবংশজাত কোন কুমারীর বিবাহ হইয়া থাকিত, তাহা হইলে কন্যার শ্বশুর বাড়ী ও বাপের বাড়ীতে যাওয়া আসা থাকিত; কিন্তু এইরূপ যাওয়া আসার সম্বন্ধে কোন লিপিবদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ রাজবংশাবলী বা দেশীয় পুস্তকে এইরূপ বিবাহের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ যদি অত্রত্য রাজবংশের কোন রাজকুমারীর দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাহ হইয়া থাকিত তাহা হইলে রাজকুমারীর মাতৃবংশের তালিকায় এ বিবাহের কিছু না কিছু উল্লেখ থাকিত। চতুর্থতঃ কোন্ রাজবংশের রাণীর গর্ভজাত পুত্রীকে মানসিংহের খুড়া জাহাঙ্গীরকে প্রদান করিয়াছিলেন তাহার বিষয় কিছুই জানা যায় না। পঞ্চমতঃ মুসলমান ইতিহাসে এই বিবাহের উল্লেখ আছে, কিন্তু মুসলমান ইতিহাস লেখকদিগের কথা সর্ব্বসময়ে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাঁহাদিগের অনেকে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অনেকসময়ে অমূলক কথার রটনা করিয়া থাকেন। যাহাই হউক এ বিষয় প্রমাণ সাপেক্ষ।

মহারাজ জয়সিংহজীর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার ঈশ্বরীসিংহজী সিংহাসন অধিকার করিলেন। তদীয় কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুমার মাধোসিংহজী উদিপুর মহারাণার দৌহিত্র, সুতরাং তিনি পূর্ব্বোক্ত সন্ধিপত্রানুযায়ী রাজ্যাভিষেকের দাবী করিলেন। উদিপুর তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে কাবুলেশ্বর আহম্মদশাহ আবদালী পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। ঈশ্বরীসিংহজী একদল সৈন্যসহ দিল্লীশ্বর বাদশাহ কর্ত্তৃক তদ্বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। এই অবসরে মাধোসিংহজী মহলররাও হুলকারের সাহায্যে রাজা হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সতলজ নদীর নিকট পৌঁছিবামাত্র ঈশ্বরীসিংহজী এই সমাচার অবগত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাজমহল যুদ্ধে হুলকারকে পরাস্ত ও দূরীকৃত করিলেন।

পুনরায় সম্বৎ ১৮০৭ অব্দে কুমার মাধোসিংহজী রামপুর পরগণা প্রদান করিবার স্বীকার করিয়া হুলকারকে হস্তগত করিলেন। পুনরায় উভয়ে জয়পুর আক্রমণ করিলেন। এবার ঈশ্বরী সিংহজীর প্রধান মন্ত্রী হরগোবিন্দ নাটানী কুমার মাধোসিংহজীর পক্ষাবলম্বন করিলেন। নিরুপায় হইয়া ঈশ্বরী সিংহজী বিষপান পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। মাধোসিংহজী নিরাপদে গদী আরোহণ করিলেন।

ঈশ্বরী সিংহজী এক মুহূর্ত্তও সুখে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। মাধোসিংহজী মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহার্য্যে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবেন এই চিন্তা অবিরত তাঁহার মনে জাগরিত হইতে লাগিল। জয়পুরের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিক পাহাড়ে বেষ্টিত, কেবল দক্ষিণদিকে খোলা সমতলভূমি. এই কারণে দক্ষিণদিক হইতেই শত্রুপক্ষ আসিবার সম্ভাবনা। ঈশ্বরী সিংহজী রাজপ্রাসাদভূমির মধ্যে এক উচ্চ স্তম্ভগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। সাধারণ লোকে ইহাকে "স্বর্গাস্থলি" বা "ঈশ্বরীলাট" বলে। তিনি প্রায় এই স্তম্ভের উপরে উঠিয়া দূরবীক্ষণ দ্বারা শত্রু আসিতেছে কি না দেখিতেন। এই ঘটনাটীকে লোকে এক উপন্যাসে পরিণত করিয়াছে—একটী অমূলক প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রবাদটী এই যে, ঈশ্বরী সিংহজীর মন্ত্রী নাটানীর এক পরমা রূপবতী কন্যা ছিল। তিনি স্তম্ভে উঠিয়া দূরবীক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে দেখিতেন।

এই ভাগ্যহীন ভূপতি ঈশ্বরী সিংহজীর 'ছত্রী', 'দউড়ী' বা রাজপ্রাসাদভূমির অভ্যন্তরে অবস্থিত। অত্রত্য লোকদিগের চক্ষে ছত্রীটী অতি পবিত্র। রাজটীকা হইবার পূর্ব্বে নবরাজকে এই ছত্রী প্রথমে দর্শন করিতে হয়। সাধারণ লোকেরা ছত্রীটীকে একরকম 'তারকেশ্বর' করিয়া তুলিয়াছে। এখানে জনক জননীরা ব্যাধিগ্রস্ত সন্তান সন্ততির আরোগ্য লাভের কামনায় মানত করে ও পূজা দেয়।

মহারাজ 'আব্বল' মাধোসিংহজী সতের বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার

রাজত্বকালে ধুঁঢাড় রাজ্যের শ্রী বর্দ্ধিত হয়। রনথম্ভোরের প্রসিদ্ধ গড় বা দুর্গ বিনাযুদ্ধে তাঁহার হস্তগত হয়। এই ঐতিহাসিক গড় দিল্লীশ্বর বাদশাহের অধিকারে ছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাদিগের উন্নতির মধ্যাহ্ন-কালে এই দুর্গ লইতে প্রয়াস করে। দুর্গাধ্যক্ষ পুনঃ পুনঃ বাদশাহের নিকট সহায়তার জন্য আবেদন করিলেন। কিন্তু তিনি কোনই উত্তর পাইলেন না। এদিকে মহারাষ্ট্রীয়েরা আসিয়া রনথম্ভোর বেষ্টন করিল। অনন্যোপায় হইয়া দুর্গাধ্যক্ষ মহারাজ মাধোসিংহজীর নিকট এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন "জয়পুর রাজগণ বাদশাহদিগের চিরমিত্র; মহারাষ্ট্রীয়গণ চিরশত্রু। অতএব আপনি যদি এই সঙ্কটকালে আমাকে কিছু সৈন্য প্রেরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে রণথম্ভোর দুর্গ মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া আপনারই হস্তে অর্পণ করিব।"

মহারাজ মাধোসিংহজী অনতিবিলম্বে দুর্গাধ্যক্ষের নিকট সৈন্য প্রেরণ করিলেন—মহারাষ্ট্রীয়েরাও দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল আর দুর্গাধ্যক্ষ স্বীয় কথানুযায়ী মাধোসিংহজীর সেনাপতির হস্তে রণথম্ভোর গড় সমর্পণ করিলেন। অদ্যাপিও এই প্রসিদ্ধ গড় ধুঁঢাড় বা জয়পুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। রনথম্ভোর গড়ের সহিত একটী লোমহর্ষণ স্মৃতি জড়িত আছে। দিল্লীশ্বর বাদশাহ আলাউদ্দিনের সময় রাজপুতরাজ হাম্বীর রনথম্ভোর দুর্গে বাস করিতেন। সেই সময়ে মহীমসা নামক জনৈক রাজবিদ্রোহী রাজা হাম্বীরের আশ্রয় গ্রহণ করে। বাদসাহ মহীমসাকে তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে হাম্বীরের প্রতি আদেশ করেন। কিন্তু হাম্বীর এইরূপ রাজপুতরীতি বিগর্হিত কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। বাদশাহ আলাউদ্দিন তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। রনথম্ভোরের কেল্লার নীচে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়। রাজা হাম্বীর যুদ্ধে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে রাণীদিগকে বলিয়া আসিয়াছিলেন—"নীল নিশান নত হইলে জানিবে আমরা পরাজিত হইয়াছি।" ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজা হাম্বীর বিজয়ী হইলেন। কিন্তু হায় জয়োল্লাসের মধ্যে ঘটনাক্রমে নীল নিশান মুহূর্ত্তের জন্য নত হইল। হায়, রাণী ও কন্যারা তাঁহার পরাজয় ভাবিয়া অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। হাম্বীর জয়োল্লাসে স্ফীত হইয়া রন-

থম্ভোরে প্রবেশ করিলেন কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাগণকে চিতানলে প্রজ্ব-লিত দেখিয়া আপনিও প্রাণত্যাগ করিলেন।

মাধোসিংহজীর রাজত্বকালে স্বদেশপ্রিয়তার এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অলওর (Alwar) রাজ্য স্থাপয়িতা মাচেঁড়ীর রাও প্রতাপসিংহ কোন কারণবশতঃ মাধোসিংহজী কর্ত্তৃক ধুঁটাড় রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া ভরতপুরের মহারাজা জবাহির সিংহজীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পরে জবাহির সিংহজী জয়পুর রাজ্যের মধ্য দিয়া পুষ্করে স্নান করিতে যান। তাঁহার সঙ্গে অনেক দলবল থাকায় মাধোসিংহজী পত্রদ্বারা তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য মধ্য দিয়া প্রত্যাগমন করিতে নিষেধ করি-লেন। জবাহির সিংহজী এ নিষেধ বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মাধোসিংহজীর পরাস্ত হইবার উপক্রম হইতেছে এমন সময়ে রাও প্রতাপ তৎকৃত পূর্ব্বাপমান বিস্মৃত হইয়া জবাহির সিংহজীর পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাধোসিংহজীর সৈন্যদলমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘোর-তর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। জবাহির সিংহজী পরাস্ত হইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। মাধোসিংহজী মহা সন্তুষ্ট হইয়া রাও প্রতাপ সিংহ-জীকে মাচেড়ী প্রদেশ পুনরর্পণ করেন। রনথম্ভোরের নিকট জয়নগরের অনুরূপ সবাই মাধোপুর নামক তাঁহার স্থাপিত একটী সমৃদ্ধিশালী নগরী আছে।

জয়ছত্রীর বামদেশে মহারাজ প্রতাপসিংহজীর ছত্রী। প্রতাপসিংহজী পঞ্চদশ বয়ঃক্রমকালে কছবাহ রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবানল পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তিনি কছবাহ ও রাঠোড়গণের মধ্যে সুপ্রীতি স্থাপন করতঃ সম্বত ১৮৪৩ অব্দে তুঙ্গ যুদ্ধে সিন্ধিয়ার সৈন্যদলকে পরাস্ত করিয়া সমগ্র রাজস্থানে যুগপৎ সুযশ ও আতঙ্কের পাত্র হইয়াছিলেন।

সম্বত ১৮৪৬ অব্দে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব বজীর আলী ইংরাজরাজের সহিত গোলমাল করিয়া প্রতাপসিংহজীর শরণাপন্ন হয়েন। ইংরাজরাজ ঘন ঘন তাঁহার প্রত্যর্পণের জন্য প্রতাপসিংহজীকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

* প্রথম সংখ্যা পুণ্য দেখ।

অগত্যা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইল, কিন্তু তিনি তাঁহাকে প্রাণদণ্ড হইতে মুক্ত করিলেন। কোন শরণাগত ব্যক্তিকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করা রাজপুতনীতি বিগর্হিত। এই কারণ বশতঃ অদ্যাপিও লক্ষ্ণৌ প্রদেশে মুসলমানদিগের নিকট জয়পুরবাসীর সদ্ব্যবহার পাওয়া দুষ্কর।

মহারাজ প্রতাপসিংহজীর সংস্কৃত ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রতাপ সাগর নামক হিন্দীভাষায় তাঁহার রচিত এক গ্রন্থ আছে। সঙ্গীত বিদ্যায়ও তিনি অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক গান এখানে এখনও প্রচলিত আছে। ১

সমাধি ক্ষেত্রের পূর্ব্ব পার্শ্বে সবাই পৃথ্বীসিংহজীর ছত্রী। পৃথ্বীসিংহজী বীকানিরে বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যখন তিনি বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন তৎকালে বীকানির প্রদেশে অত্যন্ত জলকষ্টের প্রাদুর্ভাব হয়। তাঁহার যাত্রীবর্গদিগকে পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইতে হইয়াছিল। এক এক টাকা দিয়া এক এক বাটী জল ক্রয় করিতে হইয়াছিল। এই কারণ বশতঃ পৃথ্বী সিংহজী তাঁহার বংশের সন্তানসন্ততিদিগকে বীকানিরে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

সমাধি ভূমির এক পার্শ্বে মহারাজ জগৎসিংহ ও তৎপুত্র তৃতীয় জয়সিংহজীর ছত্রী। তৃতীয় জয়সিংহজী সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। কছবাহদিগের সিংহাসন কখন শূন্য থাকে না। কোন রাজা মরিলে নবরাজাকে তাঁহার অগ্নি সৎকার করিতে হয়। মহারাজ জগৎসিংহজীর মৃত্যুকালে তদীয় রাণী গর্ভবতী ছিলেন। অতএব সিংহাসন শূন্য না রাখিয়া মন্ত্রীবর মহনরাম নরবর দেশের রাজার পুত্র কুমার মানসিংহজীকে আহ্বান করিলেন। তিনি চার মাস রাজত্ব না করিতে করিতে মহারাজ জয়সিংহজী জন্মগ্রহণ করিলেন। মানসিংজীও নরবরে (Narwar) প্রস্থান করিলেন।

রাজছত্রী সমূহের সর্ব্ব মধ্যস্থলে 'তীসরে' জয়সিংহজীর পুত্র মহারাজ রামসিংহজীর ছত্রী বিরাজমান আছে। কছবাহ রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজ রাম সিংহজী তদীয় পূর্ব্বপুরুষ পুণ্যশ্লোক শ্রীরামচন্দ্রজীর অনুরূপ মহাবিচক্ষণ, স্বাধীনচেতা, প্রজাবৎসল ও সরল হৃদয় রাজা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর

১ ৫ম সংখ্যা পুণ্য দেখ।

রাজ্যের সুদূরসীমা হইতে প্রজারা আসিয়া তাঁহার সমাধি ভস্ম মাদুলিতে ধারণ করিয়া রোগোপশম করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিল। অদ্যাপিও অনেকে তাঁহার মূর্ত্তি কবচের ন্যায় কণ্ঠে ধারণ করে।

"নানা নগর নগর মে জিহি শুনে গয়ে রামসিংহ (স্বর্গ) ধাম।
সব রাজা রোয়ে, বন্দ কিয়ো সবকাম॥"

মহারাজ রামসিংহজী অত্যন্ত শান্তি প্রিয় ও মিষ্টভাষী ছিলেন। সম্বত ১৯৩৩ অব্দে মহারাণী ভারতেশ্বরীর রাজরাজেশ্বরী পদবী গ্রহণোপলক্ষে লর্ড লিটন চিরপ্রথানুসারে প্রাচীন রাজধানী দিল্লীতে রাজ রাজড়াদিগের মহা-দরবার বসাইয়াছিলেন। মহারাজ রামসিংহজীও দরবারে উপস্থিত হন। তথায় উদিপুরের মহারাণা সজ্জন সিংহজী ও বুন্দীর-মহারাজ রামসিংহজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অনেক বৎসর পর্য্যন্ত বুন্দী ও উদিপুরের সহিত জয়পুরের সোহৃদ্য ছিল না। কিন্তু রামসিংহজী এরূপ তাঁহাদিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন যে দরবার হইতে ফিরিবার সময় রাজাদ্বয় তাঁহার সহিত জয়পুরে আসিলেন। রামসিংহজী তাঁহাদিগের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করি-লেন। অম্বর গড়ে তাঁহাদিগের জন্য এক মহাভোজের আয়োজন করিলেন। উদিপুর ও জয়পুরের সহিত বহুকাল সদ্ভাব ছিল না। সম্ভবতঃ হিংসাই এই অসদ্ভাবের কারণ বলিয়া মনে হয়। রাজা মানসিংহজী দিল্লীশ্বর বাদশাহের প্রধান সেনাপতি ও প্রিয়পুত্র বলিয়া অন্যান্য রাজপুত রাজাগণের হিংসার পাত্র হইয়াছিলেন। মহোদয় টড্ সাহেবের গ্রন্থে তাহার কারণ এইরূপ লিখিত আছে। রাজা মানসিংহজীর খুল্লতাত ভগবৎ দাসজী তাঁহার পুত্রীকে সেলিমকে (জাহাঙ্গীর) প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহজী দাক্ষি-ণাত্য প্রদেশ জয় করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিবার সময় উদিপুরের জগৎ বিখ্যাত রাজপুত্র কুলতিলক মহারাণা প্রতাপসিংহজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। প্রতাপ সিংহজী সাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার জন্য এক ভোজের আয়োজন হইল। মানসিংহজী আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু প্রতাপকে আহার স্থলে দেখিতে পাইলেন না। কুমার অমরসিংহজী করজোড়ে মানসিংহজীকে নিবেদন করিলেন—প্রতাপসিংহজী শিরোবেদনায় পীড়িত হইয়াছেন। তিনি আশা করেন যে তাঁহার ব দ্ধমান-

সিংহজীর নিকট লোকলৌকিকতার প্রয়োজন হবে না। মানসিংহজী তৎক্ষনাৎ খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ না করিয়া ক্রোধভরে উঠিয়া কুমার অমরসিংহকে বলিলেন—"রাণাকে বল আমি ইহার শিরোবেদনার কারণ বুঝিয়াছি। আমার বংশে যে কলঙ্ক পড়িয়াছে তাহার সংশোধন হওয়া অসম্ভব।" রাণা আসিয়া বলিলেন—আপনি ক্ষমা করিবেন আপনার সহিত আমি একত্র ভোজন করিতে পারিনা, আপনার ভগিনী তুর্ককে বিবাহ করিয়াছে।" মানসিংহজী গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"উদিপুরের রাজবংশ রাজপুতদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য ও শীর্ষস্থানীয়। আপনার মহদ্বংশের গৌরব রক্ষার জন্ম আমরা আমাদিগের মান ও গৌরব বিসর্জ্জন দিয়াছি। উদিপুরের জন্যই আমরা আমাদিগের ভগিনী ও দুহিতা তুর্কদিগকে সম্প্রদান করিয়াছি। রাণা আমি একদিন না একদিন আপনার গর্ব্ব খর্ব্ব করিব—মানসিংহ নামের সার্থকতা দেখাইব।" এই কথা বলিয়া তিনি যে টুকু খাদ্য অন্নদেবকে নিবেদন করিয়াছিলেন তাহাই আপনার শিরোবেষ্টনের মধ্যে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর সালিমের সহিত মানসিংহ উদিপুর আক্রমণ করিলেন। সম্বত ১৬৩২ অব্দে হলদীঘাটের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মানসিংহজী প্রতিশোধ লইলেন। প্রতাপ মহাকষ্টে পতিত হইলেন। এমন কি তাঁহাকে তৃণশয্যায় শয়ন ও বৃক্ষপত্রে আহার করিতে হইয়াছিল। এই সময় প্রতাপ এই অটল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যতকাল তিনি আম্বেরের কেল্লা অধিকার ও আমেরের রাজার শিরশ্ছেদন করিতে না পারিবেন, ততকাল তিনি বৃক্ষপত্রে আহার ও তৃণশয্যায় শয়ন করিবেন। কাল ক্রমে এই প্রতিজ্ঞার এই রূপান্তর ঘটিল যে, তাঁহার বংশীয় রাজাগণ স্বর্ণথালের নিম্নে কদলীপত্র রাখিয়া ভোজন করিতেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যখন মহারাজ রামসিংহজী উদিপুরের মহারাণা সজ্জনসিংহজীকে আমেরে ভোজ দিয়াছিলেন চিরপ্রথানুসারে তাঁহার থালের নিম্নে কদলীপত্র স্থাপিত হইয়াছিল। রামসিংহজী সজ্জনসিংহজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাণাসাহেব আপনার থালার নিম্নে কদলীপত্র কেন? তিনি মহালজ্জিত ভাবে বলিলেন—আমার পূর্ব্ব পুরুষ প্রতাপসিংহজী এই শপথ করিয়াছিলেন যে, যত কাল আমেরের কেল্লা অধিকার ও অম্বরেশ্বরের শিরশ্ছেদন না করা হইবে ততকাল তাঁহার বংশীয় রাজাদিগকে কদলীপত্রে

ভোজন ও পর্ণ শয্যায় শয়ন করিতে হইবে। রামসিংহজী হাসিতে হাসিতে তাঁহার হস্তে তলয়ার দিয়া তাঁর নিকট মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন—"এই আমেরের রাজার কেল্লা—এই নিন আমেরের রাজার শির। হয় আপনি আমেরের রাজার শিরশ্ছেদন করুন নতুবা কদলীপত্র ফেলিয়া দিয়া আহার করুন।" সজ্জনসিংহজী কদলীপত্র ফেলিয়া দিয়া আহার করিলেন। ঐ দিবস হইতে জয়পুর ও উদিপুরের মধ্যে আন্তরিক সৌহৃদ্য স্থাপিত হইল।

রামসিংহজী সুন্দর রসময় ইংরেজি কহিতে পারিতেন। অত্রত্য কোন সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীর প্রমুখাৎ তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদিগের সম্বন্ধে এইরূপ উপহাসপূর্ণ মন্তব্য শোনা গিয়াছে Once a young graduate fresh from the university went out to shoot wild ducks. He fired at a flock but missed his aim. The ducks flew away crying aloud "quack, quack". ১

সম্বত ১৯২৪ অব্দে জয়পুর রাজ্যে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়। মহারাজ রামসিংহজী ক্ষুধা পীড়িত প্রজাদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য পূর্ত্তকার্য্য খুলিলেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ রামনিবাস বাগও একটী। এই বাগানটীকে নন্দন কানন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাগানটী একাধারে চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, বটানিকাল গার্ডেন, ইডেন উদ্যান। ইডেন উদ্যানের ন্যায় এখানেও একটী বাদ্যমণ্ডপ আছে। প্রতি সোমবারের সন্ধ্যাকালে গড়ের বাজনা বাজে। গাড়ী ঘোঁড়াতে এ স্থানটী পরিপূর্ণ হয়। কলের জল, গ্যাসের আলো, হাস্পাতাল, ও শিল্পবিদ্যালয় প্রভৃতি মহারাজা রামসিংহজীর দ্বারা প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া নগরের শোভা সমৃদ্ধি অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছে।

ছত্রীভূমির উপরিস্থিত নাহাড়গিরির চূড়ার উপর দুইটী মন্দির আছে। একটীর নাম চরণ মন্দির, আরেকটীর নাম গণেশগড়। রাজপুতানা শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভূমি—পাণ্ডবদিগের গুপ্ত প্রবাস ভূমি। জয়পুরের

---

১ কোয়াক (quack) শব্দের দ্বারা শ্লেষোক্তি করিয়া ইউনিভার্সিটীর বৃথা উপাধিধারীদিগকে উপহাস করিয়াছেন। কোয়াক শব্দে যেমন হংসডাক বুঝায়, সেইরূপ যাহারা বৃথা বিদ্যার গর্ব্ব করে তাহাদিগকে বুঝায়। বিশেষতঃ কোয়াক বলিতে বিদ্যাহীন হাতুড়ে চিকিৎসকদিগকে বুঝায়।

অধিকাংশ দেবমূর্ত্তি কৃষ্ণমূর্ত্তির রূপান্তর মাত্র। কথিত আছে, নাহাড় গিরির উপরে শ্রীকৃষ্ণ গরু চরাইতেন। তাঁহার সুমধুর বংশীধ্বনি শুনিয়া কঠিন প্রস্তরও গলিয়া গিয়া তাঁহার পদাম্বুজ ও তাঁহার পশুদিগের ক্ষুরের ছাপ ধারণ করিয়াছিল। অদ্যাপিও ঐস্থানে মনুষ্যের পদাঙ্ক ও পশুর ক্ষুর চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। এ স্থানে একটী মন্দির আছে—মন্দিরটীর নাম চরণ মন্দির।

চরণ মন্দির সন্নিকটেই গণেশগড় আছে। এই মন্দিরের চতুঃপার্শ্ব প্রস্তর প্রাচিরে বেষ্টিত সুতরাং দুর্গের ন্যায় দৃঢ় বলিয়া গণেশগড় নাম হইয়াছে। গনেশগড় বা মন্দিরও নাহাড় গিরির চূড়ার উপর অবস্থিত। সবাই জয়সিংহজী দিল্লীর সুবাদার হইবার পর প্রাচীন রাজাদিগের ন্যায় এক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পুরাকালে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে গিয়া অনেক রাজাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। সবাই জয়সিংহজীর যজ্ঞাশ্ব কুম্মানী নামক কছবাহদিগের শাখা কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিল। অশ্বের উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। গণেশ হিন্দুদিগের মঙ্গল দেবতা, হিন্দুগৃহের দ্বারদেশে গণেশ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বনিয়াগণ তাঁহাদিগের হিসাবের খাতার প্রারম্ভে এইরূপ গণেশ মূর্ত্তি অঙ্কিত করে। চিত্রকরেরা প্রথমে গণেশমূর্ত্তি আঁকিতে শেখে। সর্ব্বকার্য্য প্রারম্ভে হিন্দুরা ষোড়শোপচারে গণেশ মূর্ত্তির পূজা করে। মহারাজ জয়সিংহজীও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সময় এই গণেশ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রথমে পূজা করিয়াছিলেন। গণেশ গড়ে উঠিবার একটী সুবৃহৎ ও উচ্চ প্রস্তরের সোপান আছে। সোপানটীর দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে একটী গল্প শোনা যায় এই যে এক ব্যক্তি মানত করিয়াছিলেন যে মন্দিরে উঠিতে যত পা ফেলিতে হইবে তত সংখ্যা "লাড্ডু" তিনি দেবতাকে ভোগ দিবেন। তিনি আড়াই হাজার লাড্ডু" ভোগ দিয়া ছিলেন। ইহাতে এই প্রমাণ হইতেছে যে মন্দিরে উঠিতে আড়াই হাজার পদনিক্ষেপ করিতে হয়। মতিডুঙ্গরী পাহাড়েও একটী গণেশমূর্ত্তি আছে। এ মূর্ত্তিটা চাঁদা করিয়া স্থাপন করা হয়। গণেশ মূর্ত্তিদ্বয়ের বাহক দুইটী মুষিক। গণেশ মূর্ত্তির দুই ধারে রিদ্ধ (wealth) ও সিদ্ধ (success) নামক দুইটী স্ত্রীমূর্ত্তি চামর ধরিয়া

রহিয়াছে। আর লক্ষ ও লাভ নামক দুইটী বালক মূর্ত্তিও আছে (লক্ষ= অসংখ্য, লাভ=প্রাপ্তি)। প্রতিবৎসর ভাদ্র চতুর্দ্দশীতে এখানে একটী মেলা হয়। ইহাকে এখানে "চৎরা-চোৎ" মেলা বলে। প্রতিবৎসর সাঙ্গানের তন্তুবায়েরা মতি ডুঙ্গড়ীর গণেশ মন্দিরে, মুষিকদিগের উৎপাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য দুই তিনবার পূজা দিতে যায়। কেহ কেহ গণেশকে পূজা না করিয়া তাঁহার বাহক মুষিকগণকে পূজা করে।

নাহাড় গিরির শিখরস্থিত জয়পুরের কেল্লা ছত্রী ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে ভীমদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। কেল্লাটীর নীচে পাহাড়ের গায়ে বৃহদক্ষরে WEL COME কথা খোদিত আছে। সুদূর হইতে কথাটী সুস্পষ্ট পড়িতে পারা যায়। সম্বৎ ১৮৩২ অব্দে রাজরাজেশ্বরী মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ এর শুভাগমন ঘোষণার জন্য কথাটী খোদিত করা হইয়াছিল। নাহাড়গড়ের সহিত একটী ক্ষুদ্র গল্প জড়িত আছে। মহারাজ জগৎসিংহজী ১৭ বৎসর বয়সে 'গদী' আরোহণ করেন। সুতরাং যুগপৎ তাঁহার রাজ্য ও চরিত্রের কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খল ঘটে। তিনি রসকর্পূর নামক জনৈক যবন রমণীর প্রেম-কুহকে পড়িয়া তাঁহার প্রজাবর্গের বিশ্রদ্ধা ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি এই রমণীর প্রেমযাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে অর্দ্ধেক অম্বররাজ্যপ্রদান পূর্ব্বক পাটরাণীর স্থানীয় করিয়াছিলেন। এই কারণে সর্দ্দারগণ ইহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। অগত্যা তাঁহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য তিনি রসকর্পূরকে নাহাড় গড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

জগৎসিংহজীর রাজত্বকালে টোঁক-রাজ্য স্থাপন কর্ত্তা যবন পিশাচ নবাব আমির খাঁ জয়পুর আক্রমণ করেন। মতি ডুঙ্গড়ী (ডুঙ্গড়ী অর্থ পাহাড়) তে তোপ মারিয়া পাহাড়ের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, এখনও ভাঙ্গা আছে। প্রবাদ আছে যে আমির খাঁ মতিডুঙ্গড়ী হইতে নাহাড়গড়ে এক সুবর্ণ গোলা মারিয়াছিলেন—ইহার তাৎপর্য্য এই যে তাঁহার সৈন্য ও অর্থবল অধিক, সুতরাং জয়পুররাজ বৃথা যুদ্ধ না করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করুন। পরে জগৎসিংহজী ইংরেজ রাজের উপদেশে টোঁক প্রভৃতি কতিপয় প্রদেশ দান করিয়া জয়পুররাজ্যে শান্তি

স্থাপন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে আমির খাঁ জগৎসিংহজীর মহাশত্রু ছিলেন। তিনিই উদিপুরের রাণা ভীম সিংহজীর কন্যা কৃষ্ণকুমারীর সহিত জগৎ-সিংহজীর বিবাহ প্রস্তাবে বাধা দিয়াছিলেন। তিনি যোধপুরাধিপ মান-সিংহজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভীমসিংহজী কোন মতেই সম্মত হইলেন না। এই কারণ বশতঃ জয়পুর, যোধপুর ও উদিপুরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যবন পিশাচ আমির খাঁ বিষপ্রয়োগ দ্বারা কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিয়া এই বিবাদ ভঞ্জন করিতে পরামর্শ দিলেন। কৃষ্ণকুমারীও বিষপান করিয়া রাজস্থানের অশান্তি দূর করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গীতিকুঞ্জ।

ক্ষুদ্রশক্তি।

সিন্ধু সিন্ধুড়া—রূপক

ক্ষুদ্র শক্তি ল'য়ে এই
কি করিব কাজ এই ধরাধামে ?
সাধ্য নেই সাধ্য নেই,
তুমি দয়া কর, জাগি তব নামে।
কত ভয় এ ধরায়,
মোর শোকে ভয়ে কাঁপে সদা প্রাণ ;
চাই তোমার কৃপায়,
পেলে তব কৃপা হবে পরিত্রাণ।

যতদূর সাধ্য আছে
দিয়ে মন প্রাণ পালিব আদেশ ;
পূর্ণ বল তব কাছে
দিলে তাহা নাথ হয় কার্য্য শেষ।
দুটী পায়ে পড়ি নাথ
সহায়তা কর মোরে কৃপা করি,
সবেতেই তব হাত
আশা ভরসা মম তবোপরি।
আর যাব কার দ্বারে
কে করিবে সহায়তা, দয়া মোরে ?
তাই, ডাকিছি তোমারে
রব তব প্রদর্শিত পথ ধ'রে।
কি করিব এই বলে ?
তোমারে ছাড়িলে হই মুহ্যমান ;
সংসার এ নাহি চলে
ছারখার প্রিয়জন ধনমান।

লক্ষ্মী।

শঙ্কর বিহঙ্গ—কাওয়ালি।

ঘরের লক্ষ্মী তুমি
নন্দনা
তোমায় করি আমি
বন্দনা।
অলস নহ গো তুমি
করমে চঞ্চল ;
সংসার তোমারি ভূমি
তোমারি অঞ্চল।

তোমায় ক'রেছে বিধি
করুণা-নিধান
সংসারের সার নিধি
দাও ধন ধান।
ঘরের লক্ষ্মী তুমি
নন্দনা
তোমায় করি আমি
বন্দনা।

ধরা অর্থে ভরা।

(শ্রমজীবীর গান)

সাহানা—ঝাঁপতাল।

হায় অর্থ নাই এরি তরে
প'ড়ে আছি পদতলে
সকলে যা ইচ্ছা তাই করে
অত্যাচার প্রতিপলে।
এখনি যাইরে ছুটে অর্থ করি খেটে
অর্থ না আনিলে পরে অন্ন নাই পেটে
বিলম্ব নয় রে আর চাই অর্থ করা—
আনিতে হইবে অর্থ যাই ছুটে ত্বরা
খাটিলেই পাব—ধরা অর্থে ভরা।

কেননা তোমার কর্ম্ম করি।

ভূপালী—ঝাঁপতাল।

দেব, জন্ম দিয়াছ যবে
এ সংসারের মাঝে
কেননা তোমার কর্ম্ম করি।

(তুমি) সাথে চিরদিন রবে
রহিব তোমারি কাজে।
এ দেহ তোমার দেহ
এ প্রাণ তোমার প্রাণ
এ বিশ্ব তোমারি গেহ
তোমাতেই পরিত্রাণ।
কেননা তোমার কর্ম্ম করি।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ত্রিবেণীর ঝড়।

(জলপথে কাশীযাত্রা।)

সুখে দুঃখে ভয়ে আনন্দে আমাদের একটা দিন নদীর উপরে কাটিল। আজ যাত্রার দ্বিতীয় দিন। কাল যদিও আমরা অনেক রাতে শুইতে গিয়াছিলাম তবু আজ ভোর হইতে না হইতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেছে। যে কয়েক ঘণ্টা ঘুমাইয়াছি ঘোর নিদ্রা হইয়াছিল। কাকীমাতা আমাদের উঠিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাল ঘুম হইয়াছিল ত?" বজরার ছাদে উঠিয়া শীতল সমীর সেবন করিতে করিতে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলাম। এমন সময় শুনিলাম "হো কালাচাঁদ মাঝী হো চামরু দুধ লেয়ায়া" বলিয়া ওপারে কে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে। "দুধ লেয়ায়া"—শুনিয়া সকলেই বুঝিলাম দুধ আসিয়াছে তাই ঠাকুরদাস দ্বারবান ডাকিতেছে। কালাচাঁদ মাঝী চামরু সকলেই সাড়া দিল বটে কিন্তু ঠাকুরদাসের হাঁক আর থামে না, হাঁকের উপর হাঁক দিতেছে, শেষে সারেং যখন ষ্টীমারের বাঁশী বাজাইয়া দিল তখন থামিল—বুঝিল যে কোথায় ষ্টীমার আছে। কাল দ্বারবানকে বলিয়া রাখা হইয়াছিল যে, আমাদের

নৌকা বেশী দূর যাইবে না, সালিকায় গিয়া নঙ্গর করিবে। সে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া যখন কোন পরিচিত নৌকার চিহ্নই দেখিতে পাইল না তখন সে ডাক দিতে দিতে বরাবর চলিয়া আসিয়া ষ্টীমারের বাঁশী শুনিয়া তবে থামিয়াছে। ঠাকুরদাস একটা ছোট ডিঙ্গি করিয়া আমাদের বজরাতে এপারে দুধ লইয়া আসিল। মা'রা তাহাকে গৃহের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুধ আসিয়াছে দেখিয়াই পিতৃদেব নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। ঠাকুরদাস বিদায় লইয়া ওপারে ফিরিয়া গেল। যেই শুনিলাম নৌকা ছাড়িবে সেই তাড়াতাড়ি মুখ ধুইতে গেলাম। এখন হইতে সকল কাজে আমরা গঙ্গার জল ব্যবহার করি। কলের জল কেবল খাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আমরা সঙ্গে বড় বড় দুই জালা ভরিয়া কলিকাতার কলের জল আনিয়াছি।

এইবারে নৌকা ছাড়িবে। পিতৃদেব সারেংকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন্ পার দিয়া যাইবে?" সারেং বলিল—"কলিক[illegible] এপারে বেশ গভীর জল আছে, ষ্টীমারের পক্ষে পারে কেবলি চড়া খালাসী ও দাঁড়ীরা কাছি দিয়া নৌকা ষ্টীমারের সঙ্গে এপারটাই ভা[illegible]গিল। আমাদের বজরাটাকে ষ্টীমারের পশ্চাতে বাঁধিল; বজ-বাঁধিতে[illegible]র্শ্বে পান্সীটাকে বাঁধিল এবং বজরার পশ্চাতে ছোট বোটটাকে রাখিয়া দিল। পান্সীকে যে বজরার পার্শ্বে বাঁধিল তাহার কারণ আছে। পান্সীটা ছিল আমাদের রান্নাঘর। সকালের লুচি প্রভৃতি রান্না চলিতেছে। ভৃত্যেরা পান্সী হইতে বজরায় একে একে আনিয়া আহারের সরঞ্জাম গুছাইতেছে। ষ্টীমার বজরা ও পান্সী প্রভৃতিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে—যেন মরালী তাহার শাবকগুলিকে সঙ্গে লইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। দাঁড়িদের এখন কোন কাজ নাই, ছাতের উপরে গিয়া তামাক টানিতে টানিতে গল্প করিতেছে।

আমরা আহার করিতে বসিয়াছি। গরম গরম পরোটা, এবং তৎসঙ্গে ছোকা ও ডিমের আমলেট, টিনের দুধ ও জ্যাম এবং সর্ব্বশেষে দুগ্ধ বা চা-পান, আপাততঃ ইহাই আমাদের প্রাতরাশ। সকালে গরুর দুধ না

ষ্টীমারে, টম পাচক, শ্যামবাবু ও কর্ম্মচারী যে সকলে পড়িতে বসিলাম।
নৌকার মাঝী 'শামল' 'শামল' করিতেছে। ষ্টী দাদামহাশয়ের কাছে দেখা
একবার গঙ্গার মধ্যে তলাইয়া যাইতেছে, আবা বানেরা বাড়ীতে দোতালায়
উঠিতেছে। আমাদের বজরাটার মহাশয় ও পিতা বোটেই শুইলেন।
মহাশয় ও আমাদিগের মধ্যে বাগানে বেড়ান গেল। তারপরে সকলে
করিতেছেন। আলমারির সম ময়ে শুনিলাম নবীন সূপকার পলাইয়াছে।
ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া যা রিয়া সেই যে গিয়াছে আর ফিরে নাই।
গেছে বেশী। ছোট বোটটা য়া সে বোধ হয় প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিয়া
দিতে জলের টানে যে শ্যাম বাবুকে ডাকিয়া আরেকজন সূপকার খুঁজিয়া
বোটটার মাঝীর নাম ছি বাবু সকালে চা-রুটী খাইয়া সেই যে বাহির
ছিল। সে প্রাণপণে তা টার সময় টম্ নামধেয় হ্যাটকোটধারী একটী
য়াছে। ছোট বোটটার থ রিয়া আনিলেন এবং এই সঙ্গে ফরাসডাঙ্গার
করিতে লাগিল। পরিচা মাংস ও তরকারী প্রভৃতিও বাজার করিয়া আনি-
চাপা দিয়া জল আ বেতন নির্দ্দিষ্ট হইল কুড়ি টাকা। স্থির হইল বাড়ীতে
ঝড় কাটাইয়া আমা ও সে আমাদের কাছে কাজ করিবে।
পারিল। ক্রমে থা রাসডাঙ্গা ছাড়িয়া যাইব। সেই জন্য মধ্যাহ্ন ভোজনের
লাগাইল। ষ্টিমার মহাশয় পিতা দাদামহাশয়ের কাছে দেখা করিতে
দেখা নাই। সক শয় বলিলেন—"আজ যে রকম গরম হইয়াছে তাহাতে
গিয়াছে। কেহ ঝড় হইবে। আজকার দিনটা না হয় এইখানে থাকিয়া
কিছু " পিতা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন—"না তেমন কিছু ঝড় হইবে
যদি আজ খানিকটা এগিয়ে থাকা যাক, যদি তেমন ঝড় আসে ত
সকা করিতে বলিব।" পরে দাদামহাশয় আমাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া
না য় দিলেন। পিতৃদেবেরা নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিতে
ঝপালম। দুইখানি বোট ষ্টীমারের দুই পার্শ্বে বাঁধিয়া দিল এবং আমাদের
টিগারের পশ্চাতে পান্সীকে বাঁধিয়া দিল। দাসী চাকরদের এখনো খাওয়া
অ হয় নাই। তাহারা পান্সীতে ভাত খাইতেছিল। এখন বেলা
সঙ্গে ছো এই সময়ে আমাদের নৌকা ছাড়িয়া দিল। কত দৃশ্য
চা-পান, আতে চলিলাম। কোথাও বা পোড়োবাড়ি, ঘাটে দুএকটী রমণী

কলস ভরিয়া জল তুলিতেছেতে আমাদের মধ্যে আসিয়াছে। বিধাতার
বা বিশাল বটচ্ছায়ায় এপ্রকৃষ্ট শিল্প রচনা—তাহারই ছায়ায় আমাদের
সকলি যেন উদাস। ছু একপ্রকাশ পাইতেছে। বিশ্বকর্ম্মার এই বিশ্বের
বা বালুচর। বালুচরে নানা কর্ণিক কলয়ারই প্রকৃষ্টরূপ শিলাই কার্য্য
গাছে ঝোঁপ হইয়া আছে। আকাশের বৈচিত্র শিলাই চলিয়াছে। তাঁহার
শোভা। আকাশের মেঘের পানে চাহিলে প্রস্তরে, ও তৃণের শ্যামলাস্তরণে
ইচ্ছা হয়। সাধ হয় মেঘের মত শুধুই ধাছে, মহা শিলাই কার্য্য সম্পন্ন
আলোকে আধ ছায়ায় স্বপ্নময় মেঘেরা কোথা কিছু হেয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয়
ভাসিতে ভাসিতে যখন আমরা চারিটা সাোভ করিবার চেষ্টা করি-
আসিলাম তখন দূরে কাল মেঘের রেখা প্রেম আমাদের কাছে যেমন
বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। গতিক বুঝিয়া ষ্টীমারেরর ভাব লইয়াই আমাদের
বলিতে লাগিল "ভয়ানক ঝড় আসিবে, নঙ্গর েতির মহাশিল্প রচনার অনু-
এ.প্রস্তাবটা মনের মত হইল না। তিনি খুব র্য্য প্রভৃতিতে পরিপুষ্টতা
হাওয়া পাইয়া ষ্টীমারের ছাদে দিব্য গাত্রের উত্তরীয় ফে
আরাম" বলিতে বলিতে আয়েস করিতেছেন। ।শ্যাম। ামার্য্যে বিশেষরূপে
মেঘ বাতাসে উড়িয়া যাইবে।" কাজেই কাপ্তেন সা সুকুমার শিল্পকে
কথা কহিতে পারিল না। ঝড়ের মুখেই চলিতে মধ্যে রূপ রি। মাল-
গ্রামের পর গ্রাম ছাড়াইয়া আমরা ত্রিবেণীর ঠিক মধ্যস্থে. রূপ দে. আখ্যাত
ভয়ানক ঝড় আরম্ভ হইল। এ যাত্রা আর বুঝি উদ্ধার রূবে
নৌকাগুলা ঢেউয়ের সঙ্গে একবার উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল আবার ছা
যাইতে লাগিল। নৌকায়, ষ্টীমারে টকাটক্ ধাক্কা লাগিতে আরম্ভ হ পর
পিতৃদেব বিপদ বুঝিয়া নৌকার কাছি কাটিয়া সত্বর নৌকাগুলিকে একে
আলাদা করিয়া দিতে বলিলেন। ত্রিবেণীর মোহানার মাঝখানে অ র
চারিটী নৌকা আলাদা হইয়া ভয়ানক দোল খাইতে লাগিল। তর
ভীষণ আস্ফালন ও বিদ্যুৎ বজ্র ক্ষণমধ্যে তুমুল কোলাহল তুলিল।

ছোট বোটটাতে পরিচারিকাদের কাছে ছোট্ট ভগ্নীটী ছিল তাহ র্থ
আর উঠাইয়া বজরায় তুলিয়া আনিতে পারা গেল না। পান্সীতে চ
ঈশান ও দোলো এই ভৃত্যেরা ও রামেশ্বর ঠাকুর পাচক রহিয়া গে

ষ্টীমারে, টম পাচক, শ্যামবাবু ও কর্ম্মচারী যে বাবু রহিলেন। প্রত্যেক নৌকার মাঝী 'শামল' 'শামল' করিতেছে। ষ্টীমারটা জল কাটিতে কাটিতে একবার গঙ্গার মধ্যে তলাইয়া যাইতেছে আবার ঢেউয়ের সঙ্গে ডুব খাইয়া উঠিতেছে। আমাদের বজরাটার ত কথাই নাই, ভয়ানক দুলিতেছে। কাকা-মহাশয় ও আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দোলার কারণে কেবল বমি করিতেছেন। আলমারির সমস্ত জিনিষ পত্র ঝন ঝন শব্দে পড়িতেছে ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা ছোট বোটটার বিপদ গেছে বেশী। ছোট বোটটাকে ষ্টীমার হইতে আলাদা করিয়া দিতে না দিতে জলের টানে যে কোথায় ভাসিয়া গেল আর দেখা গেল না। এই বোটটার মাঝীর নাম ছিল পরমেশ্বর পাঠক। নৌকাটা তাহার নিজের ছিল। সে প্রাণপণে তাহার নৌকাকে ঝড়ের মাঝে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছে। ছোট বোটটার খড়খড়ের ভিতর দিয়া জলের ঝাপটা প্রবেশ করিতে লাগিল। পরিচারিকারা প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া ডালা চাঙ্গাড়ী চাপা দিয়া জল আটকাইবার প্রয়াস পাইয়াছিল। সন্ধ্যা ৬টা ৬॥ টার সময় ঝড় কাটাইয়া আমাদের বজরা 'ডুমুরদয়ে' আসিয়া নদীর কিনারায় আসিতে পারিল। ক্রমে খানিক পরে পান্সীটাও, দেখি আমাদেরি কাছে আসিয়া লাগাইল। ষ্টিমার একটু দূরে নঙ্গর ফেলিয়া রহিল। কিন্তু ছোট বোটটার দেখা নাই। সকলে ভাবিল হয়ত বা সেটা এই ভীষণ ঝড়ে ডুবিয়া গিয়াছে। কেহ বলিল—"বোধ হয় অন্য কোথাও লাগাইয়াছে" কেহই কিছু স্থির করিতে পারিতেছে না। চামরু ও সারেং অনেকবার হাঁক দিল যদি তাহার কোন সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু কোন উত্তরই পাওয়া গেল না। সকলে ভাবিয়া আকুল যে বোধহয় বাস্তবিকই নৌকার দেখা পাওয়া যাইবে না। পরে রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় খালাসীরা দূর হইতে একটা দাঁড়ের ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দ শুনিতে পাইয়া বাঁশী বাজাইল। বজরার দাঁড়ীরা খালাসী-দিগকে জিজ্ঞাসা করিল—"ও বোটের কি সাড়া পেলে?" তাহাতে ষ্টীমারের লোকেরা বলিল—"হাঁ মনে হইতেছে ত যেন একটা নৌকা আসিতেছে।" সঙ্গে শুনিয়া তবু যেন সকলে একটু আশ্বস্ত হইলেন। পিতৃদেব ষ্টীমারে দুটা চা-পানি আলো ধরিতে বলিয়া দিলেন যাহাতে ঐ বোটের মাঝী বুঝিতে

পারে কোথায় ষ্টীমার আ
ষ্টীমারের কাছে আসিয়া দ
টাকে ষ্টীমারের সঙ্গে বাঁ
টীকে তুলিয়া লইলেন। সে
সেই ক্ষুদ্র তরীটীতে বসিয়া
ছিল। ত্রিবেণীর কাছে এ
সেই টানে পড়িয়া হাবুডুবু
গিয়াছে এক্ষণে আমরা নিরাপদ।
কাটাইয়া আবার সকলে একত্র হইতে
তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলি নাই।

হইতে আমাদের মধ্যে আসিয়াছে। বিধাতার
। প্রকৃষ্ট শিল্প রচনা—তাহারই ছায়ায় আমাদের
ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। বিশ্বকর্ম্মার এই বিশ্বের
র্ষণরূপী সূত্ররেখারই প্রকৃষ্টরূপ শিলাই কার্য্য
বিশ্বের চতুর্দ্দিকে বিচিত্র শিলাই চলিয়াছে। তাঁহার
লতিকায় মৃত্তিকা প্রস্তরে, ও তৃণের শ্যামলাস্তরণে
। উঞ্ছবৃত্তি চলিয়াছে, মহা শিলাই কার্য্য সম্পন্ন
শিল্পে কোন কিছু হেয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয়
সৌন্দর্য্য লাভ করিবার চেষ্টা করি-
মহাশিল্প আমাদের কাছে যেমন
শিল্পের ভাব লইয়াই আমাদের
কৃতির মহাশিল্প রচনার অনু-
র্য্য প্রভৃতিতে পরিপুষ্টতা
কার্য্যে বিশেষরূপে
সুকুমার শিল্পকে
রি। মাল-
আখ্যাত
রূপে

প্রাচীন ভারতে শিল্পানুরা

আমরা বিশ্বসংসারে যে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় আছে, তন্মধ্যে রূপ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতির মধ্যে রূপ চক্ষু দ্বারা গ্রাহ্য। রূপ দে জন্যই নয়নের সৃষ্টি; এই নয়নের দ্বারা বিশ্বের বিচিত্র রূপ দেখিতে দেখি ক্রমে অতীন্দ্রিয় চক্ষুর দ্বারা বিশ্বকর্ম্মার স্বরূপ দেখিতে আমাদিগের ইচ্ছা হয়। রূপ বিনা নয়নের রঞ্জন সাধন হয় না। রঞ্জনাৎ রাগঃ; রূপের দ্বারা চক্ষুর রঞ্জন সাধিত হয় বলিয়া তাহাকেও রাগ বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ জগতের শব্দ—আহত ও অনাহত নাদ হইতে যেমন সঙ্গীতে রাগের সঞ্চার হয়, সেই প্রকার বিশ্বের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট রূপের প্রভাবে চিত্রের উৎপত্তি হয়; এই রূপই শিল্পের প্রাণ; ইহার জন্যই মানবের শিল্প।

শিল্প শব্দের শিল ধাতু হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। 'শিল' ইহার ধাত্বর্থ উঞ্ছবৃত্তি। এখানে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে শিলধাতুর এই উঞ্ছবৃত্তি অর্থে আমরা কেমন শিল্পের সেই সূক্ষ্ম কৃচ্ছ্রসাধ্য যোগধর্ম্মে উপনীত

স্টীমারে, টম পাচক, শ্যামবাবু ও কর্ম্মচারী যে বাবু ... ঋষিগণ অন্তরের মধ্যে
নৌকার মাঝী 'শামল' 'শামল' করিতেছে। স্টীমারে ... করিতেন; সেই প্রকার
একবার গঙ্গার মধ্যে তলাইয়া যাইতেছে আবার ঢে... সাধন করা আবশ্যক।
উঠিতেছে। আমাদের বজরাটার ত কথাই নাই, ভয়...ন কিছুকে অবজ্ঞা করিয়া
মহাশয় ও আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দোলা করিয়াও তাহার দ্বারা শ্রেয়
করিতেছেন। আলমারির সমস্ত জিনিষ পত্র বিষয়কেও ঘৃণা না করিয়া
ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। সর্ব্বা...ত্তর কর্ম্ম। ইহাতেই দেখা
গেছে বেশী। ছোট বোটটাকে স্টীমা... ...দারতা। ক্ষুদ্র ... বা সূক্ষ্মের মধ্যে কতটা
দিতে জলের টানে যে কোথায় ভা... পদার্থকেও শ্রেয় পদা...ার্থরূপে পরিণত করা
বোটটার মাঝীর নাম ছিল পর... হয়। তাই পদার্থের ... পাঙ্কনে ভালরূপে
ছিল। সে প্রাণপণে তার ... উঞ্ছবৃত্তিমুখী হইয়া শিল্পের প্র...তি মনোনিবেশ
য়াছে। ছোট বোটটার ... আমরা শিল্পের মহিমা ও উদার...তা উপলব্ধি
করিতে লাগিল। পরিচা... ...য় পণ্ডিতেরা শিল্পের এই উদারতা ও মহত্ত্ব ... অনুভব
চাপা দিয়া জল আট... তাঁহারা আলেখ্যবিদ্যাকে Liberal art বা উদা...র শিল্প
ঝড় কাটাইয়া আমা... পারেন নাই। আমাদিগের বিশ্বাস সমুদয় শিল্পের ... মধ্যেই
পারিল। ক্রমে ... ...ক্ষা করাই সঙ্গত। কারণ প্রকৃতপক্ষে সমুদয় শিল্পে ... মূল
লাগাইল। ... টটা
দেখা নাই।

...শিল্প কথা শুনিলেই সাধারণতঃ শিলাই করা বা বুনন করার ভাব ...কের মনে জাগিয়া উঠে; শিল্পের এই সাধারণ ভাবের বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলিতে চাহি না, কারণ আমরা ধ্রুব বিশ্বাস, বস্তুতঃ সকল প্রকার শিল্পের প্রাণই শিলাই কার্য্য। সম্ভবতঃ 'শিল্প' হইতেই 'শিলাই' কথা নামিয়াছে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় চিত্রবিদ্যায় সুনিপুণ ব্যক্তিগণ প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে চিত্রাঙ্কন 'ক্রস' Cross 'রিক্রস্' Recross প্রভৃতি রেখা টানা অথবা রেখার শিলাই করা ভিন্ন আর কি? শিল্প মাত্রই দেখিয়াছি বিন্দু ও রেখা সমূহের পরস্পর সংযোগ ও সজ্জা ব্যতীত আর কিছুই নয়। শিল্পের এই শিলাই কার্য্যে কোথাও আমরা সূচিকা ব্যবহার করি, কোথাও বা লেখনী, তুলিকা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়; ইহাই যা প্রভেদ। মোটের উপর শিল্প মাত্রেরই মূলভাব এক। শিল্পের এই মূলভাবও বিধা

তার প্রকৃতি-শিল্পরচনা হইতে আমাদের মধ্যে আসিয়াছে। বিধাতার প্রকৃতিই প্রকৃষ্ট কৃতি বা প্রকৃষ্ট শিল্প রচনা—তাহারই ছায়ায় আমাদের এই ক্ষুদ্রকৃতি বা কারুকত্ব প্রকাশ পাইতেছে। বিশ্বকর্ম্মার এই বিশ্বের প্রত্যেক স্তরে কেবল আকর্ষণরূপী সূত্ররেখারই প্রকৃষ্টরূপ শিলাই কার্য্য দীপ্যমান দেখিতে পাই। বিশ্বের চতুর্দ্দিকে বিচিত্র শিলাই চলিয়াছে। তাঁহার এই জগতে, গিরিশৈলে, বৃক্ষলতিকায় মৃত্তিকা প্রস্তরে, ও তৃণের শ্যামলাস্তরণে ছায়া আলোকে অবিশ্রান্ত মহা উঞ্ছবৃত্তি চলিয়াছে, মহা শিলাই কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। তাঁহার এই ব্রহ্মাণ্ডের মহাশিল্পে কোন কিছু হেয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয় না। সকলই তাঁহার কার্য্যকৌশলে সৌন্দর্য্য লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাই ভগবানের এই প্রকৃতিরূপ মহাশিল্প আমাদের কাছে যেমন চিরপুরাতন তেমনি চিরনূতন। তাঁহার মহাশিল্পের ভাব লইয়াই আমাদের এই ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপত্তি। যতটা আমরা প্রকৃতির মহাশিল্প রচনার অনুসরণ করিব ততই আমাদিগের শিল্প সৌকুমার্য্য ঔদার্য্য প্রভৃতিতে পরিপুষ্টতা লাভ করিয়া তাহা রসাত্মক হইবে।

শিল্পের যে বিভাগ মহত্ত্বে লাবণ্যে লালিত্যে সৌকুমার্য্যে বিশেষরূপে রসাত্মক হইয়া উঠে তাহাকেই সুকুমার শিল্প কহে। এই সুকুমার শিল্পকে আমরা কবি কালিদাসের কথায় ললিত বিজ্ঞান কহিতে পারি। মালবিকাগ্নিমিত্রের দ্বিতীয়াঙ্কে কবি ইহাকে বিজ্ঞানললিত নামে আখ্যাত করিয়াছেন ;—"বিদূষক মহারাজকে বলিতেছেন "ভো ন কেবলং রূবে সিপ্পেবি অদ্বুদিআ মালবিআ।

"ওহে কেবল রূপে নয়, শিল্পেও মালবিকা অদ্বিতীয়া।"

রাজা তাহার উত্তরে বলিতেছেন "বয়স্য!

অব্যাজসুন্দরীং তাং বিজ্ঞানেন ললিতেন যোজয়তা।

উপকল্পিতো বিধাত্রা বাণঃ কামস্য বিষদিগ্ধঃ॥

"বয়স্য অকপট সুন্দরী, মালবিকাকে আবার ললিত বিজ্ঞানযুক্তা করিয়া বিধাতা কামের বিষদিগ্ধ বাণরূপে তাহাকে উপকল্পিত করিয়াছেন।

আমরা কবি কালিদাসের ললিত বিজ্ঞান কথাটীও সুকুমার শিল্পের স্থানে ব্যবহার করিতে পারি।

ইউরোপীয়েরা এই সুকুমার শিল্পের মধ্যে তিনটী বিষয় অন্তর্গত করেন— সঙ্গীত, কবিতা ও চিত্র বিদ্যা। এই বিদ্যাত্রয়কে সৌকুমার্য্যে ঔদার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিল্প রাজ্যের সিংহাসনে বসাইয়াছেন। এই তিনের মধ্যে তাঁহাদিগের মতে মুখ্যরূপে কাব্য বিরাজিত আছে; তিনটীকেই প্রকারান্তরে একরূপ কবিতা বলিতে চাহেন; সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যাকে তাঁহারা কবিতার ভগ্নী বলেন। বাস্তবিক সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা কবিতার সীমার বহির্ভূত নয়। অনেকে সঙ্গীতের সঙ্গে কবিতার যোগ অনুভব করেন, কিন্তু চিত্রাঙ্কনও যে কবিতাপ্রাণ তাহা সেরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাহার কারণ কতকটা বোধ হয় চিত্রের অপেক্ষা সঙ্গীতের সঙ্গে কবিতার নিকট সম্বন্ধ যেন বাহিরে কিঞ্চিৎ প্রকাশ পায়। সঙ্গীতের উপকরণ যেমন স্বর বা শব্দ কবিতার ও উপকরণ সেইরূপ শব্দাক্ষর বা স্বরবর্ণ। কিন্তু চিত্রের সঙ্গেও কবিতার তদনুরূপ নিকট সম্বন্ধ আছে। চিত্রাঙ্কন একরূপ কবিতার অঙ্কশাস্ত্র। অর্থাৎ কবিতাটী চিত্রাঙ্কে কষিয়া তাহাকে সিদ্ধান্তে আনিতে হয়। একজন ইউরোপীয় শিল্পশাস্ত্রকার ঠিক ইহার বিপরীত অথচ অনুরূপ ভাবে আমাদের কথায় সায় দিয়াছেন "Drawing is the poetry of mathamatics." "চিত্রাঙ্কন অঙ্কশাস্ত্রের কবিতা। কবিতার ধর্ম্ম যেমন লেখা, আলেখ্যের ধর্ম্মও সেইরূপ লেখা, কেবল প্রকারে প্রভেদ। ইংরাজ চিত্রকার সার জষুয়া রেনল্ড বলেন "Style in painting is the same as in writing a power over materials, whether words or colowrs, by which conceptions or sentiments are conveyed. কবিতায় আমরা বর্ণাক্ষরের সাহায্যে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করি, সঙ্গীতে স্বরের দ্বারা অন্তরের ভাব পরিব্যক্ত করি। আর চিত্রে বিচিত্রবর্ণে চিত্তের ভাব অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করি। এই তিনেই প্রাচীন ভারত উন্নতিশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতে আর্য্যেরা সঙ্গীত, কবিতা ও চিত্রের মধ্যে পরস্পরের যে কি সম্বন্ধ তাহা রীতিমত বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্যই তাঁহাদের কাব্য নাটকে এই তিনেরই সমাবেশ ও খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীত, কবিতার সঙ্গে তাঁহারা চিত্রেরও সমাদর করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্য

নাটকাদি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বস্তুসকলের চিত্রার্পিত ভাবে রসাস্বাদন করিতে ভারতীয় সংস্কৃত কবিদিগের বড়ই ভাল লাগিত। কোনরূপ দৃশ্য চিত্রে অর্পিত হইয়া যে কি শোভা ও আনন্দের উদ্রেক করে তাহা তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিতেন। মহাভারতে বিরাটপর্ব্বে আছে "সুরোত্তমগণের সেই সমস্ত বহুতর মণিরত্নোদ্ভাসিত গতিশীল ও স্থিতিশীল বিমানসমূহ দ্বারা গগনমণ্ডল যেন সুচারু চিত্রলিখিতের ন্যায় বিরাজিত হইল।" রঘুবংশে আছে।

"বামেতর স্তস্য করঃ প্রহর্ত্তু।
র্নখপ্রভা ভূষিত কঙ্ক পত্রে।
সক্তাঙ্গলিঃ সায়কপুঙ্খ এব।
চিত্রার্পিত ইবাবতস্থে॥

"প্রহারকারী সেই দিলীপ বাণাধারে হস্ত প্রদান করিলে পর তাঁহার দক্ষিণ করের অঙ্গুলি সকল, নখরাগরঞ্জিত কঙ্কপত্র যুক্ত (মাছরাঙার পক্ষযুক্ত) বাণের মূলদেশে সংসক্ত হওয়ায় চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল হইল।" আমাদের প্রাচীন বঙ্গকবি বিদ্যাপতির গানে আছে।

"মাধব পেখনু সোধনি রাই।
চিতপুতলি জনু এক দিঠে চাই।

রাই মাধবকে দেখিয়া যেন চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় চাহিয়া রহিয়াছে।"

মালবিকাগ্নিমিত্রে মালবিকা স্বামীকে চিত্রগত মনে করিয়া অসূয়া প্রদর্শন করিয়াছিল, সখি বকুলা আত্মগত বলিতেছে :—

"চিত্তগদং ভট্টায়ং পরমহুদো সংকপ্পিঅ অসূইস্ সন্ধি। ভোদু কীলইস্সং দাব এদাএ।

"এই মালবিকা প্রকৃতপক্ষেই স্বামীকে চিত্রগত মনে করিয়া অসূয়া প্রদর্শন করিতেছে। আচ্ছা ইহার সহিত ক্রীড়া করিব।

শকুন্তলা নাটকে নটীকে সূত্রধার বলিতেছে "আর্য্যে, সাধু গীতম্। অহো রাগাপহৃত চিত্তবৃত্তিরালিখিত ইব বিভাতি সর্ব্বতো রঙ্গঃ।" আর্য্যে বেশ গাহিয়াছ। অহো তোমার রাগমাধুর্য্যে অপহৃত-চিত্তবৃত্তি হইয়া রঙ্গভূমি চিত্রে আলিখিতের ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্য্যেরা চিত্র বিদ্যার বড়ই অনুরাগী ছিলেন। ছবি আঁকিবার জন্য মূর্ত্তি গড়িবার জন্য তাঁহাদের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত। ছবি আঁকা ও মূর্ত্তিগড়া প্রকৃত চিত্রকারের মনে দম্পতির ন্যায় বিরাজ করে; চিত্রবিদ্যার উন্নতির পক্ষে দুয়েরই সমান আবশ্যকতা আছে। ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাইকেল এনজেলো এই দুই বিষয়েই অভিজ্ঞ ছিলেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে আছে, চিরস্মরণীয়া লোকললামভূতা সাধ্বী সাবিত্রীর পতি সত্যবানের বাল্যাবস্থায় অশ্ব সকল অতিশয় প্রিয় ছিল; তিনি মৃণ্ময় অশ্ব সমুদয় নির্ম্মাণ করিতেন এবং চিত্রপটেও অশ্ব সমস্ত লিখিতেন; এই নিমিত্ত তাঁহার অন্যতম নাম চিত্রাশ্ব ছিল; তিনি চিত্রাশ্ব বলিয়াও উক্ত হইতেন।

"বালস্যাশ্বাঃ প্রিয়শ্চাস্য করোত্যশ্বাংশ্চ মৃণ্ময়ান্।
চিত্রেপি বিলিখত্যশ্বাং শ্চিত্রাশ্ব ইতি চোচ্যতে॥"

চিত্রাঙ্কন ও মূর্ত্তিগঠন এই দুই বিষয় চিত্রবিদ্যার অঙ্গ। প্লিনি বল্লেন গ্রীসেও এই দুইটী বিষয় সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

এই চিত্রাঙ্কন ও মূর্ত্তিগঠনে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যদিগের মত এখন আর আমাদের সে প্রতিভা নাই। তাহার কারণ সে অনুরাগ বা প্রীতি নাই। হায় দুঃখে অবসন্ন হইতে হয় যখন আমাদের দুর্গতির কথা ভাবি। কালে ভারতে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় শিল্পেরও দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। সঙ্গীতও যেমন নিম্ন ব্যবসায়ীর হস্তে পড়িয়া নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে চিত্রবিদ্যারও সেই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকদিগের মধ্য হইতে চিত্রবিদ্যার চর্চ্চার লোপই এই অবনতির কারণ; ছবি আঁকা পোটোর কর্ম্ম ও মূর্ত্তি গড়া কুমো-রের কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইল। সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি তাঁহাদের অযোগ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, ভুলিয়া গেলেন, যে প্রাচীন-কালে এ দেশে রাজা রাজকন্যারাও আনন্দের সহিত চিত্রবিদ্যাভ্যাস করিতেন। তাই আমি বলিতেছি যে সত্যবান মিথ্যা কথা জানিতেন না, শুধু সত্যের জন্য সতবান নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সাবিত্রীপতি চিত্রাশ্বনামধারী সত্যবানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, আমাদের মিথ্যা কু-সংস্কারাদি পরিহারপূর্ব্বক সানন্দে সবল হৃদয়ে চিত্রবিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হওয়া

উচিত। চিত্রশিল্পীরাই জানেন যে চিত্রাঙ্কনে তাঁহাদের কত • অমোদ। "মানব হৃদয়ে চিত্রের প্রভাব" নামক পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়া আসিয়াছি যে চিত্রের অর্থ চিত্তকে বিস্মৃতি হইতে ত্রাণ করা। আমরা যাহা ভালবাসি তাহার রূপ বা মূর্ত্তি আমরা চক্ষের সম্মুখে অথবা স্মৃতিপথে সমুদিত রাখিতে চাই। তাহা ভুলিতে ইচ্ছা হয় না। তাঁহাকে স্মরণে জাগ্রত রাখিয়া তাহার বিচ্ছেদ জনিত ক্লেশের উপশম করিতে এবং তাহার প্রীতিসুখ উপভোগ করিবার জন্য ইচ্ছা হয়। তাহার চিত্রমূর্ত্তি দেখিয়া তাহার সহিত দুটো মনের কথা কহিতে প্রবৃত্তি হয়। কোন বৈষ্ণব সাধক গাহিয়াছেন "পিরীতির মুরতি চিত্র বানাইয়া কহিয়ে মনের কথা।" এই পিরীতির মূরতি চিত্র বানাইয়া মনের কথা কহিবার জন্ম ভারতে কিনা হইয়া গিয়াছে। পরমপ্রীতির আস্পদ অনন্তস্বরূপ পরমেশ্বরের অসংখ্য রূপমূর্ত্তি কল্পনা হইয়া গিয়াছে। "ন তস্য প্রতিমা অস্তি" তথাপি তাঁহার প্রতিমার শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই প্রীতির প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিতে গিয়াই গ্রীসে সর্ব্বপ্রথম চিত্রবিদ্যার আরম্ভ হয়। এতৎ সম্বন্ধে প্লিনির একটী উপাখ্যান আছে;— "সাগনের সুন্দরী কন্যা ডিবুটাডেস, তাহার প্রিয়তমের বহুদিন সাক্ষাৎ না পাওয়ায়, বিরহে ব্যাকুল ছিল; এবং তাহার প্রীতি সুধাপানের জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। সৌভাগ্য বশতঃ একদিন তাহার প্রিয়তম আসিয়া উপস্থিত হইল। দুজনের মধ্যে অনেকদিনের পর সাক্ষাৎ, উভয়ের মধ্যে পরস্পরের একাগ্রচিত্ততার সম্বন্ধে নানা কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে, যুবক আবেশে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন সেই কন্যার কাছে তাহার প্রিয়ের মুখমণ্ডল যেন "মদন বাঁটিয়া কেবা বদন গড়িল গো"। সেই রমণীয় সময়ে অপ্সরাসদৃশী কন্যা ডিবুটাডিস সহসা দেখিতে পাইল যে তাহার প্রিয়তমের পাশের ছবি দেওয়ালে পড়িয়াছে; তাহার প্রিয়ের মূর্ত্তিটী আঁকিয়া লইবার ইচ্ছা হইল। পরে তাড়াতাড়ি সেই অনুরাগিনী অনুরাগ ভরে একটী কয়লা লইয়া দীপালোকে দেওয়ালে পতিত সেই ছায়ার দাগে দাগে চিত্র আঁকিয়া লইল। তাহার পিতা সেই অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহার তৎক্ষণাৎ সেই ছবিটী যতদূর সম্ভব আরও ভালরূপে বাচাইয়া রাখিবার অভিলাষ জন্মিল

তিনি তাহার একটী মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া তাহা অগ্নিতে সেঁকিলেন। ১ এই কন্যা ডিবুটাডিসের এই প্রেমচিত্রের দৃষ্টান্ত আমাদের ভারতের প্রাচীন উপাখ্যানদির মধ্যে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়; আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রে রাগিণী ধানশ্রীর ধ্যানের বর্ণনায় আছে।

"দুর্ব্বাদল শ্যাম তনু মনোজ্ঞা কান্তং লিখন্তী বিরহেন দূনা।

বিরহে ব্যাকুল হইয়া ধনাশ্রী কান্তের চিত্রাঙ্কনে রতা! মেঘদূতে উত্তর মেঘে যক্ষ তাহার বিরহ বিধুরা সাধ্বী পত্নীর সম্বন্ধে নানা কথা কহিতে বলিতেছে;—"মৎসাদৃশ্যং বিরহ তনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।" আমার সাদৃশ্য বা বিরহ-তনু যতদূর ভাবগম্য আলিখিত করিতেছে। মালতী মাধবে মকরন্দ কলহংসকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "কলহংসক, কেনৈতন্মাধবস্য প্রতিবিম্বমালিখিতং? কাহা কর্ত্তৃক মাধবের চিত্র আলিখিত হইয়াছে?"

কলহংস কহিতেছে —"জেণ জেব্ব সে হি অত্যং অবহরিদং"

যাঁহা কর্ত্তৃক ইহার হৃদয় অপহৃত হইয়াছে।

মক। অয়ি মালত্যা? মালতীকর্ত্তৃক?

কল। অধইং! আর কি।

কান্তের ভাবে মুগ্ধা কামিনীগণের প্রিয় চিত্রাঙ্কন হৃদয়রাজ্যে এক অভিনব স্বপ্নের সৃজন করে। মনে হয় "লাবনী বাঁটিয়া কেবা চিত্ত নিরমাণ কৈল অপরূপ রূপের বলনি।" সংস্কৃতগ্রন্থে যেমন কান্তের ভাবে মুগ্ধা কামিনীগণের চিত্রাঙ্কনের বিষয় আছে সেই প্রকার প্রিয়তমার ভাবে মুগ্ধ কান্তগণের চিত্রাঙ্কনের বিষয়ও পাওয়া যায়। শকুন্তলায় বিদূষক রাজাকে বলিতেছেন "কেন এই তো তুমি যে লিপিকরী মেধাবিনীকে তোমার স্বহস্তে লিখিত শকুন্তলার চিত্রপট ল'য়ে মাধবীলতামণ্ডপে যেতে আদেশ করলে!"

বিক্রমোর্ব্বশীর দ্বিতীয়াঙ্কে বিদূষক রাজাকে উর্ব্বশীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া আত্মবিনোদনে পরামর্শ দিতেছেন। বলিতেছেন—

"স্বপ্নসমাগমকারিণী নিদ্রা সেবন কর, অথবা সেই উর্ব্বশীর প্রতি-

---

১ এইমূর্ত্তিটী কোরিন্থের সাধারণ ভাণ্ডারগৃহের ধ্বংসের শেষ দিন পর্য্যন্ত রক্ষিত হইয়াছিল।

কৃতি চিত্রফলকে অঙ্কিত করিয়া তাহা দেখিয়া আত্মাকে বিনোদন কর। মালতীমাধবে দেখিতে পাওয়া যায় মালতীও যেমন প্রিয় মাধবের চিত্র আঁকিয়াছিলেন সেইরূপ মাধবও প্রিয়া মালতীর ছবি আঁকিয়াছিলেন।

এইরূপে দেখা যায় পূর্ব্বে ভারতের রাজা ও রাজকন্যাগণ প্রভৃতি চিত্র-বিদ্যায় সুনিপুণা ছিলেন। এই কারণে তাঁহারা চিত্রের দোষগুণের সাধ্যমত সমালোচনা করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। ভাল মন্দ বিচার পূর্ব্বক তাহার প্রকৃত রসগ্রহণে যত্নবান হইতেন। মালবিকাগ্নিমিত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজা বিদূষককে মালবিকার অসুসম্পন্ন চিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

রাজা। বয়স্য চিত্রগতায়ামস্যাং কান্তিবিসংবাদশঙ্কি মে

হৃদয়ম্। সম্প্রতি শিথিলসমাধিং মন্যে যেনেয় মালিখিতা॥

রাজা। বয়স্য! ইহাকে চিত্রে দেখিয়া ইহার অন্যরূপ কান্তি ভাবিয়া শঙ্কা হইয়াছিল, সম্প্রতি বুঝিতে পারিতেছি, যে ইহার ছবি আঁকিয়াছে, সে শিথিলসমাধি—সমাধান বিষয়ে শিথিল—অর্থাৎ ভালরূপে ছবি সম্পন্ন করিতে পারে নাই।

পূর্ব্বে ভারতে চিত্রকারদিগের বেশ সমাদর ছিল। আমাদের রাজারা গুণ দোষ সমালোচনা করিতেন, এবং সেই সঙ্গে তাহাদের গুণের পুরস্কার দিয়া উৎসাহ দিতে বিরত হইতেন না। দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার একটী কাহিনীর মধ্যে আছে। বহুশ্রুত রাজা বড় কামী ছিলেন; তিনি কামাধিক্য বশতঃ স্বীয় রাজ্ঞী ভানুমতীকে সিংহাসনে বসিবার সময় অর্দ্ধাসনে উপবেশন করাইতেন তাই দেখিয়া মন্ত্রী তাহার প্রতিবাদ করিয়া রাজার অনুচিত কার্য্য বলিয়া কত নিবেদন করিলেন। রাজা বলিলেন সকলই জানি, কি করি রাজ্ঞীকে ত্যাগ করিয়া আমি ক্ষণমাত্র থাকিতে পারি না। তখন মন্ত্রী কহিলেন "তর্হ্যেব ক্রিয়তাম! রাজ্ঞোক্তং কিং নিষ্পাদ্যতাম্। তেনোক্তং চিত্রকার মাহূয় তেন পটস্যোপরি ভানুমত্যা রূপং লেখয়িত্বা পুরস্থিতে ভিত্তিপ্রদেশে সংঘট্য তস্যাঃ স্বরূপং দ্রষ্টব্যম্। তদ্বচনং রাজ্ঞঃ চিত্তে লগ্নম্। ততো রাজা চিত্রকার মাহূয়োক্তবান ভো চিত্রকার ভানুমত্যা রূপং চিত্রে লেখনীয়ম্। চিত্রকারেণোক্তং ভো দেব তস্যাহং রূপং প্রথমং প্রত্যক্ষ বিলোক্য পশ্চাদ্য-

থাবয়বং বিলিখিষ্যামি। তচ্ছ্রুত্বা রাজ্ঞা ভানুমতী আকারিতা তস্মৈ দর্শিতা চ। স তু তাং পদ্মিনী স্ত্রী ইয়মিতি বিজ্ঞায় পদ্মিনীলক্ষণযুক্তাং বিলিলেখ।

"তবে একটী কায করুন। রাজা বলিলেন 'কি তা নিরূপণ কর। মন্ত্রী বলিলেন চিত্রকারকে ডাকিয়া তাহার দ্বারা ভানুমতীর রূপ লেখাইয়া পুরস্থিত ভিত্তি প্রদেশে রাখিয়া তাহার স্বরূপ দ্রষ্টব্য। তাহার বাক্য রাজার মনে লাগিল। তখন রাজা চিত্রকারকে ডাকিয়া বলিলেন—অহে! ভানুমতীর রূপ চিত্রে লিখিতে হইবে। চিত্রকার বলিল দেব আমি তাঁহার রূপ প্রথমে প্রত্যক্ষ দেখিয়া পশ্চাৎ তাঁহার যে প্রকার অবয়ব লিখিব। তাহা শুনিয়া রাজা ভানুমতীকে সম্মুখে আনাইয়া তাঁহাকে দেখাইলেন। সেই চিত্রকার তাঁহাকে বিলোকন করিয়া পদ্মিনী স্ত্রী এইরূপ বিজ্ঞান করত, তাঁহাকে পদ্মিনী লক্ষণযুক্ত করিয়া চিত্রিত করিল।" রাজা চিত্রলিখিত ভানুমতীর রূপ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া চিত্রকারকে উচিত পুরস্কার দান করিলেন।

চিত্রকার যে ভানুমতীকে আঁকিবার পূর্ব্বে রাজাকে বলিল "আমি তাঁহার রূপ প্রথমে প্রত্যক্ষ দেখিয়া পশ্চাৎ যথা অবয়ব আঁকিব।" ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে পূর্ব্বে চিত্রকারেরা life অর্থাৎ জীবন্ত প্রাণীকে দেখিয়া তাহার প্রতিকৃতি নির্ম্মাণকরণে সক্ষম ছিলেন। তাহার উপর তাঁহারা জীবন্ত ব্যক্তিকে তাহার স্বীয় লক্ষণযুক্ত করিয়া অর্থাৎ মনুষ্যের বিশেষত্বযুক্ত করিয়া আঁকিতে চেষ্টা করিতেন। এই লক্ষণাক্রান্ত করিয়া আঁকিবার কথায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে প্রাচীনকালে ভারতবাসীরা চিত্রবিদ্যায় বিশেষরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

লক্ষণাক্রান্ত করিয়া আঁকা চিত্রে কতকটা ideal প্রাণ দেওয়া ভিন্ন আর কি। যাহার যে ভাবটী প্রাণগত তাহা চিত্রে বিকাশ করিয়া তোলাই যথার্থ চিত্রকের উপযুক্ত কার্য্য। তাহাতে চিত্রকারের প্রকৃত শিল্পের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। লক্ষণাক্রান্ত করিয়া আঁকাতেই চিত্রিত বিষয়ের অন্তরঙ্গ সম্পাদিত হয়। যাঁহার চিত্রে বহিরঙ্গ সাধনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সাধিত হয়—পরিস্ফুটতা লাভ করে তাঁহার চিত্র শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে ও সমধিক চিত্তাকর্ষণে সক্ষম হয়। "বহিরঙ্গ বিধিভ্যঃ স্যাদন্তরঙ্গ বিধির্বলী" বহিরঙ্গবিধি

হইতে অংস্তরঙ্গ বিধি বলী। কারণ বহিরঙ্গ সম্মুখস্থিত প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রত্যয়াশ্রিত হইয়া কার্য্য করে, আর অন্তরঙ্গ সেই প্রকৃতি—স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে "প্রত্যায়াশ্রিত কার্য্যন্তু বহিরঙ্গমুদাহৃতং। প্রকৃত্যাশ্রিত কার্য্যং স্যাদন্তরঙ্গমিতি ধ্রুবং।"

ভাল চিত্রকর হইতে ইচ্ছা করিলে প্রকৃত্যাশ্রিত কার্য্য অর্থাৎ অন্তরঙ্গ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে ইঙ্গিতে চিত্রের ভাব ধরিতে পারা যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিই, ধরুন ঝড়ের মেঘ আঁকিতে ইচ্ছা হইয়াছে। ঝড়ের মেঘের বহিরঙ্গ দেখিয়া আমাদের ঝড়ের মেঘ বলিয়া প্রতীতি বা প্রত্যয় হইলে আমরা তাহা চিত্রে অঙ্কিত করিলাম। কিন্তু এই বহিরঙ্গ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার প্রত্যয়াশ্রিত কার্য্যের বল অপেক্ষা অন্তরঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রকৃত্যাশ্রিত কার্য্যের বল আরও অধিক। কারণ ঝটিকার মেঘের দৃশ্য বহিরঙ্গ না পাইলেত আর আঁকিতে পারিব না, কিন্তু ঝটিকা মেঘের প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিলে তাহার অন্তরঙ্গ আয়ত্ত হইল। ইহাতে আমরা যখন ইচ্ছা মেঘের প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রিত করিতে সমর্থ হইব। ঝটিকার সময় কিরূপে কি ছন্দে মেঘেরা ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে, কিরূপে তাহার ইন্দ্রজাল রচিত হয়, ইত্যাদি ঝটিকার মেঘের প্রকৃতিটী একবার বুঝিতে পারিলে আমরা যখন ইচ্ছা ঝড়ের মেঘের স্বভাব অক্লেশে আলিখিত করিতে পারিব। এই অন্তরঙ্গের দিকে যত আমাদের দৃষ্টি থাকিবে ততই আমাদের শিল্প স্বভাবিক হইয়া উঠিবে, প্রকৃত স্বভাব অঙ্কনে আমরা কৃতকার্য্য হইব।—যাহার যেরূপ স্বভাব তাহা বহিরঙ্গে কিঞ্চিৎ ব্যক্ত হয় মাত্র—বহির্লক্ষণরূপে আভাস পাইতে থাকে—চিত্রকবি প্রকৃতির সেই স্বভাবরূপ অন্তরঙ্গ হইতে চিত্রকে আপনার মনোমত ফুটাইতে পারেন। এই লক্ষণাক্রান্ত করিয়া ফুটাইতে পারা কৃত্রিম কৌশলে ফুটাইয়া তোলা কি কম শিল্পের কার্য্য। মনে করুন, এক ধার্ম্মিক ব্যক্তির কেহ ছবি আঁকিতে আসিয়াছে, আঁকিতে আসিয়া দেখিল তিনি কোন কারণ বশতঃ দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছেন, মুখ জ্যোতিহীন ম্লান হইয়া গিয়াছে, তাই বলিয়া চিত্রকার সেই সময়ে তাহার ছবি আঁকিতে আসিলে কি তাহার সেই ভাবের অনুকরণ করিবে? না, তাহাকে ধর্ম্মের প্রভাব প্রভাবিত করতঃ তাঁহাকে

প্রকৃত ধর্ম্মের লক্ষণাক্রান্ত করিয়া আঁকিবে? চিত্রকার র‍্যাফেলের এই লক্ষণাক্রান্ত করিয়া আঁকিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রন্থোক্ত 'অ্যাপসল'দিগের চেহারা ভাল না হইলেও তাহাদের মুখে গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য প্রভৃতি ধর্ম্মের লক্ষণসমূহ ফুটাইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মভাবে শোভিত করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ইংরাজ চিত্রকর সার জষুয়া রেনল্ড এইরূপ লক্ষণসম্পন্ন চিত্রাঙ্কনের মর্য্যাদা বুঝিয়াই বলিয়াছেন"—Alexander is said to have been of a low stature, a painter ought not so represent him. Agesilaus was low, lame and of a mean appearance. None of these defects ought to appear in a piece of which he is hero. In conformity to custom, I call this part of the art history painting, it ought to called poetical, as in reality it is."

সার জষুয়া রেনল্ড এইরূপ চিত্রাঙ্কনের কবিত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তিনি বলেন এইরূপ চিত্রাঙ্কন সত্যের বিরোধী নয়; বরঞ্চ অনুগত। তিনি আরও বলিয়াছেন "He (The painter) can. not make his hero *talk like a great man he must make him look like one.* বাস্তবিক নায়ক নায়িকার প্রকৃত লক্ষণ জীবিত মূর্ত্তিতে নানাভাবের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু তাহাদিগকে তাহাদের স্বীয় লক্ষণাক্রান্ত করিয়া চিত্রার্পিত করিতে গেলে চিত্রের দৃশ্যটার প্রতি একটু বেশী ঝোঁক দিয়া যতটা পারা যায় অভাব পূরণ করিয়া লইতে হয়। কবি কালিদাস এইরূপ চিত্রাঙ্কনের মর্য্যাদা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার রঘুবংশের প্রথমসর্গে নায়ক দিলীপকে কেমন বীরত্বের লক্ষণান্বিত করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। "ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুমহাভুর্জঃ।" ইহাতে ক্ষত্রিয় রাজা দিলীপের বীরোচিত সাক্ষাৎ মূর্ত্তি আমাদের কাছে কেমন দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত (দ্বাংত্রিশৎ পুত্তলিকা গ্রন্থোক্ত) চিত্রকার রাজার সাতিশয় প্রিয়া রাজ্ঞী ভানুমতীর রূপ দেখিয়া তাঁহাকে রমণীর শ্রেষ্ঠ অনুভব করিয়া তাঁহাকে পদ্মিনীলক্ষণাক্রান্ত করিয়া আঁকিলেন। পদ্মিনী লক্ষণ রমণীর শ্রেষ্ঠলক্ষণ। আমাদের শাস্ত্রে চারিজাতীয়া রমণী আছে; পদ্মিনী, চিত্রাণী, শঙ্খিণী ও হস্তিনী। ইহাদের মধ্যে পদ্মিনী শ্রেষ্ঠা।

পদ্মিনীর লক্ষণ কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন ;—

কমল মুকুল মৃদ্বী ফুল্লরাজীবগন্ধা
সুরত পয়সি যস্যাঃ সৌরভং দিব্যমঙ্গে
চকিত মৃগসনাভে প্রান্তরক্তে চ নেত্রে
স্তনযুগলমনর্ঘং শ্রীফল শ্রীবিড়ম্বি
তিলকুসুমসমানাং বিভ্রতী নাসিকাং বা
দ্বিজ সুর গুরু পূজাং শ্রদ্দধানা সদৈব
কুবলয় দলকান্তিঃ কাপি চাম্পেয় গৌরী
বিকচ কমলকোশা কামিনী কান্তপত্রা।
ব্রজতি মৃদুসলীলং রাজহংসীব তন্বী।
ত্রিবলি ললিতমধ্যা হংসবাণী সুবেশা।
মৃদু লঘু শুচি ভুঙ্‌ক্তে রাজহংসী সুকেশী
ধবল কুসুম বাসোবল্লভা পদ্মিনী স্যাৎ।

শাস্ত্রে আর দুই প্রকার পদ্মিনী লক্ষণ লিখিত আছে ;—

(১) সতী পতিব্রতা যা চ সদা ধর্ম্মপরায়ণা।
মৃগাক্ষী পদ্মগন্ধা চ সুবাণী কোকিলস্বনা।
জগন্মোহয়তে যা চ কটাক্ষৈঃ সুমনোহরৈঃ।
মরালগমনা যা হি যা তু স্মিতশুভাননা।
সদা স্নেহময়ী যা তু সুলক্ষণৈঃ সুলক্ষিতা।
শাস্ত্রেষু তাদৃশী নারী পদ্মিনী সংস্মৃতাবুধৈঃ॥

(২) ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা
অবিরল কুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী।
মৃদুবচনশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা
সবল তনু সুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা॥

শিব এই পদ্মিনী লক্ষণাক্রান্তা সতীকে রমণী শ্রেষ্ঠা বলিয়া গিয়াছেন। শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

"ধর্ম্মশীলা সুশীলাচ পদ্মগন্ধেন বাসিতা। পদ্মিনী রমণী শ্রেষ্ঠা জানীহি পরমেশ্বরি
"হে পরমেশ্বরী! ধর্ম্মশীলা সুশীলা এবং পদ্মগন্ধে সুবাসিতা পদ্মিনী রমণী শ্রেষ্ঠা

বলিয়া জানিবে। তাই চিত্রকার রাজার অত্যন্ত প্রিয়া রাজ্ঞী ভানুমতীকে রমণীশ্রেষ্ঠভাবে উপলব্ধি করতঃ তাঁহাকে পদ্মিনী অর্থাৎ রমনীশ্রেষ্ঠ লক্ষণাক্রান্তা করিয়া চিত্রিত করিলেন। রাজা তাঁহার প্রিয়া রাজ্ঞী ভানুমতীকে সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শে চিত্রিত দেখিয়া অতীব আহ্লাদ সহকারে চিত্রকারকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করা ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে মহত্ব আনয়ন করা হেয়ক শ্রেয়োরূপ দান করাই চিত্রকবির মহান্ ব্রত। এই ব্রতে দীক্ষিত না হইলে চিত্রকবির প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

চিত্রে প্রাণ ফুটাইতে গেলে, চিত্র সুসম্পন্ন করিতে হইলে অতি সামান্য ক্ষুদ্র অংশকেও তুচ্ছ জ্ঞান না করা কর্ত্তব্য। মাইকেল এনজেলো চিত্রের ক্ষুদ্র অংশ সমূহ (details) অগ্রাহ্য করিতেন না; তাই তিনি তাহাতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এইটী বিশেষরূপে জানা উচিত যে কোন বিষয়ে সামান্যকে অবহেলা না করিলেই অসামান্যতা লাভ করা যায়। চিত্রাঙ্কনে যাঁহারা নিরভিমানী হৃদয়ে তন্নবিতন্ন করিয়া দোষ ও ভ্রম পরিহারে যত্নবান হ'ন তাঁহাদেরই ছবি ক্রমশঃ ভ্রম শূন্য নির্দ্দোষ হইয়া স্বাভাবিক জীবন্ত (natural lifelike) হইয়া উঠে। তাঁহারাই পটে পাষাণে মূর্ত্তি রচনা করিয়া তাহাতে ঠিক যেন প্রাণ দিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহাদের প্রস্তুত মূর্ত্তি দেখিলে চিত্র মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চিত্র মূর্ত্তিমান করিতে যাঁহারা পারেন তাঁহারাই প্রকৃত চিত্রকার বা চিত্রকবি।

ভারতবাসীরা যেমন সঙ্গীতে রাগ মূর্ত্তিমান করিতে জানিতেন, [illegible] চিত্রকেও মূর্ত্তিমান করিতে জানিতেন। তাহার বহুল দৃষ্টান্ত প্র[illegible] হইতেই যাইতে পারে। এই বঙ্গদেশে কৃষ্ণনগরের মূর্ত্তকেরা তাহার সা[illegible]বল কারণ তাহারা মৃণ্ময় মূর্ত্তিগুলিকে কেমন মূর্ত্তিমান করিয়া গড়িতে [illegible]হি প্রীতির দের সম্বন্ধে আর অধিক বলা বাহুল্য। তাহারা তাহাদের [illegible]বে সর্ব্বদেশে কৌশলে সমগ্র পৃথিবীকে মোহিত করিয়াছে—ইউরোপের প্র[illegible] উন্নতি লাভ তাহারা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ভারতের অত্যা[illegible]ন্নতি সাধন মূর্ত্তি বা চিত্রের জলন্ত নিদর্শন এখনও দুর্লভ নয়। এই সকল [illegible]জাতি এই

নৈপুণ্য দেখিয়া ইউরোপীয়েরা পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। সার্ ডবলিউ স্লিমান সাহেব (ভূতপূর্ব্ব ভারতীয় কোন রাজ কর্ম্মচারী) বলেন "মধ্য প্রদেশে বেরা ঘাটে একটী পাহাড় আছে; নর্ম্মদা নদী হইতে সেই পাহাড় দেখা যায়; সেই গিরিপৃষ্ঠে একটী মূর্ত্তি আছে সে মূর্ত্তিটী হইতেছে—একটী ষাঁড় হরপার্ব্বতীকে পৃষ্ঠোপরি বহিয়া লইয়া যাইতেছে। হরপার্ব্বতীর প্রত্যেকের হস্তে সর্পসমূহ আলুলায়িত রহিয়াছে; কটিবন্ধের মত হইয়া একটী প্রকাণ্ড সর্প শিবের কটিভাগ বেষ্টন করিয়া আছে। এতদ্ব্যতীত মনুষ্য মূর্ত্তি আরও অনেক নাগ (demon) ষাঁড়ের পেটের অধো দেশে শয়ান। এ সমুদয় মার্ব্বেল পর্ব্বতের মধ্যস্থিত একটা পরিখা হইতে প্রকাণ্ড কঠিন কৃষ্ণশিলা একখণ্ড বাহির করিয়া তাহা ভালরূপে কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। লোকে সেই মূর্ত্তিগুলিকে গৌরীশঙ্কর বলে। আমি সেখানে হাটে ঠিক ইহারই অনুরূপ, জয়পুর হইতে আনীত পিত্তলেরও মূর্ত্তি বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত দেখিয়াছি, কিন্তু ইহার মত এত ভালরূপে মাপাজোকা করিয়া প্রস্তুত নয়। পিত্তলের মূর্ত্তিটীর দিকে বিশেষ-রূপে নিরীক্ষণ করাতে তথাকার লোকেরা বলিল, যে পিত্তল মূর্ত্তিও ইহার মধ্যে প্রভেদ এই কারণে যে, পিত্তলের মূর্ত্তিটি মানুষের নির্ম্মিত আর মন্দিরের 'গৌরীশঙ্কর' দেবতারা জীবন্তপ্রাণীকে প্রস্তরীভূত করিয়াছেন। তাই প্রস্তরমূর্ত্তি এত জীবন্ত দেখাইতেছে।" জনৈক ইউরোপীয় মহিলা মন্দিরের এই মূর্ত্তিগুলির সম্পূর্ণতা ও ঔৎকর্ষ্য দেখিয়া বিস্মিতভাব প্রকাশ করিয়া ছিলেন। ইহার চতুর্দ্দিকে আর যে সকল প্রতিকৃতি ছিল তৎসমুদায় মুসলমানেরা [illegible]বিখণ্ড করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এখানকার একজন পুরাতন ভূস্বামী [illegible] এই মূর্ত্তি সমষ্টি ইহার চতুর্দ্দিকস্থ মূর্ত্তি [illegible]মষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক [illegible]রা যথার্থ রক্তমাংসের পরিণতি এবং কোন মর্ত্ত্য হস্ত ইহার [illegible]ত করিতে পারে না। সেদিন আসিতে আর বেশী বিলম্ব [illegible]ই আকৃতি গুলিতে প্রাণ পুনঃ প্রদত্ত হইবে, কারণ দেবতারা [illegible]রা তাহাদের পুরাতন দেহকে পুনর্জ্জীবিত করিবে।

[illegible]ৎ বিখ্যাত ওলড্‌হাম্ সাহেব বলেন "গাজীপুর জেলায় [illegible]নামক গ্রামে অনেক বড় বড় খোদিত প্রস্তরসমূহ ছড়ান রহি-

য়াছে এবং খণ্ডপ্রস্তরমূর্ত্তি সমূহ এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় যে গাজীপুরে যাইবার কালে আমি অনায়াসে উনত্রিশটী প্রস্তরমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ঐ সকল আকৃতি সমূহের তেজঃস্কর কৃতিত্ব এবং তাহাদের শিরোবেশের প্রাচ্য সৌন্দর্য্যের দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে সেই সকল প্রস্তরমূর্ত্তি কোন উন্নত প্রাচীন কালের খোদিত। সে কাল ভারতের বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে।" আরও বলেন "গাজীপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরস্থিত ঘোসপুর নামক স্থানে বকসরের পথপ্রান্তে বড় বড় পাথর এবং রাশি পরিমাণে ইষ্টক পতিত হইয়া রহিয়াছে। সময় সময় তাহাদের মধ্য হইতে অনেক নূতন মূর্ত্তি আবিষ্কার করা হইয়াছে;—একটী পুষ্করিণী খনন করিতে গিয়া একটী পাথরের স্ত্রীমূর্ত্তির উপরার্দ্ধ পাওয়া যায়, তাহা সুন্দররূপে খোদিত; ইহা ক্রমে তথাকার লোকের পূজার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। নিকটেই এক শিবালয় হইতে পরে ইহার অপরার্দ্ধ নিম্নভাগ পাওয়া যায়; এবং আরেকটী সম্পূর্ণ স্ত্রী মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসঙ্গে একটি অতি সুন্দর সিংহ মূর্ত্তিও (দৈর্ঘ ৪ ফিট এবং ৩ ফিট) পাওয়া যায়।"

আমাদিগের বিশ্বাস এ সকল মূর্ত্তি যখন শিবালয়ের ও তৎসন্নিহিত স্থানে পাওয়া গিয়াছে তখন দেবতা ও দেবতার উপাখ্যান সম্পর্কীয় মূর্ত্তি—সম্ভবতঃ সিংহবাহিনী দেবীমূর্ত্তি হইবে। যাহাই হউক এসকল প্রস্তর মূর্ত্তি দেবতা-প্রীতি সম্ভূত কল্পিত মূর্ত্তি যে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেবপ্রীতি হইতে ভারতের শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পৃথিবীর অপরাপর দেশেও এই দেবপ্রীতি হইতেই শিল্পের সমধিক উন্নতি হইয়াছে।

শিল্পোন্নত প্রাচীন গ্রীসের শিল্পে উন্নতি দেবতার প্রীতি হইতেই হইয়াছিল। কিন্তু সকলের উপরে দেখা যায় যে শিল্পের উন্নতির মূল কারণ প্রীতি বা বিশুদ্ধ অনুরাগ। ইহা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি যে এই প্রীতির কারণেই গ্রীসে চিত্রের সূত্রপাত হয়। এই প্রীতিরই প্রভাবে সর্ব্বদেশে শিল্পের অনুশীলন হইয়াছে। শিল্প দেবভাবসিক্ত হইয়া সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে দেখা যায়। দেবপ্রীতিতে ভারতে যেমন শিল্পের উন্নতি সাধন হইয়াছিল এমন কোথাও হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। হিন্দুজাতি এই

দেবতার প্রতি প্রীতিবশতঃ শিল্পে সমধিক দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। "ওলড্‌হাম সাহেব বলেন "The statues of the gods are engraved in stone with wonderfull art, and there shine under without number." "দেবতার মূর্ত্তিসমূহ আশ্চর্য্য শিল্প কৌশলে প্রস্তরে খোদিত এবং তাহারা অসংখ্য।"

এই দেবপ্রীতির বিকাশের সঙ্গে মানবের শিল্পে সত্য সুন্দর ও মঙ্গলভাবের উৎকর্ষ সাধিত হইবে।—শিল্পের দ্বারা 'সত্যং শিবং সুন্দরং' সেই পরব্রহ্মের মহিমা জগতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙ্গালীর বড়লোক।

কেহ বলে ভাল আর কেহ বলে মন্দ
বাঙ্গালীর ঘরে শুধু মতভেদ দ্বন্দ্ব!
আপনি বাজায়ে কেহ লহে করতালি—
প্রাণপণে প্রাণ দিয়া কেহ পায় গালি।
স্বার্থ যে করিবে সিদ্ধি বঙ্গবীর গুলি
উঠাইবে স্বর্গে তারে বাক্যযানে তুলি।
স্বার্থ যদি হয় ব্যর্থ, পলক মাঝারে
ফেলি' দিবে রসাতলে তুলেছিল যারে।
গরীবের নাহি মান যত বড় হোক—
যার আছে ঢাক ঢোল সেই বড় লোক।
রাম বলে নাহি লোক শ্যামের মতন
হরি বলে তিনকড়ি অমূল্য রতন।
এমনি উর্ব্বরা দেশ হায়, বস্তা বস্তা
ঘরে ঘরে বড়লোক অতিশয় শস্তা!

শ্রীসঃ।

রণক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজ।

করিবারে নারি যদি এ রাজ্য শাসন
বৃথা মের ক্ষাত্রতেজ, এই সিংহাসন ;
প্রজা যদি মারা যায়, আমি তার হেতু ;
যাই, যাই, যুদ্ধে যাই হ'য়ে ধূমকেতু,
উত্তর পশ্চিম হ'তে ভারতে যবন
আসে ঘোর ক'রে যেন ঝটিকা পবন ;
যাই যুদ্ধে ল'য়ে আমি কোটি যোদ্ধৃবর্গ
সুশিক্ষিত বশীভূত সংগ্রামকুশল—
জগতে ভারত এই দিব্য ধাম স্বর্গ
তাহায় লোলুপ রক্ষ যবনের দল !
বিলম্ব নয়রে আর যাই আমি রণে,
সেথা মোর মহাস্বর্গ জীবনে মরণে ;
হইয়া ক্ষত্রিয় রাজ জানি ক্ষাত্রবল,
তুচ্ছ করি লোষ্ট্রবৎ কালের কবল।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রকৃতির প্রেরণা।

প্রকৃতির ইঙ্গিতে জীবশ্রেণী যে সকল কার্য্য [illegible] হয়, তাহাতে বিলক্ষণ উদ্দেশ্যমূলকতা বিদ্যমান আছে। কিন্তু কার্য্যের পরিণাম বা গূঢ় অভিপ্রায় প্রকৃতির অন্ধক্রীড়নক তির্য্যক প্রাণীনিগ্রহের সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাত। মানুষ ইতর প্রাণী অপেক্ষা অনেকটা চক্ষুষ্মান, তাই প্রকৃতির আজ্ঞাবহ হইয়া কার্য্য করিলেও তাহার প্রেরণার অভিসন্ধি কতকটা বুঝিতে সমর্থ। তাহা বুঝুক আর নাই বুঝুক, প্রকৃতি যে অভিপ্রায় সাধনের নিমিত্ত

যখন তাহাকে যে দিকে পরিচালনা করে সে বাধ্য হইয়া তাহার অনুসরণ করে, এবং প্রকৃতির মনোগত উদ্দেশ্যের দিকে সে সময়ে তাহার বড় একটা লক্ষ্য থাকে না। এইস্থলে মানুষ ও তির্য্যক প্রাণীতে পার্থক্য এই, প্রথমোক্ত প্রাণী প্রকৃতির অভিসন্ধি না বুঝিয়াই কার্য্য করে, শেষোক্ত প্রাণী বুঝিলেও তৎপ্রতি দৃষ্টিহীন হইয়া প্রকৃতির আদেশ পালন করে।

অপত্যস্নেহ মানুষ এবং অন্যান্য অধিকাংশ ইতর প্রাণী সম্বন্ধে প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় বিধান। সৃষ্টিরক্ষা এই প্রেরণার গূঢ় অভিপ্রায়। কিন্তু সযত্নে সন্তান পালন প্রকৃতির উদ্দেশ্য ইহা মনে করিয়া কিছু প্রসূতি বক্ষের শোণিত অকাতরে বিতরণ করতঃ উহাকে পোষণ করে না। শিশুকে বক্ষে রাখিয়া তাহার বড়ই আরাম, তাই অশেষ ক্লেশের বিনিময়েও সে অপত্য লালনের সুখ ক্রয় করিয়া থাকে।

আসঙ্গ-লিপ্সা জীবরাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুরতিক্রম্য বিধান। মনুষ্য বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতি এই প্রেরণার মূলে সৃষ্টিবিস্তারের অভিসন্ধি নিহিত রাখিয়াছে। কিন্তু মানুষ সে উদ্দেশ্য বুঝিয়া সকল সময়ে চলে কৈ? অধিকাংশ সময়ে ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিই তাহার লক্ষ্য। চতুরা প্রকৃতি কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সাধক কার্য্যে এমনই মাদকতা মাখিয়া রাখিয়াছে যে, কার্য্যের পরিণামফল লাভের প্রতি উদাসীন হইয়া কার্য্য সম্পাদনের জন্যই সংসার লালায়িত। তাহাতে প্রকৃতির অভিপ্রায়সাধনে ব্যাঘাত বড় হয় না। কিন্তু উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে প্রকৃতির অভিপ্রেত বিষয় সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ কথা অবশ্যই মানবজাতিতে প্রয়োজ্য।

শিক্ষা, উপদেশ, অভিজ্ঞতা বা ভূয়োদর্শন নিরপেক্ষ, ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিষ্পাদনার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি, কার্য্য, কর্ম্ম নৈপুণ্য, কৌশল, ও শিল্পচাতুর্য্য প্রভৃতি যাহা কিছু প্রাণীজগতে দৃষ্ট হয়, তত্তাবৎ প্রকৃতিরই প্রেরণা বা instinct সম্ভূত। পিতৃ ও মাতৃ জাতীয় জীবমিথুনের পারস্পরিক মিলনস্পৃহা সম্পূর্ণরূপে স্বভাবজাত। স্তন্যপায়ী পশুশাবককে মাতৃস্তনে মুখ প্রদান করিতে জরায়ু হইতে কে শিখাইয়া পাঠায়? প্রত্যুপকার-প্রত্যাশা বা কর্ত্তব্যজ্ঞানে চালিত হইয়া কি পশুপ্রসূতি অপত্যানুরক্ত হয়? মধুমক্ষিকা মধুক্রম নির্ম্মাণের কৌশল কোন্ শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষা করে? পক্ষীকে নীড় নির্ম্মাণ

করিতে কে বলিয়া দেয়? অথবা কেনইবা প্রসবের পূর্ব্বে নীড় প্রস্তুত করিতে উহার এত আয়াস? যদি বল ডিম্ব প্রসব করিতে হইবে, ইহা সে পূর্ব্বেই জানিতে পারে, তাই তাহা সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য বাসা নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত হয়। পাখীর প্রথম গর্ভসঞ্চারে অবশ্যই ডিম্ব প্রসবের অভিজ্ঞতা থাকে না; এবং শৈশব হইতে যে বিহঙ্গ মিথুনকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, স্বজাতীয় প্রাণীসমূহের নিকট হইতে ডিম্ব স্থাপনার্থ নীড়নির্ম্মাণ এবং তদুপরি উপবেশন ও স্বেদ প্রদান প্রভৃতি কার্য্য কোন ক্রমেই শিখিয়া আসার সম্ভাবনা নাই, তবে কেন উহাদিগকেও সেই সেই কার্য্যে নিয়োজিত দেখা যায়? গর্ভভারাক্রান্ত বোধ করিয়া পক্ষী প্রসবোন্মুখ ডিম্ব রক্ষার আয়োজনে তৎপর হয়, এ কথাও বলিতে পারি না, কেননা অণ্ড কিরূপ পদার্থ, কোন দিনও তাহা উহাদের চক্ষুর গোচরীভূত হয় নাই এবং প্রসবের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত উহাদের গর্ভ হইতে মলমূত্র ব্যতীত আর কিছুই বহির্গত হয় না। মলাদি রক্ষার জন্য উহারা প্রযত্নও করে না। তবে প্রসবের অগ্রে উহাদের কর্ণে কে বলিয়া দিল যে, এমন কোন জিনিস নির্গমনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, যাহা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। তারপর যখন অণ্ড প্রসূত হইল তাহাতে স্বেদ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা উহাদিগকে কোন্ রাসায়নিক পণ্ডিত শিখাইয়া দিল? নবপ্রসূতি পক্ষিণী ইহাও জানে না যে, ডিম্ব হইতে উহার আকৃতিসম্পন্ন শাবক উৎপন্ন হইবে। ডিম্বের সহিত পাখীর আকৃতিগত সাদৃশ্য মোটেই নাই। সাদৃশ্য থাকিলে হয়ত মমত্ববুদ্ধির উদয় হওয়া সম্ভব। তবে কি পাখীর এমন কোন অলৌকিক দৃষ্টি আছে যে, সমস্ত ব্যাপারের রহস্য অবগত হইয়া,—অর্থাৎ ডিম্ব হইতে শাবক উৎপন্ন হইবে, ইহা সেই দৃষ্টি সাহায্যে জানিয়া তাহা সযত্নে কুলায়ে স্থাপন করে এবং তাহাতে স্বেদ প্রদানে প্রবৃত্ত হয়? ইহাও সংপূর্ণ অসম্ভব; কেননা পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, নীড়রক্ষিত ডিম্বাকৃতি একখণ্ড খড়িমাটীও ডিম্বনির্ব্বিশেষে যত্ন প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় না কি যে পরিণামজ্ঞান ও দৃষ্টি পাখীতে বিন্দুমাত্রও নাই? তবে সে জ্ঞান কোথায় আছে? বলা নিষ্প্রয়োজন যে সে জ্ঞান প্রকৃতিরই অন্তরে নিহিত।

পাখী জ্ঞানবতী প্রকৃতির হস্তে ক্রীড়োপকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রচ্ছদপুটাবৃত বলীবর্দ্দের মত পাখী অন্ধভাবে চলে, কিন্তু প্রকৃতি উহাকে পথ দেখাইয়া চালায়।

প্রাণীতত্ত্বজ্ঞের ইহা অবিজ্ঞাত নহে যে, কোন কোন গৃহপালিত পক্ষী পুংজাতীয় পক্ষীর সংস্রব ব্যতীত ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, অবশ্যই সেই ডিম্ব বন্ধ্যা বা নিস্ফল। লেখকের গৃহে একটী ময়ূরী ছিল, কিন্তু ময়ূর ছিল না, এমন কি বহু যোজন ব্যবধানেও ময়ূরের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না; অথচ সেই ময়ূরী মাঝে মাঝে ডিম্ব প্রসব করিত এবং তাহা তৃণরাশির উপর সংস্থাপন করিয়া স্বেদ প্রদান করিত। কথনও ঐ ডিম্ব হইতে ময়ূর শাবক উৎপন্ন হইতে দেখা যায় নাই। প্রসবের কয়েকদিন পরে উক্ত বন্ধ্য ডিম্ব ফাটিয়া যাইত। ডিম্ব হইতে ছানা বহির্গত হয়, পক্ষীজাতি এ তত্ত্ব বংশানুক্রমে জানিয়া তাহা রক্ষা করিতে প্রয়াস পায়, ইহা সম্ভব হইলে, বন্ধ্য ডিম্ব যে নিস্ফল ইহাও জানা অসম্ভব নহে, তবে ময়ূরী উহাতে স্বেদ প্রদান করিবে কেন? বর্ব্বরেরও বিশ্বাস্য নহে যে পক্ষীর ডিম্বাদি রক্ষণ কার্য্য উপদেশ-লব্ধ জ্ঞান হইতে নিষ্পন্ন হয়।

পাখীর ন্যায় পতঙ্গ জাতিও অণ্ডজ। পাখীর এক শরীরে দুই বার জন্ম অতিক্রম করিতে হয় তাই উহাকে দ্বিজ বলা যায়; সেই হিসাবে পতঙ্গ জাতি ত্রিজ নামে অভিহিত হইতে পারে। পাখীর প্রথম জন্ম ডিম্বরূপ, দ্বিতীয়জন্ম পক্ষীরূপ। পতঙ্গের প্রথমতঃ ডিম্বরূপ, দ্বিতীয়তঃ কীটরূপ, তৃতীয়তঃ পতঙ্গরূপ। ডিম্ব হইতে কীটোৎপত্তি বিস্ময়জনক না হইতে পারে, কিন্তু সংপূর্ণ বিজাতীয়রূপ সদন্ত মুখ, চতুর্দ্দশ পদ, পক্ষহীন একটী কীট হইতে ষট্পদ, দন্তহীন, শুণ্ড ও বিচিত্র পক্ষচতুষ্টয়যুক্ত সুন্দর পতঙ্গের উদ্ভব বস্তুতঃই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। পতঙ্গের যাহা ভক্ষ্য, উহার কীটাবস্থার খাদ্য তাহা হইতে সংপূর্ণ পৃথক। প্রসূত ডিম্ব হইতে উৎপন্ন কীট কি খাইবে পতঙ্গপ্রসূতি তাহা কথনও জানে না, জানিবার সুযোগও নাই, অথচ পতঙ্গ ডিম্ব প্রসবের সময় বৃক্ষের কচি কচি পাতা বাছিয়া লয় এবং তাহাতেই অণ্ড স্থাপন করিয়া যায়!—কীটাবস্থ পতঙ্গ শাবকের উহাই কিন্তু আহার্য্য। ডিম্ব ফুটিবামাত্রই আহারের প্রয়োজন; অক্ষম

সদ্যোৎপন্ন কীটের খুঁজিয়া খাইবারও শক্তি নাই, তাই খাদ্যরাশির উপরেই উহার জন্ম। ভাবী সন্ততির উপযোগী খাদ্য কোমল কিশলয়ে ডিম্ব রক্ষার ব্যবস্থা পতঙ্গপ্রসূতি কোথা হইতে শিখিয়া আইসে? পতঙ্গের কস্মিন কালেও মাতা পিতার সহিত পরিচয় নাই,—মাতা পিতা দ্বারা কোন দিনও সে লালিত হয় নাই, কেমনে পরিচয় থাকিবে? তবে আর কাহার নিকট শিক্ষা পাইবে? পাঠক! অন্ধযোনিজ পতঙ্গের অজ্ঞাতসারে জ্ঞানবত্তার কার্য্য (unconscious intelligence) জ্ঞানবতী প্রকৃতির প্রেরণা ভিন্ন আর কি বলিবে?

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে অপত্যস্নেহ প্রকৃতির সৃষ্টি রক্ষা বিধায়ক প্রেরণা কিন্তু পতঙ্গ ও কূর্ম্মাদি জাতীয় যে সকল প্রাণীর অপত্য, জনক জননীর যত্ন ও সাহায্য অভাবে বর্দ্ধিত হইতে ও আত্মরক্ষণে সমর্থ তাহাদের মধ্যে অপত্যস্নেহ নাই বলিলেও চলে। তবে নিরাপদ স্থানে স্ব স্ব অণ্ড স্থাপন উহাদের অপত্যস্নেহের পরিচালনায় সম্পন্ন হয়, যদি একথা কেহ বলেন তাহা হইলে সে স্নেহের স্থায়িত্ব ঐ সকল জীবের মধ্যে অতি অল্পক্ষণমাত্র সন্দেহ নাই।

যে সকল প্রাণীর শিশুশাবক স্তন্যপায়ী, তাহাদের অপত্যস্নেহ, সন্তানগুলি বর্দ্ধিত হইলে এবং স্বয়ং খাদ্য সংগ্রহের শক্তি লাভ করিলে আর থাকে না। যে গাভীর প্রাণ অচিরপ্রসূত দুগ্ধপোষ্য বৎসকে স্তন্য দিবার জন্য অতিমাত্র অধীর হইয়া উঠে এবং মূহূর্ত্তের জন্য উহা চক্ষের অন্তরাল হইলে স্নেহবিক্লব হৃদয়ে চতুর্দ্দিক ছুটিয়া থাকে—সেই গাভী বৎসটী তৃণ-ভক্ষণে পটু হইলে, তাহার জন্য তিলমাত্রও যত্ন বা স্নেহ করে না; বরং বৎসের মুখস্থ তৃণগ্রাস কাড়িয়া সে নিজের উদরসাৎ করে। যে স্থলে যত দিন অপত্যস্নেহের প্রয়োজনীয়তা তাহার অতিরিক্ত সময়ের জন্য উহার স্থায়িত্ব প্রকৃতির অভীপ্সিত নহে। অভিপ্রেত বিষয় নিষ্পন্ন হইলে, তৎসাধক উপায়ের অবলম্বনে প্রয়োজন কি?

অপত্যলালনে যে সুখ তাহা কূর্ম্ম পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীর ভাগ্যে ঘটে না। কারণ ডিম্বের শাবকাবস্থা পর্য্যন্ত উহারা অপেক্ষা করে না। তবে কেন যে ডিম গুলি যথায় তথায় না রাখিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিবার

জন্য উহাদের এত ক্লেশ স্বীকার তাহা বুঝা কঠিন। কোন কোন সামুদ্রিক মৎস্য সমুদ্রের লবণাক্ত জল ছাড়িয়া বহু যোজন অতিক্রম করতঃ নির্ম্মল স্বপেয় নদীর জলে ডিম পাড়িয়া যায়। লবণাক্ত জলে উহাদের ডিম্ব নষ্ট হইয়া যায় বলিয়াই প্রকৃতির এই বিধান। আরাম বা সুখস্পৃহা এই সকল প্রাণীকে উল্লিখিত কার্য্যে পরিচালিত করে ইহা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। এতদ্ব্যাপার হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সকল প্রাণীতে অপত্যস্নেহ কেবল সন্তানলালনজনিত সুখের স্পৃহা হইতে উদ্ভূত নহে।

দাম্পত্যপ্রীতি কিন্তু কোন প্রাণীতেই সুখলালসা বর্জ্জিত নহে। ইতর প্রাণীর মধ্যে পক্ষী ভিন্ন অপরাপর সকল জাতিরই দাম্পত্যবন্ধন অতি-মাত্র শ্লথ। পক্ষীজাতি এ বিষয়ে অনেকটা মানুষের মত। অধিকাংশ পাখীই জোড়া ছাড়া থাকে না। কিন্তু যে জাতীয় পক্ষী এককালে অধিক ডিম্ব প্রসব করে না, তাহাদের মধ্যে যুগ্মভাবে অবস্থান সকল সময়ে দেখা যায় না। স্তন্যপায়ী প্রাণীর পিতার সহিত সম্পর্ক না থাকিলেও চলে, কেননা শৈশবে উহার জীবন ধারণের জন্য জনকের সহায়তা আবশ্যক নহে, কেবল মাতৃস্তন্যই উহার প্রাণ। সুতরাং গর্ভাধানের সময় ভিন্ন পিতামাতার একত্র বাস অনাবশ্যক। কিন্তু বিহঙ্গ জাতির তাহা হইলে চলে কৈ? এক সময়ে অনেক ডিম্ব প্রসব করিতে হয়; তদুৎপন্ন ছানা গুলির খাদ্য আহরণ করিতে প্রসূতি একক অসমর্থ। ইহাব্যতীত কোন রক্ষক না রাখিয়া নিরাশ্রয় শাবক সমূহ বাসায় পরিত্যাগ করতঃ আহার অন্বেষণে যাওয়া নিরাপদ নহে, তাই উহাদিগকে পালন করিতে জনক জননীর সমবেত সহায়তার প্রয়োজন। একের অনুপস্থিতিতে অপরের উপর সন্তানের রক্ষাভার অর্পিত না হইলে, বহুবিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। সেই জন্যই প্রকৃতি বিহঙ্গজাতিকে দৃঢ় দাম্পত্য বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছে। এত জ্ঞান এত পরিণাম দৃষ্টি যে প্রকৃতিতে সে কি কখনও অন্ধ জড় প্রকৃতি মাত্র হইতে পারে?

মহামতি ধীমান কাণ্ট (Kant) বলিয়াছেন—"Instinct is the voice of God" প্রকৃতির প্রেরণা ঈশ্বরেরই প্রত্যাদেশ।

জ্ঞানাংশইতো ঈশ্বর এবং এই ঈশ্বর প্রতি জীবেরই হৃদয়নিহিত দেবতা। কোন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক কান্টের বাক্য অনুমোদন করিয়া বলেন,—"Yes the God in ones own breast, the immanent God", আমাদের বিশ্ববরণীয় গীতাকারের মুখেও তাহাই শুনিতে পাই, যথা,—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" তাহা ভিন্ন আর কি? জীবনিবহ হৃদয়গুহাশায়ী নিয়ন্তার যন্ত্রারূঢ় পুত্তলী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শ্রীগুরুপ্রসন্ন সোম।

সবজির পিক্‌ল্। ১

উপকরণ।—ভাল আকের সির্কা সাত সের, আদা দেড় পোয়া, রসুন, এক পোয়া, কাঁচা লঙ্কা আদপোয়া, মৌরী আধ ছটাক, কালজীরা এক কাঁচ্চা, কাবাবচিনি আদ ছটাক, নুন পাঁচ ছটাক, মূলা (মোটা ও বড় দেখিয়া লইবে) আটটা, ফুলকপি আটটা, ছোট মোটা সিম (ইংরাজীতে যাহাকে ফ্রেঞ্চবিন বলে) এক পোয়া, গাজর চব্বিশটা, সালগম চব্বিশটা, ওলকপি চারিটা, বিটপালম আটটা, কচি শসা কুড়িটা, ছাড়ান কলাইশুটি একপোয়া।

প্রণালী।—প্রথমতঃ যে বুয়েমে * পিক্‌ল্ প্রস্তুত করিবে সেই বুয়েমটী ধুইয়া, তাহার ভিতরে ভাল করিয়া মুছিয়া রাখ।

এইবারে সির্কা পাক করিতে হইবে একটি মাটীর বা কাচের কলাই করা হাঁড়িতে সাতসের সির্কা ঢালিয়া উনানে চড়াইয়া দাও। প্রায় পঁচিশ মিনিট সির্কা সিদ্ধ হইয়া পাক হইলে পর তিন ছটাক নুন দিবে। ইহার পরে আরও পাঁচ মিনিট সিদ্ধ হইলে তবে সির্কার হাঁড়ি নামাইবে। একেবারে ঠাণ্ডা হইলে বুয়েমের মুখে একখানি কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া পাঁচসের সির্কা ঐ বুয়েমে

যদে সির্কা প্রভৃতি দ্বারা আদ্রিত চাটনি বিশেষ। ইংরাজীতে পিক্‌ল (pickle) বলে; তবে কেন বে প্রস্তুত বড় বড় বোতলের আকারের পাত্রকে বুয়েম বলে।

ঢালিতে হইবে। বাকী দুইসের সির্কা আর একটি বোতলে রাখিয়া দিবে। ইহা পরে আবশ্যক হইবে। এইরূপে সির্কা প্রস্তুত হইল।

এইবারে সবজিগুলি বানাইতে হইবে। আদার খোসা ছাড়াইয়া চাকা চাকা বানাইয়া ধুইয়া রাখ। খোসাশুদ্ধ রসুন অল্প অল্প থেঁতলাইয়া রৌদ্রে দাও। একদিন রৌদ্র পাইলে সেইদিন বৈকালে রসুনের খোসা ছাড়াইবে। দেখিবে প্রতি রসুনের কোয়ায় পর্য্যন্ত খোসা উঠিয়া যাইতেছে। কাঁচালঙ্কার বোঁটাগুলি ছাড়াও। মৌরী, কাবাবচিনি এবং কালজীরার কুটা ও বালি প্রভৃতি বাছিয়া ঝাড়িয়া রাখ। মূলা লম্বাদিকে চারচির করিয়া কাটিয়া, সেইগুলি আবার এক এক আঙ্গুলের সমান লম্বা করিয়া কাট। ফুলকপির পাতার শাকগুলি ছাড়াইয়া ফেল; ইহার মোটা মোটা ডাঁটিগুলি দুতিন ইঞ্চি লম্বা করিয়া কাটিয়া রাখ। ফুলকপির এক এক ডাল ফুল কাটিয় রাখ। কপির গোড়াও খণ্ড খণ্ড কাটিয়া রাখ। ফুলকপির কেবল পাতার শাকগুলি ছাড়া আর কিছুই ফেলা যাইবে না। শিমের সরু বোঁটা খুলিয়া আস্ত রাখিয়া দাও। শিম বাছিবার সময় পুরু ও এক সমান লম্বা দেখিয়া লইবে। গাজরের খোসা ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাট। সালগমেরও খোসা ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাট। ওলকপির খোসা ছাড়াইয়া ডুমা ডুমা করিয়া কাট। বিটের খোসা ছাড়াইয়া ডুমা ডুমা আকারে বানাও। উপরোক্ত সমস্ত তরকারীগুলি ধুইয়া রাখ। বেশ কচি ও এক সমান দেখিয়া শসা বাছিয়া লইবে। ধুইয়া লোহার কাঁটা দিয়া ইহার গায়ে বিঁধাইয়া বিধাইয়া কাঁটা মারিবে।

একবারে আধপোয়া নুন দিয়া মূলা, ফুলকপি, গাজর, সালগম, শিম, ওলকপি, বিট এবং শসা এই তরকারীগুলি মাখ। একটি কুলায় বা চালুনিতে করিয়া শসা ছাড়া সমস্ত তরকারী এক সঙ্গে রৌদ্রে শুকাইতে দাও। এই সকল তরকারীকে দুদিন রৌদ্র খাওয়াইতে হইবে। দুদিন রৌদ্র পাইয়া তরকারীর জল শুকাইয়া যাইবে।

শসাগুলি কেবল একদিনমাত্র রৌদ্রে দিয়া পরদিনে সির্কায় ফেলিতে হইবে। আদা ও কাঁচালঙ্কাগুলিও (লাল ও সবুজরংএর মিশাইয়া লইবে) একদিন রৌদ্রে দিয়া সির্কায় ফেলিতে হইবে।

এক্ষণে বুয়েমের ভিতরে সির্কায় তরকারীগুলি ফেলিতে হইবে। কিন্তু যেমন তেমন করিয়া না ফেলিয়া একটু গুছাইয়া ভাগ ভাগ করিয়া ফেলিতে হইবে। বুয়েমটাকে মনে মনে তিন ভাগে বা তিন স্তরে বিভক্ত করিতে হইবে। সেই অনুসারে ইহার উপকরণ গুলিকেও বিভক্ত করিতে হইবে। মূলা, গাজর, ফুলকপি, শিম, সালগম, ওলকপি, ও বিট-গুলিকে দুই ভাগ কর। শসাগুলিকে তিনভাগ কর। আদা, রসুন, কাঁচা-লঙ্কা, মৌরী, কাবাবচিনি, কালজীরা, এবং ছাড়ান কলাইশুটি এই গুলির প্রত্যেককে তিনভাগ করিয়া রাখ।

এইবারে সির্কার ভিতরে তরকারী প্রভৃতি ফেলিতে আরম্ভ কর। প্রথমে এক ভাগ মৌরী, কাবাবচিনি, কালজীরা ছড়াইয়া দাও। তাহার পরে একভাগ আদা, রসুন, কাঁচালঙ্কা এবং কলাইশুটি ছড়াইয়া দাও। ইহার উপরে শসার এক ভাগ দাও। শসার উপরে মূলাদি সবজির একভাগ দাও। এইরূপে সির্কার ভিতরে এক স্তর সাজান হইল।

দ্বিতীয় স্তরে আবার প্রথমে মৌরী, কালজীরা এবং কাবাবচিনি প্রথম স্তরের সবজিগুলির উপরেই ছড়াইয়া দাও। তারপরে যেমন প্রথম স্তরে পরে পরে দিয়া আসিয়াছিলে সেই রকমেই দিয়া সাজাও দ্বিতীয় স্তরেও সবজি দিয়া শেষ করিতে হইবে। তারপরে তৃতীয় স্তরের সময় দ্বিতীয় স্তরের সবজির উপরে বাকী শসাগুলি দিয়া তারপরে বাকী আদা, রসুন, কাঁচালঙ্কা, মৌরী, কাবাবচিনি, কালজীরা ও ছাড়ান কলাইশুটি যাহা কিছু আছে সব জড়াইয়া বুয়েমে ফেলিয়া দাও। এইরূপে সাজান হইয়া গেল।

এইবারে বুয়েমের ঢাকনা চাপা দিয়া, তারপরে তাহার উপরে একখানি কাপড় দিয়া মুখ বাঁধিয়া দাও। বুয়েমের মুখের কাপড়ের উপরে আবার একটী মালসা কি গামলা চাপা দিয়া দাও। এখন ছাদের উপরে দিন রাত্রি ফেলিয়া রাখ।

প্রথম মাসে দশ বার দিন অন্তর একদিন কাঠের হাতা দিয়া নাড়িয়া দিবে। যখন দেখিবে তরকারীগুলি অনেকটা সির্কা টানিয়া লইয়াছে, তখন পূর্ব্বে যে দুই সের জ্বাল দেওয়া সির্কা অন্য একটা বোতলে ঢালিয়া

রাখিয়া ছিলে, তাহাই এই তরকারীর উপরে ঢালিয়া দিয়া বুয়েমের মুখ পর্য্যন্ত সির্কা পুরিয়া দাও। এক মাস পরে ইহার ভিতর হইতে দু একটা শসা বাহির করিয়া খাইতে দিতে পার। ইহা চার পাঁচ মাস পরে তবে খাইবার উপযুক্ত হইবে। যত বেশীদিনের হইবে তত মজিবে ও খাইতে ভাল হইবে।

ভোজনবিধি।—এই পিক্‌ল মটন চপ, মাংসের রোষ্ট প্রভৃতির সহিত খাইতে ভাল। মাছের ঝোল বা ডাল ভাতের সহিতও চাকনা দিয়া খাইতে বেশ লাগে। অনেকে বাজার হইতে পিক্‌ল কিনিয়া ব্যবহার করেন। কিন্তু এই রকমে ঘরে প্রস্তুত করিলে অল্প খরচেও হইবে এবং ভাল জিনিষও হইবে।

ইহা প্রস্তুত করিবার সময় শীতকাল। কিন্তু বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে খাইবার উপযুক্ত হয়।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

কেয়াখয়ের।

উপকরণ।—পদ্মপাটী (জৌনপুরী) খয়ের তিনসের, ছোট এলাচ তিন তোলা, মৌরী এক ছটাক, ধনের চাল তিন পোয়া, দারচিনি তিন ছটাক, বড় এলাচ এক পোয়া, লঙ্গ আধ পোয়া, জায়ফল বারটী, কেয়াফুল তিন কুড়ি (অন্ততঃ পঞ্চাশটা), জল তিন সের।

প্রণালী।—খয়ের গুলি থেঁতলাইয়া বা আধ-গুঁড়া করিয়া তিন সের জলে দিয়া ভিজাইতে দাও। খয়ের ভিজিতে দুদিন লাগিবে। সেই দুদিনের মধ্যে মৌরী ও ধনের চাল ঝাড়িয়া বাছিয়া রাখিবে। জায়ফল আধ-থেঁতো করিবে (জায়ফলের অভাবে জৈত্রী দিবে)। বড় এলাচ ও ছোট এলাচের দানা ছাড়াইবে। ইহা হইতে কতকগুলা এলাচের দানা লইয়া আধ-থেঁতো করিয়াও দিতে পার। লঙ্গ আস্তই থাকিবে।

কেয়াফুল যখন আনিবে বেশ শাদা ও টাট্‌কা সদ্যভাঙ্গা দেখিয়া লইবে। গোড়া কি আগার দিকে একটু কাল দাগ থাকিলে সে ফুল লইবে না, তাহার ভিতরে পোকা থাকে। কেয়াফুলের ছোট, বড় সব পাতাগুলি খুলিয়া ফুল ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া সমস্ত রেণুগুলি একত্র কর। রেণু বাহির করা হইয়া গেলে যে সমস্ত শাদা শাদা কচি পাতা পাইবে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া রাখ। এইবারে খয়ের আন। প্রথমে ভিজান খয়েরটা হাতে করিয়া চটকাইয়া মোলায়েম করিয়া ফেল। ক্রমে ইহাতে সমুদয় মসলা, কেয়াফুলের কুঁচিকরা পাতা এবং কেয়াফুলের রেণু সব ঢালিয়া চট্‌কাইয়া মিশাও। এই সময়ে ইচ্ছামত ইহাতে কেওড়া বা গোলাপজল মিশাইতে পার।

খয়ের বাঁধিতে কেয়াফুলের পাতা কাজে লাগিয়া যাইবে। এক একটী বড় পাতা লইয়া তাহার মধ্যস্থলে প্রায় এক বিঘৎ লম্বা ও এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি মোটা গোল করিয়া খয়ের ভরিয়া দাও। এখন ইহার দুই পার্শ্বের পাতা দুইধার হইতে মুড়িয়া তাহার উপরে আর একখানা পাতা ঢাকা দাও। তার পরে দুইদিকের পাতা মুড়িয়া লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বাঁধিয়া দাও। এই পাতায় বাঁধিয়া না দিতে পার তো কলাপাতার বাশ্‌না বা দড়ি দিয়া বাঁধিলেও হইবে। গোলা খয়েরেটা এমনি করিয়া পাতার ভিতরে জড়াইতে হইবে যেন বাহির হইয়া না পড়ে। এই প্রকারে সব খয়ের বাঁধা হইয়া গেলে সমুদয় একত্র করিয়া একটি কাঠের বা পাথরের খোরাতে (গাঢ় পাত্র) রাখিয়া দাও। দু তিন দিন পরে ইহার রস বাহির হইলে অর্থাৎ একটু মজিলে, তখন দু তিনটী ডালায়, বাঁধা খয়েরগুলি বিছাইয়া দিয়া প্রত্যহ রৌদ্রে দিবে। যখন দেখিবে বেশ শুকাইয়া গিয়াছে এবং সহজেই উপরের পাতা খোলা যাইতেছে তখন আর রৌদ্রে দিবার আবশ্যক নাই।

এই প্রকারে মজাইয়া লইলে খয়েরে পোকা ধরে না আর গন্ধও ভাল হয়। ইহা শুকাইতে একটু দেরী হয়। বিলম্ব না করিয়া যদি শীঘ্র করিতে চাহ তো যে দিন খয়ের বাঁধিবে সেইদিন হইতেই রৌদ্রে দিতে আরম্ভ করিবে। ভাল রকম রৌদ্র পাইলে দিন পনেরর মধ্যে শুকাইয়া যাইবে।

শ্রাবণ মাসে যখন কেয়াফুলের বেশী পরিমাণে আমদানি হয়, সেই সময়ে

সস্তা হয়। সেই সময় কেয়াখয়ের প্রস্তুত করিবার সময় ভাদ্রমাসের প্রথম হইতে কেয়াফুল একটু একটু করিয়া মাগ্গি হইতে আরম্ভ হয়।

ভোজনবিধি।—কেয়াখয়ের দিয়া নানা মসলার সংযোগে পান সাজ, পানের আস্বাদ আরও ভাল হইবে। পানে চুণ, সুপারি এবং কেয়াখয়ের একটু দিলে আর কোন মশলা না দিলেও চলে। যাঁহারা আজকাল বাজারের তাম্বুল চূর্ণ প্রভৃতি অনেক খরচ করিয়া কিনিয়া থাকেন তাঁহারা ঘরে কেয়াখয়ের প্রস্তুত করিয়া তাহাপেক্ষা অল্পমূল্যে ভাল জিনিষ যে পাইবেন তাহার, আর সন্দেহ নাই। পানে কেয়াখয়ের দিয়া খাইলে মুখে দিব্য কেতকী গন্ধ হইবে।

আনুমানিক ব্যয়।—পদ্মপাটী বা জৌনপুরী খয়ের তিনসের আড়াই টাকা, ছোট এলাচ প্রায় সাত আনা, মৌরী দুই পয়সা, ধনের চাল পনের পয়সা, দারচিনি প্রায় চৌদ্দ পয়সা, লঙ্গ দুই আনা, বড় এলাচ একপোয়া পাঁচ আনা, জায়ফল তিন আনা, কেয়াফুল প্রায় আট আনা (আমি শ্রাবণ মাসে সস্তার সময়ের কথা বলিতেছি, কিন্তু ভাদ্রমাসে করিতে গেলেই এক একটি কেয়াফুলের দাম চার পয়সার পরিবর্ত্তে চার আনা হইবে।) সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় সাড়ে চার টাকা খরচ হইবে। ভাদ্রমাসে করিতে গেলে প্রায় এই স্থলে পাঁচ ছয়টাকা খরচ পড়িয়া যায়। তিনসের খয়েরে প্রায় সাড়েপাঁচ সের ছয় সের খয়ের হইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

তালের সন্দেশ।

উপকরণ।—ছানা আধসের, তালের মাড়ি এক ছটাক, চিনি সাত ছটাক জল একপোয়া।

প্রণালী।—পাকা তাল আনিয়া তাহার উপরের কাল খোসা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ছাড়াও। তারপরে আঁটিগুলি একটু জলের ছিটা দিয়া হাতে করিয়া চটকাইয়া লও। ইহাতে আঁটিগুলি বেশ নরম হইয়া যাইলে মাড়িবার বিশেষ।

সুবিধা হইবে। একটী তালমাড়া-বেতের ঝুড়ি বা দস্তার জালের চালুনি লইয়া আস। ঝুড়ির বা চালুনির নীচে একটী থালা রাখ। একটী তালের আঁটি হাতে করিয়া লইয়া ঝুড়ির উপরে রগড়াইয়া রগড়াইয়া মাড়িতে থাক তাহার নীচে ঝুড়ির ভিতরের থালাতে যে 'মাড়ি' বা ঘন রস পড়িবে তাহাকেই "তালের মাড়ি" বলে।

একছটাক তালের মাড়ি একটি কলাইকরা কড়াতে দুইচার বার ফুটাইয়া লইয়া নামাইয়া রাখ। ছানা একটি কাপড়ে বাঁধিয়া তাহার জল নিংড়াইয়া ফেল।

চিনিতে একপোয়া জল দিয়া রস চড়াইয়া দাও। ছানা হাতে করিয়া চট্‌কাইয়া চট্‌কাইয়া ভাঙ্গ। আট দশমিনিটের মধ্যে চিনির রস গাঢ় হইয়া আসিলে ভাঙ্গা ছানা এই রসে ফেলিয়া দাও। তার পরে ফুটান তালের মাড়িটুকুও ঢালিয়া দাও। তাড়ু দিয়া নাড়িতে থাক। নরম আঁচে প্রায় মিনিট পনের নাড়িতে নাড়িতে যখন দেখিবে জলীয় ভাব মরিয়া জমাট বাঁধিয়া আসিতেছে, ও ডিম ডিম হইয়া যাইতেছে তখন নামাইয়া ঠাণ্ডা করিতে দিবে। ঠাণ্ডা হইয়া গেলে তারপরে গোল্লা বাঁধিবে কিম্বা বাটীছাঁচে ঢালিবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

হিন্দুস্থানী চতুরঙ্গ।

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালী।

চতরঙ্গ সব মেলে গাও বাজাও
রেঝাও সোর সঙ্গতয় সোঁ তান
তার বোল লয় বঠাও।
দীম্ দীম্ দীম্ তানা না না না না
না না না না তা দুম্ দেরে না তানা

না না না না না না না না না দ্রে দ্রে
তোম্ দ্রে দ্রে দ্রে দ্রে ধে ত্লাং তোম্
দ্রে দ্রে তা না ধে ত্লাং তোম্ দ্রে দ্রে দানি।
ধে ধে তা ধে ধে তা তেরে কেটে
তাগে তেরে কেটে তাগে তেরে কেটে
তাগ্ ধুম্ কেটে তাগ্ ধা ত্তে ন্না ধা ত্তে ন্না
নাগ্ দেৎ কৃড়াং তেরে কেটে তাক্‌ড়াং ধা ধা
সোরদ বেদ সোঁ জ্ঞান উপজাওয়ে
নিনি ধাধা পাপা মামা গাগা রেরে সা।
সারেগা রেগামা গামাপা মাপাধা পাধানি
ধানিসা নিধাপা মাগারে সা॥

তালি। ১ । ২ (স্থ) । ৩। ০ (স্থা, তো, গু) ॥
মাত্রা। ৪ । ৪ । ৪। ৪ ॥

নিঁ নিঁ পা মা। পা পা মা২ গা২ মা। নিঁ২
চ ত র ঙ্গ। স ব মে — লে। গা

২........................
ধা নিঁ। পা২ ধা২ নিঁ২ সা২ সা সা। সা২ নিঁ২
— —। — — — — ও বা। জা —

২......
সা সা নিঁ। পা২ মা গাঁ। র্গাঁ২ গাঁ মা। নিঁ
— ও রে। খা ও —। ও সো র। স

ধা পা২। মা গাঁ র্গাঁ মা। রে২ সা২। সা২
— ঙ্গ। — — — ত। য্ সোঁ। তা

সা মা। মা মা মা২ রে২ মা। পা২ মা মা২ রে২।
ন তা। — য় বো — ন। ব — — —।

২.........
মা৩ মা। নিঁ২ ধা নিঁ। পা২ ধা২ নিঁ সা সা।
—য্ বা। ঠা — —। — — — — ও।

(স্থা—পু):—নিঁ নিঁ পা মা। পা পা মা২ রে২ মা।
(স্থা—পু):—চ ত র ঙ্গ। স ব মে — লে।

(স্ত):—মা২ নিঁ ধা। ধা নিঁ সা সা। সা সা সা সা।
(স্ত):—দীম্ দী ম্। দী—ম্ তা না। না না না না।

সা সা সা সা। সা সা নিঁ রে। সা সা নিঁ
না না না না। তা হু—ম্ দে। রে না তা

নিঁ। নিঁ সা সা নিঁ। নিঁ ধা ধা ধা। নিঁ ধা
না। না না না না। না না না না। না দ্রে

ধা নিঁ। সা সা সা সা। সা মা গাঁ মা।
দ্রে তোম্। দ্রে দ্রে দ্রে দ্রে। ধে ত্লাং—ং তোম্।

রে সা নিঁ নিঁ। নিঁ রে সা রে। নিঁ সা নিঁ২
দ্রে দ্রে তা না। ধে ত্লা—ং তোম্। দ্রে দ্রে দা

ধা২ পা॥
— নি॥

(ভো):—সা সা সা। মা মা মা২। নিঁ২ ধা২ পা২
(ভো):—ধে ধে তা। ধে ধে তা। তে রে কে

পা২ পা পা। নিঁ২ ধা২ পা২ পা২ পা পা।
টে তা গে। তে রে কে টে তা গে।

নিঁ২ নিঁ২ নিঁ২ নিঁ২ নিঁ সা। সা২ সা২
তে রে কে টে তাগ্ ধুম্। কে টে

সা নি পা। মা২ রে সা। মা২ রে সা।
তাক্ ধা তে। ন্না —। — — —।

সা সা সা২। মা মা মা২। নি ধা পা পা পা
ধে ধে তা। ধে ধে তা। তে রে কে টে তা

পা। নি ধা পা পা পা পা। নি নি নি
গে। তে রে কে টে তা গে। তে রে কে

নি নি সা। পা পা পা মা মা মা পা পা
টে তাগ্ ধুম্। কে টে তাগ্ ধা তে ন্না ধা তে

পা। সা সা সা। সা সা সা সা সা
ন্না। নাগ্ দেৎ কৃড়াং। তে রে কে টে তা

মা। মা২ মা মা। (স্থা—পু):—নি নি পা মা। পা
কৃড়াং। — ধা ধা। (স্থা—পু):—চ তর ঙ্গ। স

পা মা রে মা।
ঘ মে — লে।

(ঞ):—মা মা মা মা। ধা নি সা২।
(ঞ):—সো র দ বে। — দ সোঁ।

সা২ সা সা। সা সা। মা মা রে। সা সা
জ্ঞান্ উ প। যা ওয়ে। নি নি ধা। পা পা

নি ধা। পা পা মা গা। মা২ সা রে। গা২

রে গা। মা২ গা মা। পা২ মা পা। ধা২
রে গা। মা২ গা মা। পা২ মা পা। ধা২

পা ধা। নিঁ২ ধা নিঁ। সা২ মা২। গাঁ½ মা½
পা ধা। নি২ ধা নি। সা নি। ধা —

পা মা রেঁ½ সা½। গাঁ½ মা½ পা মা সা॥
— পা মা —। গা — — রে সা॥

১। স্থা=অস্থায়ী। স্থা—পু=আস্থায়ী পুনরায়। অ=অন্তরা। ভো =আভোগ। স=সঞ্চারী।

২। স্বরের পার্শ্বে সংখ্যাচিহ্ন=মাত্রাচিহ্ন। যথা সা২ বা ২সা=দ্বিমাত্রিক সা। ½ সা বা সা½=অর্দ্ধমাত্রিক সা।

৩। ঁ চন্দ্রবিন্দুর চিহ্ন=কোমলের চিহ্ন যথা নিঁ=কোমল নিখাদ।

৪। স্বরের উপরে ২ সংখ্যা চিহ্ন=দ্বিতীয় উচ্চসপ্তকের চিহ্ন অথবা তারসপ্তকের চিহ্ন। যথা সা (২)=দ্বিতীয় উচ্চসপ্তকের বা তারসপ্তকের সা। যদি একই উচ্চসপ্তকের কতকগুলি স্বর পরে পরে থাকে তাহা হইলে প্রথম স্বরটীর উপরস্থিত সপ্তক চিহ্ন হইতে ফুটকি বা ক্ষুদ্র কসি টানিয়া যাইতে হইবে। যথা। সা সা সা সা। (২ ....)
ড্রে ড্রে ড্রে ড্রে।

শ্রীপ্রতিভাসুন্দরী দেবী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রদীপ—আষাঢ়।

এই সংখ্যার প্রদীপে বঙ্কিম বাবু ও চন্দ্রনাথ বাবুর দুইটী চিত্র আছে। "বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবুর প্রতি চন্দ্রনাথ বাবুর একান্ত অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রবন্ধটী বঙ্কিমবাবুর জীবনীর পক্ষে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিবে। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর লেখনী হইতে আমরা অধিক আশা করি। আমাদিগের ইচ্ছা চন্দ্রনাথ বাবু বঙ্কিম বাবুর একটি জীবনী লিখিয়া তাঁহার আত্মার তর্পণ করুন। "চৈতালি সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য" প্রবন্ধটী অনেকটা ব্যক্তিগত দ্বেষ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কোন্‌কালে 'দাসীতে 'চৈতালি সমালোচনা' বাহির হইয়াছিল, লেখক শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ আজ তাহারি প্রতিবাদ লিখিয়া এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবন্ধের লক্ষ্য শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ও সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। কিন্তু এরূপ বৃথা বিবাদে সাহিত্যের মহান লক্ষ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য জগতের হিতসাধন "শিবেতর ক্ষতয়ে"। 'প্রকৃতির খেয়ালের ছবি না দিলেই ভাল ছিল। কুৎসা রটনা যেমন অন্যায় সেইরূপ ব্যাধি ও বিকৃতিগ্রস্ত জীব-জন্তুর কুৎসিত চিত্রাদি প্রকাশও অহিতকর। ইহাতে বোধ হয় সাধারণত পাঠক ও পাঠিকাগণের অপকার ভিন্ন উপকারের সম্ভাবনা নাই। ইহা প্রকৃতির খেয়াল নহে ইহা বিকৃতির খেয়াল।

পন্থা—

পন্থা যে পথে চলিতে চাহিয়াছেন তাহা তাহার মূল মন্ত্রেই প্রকাশ,— "মহাজনো যেন গতঃস পন্থা"; তাহা ভালই করিয়াছেন। কিন্তু এখানে "পন্থাকে" একটী কথা বলিয়া রাখি,—এই সংসারে নানা মহাজন ও নানা পন্থা, আমরা কোন পন্থা অবলম্বন করিব? আমাদের পথহারা হইবার সম্ভাবনা। আমাদের সেই গন্তব্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমৃত পথের পথিক হইতে

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥"

সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন তদ্ভিন্ন অন্য পথ নাই"

ঋষি—আষাঢ়।

ঋষি নামক পত্রে অনেক আর্ষপ্রয়োগের ব্যবস্থা হইতেছে দেখিতেছি,—ঋষি আধিব্যাধির ঔষধের সঙ্গে উপাধি বিতরণেও কৃতসংকল্প হইয়াছেন !!

পূর্ণিমা—আষাঢ়।

"কি লিখিব" প্রবন্ধটি না লিখিলেই ছিল ভাল। ইহা একরূপ প্রলাপোক্তিমাত্র। মৃত্যুর পর" লেখাটী অতিবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই অতিব্যাপ্তির কারণেও অনেক স্থানে বৃথা বাবদূকতার জন্য ইহার শক্তি অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। বৈদেশিক প্রসঙ্গে 'কুমারী সিম্বিরস' নামক প্রবন্ধটী মনোরঞ্জক হইয়াছে।

উৎসাহ—আষাঢ়।

'মাতার আহ্বান' কবিতার শেষ অংশটুকু একটু মিষ্ট লাগে। কবিতাটী অনেকটা গানের ছন্দে গ্রথিত। 'সন্ন্যাসী' একটী সুপাঠ্য ভ্রমণবৃত্তান্ত। 'নীল' প্রবন্ধটী পড়িয়া তৃপ্তি হইল। জর্ম্মণীর রসায়নাগারে শুদ্ধ নীল কংস কেন এমন অনেক কংসেরই ধ্বংসের জন্যই 'আয়োজন হইতেছে। 'মেড্ইন জর্ম্মণী'র জ্বালায় ইংরাজ বণিকেরাও ক্ষিপ্তপ্রায়। জর্ম্মণীর ন্যায় ভারতকেও সর্ব্বদিকে শ্রমশীল হইতে হইবে, নচেৎ নিরুপায়। রাজা রামানন্দ রায় একটী সুপাঠ্য প্রবন্ধ।

স্বাস্থ্য—আষাঢ়।

স্বাস্থ্যের 'শিশুর অসুখ ও মাতার জ্ঞাতব্য' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী বড় আবশ্যকীয়। স্বাস্থ্যে স্বাস্থ্য চর্চ্চার উপযোগী প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে।

অনেকগুলি পুস্তক সমালোচনার জন্য আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আগামীবারে সেগুলির সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।

পুণ্য।

লক্ষটাকার এক কথা।

(জয়পুরী গল্প)

রাম শঙ্কর নামক জনৈক বণিক নানান সুখে সুখী হইলেও বহুকাল পর্য্যন্ত পুত্রসুখে বঞ্চিত ছিলেন। তজ্জন্য তিনি সতত বিমর্ষ থাকিতেন এবং দেব দেবীর নিকট মানত সহকারে পূজা দিতেন। অনেক যাগযজ্ঞের পর, বৃদ্ধবয়সে তাঁহার একটী পরম সুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, তিনিও 'পুন্নর'কের ভয় হইতে মুক্ত হইলেন। পুত্রটী গোলাপ ফুলের ন্যায় লাল দেখিতে হইয়াছিল, তাই পিতা মাতা আদর করিয়া তাহার গোলাপ শঙ্কর নাম রাখিলেন।

বার্দ্ধক্য বশতঃ রামশঙ্কর ঘনঘন পীড়াগ্রস্ত হইতে লাগিলেন—তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিল। তিনি শীঘ্র শীঘ্র পুত্রের বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি একটী ধনাঢ্য বণিক কন্যার সহিত গোলাপ শঙ্করের বিবাহের সম্বন্ধ করিলেন। কন্যাটি সর্ব্বগুণসম্পন্না হইলেও তাহার একটী মহৎ দোষ ছিল—তাহার রং একটু কাল ছিল। বৃদ্ধ বয়সের পুত্র বলিয়া গোলাব শঙ্কর তাহার মা বাপের, বিশেষতঃ তাহার মার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তজ্জন্য তাহার জননী কালো মেয়ের সহিত বিবাহ দিতে কোন মতে সম্মত হইলেন না; তিনি ঘরে রাঙ্গা বউ আনিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার স্বামী পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণকায় বণিক কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া ফেলিলেন এবং কিছুদিন

আপনিও পুনরায় শয্যাগত হইলেন। রামশঙ্করের স্ত্রী অত্যন্ত "তা হইলেন এবং ক্রোধে অন্ধ হইয়া স্বামীর সেবা শুশ্রূষা হইতে বিরত হইলেন। পুত্রের বিবাহের কিয়দ্দিন পরে রামশঙ্কর পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার স্ত্রী স্বামীর জন্য দুঃখ করা দূরে থাকুক, ছেলের জন্য রাঙ্গা বউ খুঁজিতে লাগিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর এক বৎসর না যাইতে যাইতেই সর্ব্বস্ব খরচ করিয়া পুনরায় পুত্রের বিবাহ দিয়া ঘরে রাঙ্গা বউ আনিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বহুকাল রাঙ্গা বউএর সহিত ঘর করিতে হইল না। অল্পদিনের মধ্যে তিনিও বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বামীর অনুগমন করিলেন।

গোলাব শঙ্কর যৎকিঞ্চিৎ পিতৃসঞ্চিত ধনসাহায্যে রাঙ্গা বউয়ের সহিত কিছুদিন সুখে অতিবাহিত করিলেন। শীঘ্রই তাহাদের দৈন্যদশা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাহার পৈত্রিক গৃহাদি বিক্রয় করিয়া অন্যত্র বাস করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু অর্থ ব্যয়ই করিতে লাগিল, অর্থ সংগ্রহের কোন উপায় করিল না। সে রাঙ্গা বউএর অঞ্চল ছাড়িয়া এক তিল ঘর হইতে বাহির হইত না। কিন্তু লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ন্যায় প্রেম ও দারিদ্র্যও একত্র বুঝি চিরস্থায়ী হয় না।

যখন গোলাবশঙ্কর কোন মতে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে উদ্যোগী হইল না তখন অগত্যা তাহার রাঙ্গা বউ স্বামীশাসনী ভৎর্সনা দ্বারা তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রত্যহ এইরূপ তাড়না, ভৎর্সনা খাইতে খাইতে গোলাব শঙ্কর একদিন মনের কষ্টে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে সে এক নদীর তীরে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিকটে একটি মুদির দোকান ছিল। দোকানটী একটী ক্ষুদ্র সরাই বা পান্থশালা বিশেষ ছিল। দুএকটী যাত্রী প্রায় তথায় ভোজনাদি ও রাত্রিযাপন করিত। দুইটী ভদ্রলোক পূর্ব্বরাত্রে মুদির দোকানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে নদীতে স্নান করিতে গিয়া গোলাব শঙ্কর বসিয়া কাঁদিতেছে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিল। যাত্রী-

দ্বয় তাহার প্রতি করুণচিত্ত হইয়া স্নানাদি করতঃ তাহাকে সঙ্গে করিয়া মুদির দোকানে আসিলেন ও তাহারও আহার প্রস্তুত করিবার জন্য মুদিকে আদেশ করিলেন। গোলাব শঙ্কর প্রাণপণে তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিল। যাইবার সময় তাঁহারা তাহাকে কিছু পুরস্কার দিয়া প্রস্থান করিলেন।

যাত্রীদ্বয় গমন করিলে পর গোলাবশঙ্কর তাহার দুঃখের কাহিনী মুদির কর্ণগোচর করিল। সে তাহাকে রাঙ্গা বউ পরিত্যাগ করিয়া কাল বউএর সহিত ঘর করিতে পরামর্শ দিল এবং দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া যাত্রীদিগের সেবাকার্য্যের জন্য অতি অল্প বেতনে নিযুক্ত করিল। গোলাব শঙ্কর বেতন ব্যতীত যাত্রীদিগের নিকট হইতেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুরস্কার পাইতে লাগিল।

একমাসের মধ্যে গোলাব শঙ্কর আঠারটী টাকা উপার্জ্জন করিল। এক্ষণে সে বাড়ী যাইতে অত্যন্ত উৎসুক হইল। রাঙ্গা বউএর মুখ তাহার হৃদয় মন্দিরে জাগিয়া উঠিল। সে ভাবিল এবার আর রাঙ্গা বউ তাহাকে তাড়না করিবে না। এবার রিক্ত হস্তে যাইতেছে না—টাকা লইয়া যাইতেছে।

অর্দ্ধরাত্রে যখন মুদি নিদ্রায় মগ্ন সেই অবসরে গোলাব শঙ্কর রাঙ্গা বউ দেখিতে উন্মত্ত হইয়া চুপি চুপি গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। পথে একটী 'বয়লে গাড়ি' (রথ) যাত্রী লইয়া যাইতে দেখিয়া সেও সেই গাড়িতে উঠিল। অন্যান্য যাত্রীরা নিদ্রা যাইতেছে কিন্তু তাহার চক্ষে লেশ মাত্রও নিদ্রা নাই। সে রাঙ্গা বউয়ের চিন্তায় বিহ্বল। গাড়োয়ান তাহাকে নিদ্রাশূন্য ও চঞ্চলচিত্ত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সে তখন সমস্ত বিবরণ খুলিয়া বলিল এবং তাহার নিকট যে আঠারটী টাকা আছে তাহাও বলিতে ভুলিল না। গাড়োয়ানটী তাহার নিকট হইতে টাকাগুলি বঞ্চিত করিবার জন্য ফিকির আঁটিতে লাগিল। গাড়োয়ানটী কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল।

গোলাব শঙ্কর মনের কথাগুলি বলিতে উদ্বিগ্ন হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ভাই আমার সহিত কথা কহিতেছ না কেন?"

"সে উত্তর করিল—"আমার কথার লাখ টাকা দাম।" এই কথা শুনিয়া

গোলাব শঙ্কর বলিয়া উঠিল—"আমার কাছে আঠারটী টাকা আছে আমায় লাখ টাকার কথাটী বিক্রী কর।"

গাড়োয়ানটী এই সুবিধা পাইয়া বলিল—"পাগল! লাখ টাকার কথা কি কখন আঠার টাকায় বেচা যায়। তবে আমি একটী হাজার টাকার কথা বিক্রী করতে পারি।" গোলাব শঙ্কর তাহার হাতে চারিটী টাকা দিয়া বলিল—"আমায় হাজার টাকার কথাটী তবে বল।"

শঠ গাড়োয়ান টাকাগুলি দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া বলিল—"বিদেশে গেলে যে কোন কাজ হাতে পাইবে তাহাই করিবে। মান অপমান দেখিও না।"

গোলাব শঙ্কর বলিল—"এ নতুন কথা নয়। আমাকে লাখ টাকার কথাটী বল—চোদ্দ টাকা দিচ্ছি।" গাড়োয়ান বলিল—"পাগল! লক্ষ টাকার কথা কি চোদ্দ টাকায় দেওয়া যায়? তবে আমি দশহাজার টাকার কথাটী বলিতে পারি।"

গোলাব ছয়টী টাকা তাহার হস্তে দিয়া বলিল—"আমাকে দশ হাজারের কথাটীই তবে বল।"

শঠ কহিল—"কোন গুপ্তকথা স্ত্রীলোকদিগের নিকট বলিও না।"

গোলাব বলিল—"ইহাও তো নূতন কথা নহে। আমার কাছে আর আটটী মাত্র টাকা আছে, লও, লক্ষ টাকার কথা বল।"

গাড়োয়ান দেখিল যে তাহার নিকট আটটটীর বেশী টাকা নাই তখন টাকাগুলি লইয়া বলিল—"যদি তুমি প্রতিশ্রুত হইতে পার যে আমার উপদেশানুসারে লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিলে পর আমাকে হাজার টাকা দিবে, তাহা হইলে আমি আট টাকায় তোমাকে লাখ টাকার কথা দিতে পারি।"

সে তাহাতেই সম্মত হইল।

তখন গাড়োয়ান বলিল—"শোন, কোন জিনিষ ফেলিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া ফেলিও।"

এই সময় গোলাব শঙ্কর তাহার গন্তব্য স্থানের সন্নিকটে আসিয়াছিল, অন্যান্য যাত্রীরা তখনও নিদ্রিত ছিল। গাড়োয়ান এই অবসরে গোলাব শঙ্করকে গাড়ি হইতে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া জোরে গাড়ি হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। গোলাব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পথিমধ্যে বসিয়া পড়িল;

তাহার সমস্ত সুখআশা নির্ব্বাপিত হইল। কেবল রাঙ্গা বউয়ের মার্জ্জনী তাহার স্মৃতিপথে ঘন ঘন উদয় হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে উঠিয়া অতি ক্ষুণ্ণমনে পদব্রজে যাইতে প্রবৃত্ত হইল।

পরে মধ্যাহ্নে গৃহে আসিয়া পৌঁছিল। রাঙ্গা বউ তাড়াতাড়ি তাহার পা ধুইবার জল আনিয়া দিল। রাঙ্গা বউএর শরীর অতিশয় কৃশ এবং তাহার বস্ত্র মলিন ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সে এক পয়সার বাতাসা আনিয়া তাহার স্বামীকে জলপান করিতে দিল। জলপানের পর সে তাহার স্বামীকে বলিল—"তুমি কেন আমায় অসহায় ও নির্দ্দয়রূপে ফেলিয়া গিয়াছিলে? দেখ আহারাভাবে আমার শরীর ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে এবং বস্ত্রাভাবে এই ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিতেছি। নিরুপায় হইয়া আমি সুতা কাটিয়া এতদিন চালাইয়াছি। আজ এই এক পয়সা মাত্র আমার কাছে সম্বল ছিল তাহা দিয়া তোমার জন্য বাতাসা কিনিয়াছি। যদি টাকা না আনিয়া থাক তো আজ আমাদের উভয়কে উপবাস করিতে হইবে।"

এই বলিয়া রাঙ্গা বউ টাকার জন্য তাড়াতাড়ি তাহার বস্ত্রাদি অন্বেষণ করিতে লাগিল কিন্তু কিছুই পাইল না। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল—"টাকা এনেছ কি?

গোলাব শঙ্কর বলিল—"টাকা এনেছিলুম।"

রাঙ্গা বউ বলিল—"এনেছিলুম, সে কি?"

গোলাব বলিল—"আমি আঠার টাকা দিয়ে লাখ টাকার কথা কিনেছি"

রাঙ্গা বউ আর থাকিতে পারিল না। সে তাহাকে সাতিশয় তিরস্কার ও ভৎর্সনা করিতে লাগিল। এইরূপে তাড়িত হইয়া গোলাব রাঙ্গা বউকে এই বলিয়া পুনরায় গৃহ হইতে বহির্গত হইল—"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি লক্ষ টাকা লইয়া ঘরে ফিরিব, কাল বউকে লইয়া ঘর করিব এবং তোকে কাল বউএর দাসী করিয়া রাখিব।"

গোলাব শঙ্কর বিমর্ষমনে মুদির নিকট চলিল। রাত্রিকালে সে পূর্ব্বোক্ত মুদির দোকানে উপস্থিত হইল এবং রাঙ্গা বউএর ভৎর্সনার কথা বলিয়া তাহাকে পুনরায় কার্য্যে নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিল। গোলাব

শঙ্কর না বলিয়া পলাইয়া যাওয়াতে মুদি আর তাহাকে ভৃত্য রাখিতে ইচ্ছা করিল না। কিন্তু রাত্রি দেখিয়া তাহাকে তাহার দোকানে সে দিন স্থান দিল।

ঘটনাক্রমে সেই রাত্রে একটী বণিক মুদির পান্থশালায় অবস্থিতি করিতে ছিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার ঘরে আলো জ্বলিতে দেখিয়া মুদি কৌতূহল বশতঃ কবাটের ছিদ্র হইতে দেখিতে গেল—যাহা দেখিল তাহাতে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বণিকটী গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়া ঝুলিতেছে।

এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া মুদি গোলাব শঙ্করের নিকট গিয়া বলিল— "ভাই আজ এক ঘোর বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা কর, একটি বণিক আত্মহত্যা করিয়াছে; এই রাত্রির মধ্যেই যদি তাহাকে জলে না ভাসাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে কাল প্রত্যূষে আমাকে নিশ্চয় বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।" তৎক্ষণাৎ গোলাব শঙ্করের গাড়োয়ানের সেই প্রথম উপদেশ স্মরণ হইল। "বিদেশে গেলে যে কাজ পাইবে তাহাই করিবে, মান অপমান দেখিবে না।" সে মৃত দেহ লইয়া তীরে বাঁধা একখানা নৌকা খুলিয়া লইয়া মাঝ জলে ভাসাইয়া দিতে গেল। শব ফেলিতে যাইতেছে এমন সময় গাড়োয়ানের শেষ লাখটাকার উপদেশ স্মরণ হইল। "কোন বস্তু ফেলিবার পূর্ব্বে তাহা ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া তবে ফেলিও।" সে শবকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিল। দেখিল তাহার কটিদেশে মূল্যবান হীরক প্রভৃতি লক্ষাধিক টাকার প্রস্তর রহিয়াছে তদ্ব্যতীত অনেক স্বুবর্ণ মোহরও রহিয়াছে। সে এই সকল নিজের কটীদেশে বাঁধিয়া ফেলিল ও শবকে ভাসাইয়া দিয়া পূর্ব্বের মত নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়া মুদির নিকট ফিরিয়া আসিল।

প্রাতঃকাল না হইতে হইতেই মুদির নিকট বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মুদিও পাছে তাহার অবস্থিতিতে বিপদ ঘটে এই জন্য আনন্দের সহিত তাহাকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিল।

অনন্তর গোলাব শঙ্কর তাহার জন্মভূমিতে ফিরিয়া গেল। সে দারিদ্র্য বশতঃ পূর্ব্বে যে পৈত্রিক বিষয় বিক্রয় করিয়াছিল তাহা এক্ষণে দ্বিগুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিল।

সে তাহার প্রতিজ্ঞানুযায়ী কাল বউকে লইয়া ঘর করিতে লাগিল এবং রাঙ্গা বউকে তাহার দাসী করিয়া রাখিবার জন্য লোক প্রেরণ করিল।

ধনাঢ্য বণিক দুহিতা কালবউ মহাধুমধাম করিয়া স্বামীগৃহে আসিল আর এদিকে চারিটী কুলি নিরাশ্রয়া রাঙ্গা বউকে খাটিয়ায় করিয়া লইয়া আসিল--উভয়ে এক সময় স্বামীগৃহে উপস্থিত হইল। অনাহারে উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়া রাঙ্গা বউ মৃতপ্রায় হইয়াছিল। পথে আনিতে আনিতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়া গেল—স্বামীর ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে হইল না। গোলাব শঙ্করের শেষ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল না।

বলাবাহুল্য গাড়োয়ানের দ্বিতীয় উপদেশ অনুসারে গোলাব শঙ্কর ধন-প্রাপ্তির কথা কাল বউএর নিকট গোপন রাখিল এবং প্রতিজ্ঞানুযায়ী পূর্ব্বোক্ত গাড়োয়ানকে হাজার টাকা প্রদান করিল।

শ্রীশোভনাসুন্দরী দেবী

বাইসিকেল বা দ্বিচক্র রথ।

আজকাল য়ুরোপীয় ও আমেরিকান সভ্য জগতে বাইসিকলের ব্যবহার একরূপ ফ্যাসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষিত নর নারী সখের ষ্টীমার, গাড়ী, ঘোড়া ত্যাগ করিয়া এখন বাইসিকলের আদর করিতেছেন। এই সখের ঢেউ আমাদের দেশেও আসিয়াছে। বাঙ্গলার অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই বাইসিকেল চড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাস্তবিক দেখিতে গেলে প্রাত্যহিক ব্যায়ামের পক্ষে বাইসিকেল প্রথম স্থান অধিকার করে। ইহাতে শারীরিক সমস্ত অঙ্গের চালনা হয় এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে উপযুক্তরূপ ব্যায়াম হইয়া থাকে। যান সম্বন্ধে দেখিতে গেলে ইহা অতি সুন্দর এবং শীঘ্রগামী। আমরা যাহাকে 'বামুনের গরু' বলি ইহা এক রকম তাহাই। পরিচালক চাকরের দরকার নাই—কিছু খাইতে দিতে হইবে না অথচ ঘোড়ার মত এমন কি তাহা অপেক্ষাও বেশী কাজ দিবে।

গত দশ পনের বৎসরের মধ্যে বাইসিক্লেলের বহুল প্রচার হইয়াছে।

পূর্ব্বে একখানি প্রকাণ্ড চক্র ও তৎ পশ্চাৎ একখানি অতি ক্ষুদ্র চক্র বিশিষ্ট যে বাইসিকেল গাড়ী প্রচলিত ছিল তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহাতে আরোহণ করা বড়ই বিপদ জনক ছিল এবং অতি অল্প সংখ্যক লোকেই তাহা ব্যবহার করিত। ইহা চালানও বড় কষ্টসাধ্য ছিল।

দুইখানি সমান আয়তন বিশিষ্ট চক্র সম্বলিত সুদৃশ্য যে সকল গাড়ী আজকাল ব্যবহার হয় তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় কলিকাতার ময়দানে দলে দলে নরনারীগণ যেরূপ সুখোপবিষ্ট হইয়া রথারোহণে ভ্রমণ করেন তাহা বড়ই মনোরম। স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণও এই আরোহণ বিদ্যায় পশ্চাদপদ নহেন। তাঁহারাও নিজ নিজ রথকে এরূপ দক্ষতার সহিত সুচারুরূপে চালনা করেন যে নির্জীব রথ সজীব পদার্থের ন্যায় নিজ প্রভুর ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করে।

ইংরাজ জাতি সর্ব্বপ্রকার সাহসিক কার্য্যে অগ্রগণ্য। বাইসিকেল চড়িয়া হাওয়া খাওয়া অথবা আফিস যাওয়া কিম্বা দুই চারি ক্রোশ দূরে বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করা প্রভৃতি সামান্য ভ্রমণে তাঁহারা পরিতুষ্ট নহেন। মিঃ ফ্রেজার, লো এবং লান নামা তিন জন ইংরাজ দ্বিচক্র রথে চড়িয়া পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। গত শীতকালে লাহোর হইতে তাঁহারা ট্রাঙ্ক রোড (Grand Trunk Road) ধরিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এদেশ হইতে ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপান ভ্রমণ করিয়া আমেরিকা গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা চিকাগো নগর ছাড়াইয়া চলিতেছেন, আর অল্প দিন মধ্যেই সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া প্রায় তিন বৎসর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এই তিন মহাত্মার সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা ভূয়সী প্রশংসনীয়।

আজকাল প্রধানতঃ দুই প্রকার বাইসিকেল প্রচলিত হইতেছে প্রথম চেন অর্থাৎ সিকলিযুক্ত ও দ্বিতীয় চেন বিহীন। ইহার নির্ম্মাণ কৌশলের দিন দিনই উৎকর্ষতা সাধিত হইতেছে। নির্ম্মাতাগণ স্ব স্ব বুদ্ধিবলে নানা প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া নূতন নূতন নামকরণ করিতেছেন। কিন্তু সে সকল লিখিয়া পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না। বাইসিকেল যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের মোটামুটি নাম ও তাহাতে আরোহণ করা বিষয়ে দুই চারি কথা বলাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

জীন (Saddle) ;—যেস্থানে আরোহী বসিয়া থাকেন। এই অংশ ইচ্ছামত খুলিতে পারা যায়। লৌহ শলাকা দ্বারা পশ্চাৎবর্ত্তী চক্রের উপর ইহা সংযুক্ত।

হাতল (Handle,) ;—আরোহী দুই হাতে ইহা ধরিয়া গাড়ী চালাইয়া থাকেন। ইহা নৌকার হালের মত গাড়ি পরিচালন করে। সম্মুখস্থিত চক্রের উপরিভাগে লৌহ শলাকা দ্বারা ইহা সংযুক্ত থাকে।

টায়ার (Tyre) ;—গাড়ীর দুই চাকাই মোটা রবার দ্বারা মণ্ডিত। ইহা থাকাতে গাড়ী চালানর বিশেষ সুবিধা হয়। পূর্ব্বে অতি সামান্য আয়তনের রবার দ্বারা চক্র দুইটী মণ্ডিত থাকিত, তাহাকে সলিড টায়ার (Solid Tyre) বলে। এই টায়ার সাধারণতঃ ⅞ ইঞ্চি আয়তন বিশিষ্ট। এক্ষণে নিউম্যাটিক (Pneumatic) টায়ার অধিকাংশ ব্যবহৃত হয়। ইহা খুব মোটা। সমস্ত পরিধিটিই (Rim) বেষ্টন করিয়া থাকে। ইহার ভিতর ফাঁপা একটী রবারের নল থাকে, যন্ত্র বিশেষের সাহায্যে তাহাতে বায়ু প্রবিষ্ট করাইলেই সমস্ত টায়ারটী ফুলিয়া উঠে। নিউম্যাটিক টায়ার যুক্ত গাড়ী চালনা করা বড়ই আরাম। কিন্তু ফাঁপা বলিয়া নিউম্যাটিক টায়ারের একটী প্রধান অসুবিধা ;—এই যে, সামান্য আঘাত লাগিলেই ফুটিয়া যায় এবং মফঃস্বলে তাহার মেরামত করাও সুবিধা জনক নহে। নিউম্যাটিক টায়ারের অনুকরণে একরূপ সলিড টায়ার নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাকে কুশন টায়ার (Cushion Tyre) বলে। তাহা বাহ্যিক আকারে দেখিতে ঠিক নিউম্যাটিক টায়ারের মত অথচ ফাঁপা নহে। মফঃস্বলবাসী অনেক নিউম্যাটিক টায়ারের পরিবর্ত্তে এই নূতন কুশন টায়ার পছন্দ করেন।

পেডাল অর্থাৎ পদ রক্ষণ স্থান, বা পদাধার ;—ইহার উপর পদস্থাপন করিয়া চাপ প্রয়োগ করিলে পশ্চাতের চক্রে গতি উৎপাদিত হইয়া গাড়ী চলিতে থাকে। পেডাল দুইটি সাধারণতঃ দুই চাকার মধ্যস্থলে স্থাপিত থাকে। দুইটা লৌহ শলাকা দ্বারা জাল এবং হাতলের সহিত ইহা সংযুক্ত থাকে। বাইসিকেল যন্ত্রের প্রধান কল এই পেডালের নিকট অবস্থিত। একটা দণ্ড বিশিষ্ট ক্ষুদ্র বৃত্ত এই পেডাল দ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত, পশ্চাৎ চক্রের কেন্দ্রেও ঐরূপ একটি ক্ষুদ্রায়তন দণ্ডবিশিষ্ট

বৃত্ত দৃঢ় সন্নিবিষ্ট আছে। চেন বিশিষ্ট গাড়ীতে একটি হারের ন্যায় চেন দ্বারা এই দুই ক্ষুদ্র বৃত্ত বেষ্টিত থকে। পদাধারে চাপ প্রদান করিলে নিকটস্থ বৃত্ত ঘুরিতে আরম্ভ করে এবং চেন কর্ত্তৃক সেই বেগ পশ্চাতের চক্রের কেন্দ্রস্থিত বৃত্তে নীত হইয়া পশ্চাতের চক্রে গতি উৎপন্ন করে। তখনি গাড়ী চলিতে থাকে। চেনবিহীন যন্ত্রের গঠন প্রণালীও প্রধানতঃ এইরূপ, তবে চেনের পরিবর্ত্তে একটি দৃঢ় শলাকা দ্বারা ক্ষুদ্র বৃত্তদ্বয় সংযুক্ত থাকে। ইহার নির্ম্মাণ প্রণালী অধিক লিখিয়া প্রস্তাবের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। চেন বিহীন যন্ত্রের আজিও শৈশবাবস্থা। নির্ম্মাতাগণ যদিও ইহাকে চেনযুক্ত যন্ত্র অপেক্ষা একাধিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলেন তথাপি দীর্ঘকাল ব্যবহার না করিলে ইহার যথার্থ গুণাগুণ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা যাইতে পারে না। তবে অনেকে চেনবিহীন যন্ত্রগুলি শীঘ্র বিকল হয় না এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার নির্ম্মাণ প্রণালী চেনযুক্ত যন্ত্র অপেক্ষা সরল এবং মেরামত অল্লায়াস সাধ্য।

উপরে যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিষয় লিখিত হইল তাহা ব্যতীত ব্রেক, মাডগার্ড, ঘণ্টা, আলো প্রভৃতি দ্বারা গাড়ীর অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারোপযোগী গাড়ী অপেক্ষাকৃত আয়তনে ছোট ও পশ্চাতের চক্রের উপরার্দ্ধ সূক্ষ্ম রেশমী তার দ্বারা আবরিত, তাহাতে আরোহীর বসন গমনশীল চক্রে আবদ্ধ হইতে পারে না।

শিক্ষিত আরোহীগণ যখন সবেগে গাড়ী চালাইয়া গমন করেন কেহবা দুই হস্ত ছাড়িয়া দিয়া সুখোপবিষ্ট থাকেন তখন, তাঁহাদের ইচ্ছামত গমন পরিবর্ত্তন ইত্যাদি দেখিয়া মনে হয় হয়ত বাইসিকেলে চড়া খুব সহজ, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইহাতে চড়িতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে শারীরিক ভার সমতা (balance) নির্ণয় করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রকারে বাইসিকেলে আরোহণ করা হয়। পশ্চাতের চক্রের কেন্দ্রের বাম ভাগে প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা একখানি লৌহ খণ্ড সংযুক্ত আছে। আরোহী গাড়ীর পশ্চাৎ দণ্ডায়মান হইয়া দুই হস্তে হ্যাণ্ডেল বার ধরিয়া ঐ লৌহখণ্ডে বাম পদ স্থাপন করেন। পরে ভূ সংশ্লিষ্ট দক্ষিণ পদ দ্বারা কয়েক পদ সম্মুখে অগ্রসর হয়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীখানিও চালনা করিয়া লইয়া যান। এরূপে গাড়ী গতিযুক্ত

হইলে লৌহখণ্ডস্থিত বাম পদে ভর দিয়া জীনের উপর উঠিয়া বসেন এবং পেডালে পদস্থাপন করিয়া চাপ দিলে সবেগে গাড়ী চলিতে থাকে, তখন হ্যাণ্ডেল সাহায্যে তাহাকে যদৃচ্ছা বাম ও দক্ষিনে এবং পদ দ্বারা সবেগে ও ধীরে পরিচালনা করা আরোহীর ইচ্ছা সাপেক্ষ। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে একাএকা ঐরূপ করিয়া চড়িতে যাওয়া বিপদ সঙ্কুল। প্রথম শিক্ষার্থী অন্যের সাহায্য ব্যতীত একক আরোহণের চেষ্টা করিবেন না। কলিকাতায় ব্যবসাদার বাইসিকেলশিক্ষক পাওয়া যায়, তাহারা পারিশ্রমিক লইয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে চড়িতে শিখায়। মফস্বলবাসীগণ বাইসিকেলবিশারদ বন্ধুর সাহায্যে শিখিতে পারেন। কিন্তু প্রথম শিখিবার সময় কোন অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমে শিখিতে হইলে অল্প উচ্চ এক খানি গাড়ী যোগাড় করিতে পারিলে ভাল হয়, কারণ মাটি হইতে পদদ্বয় যত কম উপরে থাকে ততই বিপদের আশঙ্কা কম। সাধারণতঃ পুরুষদিগের ব্যবহারোপযোগী গাড়ী গুলির ফ্রেম ২২ ইঞ্চি হইতে ২৬ ইঞ্চি উচ্চ হইয়া থাকে। ফ্রেমের পরিমাণ স্থির করিতে হইলে পশ্চাতের চক্রের কেন্দ্র হইতে জীনের নীচে পর্য্যন্ত যে লৌহশলাকা অবস্থিত আছে তাহার দৈর্ঘ্য মাপিতে হয়। চক্রের ব্যাস প্রায় ২৮ ইঞ্চি হয়। সুতরাং পুরুষদিগের ব্যবহারের গাড়ী সাধারণতঃ ৩৫।৩৬ ইঞ্চ হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের গাড়ী ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন। শিক্ষার্থী একখানি গাড়ী সংগ্রহ করিয়া প্রথমে জীনে বসিয়া দুই হস্তে হ্যাণ্ডেল ধরিয়া ব্যালান্স ঠিক করিতে চেষ্টা করিবে। কোন অল্প ক্রমনিম্ন (slope) স্থানের উপর গাড়ী রাখিয়া জীনের উপর বসিবে এবং দুই হাতে হ্যাণ্ডেলটি সমানভাবে রাখিবার চেষ্টা করিবে। মাটি হইতে পা উঠাইয়া লইলেই গাড়ী অমনি ঢালের দিকে চলিবে তখন হ্যাণ্ডেলটা সোজা রাখিলেই গাড়ী সোজা চলিবে কিন্তু প্রথম প্রথম হ্যাণ্ডেল প্রায়ই সোজা থাকিবে না ও গাড়ী এদিক ওদিক বেঁকিয়া পড়িবে। গাড়ীর উচ্চতা কম হইলে তখনই পা মাটীতে ঠেকিবে ও পতনের আশঙ্কা থাকিবে না। গাড়ীর বেগে হয়ত সময় সময় ইহাতেও আরোহীকে পড়িয়া যাইতে হয় কিন্তু প্রত্যেক গাড়ীর সম্মুখের চাকার ব্রেক লাগান আছে। দক্ষিণ হস্তের হ্যাণ্ডেলের নীচেই ব্রেকের হ্যাণ্ডেল অবস্থিত। এই ব্রেক চাপিয়া ধরিলেই একবারে

গাড়ীর গতি বন্ধ হইয়া যায়। শিক্ষার্থী যদি এক পার্শ্বে হেলিয়া পড়িবার উপক্রম হইবামাত্র এই ব্রেক চাপিয়া ধরেন তাহা হইলে আর কোন রূপ বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

প্রথম কয়েক দিন এইরূপ অভ্যাস করিয়া ভারসমতা সম্বন্ধে জ্ঞান হইলে তখন আর গাড়ী এপাশ ওপাশ হেলিয়া পড়িবে না। গাড়ীর নির্ম্মাণ কৌশল ও টায়ারবেষ্টিত রবারের স্থিতিস্থাপকতা হেতু ক্রমনিম্ন স্থানে গাড়ী আপনিই অনেক দূর যাইবে। হ্যাণ্ডেল বার সমান করিয়া ধরিয়া থাকিলে পড়িবারও আশঙ্কা থাকে না। এই সুযোগে সাবধানে পা দুখানি পেডালের উপর স্থাপন করিতে পারিলেই পেডালের সঙ্গে সঙ্গে পা উঠিবে ও নামিবে এবং তখন তাহাতে চাপ দিতে হইবে, তাহা হইলেই গাড়ী যদৃচ্ছা চলিবে। কিন্তু এই টুকু অভ্যাস করিতে অনেক পড়িতে হইবে। সঙ্গে যে কোন লোক থাকিলেই পতনের সময় রক্ষা করিতে পারে। শিক্ষিত সহচর পার্শ্বে থাকিলে আরোহণের কৌশল শীঘ্রই শিখিতে পারা যায়। আমার প্রথম বাইসিকেল শিক্ষা কিরূপে হইয়াছিল তাহা এস্থলে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব, ভরসা করি প্রথম শিক্ষার্থীর তাহাতে অনেক সাহায্য হইবে।

আজ প্রায় তিন বৎসরের কথা—আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কলেজের অবকাশ উপলক্ষে একখানি বাইসিকেল গাড়ী লইয়া বাড়ী আসিলেন। একদিন প্রাতে তাহাতে আরোহণ করিয়া পরিচালন কৌশল দেখাইলেন। ইহার বহুপূর্ব্ব হইতে বাইসিকেল চড়িবার প্রবল ইচ্ছা ছিল; ভ্রাতার গাড়ী দেখিয়া সে ইচ্ছা আরও বলবতী হইল। আমার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই অন্যান্য অনেকে গাড়ী চড়িবার চেষ্টা করিতে ছিলেন; তাঁহাদের দুর্গতি দেখিয়া ভাবিলাম আমি অশ্বারোহণ পটু, হয়ত চড়িবা মাত্র আমি গাড়ী চালাইতে পারিব। আরও দেখিলাম অধিক বেগে চালাইলেই গাড়ী সোজা থাকিতেছে আমিও তাহাই করিব ইহা মনস্থ করিয়া গাড়ী চড়িতে গেলাম। শিক্ষিত আরোহীর মত কায়দা করিয়া দুই হাতে হ্যাণ্ডেল ও বামপদ লৌহ খণ্ডে দিয়া দাঁড়াইলাম। আমার প্রগল্‌ভতা দেখিয়া ভ্রাতা সহাস্য বদনে দূরে দাঁড়াইলেন। বিপদ যে এতদুর দাঁড়াইবে হয়ত তিনি তাহা ভাবেন নাই। আমি ভাবিলাম

সজোরে দক্ষিণ পদে কিয়দ্দূর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া জীনের উপর উঠিয়া বসিব ও পেডাল চালাইতে আরম্ভ করিব। আমার প্রগল্‌ভতার ফল ফলিল। গাড়ী চালাইয়া জীনের উপর বসিতে না বসিতে গাড়ী ডানদিকে হেলিয়া পড়িল এবং আমি পড়িয়া গেলাম। পেডাল ও চেনে পা আটকাইয়া গেল। পূর্ব্ব প্রদত্ত বেগে গাড়ী মৃত্তিকায় আমাকে টানিয়া লইয়া গেল। সকলের সাহায্যে উঠিয়া দেখি আমার ডান পা পড়িবার সময় মচ্‌কাইয়া গিয়াছে। আঘাত এত গুরুতর হইয়াছিল যে প্রায় দুই সপ্তাহ আমাকে অকর্ম্মণ্য হইয়া শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল। এই দুর্ঘটনার পর স্বতঃই মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। ভাবিলাম হয়ত কখনই আর বাইসিকেলে চড়িতে পারিব না।

গত শীত কালে চেন বিহীন গাড়ীর নূতন আবিষ্কারের কথা পড়িয়া ভ্রাতার জন্য বিলাত হইতে একখানি চেনবিহীন গাড়ী আনিতে পাঠাই। আজকাল সমস্ত গাড়ীই নিউম্যাটিক টায়ার বেষ্টিত থাকে কিন্তু আমাদের বিশেষ আদেশ অনুযায়ী এই গাডীতে দেড় ইঞ্চি আয়তনের কুশন টায়ার দেওয়া হয়। কয়েক মাস এই গাড়ী আসিয়াছে। ইহার নাম Chainless quadrant strong roadster. গাডী খানি দেখিতে বড়ই সুদৃশ্য। নূতন গাড়ী দেখিয়া ও নিজের অক্ষমতার বিষয় ভাবিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। কিন্তু ভ্রাতার আগ্রহে পুনর্ব্বার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহার আগ্রহ, চেষ্টা ও যত্ন না থাকিলে আমি কখনই কৃতকার্য্য হইতাম না। ভ্রাতার আগ্রহ ও যত্নে আমি অপেক্ষাকৃত অল্প দিনেই বাইসিকেল চড়িতে শিখিয়াছি এবং ভরসা করি সেই উপায় অবলম্বন করিলে অনেকেই অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে অভ্যাস করিতে পারিবেন। প্রথম দুই দিন কোন বিশেষ উন্নতি উপলব্ধি হইল না। দুই জন দুই পার্শ্বে গাড়ীর হ্যাণ্ডেল ও জীন ধরিয়া ঠেলিয়া লইয়া যায়, আমি সাক্ষী গোপাল হইয়া জীনে বসিয়া থাকি; যে দিকে একটু হস্তচ্যুতি হয় অমনি সেই দিকে পড়িবার উপক্রম হয়। চতুর্থ দিনে ভ্রাতা এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন—গাড়ীর জীন খুলিয়া ফেলিয়া উচ্চতা কম করা হইল। জীনের নিম্নস্থ লৌহ দণ্ডে বসিলে দুই পা মাটী স্পর্শ করে। পরে পেডাল দুইটী খুলিয়া রাখা হইল কারণ কাপড়ে পেডাল জড়াইয়া যাওয়া সম্ভব। একটী ক্রমনিম্ন স্থানে গাড়ী স্থাপন করা হইলে

আমি লৌহ দণ্ডে উপবেশন করিলাম ও দৃঢ় মুষ্টিতে হ্যাণ্ডেল ধরিয়া থাকিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা চেষ্টা করার পর অন্যের বিনা সাহায্যে প্রায় ৮০ ফুট চলিতে পারিলাম। পঞ্চমদিনে পেডালে পা দিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইলাম। কিন্তু এপর্য্যন্ত অন্যের বিনা সাহায্যে গাড়ীতে চড়িতে পারি নাই তবে চড়াইয়া দিলে সোজা চালাইতে পারি মাত্র। অল্প সাহায্যে আরোহণ অভ্যাস হইল। ক্রমনিম্নস্থানে গাড়ী স্বভাবতঃ যে বেগ পাইতে ছিল বামপদ পশ্চাৎ চক্রের লৌহ খণ্ডে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ পদে তদ্রূপ বেগ দিয়া জীনের উপর উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী চলিলে হ্যাণ্ডেল সাহায্যে তাহার গতি সোজা (Regulate) করিয়া লইলাম তখন আর পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ পেডালে পদস্থাপন করিতে অসুবিধা বোধ হইল না। এইরূপ আমি ষষ্ঠ দিনে অন্যের বিনা সাহায্যে গাড়ী চালাইতে পারিয়াছিলাম।

আরোহণের সময় জীনে বসিবা মাত্র তাড়াতাড়ি পেডালে পদস্থাপনের চেষ্টা না করিয়া প্রথমে হ্যাণ্ডেল সাহায্যে গাড়ীর গতি পরিচালনা করিয়া পরে পেডালে পদস্থাপন করা উচিত। তাহা হইলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। অনেকে লৌহ খণ্ডে পদ স্থাপন না করিয়া গাড়ী ঈষৎ হেলাইয়া একেবারে জীনের উপর চড়িয়া বসেন। এইরূপ করিয়া চড়িতে হইলে গাড়ী বাম পার্শ্বে হেলাইয়া প্রথমে দক্ষিণপদ দিয়া জীনের উপর বসিয়া পেডাল স্পর্শ করিতে হয়। গাড়ী এমন ভাবে স্থাপন করিতে হইবে যেন দক্ষিণ পার্শ্বের পেডাল উপর দিকে থাকে। পরে মৃত্তিকাস্থিত বামপদ দ্বারা ঈষৎ জোর দিলেই গাড়ী সোজা হইয়া দাঁড়াইবে ও পেডাল করিলেই চলিতে থাকিবে। কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থীর এইরূপ চেষ্টা না করাই উচিত।

এইরূপে আরোহণ ও চালনা অভ্যস্থ হইলেই উপলব্ধি হইবে যে গাড়ী যত দ্রুত চালনা করা যাইবে ততই সোজা হইয়া চলিবে, ধীরে চালাইলে পতনের আশঙ্কা বেশী। পরে যতই অভ্যাস করা যাইবে ততই নানা রূপ কৌশল উপলব্ধি হইবে। সুশিক্ষিত আরোহীর নিকট অশ্ব প্রভৃতি সজীব যান যে রূপ আরোহীর ইচ্ছামত চালিত হইয়া থাকে নির্জ্জীব বাইসিকেলও শিক্ষিত আরোহীর নিকট সেইরূপ চলে। সুবিধা থাকিলে গাড়ী ভাড়া লইয়া অভ্যাস করাই ভাল। পরে অভ্যাস হইলে নিজ মনোমত

গাড়ী পছন্দ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সখের খাতিরে কম দামে বাজে গাড়ী না লইয়া ভাল নির্ম্মাতার গাড়ী একটু বেশী দাম দিয়া লওয়াই ভাল।

বাইসিকেলের সম্মুখের চাকার দুই পার্শ্বে দুই খানি অনতিদীর্ঘ লৌহ খণ্ড আছে। আরোহী ক্লান্ত হইলে তাহার উপর পদ স্থাপন করিয়া বিশ্রাম করিতে পারেন। পর্ব্বত কিম্বা অন্য কোন ক্রমনিম্ন স্থানে অবতরণ কালে ঐরূপ পদস্থাপনা প্রয়োজন হয়। নিম্নত্ব হেতু গাড়ী আপন বেগেই চলিতে থাকে তখন আর পেডাল করার দরকার হয় না। বাইসিকেল আরোহীগণ তাহাদের ভাষায় ইহাকে "Coasting" বলেন। পর্ব্বতাদি অবতরণ কালে অনেক সময় এরূপ "কোষ্টিং" বিপদ জনক।

বাইসিকেলের সুবিধা দেখিয়া বিলাতে বাইসিকেল আরোহী সৈন্যদলের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব বাইসিকেলে বন্দুক রাখিবার স্থান করা হইয়াছে। পশ্চাতে জীনের নীচে যোদ্ধা আপন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইতে পারেন। যোদ্ধৃগণ যুদ্ধকালে নিজ নিজ পার্শ্বে মৃত্তিকায় বাইসিকেল স্থাপন করিয়া বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করেন। মার্কিন রাজ্যে বিজ্ঞাপন বিতরণকারী, ফেরীওয়ালা প্রভৃতি অনেকেই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশেও ইহার বহুল প্রচার হইয়াছে। এদেশে ডাক বিভাগে ও পুলিস বিভাগে এক্ষণে ব্যবহার হইতেছে। মহামান্য ছোট লাটের পিয়নগণ বাইসিকেল চড়িয়া পত্রাদি বিলি করিয়া থাকে। "সোয়ারের পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহারে অপেক্ষাকৃত ব্যয় লাঘবতা হইয়া থাকে।

কলিকাতার Bengal Cyclists Association নামক একটী সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার অনুষ্ঠাতাগণ বাইসিকেল দৌড়, পরিভ্রমণ ইত্যাদি আমোদের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মেম্বরগণ একখণ্ড রৌপ্য পদক পাইয়া থাকেন তদ্দ্বারা হোটেল ও রেলে তাহাদের গতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। এই সমিতির মেম্বরগণ অধিকাংশই ইংরাজ, দেশীয়ের সংখ্যা অতি অল্প। অল্প দিন হইল মুসলমান বাইসিকেল আরোহীগণও তাঁহাদের এক সমিতি করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী ভ্রাতৃগণ আজ পর্য্যন্ত এইরূপ

কোন অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়েন নাই। বাইসিকেল আরোহণ অতি বিশুদ্ধ ব্যায়াম। প্রত্যেক বাঙ্গালীরই ইহা শিক্ষা করা উচিত।

শ্রীচারুকৃষ্ণ মজুমদার।

পার্ব্বতীয় পুরুষ।

১

দেখ কি বলিষ্ঠ দেহ মুক্তপ্রাণ ভীমকায়
ভালরূপে একবার চেয়ে দেখ চেহারায়—
পার্ব্বতীয় আর্য্য শ্বেত,
উর্ব্বর শ্যামল ক্ষেত
দেখিতে পর্ব্বত হ'তে এসেছে নিম্নধরায়।

২

নিম্নদেশে এসে তার লাগিছে নূতন সব,
প্রশস্ত বয়ানে তার
কি শুভ্র রক্তিম ধার,
মৃদু মৃদু হাস্য করে করি কত অনুভব।

৩

কুন্তলিত কেশপাশ ঘনগুচ্ছ শোভা পায়,
কলেবরে কি বাঁধন,
করে কি শ্রমসাধন—
বিকশিত মাংসপেশী গ্রীবা করে বক্ষে পায়।

৪

কি ছন্দে দাঁড়ায়ে থাকে পরাক্রম জাগে মুখে,
অদ্রি জল বায়ু শৈত্য
করিয়াছে তারে দৈত্য,
শৈল হ'তে শৈলমাঝে ধায়রে সহজে সুখে।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পোড়ো মন্দির।

১

সুবিজন নদীতীরে
গোধূলির ছায়া ঘিরে,
পুরাতন সুনিবিড় বট,
তারি অন্ধকার-ক্রোড়ে,
পাষাণ মন্দির প'ড়ে,
জলে লুটায়ে পড়েছে জট।

২

গভীর স্তব্ধতামাঝে
দূরে দূরে ঘণ্টা বাজে
মঙ্গল বারতা লয়ে আসে,
অনুক্ষণ হয় মনে
কারা যেন এ বিজনে
স্বপ্ন সম যায় আর আসে।

৩

একাকী এ তরুতলে,
অতীতের স্বপ্ন বলে
প্রাণ যেন কারে খুঁজে কাঁদে;
শুধু প্রতিধ্বনি পাই —
কেহ নাই কেহ নাই
ডুবে যাই ঘোর অবসাদে।

৪

কি কঠোর ব্রত ধ'রে
একাকী বসিয়া ওরে
কে দিয়াছে তোরে চির ব্যথা?

চৌদিকে বিশ্বের গানে
জাগেনাকি তোর প্রাণে
আনন্দ উচ্ছ্বাস ব্যাকুলতা!

৫

এসংসারে কোন জন
আহা তোর কি এমন
আপনার ব'লে নাই কেহ?
ভাঙ্গা বুকের মাঝারে
এ সময়ে রাখি যারে
দিবি সুখে ভালবাসা স্নেহ?

৬

গভীর ঔদাস্য ভরে
তাই বুঝি জটা ধ'রে
পরি' তুই উদাসীর বেশ,
নিরজন নদীকূলে
অন্ধকার বটমূলে
কাটাইবি জীবনের শেষ।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আত্মার মঙ্গলভাব ও দিগ্বীক্ষণ।

যেমন দিগ্বীক্ষণের কাঁটা সর্ব্বদাই উত্তরদক্ষিণাভিমুখীন হইয়া থাকে, যে দিকে ঘুরাইয়া দেও আবার উত্তর দক্ষিণদিকে আসিয়া দাঁড়ায় তেমনি আত্মার স্বাভাবিক ইচ্ছা মঙ্গলের দিকে; তাহাকে হাজার চঞ্চল করিয়া দাও চঞ্চলতা চলিয়া গেলেই আত্মা আবার মঙ্গলের দিকে আসিয়া দাঁড়ায়।

ইহাই সকল মানুষেরপক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যদি কোন চুম্বক দিগ্বীক্ষণের কাছে পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে ধরা যায় আর তাহার কাঁটা উত্তর দক্ষিণে দাঁড়াইতে পারে না। তেমনি নিকটবর্ত্তী কোন বিষয় যখন আত্মাকে আকর্ষণ করে তখন আত্মা তাহার দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়ে। আকর্ষণ যখন ছাড়াইয়া লওয়া যায় তখন আবার আপনার স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের স্বাভাবিক ভাব মঙ্গলের দিকে; ভালই করিব এই ইচ্ছা হয়। দেখনা মানুষে বলে, 'কোন লাভ হল না অথচ মিথ্যা একজনের অনিষ্ট করলেম' অর্থাৎ আপনার স্বার্থের জন্য মন্দ করিলাম না হইলে করিতাম না। স্বার্থ আকর্ষণ করিল নচেৎ ভালর দিকে ইচ্ছাটা ছিল। যদি সেই স্বার্থটাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় ইচ্ছা আবার ভালর দিকে যাইবে।

দুই রকম মনের ভাব আছে;—এক পৃথিবীর বস্তুতে আকর্ষণ আছে, সেই জন্য প্রবৃত্তি রহিয়াছে; আর এক ইচ্ছা ভালর দিকে। এই দুই বলের আকর্ষণে মানুষ চলিয়াছে। যেমন সূর্য্য মধ্যে রহিয়াছে পৃথিবী ঘুরিতেছে, সূর্য্য টানিতেছে আপনার দিকে, পৃথিবী সোজা চলিয়াছে। পৃথিবী যতটুকু সোজা চলিয়াছে, সূর্য্য যতটুকু টানিতেছে, ইহাতেই পৃথিবী যতটুকু ঘুরিতে পারে ঘুরিতেছে। আত্মা স্বার্থপরতার দিকে যাইতেছে ইহা যেন পৃথিবীর গতি, আত্মা মঙ্গলের দিকে যাইতেছে ইহা যেন সূর্য্যের আকর্ষণ; ইহারি মধ্যে মানুষ যতটুকু ঘুরিতে পারে। দুয়ের সামঞ্জস্য পথে যে চলে সেই প্রকৃত মানুষ। সংসার আকর্ষণ করিতেছে এক দিকে, আত্মার ইচ্ছা আর এক দিকে। সংসারের আকর্ষণগুলা যদি ছাড়াইয়া দেও কাঁটার উত্তর দক্ষিণে গতির ন্যায় আত্মাও ভালর দিকে যাইবে। ভালর জন্য শিক্ষা দিতে হয়না, আপনার প্রতি ... দেখিলে অমনি ভালর দিকে যাইতে হয়। কিন্তু আপনার প্রতি টানিতেছে মোহ. ইহারি জন্য ভাল করিতে পারা যাইতেছে না।

পৃথিবীতে যত রকম বন্ধু আছে যাহাকে আপনার সমান ভালবাসা যায় তাহাদিগের মধ্যে ভায়ের মত বন্ধু কেহ নাই। একই পিতামাতা, একই ঘরে বাস, জন্ম হইতে একত্র খেলাধূলা। যে ভাই নয় তাহাকে ভালবাসিলে ভাই বলিতে হয়। এমন দেখা যায় যে এক ভাইয়ের টাকা

হইল তাহাতে অন্য ভাইয়ের ঈর্ষা হইল। যদি ঈর্ষা না হইত তাহা হইলে ভালবাসাত আছেই। ইহা কাহাকেও আর শিখাইয়া দিতে হয় না যে ভাইকে ভালবাস। কেবল প্রবৃত্তি অন্যদিকে টানিলে 'ভালবাসার কাঁটাটা ঘুরিয়া যায়। 'ভাইকে ভালবাস' 'ভাইকে ভালবাস' এ কথা আর বলিতে হয় না, ইহাত আছেই, কেবল যেটা ভালবাসাকে সরাইয়া লইয়া যায় সেইটা কাটিয়া দাও। 'পিতামাতাকে ভক্তি কর' 'ভাইকে ভালবাস' ইহাত সকলেই জানে, তবে ভালবাসা চলিয়া যায় কেন? এমন একটা কিছু আসে যাহার টানে পড়িয়া ভালবাসা ভাসিয়া যায় তাহা প্রবৃত্তির বিষয়। প্রবৃত্তির উচ্ছেদ করিলেই যেমনকার ভাব তেমনি থাকিবে। আত্মার ইচ্ছাটা মঙ্গলের দিকেই; প্রবৃত্তির বিষয়াকর্ষণ চুম্বকের ন্যায় পৃথিবীর দিকে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, সেইটার উচ্ছেদ করিলেই আবার সরিতে সরিতে আত্মা মঙ্গলের দিকে আসিয়াই স্থির হয়। মঙ্গলের দিকে যাওয়ার অর্থ হইতেছে মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বরের দিকে যাওয়া। তিনি আত্মাকে মঙ্গলের ভাব দিয়া গঠন করিয়াছেন। সচরাচর মানুষকে ভদ্র বলিয়া সম্বোধন করা যায়। ভদ্র শব্দের অর্থ কি না মঙ্গল, ভাল; যখন মানুষকে ভাল দিক্ দিয়া সম্বোধন করে তখন ভদ্র বলে। ভদ্র কি না ভালর দিকে আছে। কিন্তু মনুষ্যকে সম্পূর্ণ ভাল বলা যায় না। খ্রীষ্টকে একজন আসিয়া বলিল "হে ভদ্র হে কল্যাণ কিসে পাপ হইতে মুক্ত হই উপদেশ দাও"; খ্রীষ্ট তাহাকে বলিলেন "কল্যাণ, ভদ্র আমাকে বলিয়ো না— কল্যাণস্বরূপ একই ঈশ্বর।" কল্যাণমঙ্গল কেবল ঈশ্বরেতেই থাটে আর কাহাতেও থাটে না। যেমন সত্যস্বরূপ বলিলে ঈশ্বরকে বুঝায় তেমনি মঙ্গলস্বরূপ বলিলেও ঈশ্বরকে বুঝায়। তিনি আত্মাকে মঙ্গলের দিকে কিনা তাঁহার আপনার দিকে লইয়া যাইতেছেন। মঙ্গলের দিকে থাকার অর্থ তাঁহার দিকে থাকা। দিক্‌কাঁটা উত্তর দক্ষিণ দিকে থাকে ইহার কারণ কি? কারণ কেন্দ্রের আকর্ষণ। তেমনি আমাদের ইচ্ছা মঙ্গলের দিকে আছে কিনা ঈশ্বরের দিকে আমাদের টান আছে। আত্মার স্বভাবের টানটা ঈশ্বরের দিকে। আমাদের ইচ্ছাটা যেন কাঁটা। উত্তর দক্ষিণ দিকটা যেন হইল মঙ্গল; সেই দিকে কাঁটাটা যাইতেছে। ঈশ্বর যেন হইলেন কেন্দ্রাকর্ষণ। ইচ্ছার কাঁটা

মঙ্গলের দিকে যাইতেছে অর্থাৎ স্বভাবত ঈশ্বরের দিকে যাইতেছে। প্রবৃত্তির বিষয় আপনি ও সংসার। যখন আত্মা ইহার নিকট থাকে তখন কাঁটা ঝুঁকিয়া আসিয়া পড়ে, ইহারই নাম স্বার্থপরতা। আমরা যথার্থ ভদ্র হইব যখন সেই মঙ্গল স্বরূপের দিকে স্বভাবতঃ কাঁটা থাকিবে। তাহাই থাকে। আমাদের স্বাভাবিক ভাব আছে মঙ্গলের দিকে, সেই ইচ্ছাকে স্বাভাবিক দিকে রাখিতে পারিলেই ঠিক ভদ্র হইয়া সংসার সাগরে লোকদের মাঝে নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করিতে পারি। সভ্যতা মঙ্গল ভাবের ছায়া। কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হইলে বলিতে হয় "কেমন আছ ভাল ত?" অর্থাৎ আমার ইচ্ছা যে ভাল থাক. তাহা না হইয়া যদি কেবল বলিতে হয় বলিয়া বলা যায়, তাহা হইলে ভাল ভাবের ছায়া মাত্র ব্যক্ত হয়,—প্রকৃত তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নয় অথচ দেখাইতে হয় তোমার মঙ্গলের জন্য যেন কত ব্যস্ত। ভদ্রভাবের ছায়াটাও ভাল। যদি সত্য সত্য সেইটা মনের ভাব হয় তবেই ঠিক। ভিতরে বাহিরে সমান হইলে স্বাভাবিক অবস্থা; যদিবা সমান না হইল তবুও বাহিরে লোকের চক্ষুর সম্মুখে গিল্‌টি দিয়া চলিতে হয়—না হইলে সভ্যতা রক্ষা হয় না, লোকের কাছে যাওয়া যায় না। ভাল এমনি জিনিষ যে অন্ততঃ তাহার গিল্‌টি করিয়াও যাইতে হয়, তাহা না হইলে চলিবার উপায় নাই। যতক্ষণ ভাল না হয় ততক্ষণ লোককে দেখাইতেও হইবে যে খাঁটি আছে। যদিও মনে করিতেছ এক-জনের খারাপ হউক তবুও তাহাকে বলিতে হইবে 'ভাল আছেন ত?' ভাল ভাবের ছায়া হইল ভদ্রতা ও সভ্যতা। যদি যথার্থ ভাল ভাব হয় তবেই যথার্থ ভদ্রতা ও সভ্যতা। আত্মা যখন ঈশ্বরের দিকে থাকে তখন তাহার স্বাভাবিক অবস্থা। অন্য আকর্ষণ আসিয়া সেই স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুতি না করিতে পারে ইহারি জন্য চেষ্টা। আত্মার ইচ্ছা যখন ঈশ্বরে থাকিল তখন ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ নাই। আমরা এই ক্ষুদ্র হইয়াও আবার ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ করি? ঈশ্বরের ইচ্ছা মঙ্গলের দিকে জানিতেছি, ইহা জানিয়াও যদি আমার ইচ্ছাকে মন্দ দিকে নিয়োজিত করি তাহা হইলেই তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের ঝগড়া করা হয়। বিবাদ আর কিসে হয়, আমার ইচ্ছা যে একজন এই রকম করুক, সে তাহা

না করিয়া, যদি আর একরকম করে তাহা হইলেই বিবাদ হইল। যদি দুই ইচ্ছা এক হয় তবে ভাব হয়, দুই ইচ্ছা স্বতন্ত্র হইলে বিবাদ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা ভাল কর। যদি টাকার জন্য জমীদার প্রজার ঘর পুড়াইয়া দেয়, মানুষ কেমন করিয়া ডোবে যদি কেহ এই তামাসা দেখিবার জন্য কাহাকেও জলে ফেলিয়া দেয় তাহা হইলেই ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া যত ভাল হয় তাহা বুঝাই যাইতেছে। যে ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাদ করিবে তাহার কেমন করিয়া ভাল হইবে? সে অধার্ম্মিক হইল, কাজে কাজেই দণ্ড আসিয়া তাহাকে ভালপথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ব্যথিত করিতে লাগিল। ডাক্তারে যেমন ঔষধ দেয়, পিতা-মাতা যেমন ছেলেকে ভাল করিবার জন্য তাড়না করেন, তেমনি ঈশ্বর অধার্ম্মিক ব্যক্তিকে দণ্ড দিয়া শোধন করেন। কাঁটাটা মঙ্গলের দিকে থাকা স্বাভাবিক। যেদিকে যাওয়া উচিত সে দিকে না গেলেই ক্লেশ হইবে। আঙ্গুল স্বাভাবিক যে রকম আছে, তুমি যদি তাহা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া উল্টাইয়া লইয়া যাইতে চাও, তাহা হইলে ক্লেশের কারণ হইবে, তুমি তাহাকে উল্টাইতে পারিবেনা। যদি কেহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহা হইলে নাচার। উর্দ্ধবাহুর ন্যায় যে যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও হাতকে উপর দিকে রাখিবে তাহার হাত শুকাইয়া যাইবে, সে হাতে কিছুই করিতে পারিবে না। হাত যাহার জন্য হাতের সে কাজ তাহা হইতে সম্পন্ন হইবে না। ঈশ্বর যে স্বভাব করিয়া দিয়াছেন তাহার বিপরীত করিলেই ক্লেশ হইবে। যদি সে ক্লেশ সহ্য করিয়াও না ফিরিয়া আসি, তবে আত্মা যাহার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, আত্মা দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইল না, আত্মা অসাড় হইয়া গেল, পশু ভাবেই রহিল, মনুষ্যজন্মের সার্থকতা সম্পন্ন হইল না। ঈশ্বর যে ইচ্ছা মানুষকে দিয়াছেন সে ইচ্ছাকে মঙ্গলের দিক্ হইতে ফিরাইতে গেলে ব্যথা পাইবে। সে ক্লেশ সহ্য করিয়াও উল্টা গেলে ক্রমিকই ব্যথা পাবে যে পর্য্যন্ত না ফিরিয়া আসে। যখন মঙ্গল ভাবের উল্টা যাই তখন ভিতরের ধর্ম্মভাব দ্বারা বুঝিতে পারি; আবার যখন মঙ্গলভাবের দ্বারা ঈশ্বরের দিকে দাঁড়াই তখনো ভিতরের ধর্ম্মভাবের দ্বারা বুঝিতে পারি। যখন আমাদের ইচ্ছা মঙ্গলস্বরূপের ইচ্ছার

সহিত একতার হয় তখন সকলি সুতার হয়। তখনি বিতার (discord) হয় যখন তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছার মিল থাকেনা এবং ততক্ষণ জীবনের পূর্ণ সুখলাভ হয় না। তাঁর সঙ্গে থাকিলেই সুখশান্তি তৃপ্তি লাভ করি, ততক্ষণ যেন পিতার গৃহে থাকি। "আপন গৃহ ছাড়ি সুখশান্তি পাইবে কোথায়?"

নারিকেলের দোদল।

উপকরণ।—ঝুনা নারিকেল দুইটা (নারিকেল কোরা পাঁচছটাক), মিহি শফেদা এক পোয়া, দোবরা চিনি এক পোয়া, জল দেড় পোয়া, বড় এলাচ চারিটা, বাদাম ছয় সাতটা।

প্রণালী—নারিকেল দুইটির উপরের ছোবড়াদি ছাড়াইয়া, তারপরেও খোলার উপরে চাঁচিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া ফেল। তাহা না হইলে খোলার লাল গুঁড়া নারিকেল কোরার উপরে পড়িয়া নারিকেলের শাঁস লাল হইয়া যাইতে পারে। এবারে নারিকেলটী ঠিক আধখানা করিয়া ভাঙ্গ। কুরুনি-বঁটি করিয়া নারিকেল কুরিয়া ফেল।

বড় এলাচের দানা বাহির করিয়া আধ-গুঁড়া করিয়া একটি কাগজের ভিতরে মুড়িয়া রাখ।

বাদামের খোলা ভাঙ্গিয়া ভিজাইতে দাও। ভিজিলে তাহার খোসা তুলিয়া লম্বাদিকে বেশ পাতলা করিয়া কুচি কাটিয়া রাখ।

দেড়পোয়া গরম জল আন। নারিকেল কোরাতে আধ পোয়া জল মিশাও। একটি নূতন মলমল কাপড়ে ছাঁকিয়া দুধ বাহির কর। আবার অবশিষ্ট এক পোয়া গরম জল এই ছাঁকা নারিকেলের ছোবড়াতে মিশাও এবং পুনরায় কাপড়ে করিয়া ছাঁক। এইরূপে নারিকেলের দুধ বাহির করা হইল।

নারিকেলের দুধে চিনি ও শফেদা (চালের গুঁড়া বা চালের ময়দা

মিশাও। একটি পিতলের কড়া বা কলাইকরা কড়াতে ঐ গোলা ঢালিয়া উনানে চড়াইয়া দাও। একটি খুন্তি বা তাড়ু দিয়া ক্রমাগত নাড়িতে থাক। ইহাতে শফেদা আছে, না নাড়িলে একটু গরম হইলেই ডেলা পাকিতে আরম্ভ হইবে। সেই জন্য প্রথম হইতেই ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। ক্রমে যখন তাল বাঁধিয়া আসিতে থাকিবে ও সেই সঙ্গে ইহা হইতে নারিকেল দুধের তেল বাহির হইয়া পড়িবে, তখন নামাইয়া একটি চেপটা বাসনে ঢালিয়া খুন্তি বা হাতার উল্টা দিক দিয়া চেপ্টাইয়া রাখ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তেল বাহির হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত উনান হইতে কড়া নামাইবে না। ইহা মিনিট বার চৌদ্দের মধ্যে হইয়া যাইবে। এখন ইহার উপরে আধ-গুঁড়া বড় এলাচ ছড়াইয়া দাও। তাহার পরে বাদাম কুঁচি সাজাইয়া দাও। আস্ত বাদাম দিয়াও সাজাইতে পার। ঠাণ্ডা হইয়া গেলে বরফির আকারে কাটিয়া খাইতে দিবে।

এই দোদলে কেবল বাদাম দেওয়াতে অনেকে মনে করিতে পারেন কিস্‌মিস্ প্রভৃতি দিলেও হয় কিন্তু তাহা নয়; বাদাম দেওয়াতেই ইহার আস্বাদ ভাল হয়। ইহাতে কিস্‌মিস্ দেওয়া বিধি নয়। চালের গুঁড়ার সহিত পেষা বাদাম বা অল্পডেলা ক্ষীর মিশাইয়া দিলেও হয়।

ভোজন বিধি।—ইহা আমাদের জলখাবারে বেশ চলে। পুডিংএর পরিবর্ত্তে ও 'দোদল' দেওয়া যাইতে পারে। নারিকেলের দুধ থাকায় এ মিষ্টান্নটী বড় গুরুপাক।

ব্যয়।—নারিকেল চার পয়সা, শফেদা দুই পয়সা, দোবারা চিনি চারপয়সা, বড় এলাচ ও বাদাম দুই তিন পয়সা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় আনা তিন খরচ করিলেই ইহা হইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

চিতল মাছের স্টু।

উপকরণ।—চিতল মাছ তিন পোয়া, বিলাতী বেগুন কুড়িটী, পেঁয়াজ আধপোয়া, আদা দেড় তোলা, কাঁচা লঙ্কা সাত আটটী, লেবু তিনটী (রস দেড় ছটাক), নুন কম বেশী প্রায় পোন তোলা, ময়দা এক কাঁচ্চা, আলু দেড় ছটাক, বাগানে মশলা (পার্সলি সেলেরি ও পুদিনা) পাঁচ ছয় ডাল, জল একসের।

প্রণালী।—একটি ঝামা দিয়া চিতল মাছের উপরে ডানা পর্য্যন্ত ঘষড়াইয়া ঘষড়াইয়া ইহার আঁশ উঠাইয়া ফেল। চিতল মাছের বড় ছোট ছোট আঁশ সেই জন্য বঁটি অপেক্ষা ঝামা বা ছুরি দিয়া চাঁচিয়া আঁশ বাহির করিতে ভালরূপে সুবিধা হয়। তার পরে মাছ আড় ভাগে লম্বা ফালা ফালা করিয়া আট নয় টুকরা করিয়া কাট। ভাল করিয়া ধুইয়া ফেল।

বিলাতী বেগুনগুলি আধখানা করিয়া কাটিয়া রাখ। পেঁয়াজের খোসা ছাড়াইয়া চাকা করিয়া বানাও। আদারও খোসা ছাড়াইয়া চাকা চাকা করিয়া কাট। কাঁচা লঙ্কা তিন চারিটী চিরিয়া রাখ, আর তিন চারিটী কাঁচালঙ্কার বোঁটা ছাড়াইয়া আস্ত রাখিয়া দাও। আলুর খোসা ছাড়াইয়া চাকা চাকা বানাইয়া রাখ। বাগানে মশলার মধ্যে সেলেরি দুইডাল, পুদিনা দুইডাল আর পার্স্লি দুইডাল লও। কাঁচালঙ্কা ছাড়া সব ধুইয়া রাখ। কাঁচা লঙ্কা চিরিবার আগেই ধুইয়া লইবে।

হাঁড়িতে তিনপোয়া জল চড়াইয়া দাও। তাহাতে আলু, পেঁয়াজ আদা, কাঁচালঙ্কা ও বাগানেমশলা ছাড়িয়া দাও। প্রায় দশ বার মিনিট সিদ্ধ হইলে পর, আলু টিপিয়া দেখিবে সিদ্ধ হইয়াছে কি না। আলু বেশ সিদ্ধ হইয়া গেলে তবে মাছ ছাড়িবে। ইহার পরেই বিলাতী বেগুন ও নুন ছাড়িবে। আর আট দশ মিনিট ফুটিলে পর বিলাতী বেগুণের লাল রং বাহির হইলে ও বেগুন গুলি নরম হইয়া আসিলে নেবুর রস দিবে। দু একবার ফুটিলেই ময়দাটুকু আধপোয়া জলে গুলিয়া তাহা হাঁড়িতে ঢালিয়া দিয়া একবার নাড়িয়া দাও। মিনিট তিনচার ফুটিয়া অল্প গাঢ় রকম হইয়া আসিলে নামাইবে। ইহা কুড়ি হইতে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে হইয়া যাইবে।

বাগানে মশলা না দিলেও চলে। সুগন্ধের জন্য উহা দেওয়া যায়।

গুণাগুণ।—

"চিত্রফলো গুরুঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধো বৃষ্যো বলপ্রদঃ"

(রাজবল্লভ)

চিতল মৎস্য গুরুপাক স্বাদু স্নিগ্ধ ধাতুপুষ্টিকর ও বলদায়ক।

ব্যয়।—মাছ ছয় আনা, বিলাতী বেগুন দুই আনা, আর অন্যান্য মশলা তিন চার পয়সা। গড়ে নয় আনা পয়সা খরচ করিলেই হইবে।

শীতকালের আরম্ভে যখন এই সকল মাছ, তরকারীর নূতন আমদানী হয়, তখন অপেক্ষাকৃত বেশী খরচ লাগে। তারপরে ইহাপেক্ষা আরো কম লাগিবে।

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

মাংসের বোম্বাই কারি

উপকরণ।—ভেড়ার মাংস একসের, ধনে তিন কাঁচ্চা, শুক্নালঙ্কা চারপাঁচটি, রশুন তিন চার কোয়া (ইচ্ছামত না দিলেও হয়), হলুদ সিকি তোলা (একগিরা), পেঁয়াজ এক ছটাক, বড় এলাচ চার পাঁচটা, সাজিরা প্রায় পাঁচ আনি ভর, জৈত্রী দুআনিভর অথবা একটি জায়ফল, গোলমরিচ সিকিতোলা, জল পাঁচপোয়া, ঘি পাঁচ ছটাক, নুন প্রায় এক তোলা।

প্রণালী।—মাংস ডুমা ডুমা করিয়া কাটিয়া ধুইয়া রাখ। ধনে, শুক্না লঙ্কা, রশুন, আধছটাক পেঁয়াজ, সব বড় এলাচ গুলি, দারুচিনি, লঙ্গ, সাজিরা, জৈত্রী বা জায়ফল এই মশলাগুলি সব পিষিয়া একত্রে রাখ। হলুদ টুকু পিষিয়া আলাদা রাখিয়া দাও। আধ ছটাক পেঁয়াজ লম্বা দিকে কুচি কাটিয়া রাখ।

মাংসে নুন ও হলুদবাঁটাটুকু মাখিয়া একটী হাঁড়িতে ঢালিয়া উনানে চড়াইয়া দাও। হাঁড়ির মুখে ঢাকা দাও। কেবল মাঝে মাঝে দু একবার

নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে হইবে যাহাতে হাঁড়ির গায়ে মাংস না লাগিয়া যায়। মিনিট দশ বারর মধ্যে এই জলটুকু মরিয়া গেলে আধসের ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিবে। প্রায় কুড়ি পঁচিশ মিনিট পরে এই জলটুকু মরিয়া গিয়া আধ-সিদ্ধ রকম হইয়া আসিলে হাঁড়ি নামাইয়া ফেলিবে।

এবারে হাঁড়িতে পাঁচ ছটাক ঘি চড়াও। ঘিয়ে পেঁয়াজকুচি ছাড়িয়া ভাজ। ছয় সাত মিনিট পরে পেঁয়াজের ঈষৎ লালচে রং হইয়া আসিলে ইহার উপরে মাংস ঢালিয়া দিবে। মিনিট দশ পনের ধরিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া মাংস 'লাল' কর অর্থাৎ ঈষৎ ভাজা ভাজা কর। তারপরে যে সকল মশলা একত্রে বাটিয়া রাখিয়াছ সেই সমুদয় ইহাতে ঢালিয়া দাও। আবার মাংস এই মশলার সহিত কসিতে থাক। যখন মশলা হাঁড়ির তলায় লাগিয়া যাইতেছে দেখিবে তখন একটু একটু জলের ছিটা দিবে। এইরূপে জলের ছিটা দিয়া প্রায় এক পোয়া জল খাওয়াইতে হইবে। এই প্রকারে বার চৌদ্দ মিনিট কসা হইলে পর দেড় পোয়াটাক জল দাও। মিনিট দশ পরে এই জলটুকু মরিয়া ঘিয়ের উপরে থাকিলে নামাইবে। যদি একটু ঝোল ঝোল চাহ তাহা হইলে দেড় পোয়ার স্থানে আধসের জল ঢালিয়া মিনিট পাঁচ ফোটাইয়া নামাইবে, তাহা হইলেই ঝোল থাকিবে।

গুণাগুণ।—"মাংসং মধুরং শীতত্বাদ্‌গুরু বৃংহণমাবিকং।"

(চরক)

মেষমাংস মধুর এবং শীতলগুণ বিশিষ্ট হেতু গুরুপাক ও পুষ্টিকর। নানা মশলার সংযোগে ইহা বিশেষ উগ্রবীর্য্য খাদ্যে পরিণত হইয়াছে।

ব্যয়।—মাংস আট আনা বা দশ আনা, ঘি পাঁচ আনা, মশলা প্রায় ছয় পয়সা। একটাকার মধ্যেই হইয়া যাইবে

শ্রীপ্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী।

পাটলি গ্রাম।

(জলপথে কাশীযাত্রা।)

ত্র্যহস্পর্শ লোকে বিপদজনক বলে। নদীর ত্রয়স্পর্শে দেখিলাম তাহাই ঘটিল। কাল রাত্রে যে ঝড় হইয়াছিল তাহাতে বলিতে হয় ত্রিবেণীসঙ্গমে আমাদের একটা বিষম ফাঁড়া গিয়াছে। ডুমুরদহে নৌকা লাগাইলে সেই রাত্রে চামরু ও খালাসি গ্রামে গিয়া দুধ আনিল। গ্রামের দুধে যে ঘেসো গন্ধ ও মিষ্ট আস্বাদ পাওয়া যায় তাহা সহরের অতি খাঁটি দুধেও মিলে না। সেই খাঁটি মিষ্ট দুগ্ধপান করিয়া পরিতৃপ্ত প্রাণে সকলে শয়ন করিতে গেলাম। গভীর নিদ্রায় রাত্রি কাটিয়া গেল। উষালোকে কুলুকুলু শব্দে গঙ্গার মধুরালাপ শুনিয়া উঠিলাম। চারিদিকে তরু. গুল্ম - বিটপীর বিচিত্রবর্ণে প্রকৃতির স্নিগ্ধ ছবি যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেখানে আমরা বজরা লাগাইয়াছিলাম সেখানে বাবলার বন ছিল। ধানি রঙ্গের কচি কিসলয়ে দুএকটি গাছ ভরিয়া উঠিয়াছে দেখিলাম। সূর্য্যোদয়ে ফিকে ফিকে মেঘ ঈষৎ রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। আজও চামরু গ্রামে দুধ আনিতে গেল। বেলা ৭॥০টা ৮টার সময় দুধ আসিয়া গেলে ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। ছাড়িবার পূর্ব্বেই আমরা সকালের খাবার খাইয়া লইলাম। শুভ্রবাসাচ্ছাদিত মঞ্চোপরি কুমড়ার মেঠাই, ডিম, রুটি, বিস্কুট মাখন ও আম্র কদলী প্রভৃতি ফল সজ্জিত আছে যে যাহা পারিলাম খাইয়া লইলাম। এই সকল সামগ্রী ফরাসডাঙ্গা হইতে আনা গিয়াছিল। কেবল কুমড়ার মেঠাইটা কলিকাতার ঘরের জিনিষ। ষ্টীমার ক্রমশঃ দ্রুতগামী অশ্ব বেগে চলিতে লাগিল।

সুখসাগর ছাড়াইয়া চলিলাম। ওপারে শুভ্র বালুচর তক তক করিতেছে। বালুচরে কত বক ছবির মত বসিয়া আছে। সুখসাগরের পর থেকে নদীতীরে বালুচর বড় বেশী দেখা যায়। ষ্টিমারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া খালাসী কাদের জলমাপা দড়ি ফেলিয়া গঙ্গার কোথায় জল কম কোথায় বা বেশী সারেংকে জানাইয়া দিতেছে। 'এক বামমিলে না' * 'তল মিলেনা'

---

* এক বাম ২॥০ হাত।

'দু বাম' ইত্যাদি অপূর্ব্ব ভাষায় সুর করিয়া গাহিতে গাহিতে, ষ্টিমার যাহাতে চড়ায় না লাগে তজ্জন্য সারেংকে সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া দিতেছে। সারেং কখনও থাকিয়া থাকিয়া সজোরে বলিয়া উঠিতেছে "গন্ ইজে"। ইংরাজী "Go on easier" সারেংএর ষ্টিমারী ব্যাকরণের সাহায্যে সন্ধি প্রাপ্ত হইয়া "গনিজে" হইয়াছে। এইরূপে সারেঙ্গের মুখে ষ্টিমারী ভাষার নানা রঙ্গ শুনিয়া অমারা প্রথম প্রথম তাহার আলোচনায় বেশ আমোদ উপভোগ করিতাম।

স্নানের সময় উপস্থিত। গঙ্গায় নামিয়া স্নানের সুযোগ আজ আর ঘটিয়া উঠিল না। নৌকায় স্নান সমাধা করিতে হইল। স্নান সমাপনান্তে টমেশ্বর (টম) মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন ভোজনে আমাদিগের ডাল ভাতের সঙ্গে ইংরাজী ডিশও থাকিত। আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনটা যেন মিশ্ররাগিণীতে সাধা হইত। আধ ইংরাজী আধ বাঙ্গালা। টমেশ্বর ষ্টিমারের পাকশালা হইতে গরম গরম খাদ্যভার আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। আমাদের ত আহার হইয়া গেল। মাতৃদেবীর এখনো খাওয়া হয় নাই কারণ রামেশ্বর ঠাকুরের রন্ধন এখনও সমাপ্ত হয় নাই।

সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত ভ্রমণের পর যেন শ্রান্তদেহে বৈকাল ৪টা ৫টার সময় ষ্টিমার কালনায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কালনার ঘাট ওপারে ছিল। নদীর মাঝে একটা দ্বীপের মত চর ছিল, সেই দ্বীপে আমাদের বোট লাগাইল। ষ্টিমার ও ছোটবোটটা কালনার ঘাটে গিয়া নঙ্গর করিল। বোট লাগাইতে না লাগাইতে দেখি আজও উত্তর পশ্চিমে কাল মেঘ করিয়াছে। ভাগ্যে রক্ষা যে আমরা মাঝগঙ্গায় নাই। আমাদেরও যেই বোট লাগাইল অমনি দেখিতে দেখিতে ভয়ানক ঝড় আসিল। চারিদিকে নদীর জল কলকল-শব্দে একেবারে উথলিয়া ফেন উদ্গার করিতে লাগিল। তরঙ্গশ্রেণী বাসুকীর মণিমান শতমস্তকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ভীষণ দমকে দমকে কেবল ঝড়ের বাতাস বহিতেছে। দু চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িয়াই থামিয়া গেল। আমরা সেই দ্বীপটুকুতে দাঁড়াইয়া গঙ্গার শোভা দেখিতে লাগিলাম। কেহ কেহ খেলা করিতে করিতে বায়ুর বিপক্ষে ছড়ি ঘুরাইতেছি। মরুদ্দেব তাহা দেখিয়া যেন প্রতিশোধ লইবার জন্যই ছড়িটাকে একেবারে

দ্বিখণ্ড করিয়া দিলেন। আমদের সঙ্গে ব্ল্যাকি কুকুরটীও নামিয়াছিল। অবশেষে সেই ভাঙ্গা ছড়ি লইয়া ব্ল্যাকির সঙ্গে খেলা করিতে লাগিলাম। ছড়িটী ছুড়িয়া ফেলিয়া দিই আর ব্ল্যাকি মুখে করিয়া সেটী ধরে কিন্তু কাছে লইয়া আসে না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ন্যাজ নাড়িতে নাড়িতে সে এমনি ভাব প্রকাশ করে যেন দেখিয়া মনে হয় যে আমাদের খেলায় সে বড়ই ফুল্ল হইয়াছে। সেই ঝড়ের সময় আমরা সেই দ্বীপে বেশ সুখে বিচরণ করিতে লাগিলাম। কেহ বা ছড়ি দিয়া বালির উপরে আপনার নাম লিখিতেছে। কেহবা কুশ ছিঁড়িয়া নদী জলে ভাসাইয়া দিতেছে। দেখিতে দেখিতে একটী বোঝাই নৌকা চীৎকার করিতে করিতে আমাদের বজরার পার্শ্বে আসিয়া ভূমিতে নঙ্গর গাড়িল। ভাগ্যে ভাগ্যে এই নৌকাটী বাঁচিয়া গিয়াছে। উপরে স্তরে স্তরে শ্যাম জলদের খেলা আর নিম্নে সফেণ ঊর্ম্মিমালার উত্থান পতন। নদীতীরে দাঁড়াইয়া ঝটিকার এই দৃশ্য দেখিতে বড়ই সুন্দর। ঝড়ের বেগ প্রায় ঘণ্টা দুই ছিল তার পরে বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল। মেঘের উপরে সূর্য্য কিরণের সুবর্ণ ছটা বিকীর্ণ করিয়া সন্ধ্যা ম্লান হাসি হাসিতে লাগিল। আমরা আর চরে বেশীক্ষণ থাকিলাম না। এইবারে বজরায় প্রবেশ করিলাম। আহারান্তে রাত নয়টার পর সুনিদ্রার আয়োজন করা গেল। দূরে গ্রামের শিবাদল ডাকিয়া উঠিল। শুনিতে শুনিতে স্বপ্নময় সুষুপ্তির মাঝে আমরা মগ্ন হইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতে পিতৃদেব কালনার ঘাটে ছোটবোটে করিয়া কালনায় ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট ৺প্রতাপনারায়ণ সিংহের সহিত দেখা করিতে গেলেন। ইঁহার সহিত পূর্ব্বাবধিই আমাদিগের পরিচয় ছিল। প্রতাপ বাবু আমাদিগের বিশেষ সুহৃদ ছিলেন। বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতন আশ্রমের সূত্রে ইঁহাদের পরিবারের সহিত আমাদের পরিবারের প্রথম আলাপের সূত্রপাত হয়। প্রতাপ বাবু পিতৃদেবের অত্যন্ত আদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। বেলা নয়টা দশটার সময় পিতা ফিরিয়া আসিয়া নৌকা ছাড়িবার উদ্যোগ করিতে বলিলেন। ছোট বোটটা কালনায় আসিয়া আর আমাদের সঙ্গে দূরে যাইতে চাহিল না। ছোট বোটটা আমাদিগের তেমন বিশেষ কাজে লাগিত না তাই তাহাকে যাইবার জন্য

আর পীড়াপীড়ি করা গেল না। শুদ্ধ শ্যামবাবুর জন্য আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম। তিনি বাজার করিতে গিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে তিনি দুগ্ধ ও তরীতরকারী প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী লইয়া আসিয়া পড়িলেন। কালনা ছাড়িয়া চলিলাম। পরিষ্কার দিন পাইয়াছে ষ্টিমার আর কোথাও না থামিয়া ধূম উদ্গীরণ পূর্ব্বক ছন্দে ছন্দে শব্দ করিতে করিতে দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। একেবারে বৈকালের পোড়ো ঝিক্ ঝিকে বেলায় নদীয়ায় আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। কলিকাতা হইতে নদীয়া প্রায় ৪০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আমাদেরও নৌকা লাগাইবার বন্দোবস্ত করিতেছে এমন সময়ে আমাদের পাশে একটা বোঝাই 'পালোয়াল' নৌকা আসিয়া লাগাইবার উদ্যোগ করিল। তাহার পশ্চাতের কোণাংশ লাগিয়া বজরার দুতিন খানা সারশি ভাঙ্গিয়া গেল। নৌকার মাঝির তেমন দোষ ছিল না। গ্রীষ্মকালের বৈকালে যেমন স্বভাবতঃ বায়ু বেগে বহিতে থাকে সে দিনও সেইরূপ আরম্ভ হইয়াছিল। নদীরস্রোতের টানে ও প্রবল বায়ুর বেগে সেই পালোয়ালটি আমাদের বজরার গায়ে আসিয়া পড়িয়াছিল। পরদিন প্রাতে সাতটা আটটার সময় একটা ঘাটে নামিয়া সকলে স্নান করিলাম। সে ঘাটটিতে বড় একটা কেহ লোক ছিল না'। একটী বৃদ্ধা স্নান করিতেছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'এ স্থানটীর নাম কি? বৃদ্ধা কহিল 'নদিয়া' তখন বুঝিলাম শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মসেবিত পণ্ডিতরত্নপীঠ নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছান গিয়াছে। স্নান সমাপনান্তে নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখা গেল প্রসন্নমুখচ্ছবি ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র সহকারে উপবীত মার্জ্জন করিতে করিতে স্নান করিতেছে—সেদিন শুভতিথির যোগ ছিল। সে দিনটা জলঙ্গি ও ভাগিরথীর মুখের কাছে অগ্রসর হইয়া থাকিলাম। পরদিন আমরা স্থির করিতেছি কোন্ নদী দিয়া যাওয়া যাইবে। পিতৃদেব শ্যামবাবু ও কাকামহাশয় মিলিয়া স্থির করিলেন যে এ সময়ে পদ্মা অতি ভীষণ, সমুদয় চর ডুবিয়া জলে জলময় হইয়াছে। নদীতে ভয়ানক তুফান ও কিনারায় কেবলি কাছাড়—কোথায় নৌকা লাগাইবে। এই কারণে জলঙ্গি দিয়া যাওয়া হইল না। জলঙ্গি দিয়া যাইলে পদ্মায় পড়িতে হইবে। ভাগিরথী দিয়া বরাবর চলিয়া আমরা সে দিন প্রথম পাটলিগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

দিবাবসানে আকাশ পাটল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ষ্টিমার কিছুদূরে নঙ্গর করিল। বজরা একেবারে চরের ধারে আসিয়া লাগাইল। নদীর জল শান্ত। সন্ধ্যার ঝিল্লিদল ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বালুচরে জোনাকির দল চুমকির মত জ্বলিতে লাগিল। প্রশান্তি ও স্তব্ধতার মাঝে দূরে গ্রামের অস্পষ্ট ধ্বনি এক একবার কাণে আসিল। নদীতে কেবলি ঝড় খাইয়া আর তাহা বড় ভাল লাগিতেছিল না। এখানে নৌকা লাগাইলে কি এক শান্তিতে মন ভরিয়া উঠিল। সন্ধ্যার সময়ে চরে নামিয়া কিছুক্ষণ সকলে বেড়ান গেল। দাঁড়ীরা নৌকা হইতে কেদারা ও চৌকি আনিয়া দিল। আমাদের গল্প ও নানা কথা চলিতে লাগিল। সেই নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সন্ধ্যায় প্রাণ বন্দনাসঙ্গীত গাহিয়া উঠিল। অনন্ত সিংহাসনে বসিয়া কে যেন তাহা শুনিতে লাগিলেন। ভাগিরথীর বক্ষে রোমাঞ্চ উঠিল। নদীর তীর একেবারে নির্জ্জন—বড় মনোরম। চর ছাড়াইয়া গ্রাম অনেকটা দূরে ছিল। রাত্রি সাড়ে সাতটা আটটার সময় আমরা বজরায় প্রবেশ করিলাম।

পরদিন সকাল বেলা গ্রাম দেখিতে বাহির হওয়া গেল। কাকামহাশয় সাহেবী পোষাক পরিয়া শিকারী বেশে শিকারের জন্য বন্দুক হস্তে একদিকে চলিলেন, আমরা তাঁহারি অনুসরণ করিলাম। দিদি ও কাকীমারা আরেকদিক দিয়া গ্রামে চলিলেন। সরলপ্রাণ গ্রামের বধূ স্ত্রীলোকেরা ক্ষেত হইতে নানা তরীতরকারী তুলিয়া আনিয়া দিল। তাঁহারা মূল্য দিয়া পরিতৃপ্তচিত্তে সে সকল বজরায় লইয়া আসিলেন। সরলা বালিকারা খাঁটি দুধ দুহিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বজরা পর্য্যন্ত আসিয়া দুধ দিয়া গেল। এদিকে আমরা শীকারের অন্বেষণে চলিয়াছি—চাম্রু আগে আগে চলিয়াছে, ব্ল্যাকিও সঙ্গে চলিয়াছে। গ্রামের একটী প্রবীণ ব্যক্তি আমাদের পথপ্রদর্শক হইয়া চলিয়াছেন। বালকগণ কি এক আনন্দে আমাদিগের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। যুবতীগণ শিশু ক্রোড়ে লইয়া বিস্মিত নয়নে প্রকোষ্ঠে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। চারিদিকে বিশাল পাদপরাজি গুচ্ছ গুচ্ছ পল্লবভারে পরিশোভিত। গ্রাম্য পথটী গভীর শীতলচ্ছায় বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া চলিয়াছে। প্রভাতসমীরে চলিতে চলিতে

প্রাণমন পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। বিহগের মধুর গীতঝঙ্কারে চারিদিক নিনাদিত। কোন বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় বসিয়া কোকিল ডাকিতেছে, কোন শাখায় বা পাপিয়া মধুর রবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে; কোন বৃক্ষে বা বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত পক্ষপুচ্ছশোভী বিহগ হর্ষভরে ক্রীড়া করিতেছে; সেইস্থলে যেন সুকণ্ঠ বিহগগণের সমিতি বসিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এ সকলের প্রতি কাহারো ততটা দৃকপাত নাই। যদি গাছে অন্ততঃ একটী নিরীহ বক বা ঘুঘুও দেখিতে পাওয়া যাইত তাহা হইলে তাহাদিগের প্রাণহরণ করিয়া আজিকার শীকারে শীকারী ও টমেশ্বরের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত। কিন্তু সৌভাগ্যেরই বিষয় যে খাদ্যোপযোগী একটী প্রাণীও আজ শীকার পাওয়া গেল না। শেষে যখন হতাশ মনে সকলে ফিরিয়া আসিবার সংকল্প করিতেছে তখন গ্রামের লোকেরা আরেকটু দূর অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিল। শীকারের মত্ততায় তাহারাও কতকটা আবেগযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের কথামত চলিতে চলিতে দেখি অদূরে দলে দলে পালে পালে হনুমান বিচরণ করিতেছে। ব্র্যাকি সেই সুদর্শন জীবগুলিকে সহসা দেখিতে পাইয়া ঘেউ ঘেউ শব্দে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া গেল। আমরা একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহার সাহস দেখিতেছি। এতক্ষণ হনুমানেরা কেমন সুখে আরামে বিচরণ করিতেছিল; সহসা লোক-কোলাহল দেখিয়া তাহারা কিছু ভীত ও বিচলিত হইল। সেই হনুমানগুলি শুনিলাম দুই দলে বিভক্ত। গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীরা উদাস মনে এই গণ্ডগোলের মধ্যে না থাকিয়া নীরবে সরিয়া পড়িল। কিন্তু গৃহস্থেরা ঘর ছাড়িয়া কোথা যাইবে তাই তাহারা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইল। বালক ও দুর্ব্বল হনুমানদিগকে কিছু দূরে রাখিয়া পালের গোদা হনুমানবীর স্বয়ং আসিয়া স্বহস্তে ব্র্যাকি মহারথীর একটী কর্ণ ধরিয়া আমাদের সম্মুখেই সজোরে তাহার কপোলে একটী মধুর চপেটাঘাত বসাইয়া দিয়া বৃক্ষাগ্রে উঠিয়া বসিল। ব্র্যাকি তখন অবনতলাঙ্গুল। নিজ দর্প চূর্ণ হইল দেখিয়া কেঁউ কেঁউ শব্দে ক্রন্দন করিতে করিতে প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। হনুমানবীর যদিও ব্র্যাকির সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইল তথাপি কি জানি কি ভয়ে সদলে লম্ফযোগে দূরে সরিয়া পড়িল।

গ্রামের লোকেরা তাহাদিগকে এইরূপে পলায়নোন্মুখ দেখিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। একটী হনুমান কেবল যূথভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, লোকেরা কলরব ও চীৎকার করিতে করিতে তাহাকে তাড়াইয়া গ্রামের মধ্যে আনিয়া ফেলিল। হনুমানজীর অবস্থা কি দাঁড়ায় দেখিবার জন্য আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলাম। হনুমানটা প্রাণের দায়ে শেষে দেখি একটা পুষ্করিণীতে লাফাইয়া পড়িল। এক্ষণে হনুমানের এই অবস্থা দেখিয়া একটী লোক সাহসে নির্ভর করিয়া সাঁতার দিয়া পুষ্করিণীর মাঝে গিয়া হনুমানকে ধরিল, পাড় হইতে শীকারী তাহাকে বাঁধিবার জন্য সত্বর দড়ি ফেলিয়া দিল। হনুমানকে দড়ি বাঁধিয়া তীরে উঠাইয়া আনিলে আমরা বজরায় ফিরিয়া চলিলাম। বজরায় যখন আমরা হনুমানটীকে আনিলাম তখন সকলের হাস্যরোল পড়িয়া গেল। হনুমানটীর গলায় লৌহ শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখা হইল। সেই চরে অনেক লোক জমিয়া গিয়াছিল। তাহারা সকলেই আমাদের শীকারের সঙ্গী। হনুমানকাণ্ড সমাপ্ত হইলে লোকেরা সেদিন স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। আমরা যখন বজরায় আসিলাম তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা।

এই দিবস হইতে গ্রামের লোকদের সহিত আমাদের বড়ই প্রীতি জন্মিয়া গেল। তাহারা ক্রমে দাঁড়ি মাঝিদিগের নিকট আমাদের পরিচয় শুনিয়া আরো যত্ন ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে পাটলিগ্রামটী—ঠাকুরের জমিদারী ভুক্ত। গ্রামের লোকেরা প্রত্যহ প্রীতি উপহার দিয়া যায়। উৎকৃষ্ট ছানা, টাটকা চিড়া এই সকল উপহার পাইতে লাগিলাম। পাটলিগ্রামে আসিয়া আমাদিগের দিন বেশ আনন্দে কাটিতে লাগিল। সকালে উঠিয়া প্রত্যহ নদীচরে ঝিনুক কুড়াইতাম। বিচিত্র বর্ণের অজস্র ঝিনুক রাশি মুক্তাফলের ন্যায় নদী সৈকতে পড়িয়া আছে। এইরূপে দুই বাক্সভরা আমাদিগের ঝিনুক সংগ্রহ হইয়াছিল। এই ঝিনুকগুলি, শতবাধা বিঘ্নের মধ্যেও পুস্তকের বাক্সে চড়িয়া পাটলি গ্রামের সুখস্মৃতি জাগ্রত রাখিবার জন্য আমাদিগেরই সঙ্গে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। কিন্তু এগুলি আমাদের বিশেষ কাজে আসে নাই। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কোন জিনিষই 'ফেলনা' নহে। অনেকে

দেখিয়া থাকিবেন বাজারে ঝিনুকের ডিবে, ঝিনুকের ব্যাগ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিলাতী জিনিষ বিক্রয় হয়। বোতাম প্রভৃতি আরো অনেক জিনিষ ঝিনুক হইতে প্রস্তুত হয়। সব জিনিষেরই ব্যবহার জানিলে তাহাকে কোন না কোন কাজে লাগান যায়।

পাটলিগ্রামে আমরা দিন দশ ছিলাম। কিন্তু যে কয়দিন ছিলাম আনন্দে কাটাইয়াছিলাম—এক ঘেঁয়ে লাগে নাই। একদিন গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছি দেখি একটী কুটীরে বধূরা ঢেঁকিতে চিড়ে কুটিতেছে। তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া সলজ্জ বদনে দাঁড়াইল, অনেকটা চিড়ে আমরা কিনিয়া আনিলাম। কাকা মহাশয় হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। গ্রামের লোকেরা প্রত্যহ তাঁহার নিকট ঔষধ লইতে আসিত। রোজ চরে নামিয়া গঙ্গাস্নান করিতাম। একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বজরায় বসিয়া নদীর শোভা দেখিতেছি এমন সময়ে দেখিলাম একটী কুম্ভীর ওপারে জলের উপরে মুখ বাড়াইয়া আছে। কাকামহাশয় তাঁহার বন্দুকটী লইয়া কুম্ভীরকে লক্ষ্য করিলেন। গুলি কুম্ভীরকে লাগিয়াছিল কিনা বলিতে পারি না কিন্তু সেই অবধি সেখানে কুম্ভীর আমরা আর দেখি নাই।

আমরা পাটলিতে দশ দিন যে বসিয়াছিলাম তাহার কারণ জল কম ছিল। ষ্টীমার গভীর জল ভিন্ন চলে না। ঝড়ে ষ্টীমারের যত না ভয় চরের ভয় তদপেক্ষা বেশী। পাটলির পরে গঙ্গায় এত জল কম যে ষ্টীমার চরায় লাগিবার খুব সম্ভাবনা। দিন সাত পরে যখন নববর্ষাগমে গঙ্গা কতকটা ভরিয়া উঠিল তখন আমরা পাটলি ছাড়িবার সংকল্প করিলাম; যখন ছাড়িবার বন্দোবস্ত করা যাইতেছে তখন জানা গেল যে ষ্টীমারের কয়লা ফুরাইয়া আসিয়াছে। আর কয়লা নাই যে ষ্টীমার চলিবে। কি উপায়? কেহ বলিল "বজরা পুনরায় কলিকাতা গিয়া কয়লা লইয়া আসুক," কেহ বলিল "নিকটেই কাটোয়া থেকে বজরায় কয়লা আনাই সুবিধা।" কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া হয়? তাহা হইলে আমরা থাকি কোথায়? ষ্টীমারের ছোট কামরায় কিছু সকলে মিলিয়া থাকা যায় না, আর কাটোয়াও যে খুব নিকটে তাহা নয়। কাটোয়ায় যদি তত কয়লা নাই পাওয়া গেল। এক আধমণ কয়লায় রাঁধা চলে কিন্তু ষ্টীমারের তাহাতে বিশেষ কিছু কাজে আসেনা।

বরঞ্চ ছোট বোটটা থাকিলে এসময়ে তবু কোন কাজে লাগিত কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটীকেও আমরা কালনায় ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি। যাহাই হউক সকলেরই ইহা ভাবনার বিষয় হইল। পিতৃদেবের ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হইল। কারণ তিনি, কাশী প্রভৃতি স্থানে সকলকে লইয়া যাইবার উপযুক্ত আয়োজন করিয়া সহসা এই এক বিষম সঙ্কটে পড়িলেন—কয়লার অভাবে অগ্রসর হইবার উপায় নাই, ফিরিবারও উপায় নাই। পিতা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। নিরুপায়ের উপায় ভগবান করিয়া দেন। পরদিন পিতৃদেব প্রাতঃকালে গঙ্গায় নামিয়া স্নান করিতেছেন এমন সময়ে কিছু দূরে গিয়া দেখিলেন যে তাঁহার পায়ে যেন কি একটা বিঁধিল; তিনি সেটী তুলিয়া দেখেন একখণ্ড কয়লা। পরে আরেকটু সরিয়া গিয়া স্নান করিতে লাগিলেন, সেখানেও দেখিলেন তাঁহার পায়ে আবার কয়লা বিঁধিল। তখন তিনি খালাসীদিগকে সেই স্থানটী অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। খালাসীরা দেখিল অজস্র কয়লা। সেখান থেকে ৮০ মণ কয়লা পাওয়া গেল। আমরা এই কয়লা পাইয়া মুঙ্গের পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই খানে আমরা বিপদের কাণ্ডারী অসহায়ের সহায় ঈশ্বরের করুণা হস্ত প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। এই ঘটনা আমরা জন্মে ভুলিতে পারিবনা।

বায়ু।

বায়ুরায়ুর্ব্বলং বায়ু র্বায়ুর্ধাতা শরীরিণাং।
বায়ু র্বিশ্বমিদং সর্ব্বং প্রভু র্বায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
বাহ্যমণ্ডলচক্রেষু যথা রাজা প্রশস্যতে।
তথা শরীর মধ্যেঽপি বায়ুরেকঃ পরোবিভুঃ॥
বিসর্গাদানবিক্ষেপৈঃ সোমসূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফপিত্তানিলাস্তথা॥

দেহের মধ্যে বায়ুই সর্ব্বপ্রধান। প্রাচীন আর্য্যগণ বলিয়াছেন বায়ুই আয়ু, বল, এবং শরীর ধারণের একমাত্র প্রধান উপকরণ, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বায়ুময়, বায়ুই শরীরের প্রভু স্বরূপ। পৃথিবীতে রাজা যেমন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া সকলের পরিচালনা করিয়া থাকেন, সেই প্রকার বায়ুই শরীরস্থিত সমস্ত উপকরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া দেহের সমুদায় কার্য্যের পরিচালন বিষয়ে সহায়তা করিয়া থাকে। যেমন চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু ইহারা পরস্পরে বিসর্গ আদান ও বিক্ষেপ দ্বারা জগৎকে ধারণ করে, সেই প্রকার বায়ু পিত্ত ও কফ শরীরকে ধারণ করিয়া থাকে।

বায়ু পিত্ত ও কফ তিনই শরীর ধারণের প্রধান কারণ বটে, কিন্তু বাস্তবিক পিত্ত ও কফ অপেক্ষা বায়ুর প্রাধান্য সম্যক প্রকারে লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা স্পষ্টই দেখা যায় পিত্ত কিম্বা কফ বায়ুর সাহায্য ব্যতীত শরীরে কোন কর্ম্ম করিতে সক্ষম নহে, অর্থাৎ বায়ু কর্ত্তৃক পিত্ত ও কফ সর্ব্বশরীরে চালিত হইয়া নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।

চরক বলিয়াছেন—

যোগবাহী পরং বায়ুঃ সংযোগাদুভয়ার্থকৃৎ।
দাহকৃৎ তেজসাযুক্তঃ শীতকৃৎ সোম সংশ্রয়াৎ॥
বিভাগ করণাদ্বায়ুঃ প্রধানং দোষসংগ্রহে॥

যোগবাহী বায়ু সংযোগ দ্বারা উভয় প্রকার কার্য্য সম্পাদন করে, পিত্তের সহিত সংযুক্ত হইলে দাহজনক এবং সোমসংযুক্ত হইলে শীতজনক হয়। দেহোৎপাদক উপকরণ সমূহ বিভাগ পূর্ব্বক উহাদিগকে বায়ুই ভিন্ন ভিন্ন অবয়বে যথা যথা স্থানে উপনীত করে। এই সকল কারণে দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ুকেই আর্য্যগণ প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বায়ু দেহের সর্ব্বস্থানে অবস্থিতি করে বটে, কিন্তু শরীরের ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চস্থান আশ্রয় করিয়া পাঁচ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

হৃদয়, মলাশয়, অগ্ন্যাশয়, কণ্ঠ ও সমস্ত শরীর এই পঞ্চস্থানে যথা ক্রমে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পঞ্চ বায়ু অবস্থিতি করে, অর্থাৎ হৃদয়ে প্রাণবায়ু, মলাশয়ে অপান বায়ু, অগ্ন্যাশয়ে অর্থাৎ নাভিতে সমান বায়ু, কণ্ঠদেশে উদান বায়ু, এবং সর্ব্বশরীরে ব্যান বায়ু অবস্থিতি করিয়া থাকে।

শ্বাস এবং প্রশ্বাস সময়ে যে বায়ু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার নাম প্রাণবায়ু, এই প্রাণবায়ু দ্বারা ভক্ষিত দ্রব্য সমুদায় উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, ইহাই জীবন রক্ষা করিবার প্রধান কারণ। কিন্তু এই প্রাণ বায়ু দূষিত হইলে প্রায়ই শ্বাস এবং হিক্কা প্রভৃতি পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে।

অপান বায়ু পক্কাশয়ে অবস্থিতি করিয়া যথা সময়ে মল, মূত্র, ধাতু গর্ভ ও আর্ত্তবকে অধঃপ্রেরণ করিয়া থাকে। এই অপান বায়ু অহিত, আহার বিহার দ্বারা কুপিত হইলে বস্তি ও মলাশয় আশ্রিত শুক্রদোষ প্রভৃতি নানা প্রকার পীড়া ও যোনিব্যাপৎ প্রভৃতি জরায়ু রোগ উৎপাদন করে।

যে বায়ু পক্কাশয়ে ও আমাশয়ে অবস্থিতি করে তাহার নাম সমান বায়ু। সেই সমান বায়ু উদরাগ্নির সহিত সংযুক্ত হইয়া উদরস্থ অন্ন পরিপাক করে এবং উহা পরিপাক হইয়া যে রস ও মলাদি উৎপন্ন হয় তাহা পৃথক পৃথক করিয়া থাকে, কিন্তু সমান বায়ু কোন কারণে দূষিত হইলে মন্দাগ্নি, অতি-সার ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

যে বায়ু শ্বাস প্রশ্বাসকালে উর্দ্ধগামী হইয়া শরীর হইতে বহির্গত হয়, তাহার নাম উদান বায়ু। এই উদান বায়ু দ্বারা বাক্যকথন ও সংগীত প্রভৃতি কর্ম্মের পরিচালনা হইয়া থাকে। এই বায়ু বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে উর্দ্ধজত্রুগত রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বদেহচারী ব্যান বায়ু দ্বারা রস বহন, রক্তস্রাব এবং গমন ও ঘর্ম্ম উপক্ষেপণ উৎক্ষেপ, নিমেষ ও উন্মেষ এই পাঁচ প্রকার চেষ্টা সম্পাদিত হয়। দেহের সকল ক্রিয়াই প্রায় ব্যান বায়ু দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই বায়ুর প্রস্যন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিরেচন ও ধারণ এই পাঁচ প্রকার ক্রিয়া আছে। ব্যান বায়ু কুপিত হইলে প্রায়ই সমস্ত শরীরগত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বায়ু দেহের মধ্যে এক ঋতুতে সঞ্চিত হইয়া অন্য ঋতুতে প্রায়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে—

গ্রীষ্মে সঞ্চীয়তে বায়ুঃ প্রাবৃট্‌কালে প্রকুপ্যতি।
প্রায়েনোপশমংযাতি স্বয়মেব সমীরণঃ॥

বায়ু গ্রীষ্মকালে দেহে ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হয়, এবং উহা বর্ষাকালে

কুপিত হইয়া শরীরে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন করে, কিন্তু প্রায়ই শরীরস্থ কুপিত বায়ু নিজে নিজে উপশমিত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহাও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, যে শরীরস্থ প্রকৃত বায়ুও স্বভাবের চাঞ্চল্য উৎপাদন করে।

অল্পকেশঃ কৃশোরূক্ষো বাচালশ্চলমানসঃ।
আকাশচারী স্বপ্নেষু বাত প্রকৃতিকো নরঃ॥

অর্থাৎ বাতপ্রকৃতি ব্যক্তির মস্তকে অল্পকেশ হয় এবং রূক্ষ, বাচাল ও চঞ্চল মতি হইয়া থাকে, নিদ্রাকালীন আকাশে ভ্রমণ করিতেছে এই প্রকার স্বপ্নে বোধ করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত।

বিজয়া সঙ্গীত।

সিন্ধু—তাল জলদ তেতালা।

মা তোমার এত কি পাতকি তারিতে অলস।
শ্রান্তানও,ধরা ধ'রে দৈত্যকুল সংহারে পতিত
বঞ্চনা ক'রে হবে কি পৌরোষ গো।
একথা আর কারে কবো শৈলেন্দ্র জনক তব
নাথ তোমার সদাশিব তিনি আশুতোষ;
থাকিতে মা সম্ভাবনা যদি কর প্রবঞ্চনা
দিনের দিনতো রবেনা দুঃখ কি সন্তোষ।

কথা—নীলমণি ঘোষ। সুর—বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

তালি। ২ঃ। ৩। ০ । ১ ।
মাত্রা। ৮ । ৪। ৩, ১ (স্থা, স্ত, ভো আরম্ভ)। ৪ ।

(স্থা)ঃ০—II সা৳ নি৳। সা রে রে২। রে পা মা মগাঁ। .গঁমা
২।
(স্থা)ঃ০—II মা —। — তো মার। এ তো কি —। —

মা রে সা। রে৩ সা। সা সা সা সা। রে মা৩।
— পা ত। কি তা। — রি তে অ। ল —।

পা৳ ধা৳ প৳ মা৳ পা৳ মা৳ গাঁ৳ রে৳ সা৳। রে৩ II
— — — — —স্ গো — — —। — II

২...... ২
(অ)ঃ০—মা। মা পা পা ধা। নিঁ সা+সা নি। সা
(অ)ঃ০—শ্রা। স্তা ন — ও। ধ রা — —। —

২......... ২.......................
.... সা সা সা৳ নি৳। সা৩ সা। নি সা রে২। রে২ স২।
ধ রে — —। — দৈ। ত্য কু ল। সং —।

... ২ ২.........................
সা নিঁ ন্রে৳ "স্রে৳" বা "রে৳" সা। নিঁ ধা৳ নিঁ৳
— — হা ——— রে। — — —

২ ২..
পা পা। সা নি সা সা। সা সা সা সা। সা
— প। তি তে ব —। ঙ্ক না — —। —

২.........
নিঁ নঁরে৳ রে৳ সা। নিঁ ধা৳ নিঁ পা "পা৳ মা৳" বা
— ক — রে। — — — — হ্ —

"মা"। মা মনিঁ পা+পা। মা গাঁ+গাঁ+গাঁ। গমা রে
হ। বে কি পৌ —। রো — — —। — —ষ্

রগাঁ৳ গাঁ৳ রে৳ সা৳। রে৩
গো — — —। —

(ভোঃ)ঃ০—সা। সা সা সা সা। রে মা+মা+মা।
(ভোঃ)ঃ০—এ। ক থা — —র্। কা রে — —।

মা মা মা২। মা৩ মা। মা মা মা পা। পা প+পা
— ক বো। —, শৈ। লে শ্র — ঙ্গ। ন ক —

১। স্থা=অস্থায়ী। স্থা—পু=অস্থায়ী—পুনরায়। অ=অন্তরা। ভো-অভোগ।

২। সুরের পাশে সংখ্যাচিহ্ন=মাত্রাচিহ্ন। ৺চন্দ্রবিন্দুর চিহ্ন=কোমলের চিহ্ন সুরের উপরে ২ সংখ্যা চিহ্ন=দ্বিতীয় উচ্চসপ্তক বা তার সপ্তকের চিহ্ন সুরের নিম্নে ২সংখ্যা চিহ্ন=দ্বিতীয় নিম্ন সপ্তক বা মন্দ্র সপ্তকের চিহ্ন। যদি একই উচ্চসপ্তকের কতকগুলি সুর পরে পরে থাকে তাহাহইলে প্রথম সুরটীর উপরিস্থিত সপ্তকচিহ্ন হইতে ফুটকি বা ক্ষুদ্র কসি টানিয়া যাইতে হইবে। সুরের নিম্নে হসন্ত চিহ্ন=হসন্ত বা খণ্ডমাত্রিক চিহ্ন, এই হসন্ত মাত্রিক সুরটিকে ছুঁইয়াই চলিয়া যাইতে হইবে। পর পর সুরগুলির মধ্যে + যোগ চিহ্ন থাকিলে সেগুলি একটানে গাহিতে হইবে।

৩। যুগল আই (II)চিহ্ন=দুইবার আবৃত্তির চিহ্ন।

এই গানটীর প্রারম্ভেই তালি ও মাত্রাবিভাগের যে সঙ্কেত দেওরা হইয়াছে তাহার অর্থ এই গানটিতে দ্বিতীয় তালিতে সম বলিয়া বিসর্গ চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক তালিই ৪ মাত্রা করিয়া! ফাঁকের চতুর্থ মাত্রায় অর্থাৎ তিন মাত্রার পরের এক মাত্রায় অস্থায়ী, অন্তরা ও অভোগ আরম্ভ হইবে।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কার এ কুটীর।

উপবন হ'য়ে গেছে অরণ্য সমান,
লোকজন কেহ নাই, কার এ কুটীর?
চৌদিক নিস্তব্ধ যেন বিজন শ্মশান;
অদূরে কোথায় ওই ডাকিছে টিটীর;—
শুনি তাহা কি ঔদাস্য প্রাণে উঠে জাগি;
কাঁদিছে পবন সদা যেন কারলাগি।
সুন্দর কুটীর খানি। কুটীর এ কার?
বিরলে বিরহে যেন করে হাহাকার।

চারিদিকে গাছপালা তরু গুল্ম লতা,
তার মাঝে আছিল কে কোন্ কোমলতা ;—
একেলা গিয়াছে ফেলি, দশা তাই এই,
শ্রবণে আসিছে ধ্বনি যেন নেই নেই—
অতীতের স্বপ্নরেখা অনন্তের তান—
কুটীরের প্রাণখানি শূন্য অবসান।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কথালাপ।

(কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বে শান্তি গীতা)

পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের কালে ভগবদ্গীতার মহা শান্তি-বাক্য প্রচারিত হইয়াছিল। আজ নবযুগে য়ুরোপেও দেখি সকলেই শান্তি মন্ত্রের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইংলণ্ড 'শান্তি' বলিতেছেন, জর্ম্মণি শান্তি বলিতেছেন, রুষ 'শান্তি' বলিতেছেন। এক্ষণে য়ুরোপের রাজন্যমণ্ডলী জ্ঞাতি সম্পর্কে পরস্পর আবদ্ধ। য়ুরোপে এক্ষণে যদি কোন একটা মহা-সংগ্রাম বাঁধে ত তাহাও কুরুক্ষেত্রের ন্যায় জ্ঞাতি যুদ্ধে পরিণত হইবে। জর্ম্মণ সম্রাট মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দৌহিত্র। রুষাধিপতি মহারাণীর সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় আবদ্ধ। এইরূপে য়ুরোপের সকল রাজারাই পরস্পর জ্ঞাতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইলে কি হয় য়ুরোপের চারিদিকে বিরোধানল ধূমায়িত, সকলেই স্ব স্ব অসি শানিত করিয়া আছে। তাই যেমন ঘোরতর কুরুক্ষেত্রের আয়োজন কালে শ্রীকৃষ্ণের গীতার শান্তি বাক্য প্রচারিত হইয়া সংগ্রাম বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিল। আজ য়ুরোপেও রাজমণ্ডলীর মধ্যে খৃষ্টের শান্তিমন্ত্র প্রচারিত হইতে দেখিয়া ভয় হয় বুঝিবা ইহাও সেই কুরুক্ষেত্র সমরের অথবা সেইরূপ কোন এক অশুভ দুর্দ্দৈবের পূর্ব্ব সূচনা।

ঝটিকার পূর্ব্বে যেন নিস্তব্ধ নীরব

সমর নিপুণ জর্ম্মণ সম্রাট গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের ন্যায় ইতি মধ্যে শান্তি-

বাণী শুনিবার জন্য খৃষ্টের পীঠস্থান জেরুসালেমে উপস্থিত। ইউরোপীয় সম্রাটদিগের মধ্যে জর্ম্মণসম্রাট সর্ব্বপ্রথম এই জেরুসেলেমে পদার্পণ করিলেন। খৃষ্টতীর্থ জেরুসালেমে গিয়া জর্ম্মণ সম্রাট হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন "পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করুক"

মৎস্যঅবতার ইংলণ্ড।

যদি প্রকৃত মৎস্য অবতার কাহাকেও বলা যায় ত তাহা ইংরাজ জাতি। মহর্ষি মনুর মাছটি প্রথমে একটী জালায় ধরিত, ক্রমে সে এতখানি বাড়িল যে জালায় ধরেনা তখন মনু তাহাকে পুকুরে ছাড়িলেন। তারপরে সেই মৎস্য বাড়িতে বাড়িতে পুকুরে যখন ধরেনা তখন তাহাকে মনু নদীতে ছাড়িলেন। তার পরে যখন দেখিলেন সে এতটা বাড়িয়া উঠিল যে নদীতেও কুলায় না তখন মনু বাধ্য হইয়া সমুদ্রে ছাড়িলেন। প্রলয়ের অকূল সমুদ্রে সেই মৎস্য অবতারটী মনুর অর্ণবপোত টানিয়া লইয়া সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। ইংরাজেরাও সেইরূপ প্রথমে একরত্তি ইংলণ্ডে বাস করিত, ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া এতটা বড় হইয়া উঠিল যে সমুদ্রের একাধিপত্য লাভ করিয়াও তাহার কুলাইতেছে না। মৎস্যঅবতারের ন্যায় ইংরাজজাতিও অর্ণবপোত লইয়া কেবলি সমুদ্রে সমুদ্রে বিচরণ করিতে পটু। মনুর মাছ যেমন প্রলয় সমুদ্রমাঝে হিমালয়শৃঙ্গ পাইয়া থামিয়াছিল, ইংরাজরাও দেখি হিমালয়ের পাদদেশ ভারতে আসিয়া যেন দাঁড়াইবার একটা ঠাঁই পাইল।

আসিয়া ও য়ুরোপ—কুরুপাণ্ডব।

য়ুরোপ আসিয়ার তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও আজ জ্ঞানে ও ধর্ম্মে মোহগ্রস্ত আসিয়াকে য়ুরোপ পরাস্ত করিয়াছে। য়ুরোপ ও আসিয়ার সম্পর্কটা কুরুপাণ্ডবের সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে। য়ুরোপের পঞ্চরাজশক্তিকে পঞ্চপাণ্ডব বলা যাইতে পারে। পাণ্ডুপুত্রদিগের লোকবল অল্প আর কৌরবদিগের তাহার তুলনায় অনেক বেশী ছিল। ক্ষুদ্র পাণ্ডুপুত্রেরা শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে যেমন কৌরবদিগের বিরাট বলকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন সেইরূপ খৃষ্টের নেতৃত্বে আজ দেখিতেছি ক্ষুদ্র য়ুরোপ আসিয়ার বিরাট বলকে দলিত করিয়া খৃষ্টের মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্স।

ইংলণ্ড, রুষ ও জর্ম্মণি প্রভৃতি রাজতান্ত্রিক দেশগুলি য়ুরোপের চারিদিকে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্স তাহারি মাঝখানে যেন নিম্নভূমি উপত্যকা।

ছায়ায় যেমন চারাগাছ বাড়িতে পায় না তেমনি বড় বড় রাজাদের আওতায় ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্র তেমনটা যেন বাড়িতে প্রারিতেছে না। আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের চারা গাছ কিন্তু মুক্ত বাতাস ও সূর্য্যালোক পাইয়া বেশ পল্লবিত হইয়া উঠিতেছে। আমেরিকার প্রজাতন্ত্র ক্রমে মহাবৃক্ষে পরিণত হইবে।

ফরাসীর আহার বেঙ।

ফরাসী জাতটা পাগল। 'ফ্রান্স' থেকেই আমার ধারণা 'ফ্রাণ্টিক' (Frantic) 'ফ্রাঙ্ক' (Frank) ইংরাজী শব্দ দুটি অসিয়া থাকিবে। পাগল মানুষ খোলা খোলা হয়, ফরাসীরাও তাহাই। ফরাসীরা বেঙ খায়। নিজের ঔষধ নিজেই বাহির করিয়াছে। আমাদের দেশে বলে পাগলের ঔষধ বেঙ।

জর্ম্মণির ব্যবসা।

জর্ম্মণি এক্ষণে ধরিয়াছে ব্যবসা। বাজারে যে জিনিষটা দেখি প্রায় সকলেরই গায়ে লেখা "মেড্ইন জর্ম্মণি"। জর্ম্মণ জিনিষগুলার বিশেষ একটী গুণ যে সুলভ। জর্ম্মণি যেটা লইয়া চাপিয়া বসে তাহার একটা অন্ত না করিয়া ছাড়ে না। কিছু পূর্ব্বে জর্ম্মণি সাহিত্য ব্রত ধরিয়াছিল তখন সাহিত্যরাজ্যে দেখি গেটে শিলার প্রভৃতি বড় বড় কবি, হেগেল কাণ্ট প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত মস্তক উত্তোলন করিয়া জর্ম্মণিকে ইংলণ্ডের সমান উচ্চাসনের অধিকারী করিয়া এমন কি কোন কোন বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষাও জর্ম্মণিকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া তবে নিরস্ত হইলেন। এক্ষণে দেখি জর্ম্মণদের পণ্ডিতি মাথাটা ব্যবসার দিকে বড় বেশী ঝুঁকিয়াছে। জর্ম্মণদের কল্যাণে অসংখ্য অসংখ্য জিনিষ অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হওয়ায় লোকোপকার হইতেছে সত্য কিন্তু ইহা জর্ম্মণির উন্নতির লক্ষণ কি না বলিতে পারি না। তবে লক্ষ্মীর

সরস্বতীর একত্র অবস্থান ভিন্ন দেশের মঙ্গল নাই এক্ষণে জর্ম্মণি, ইংলণ্ড বেশ বুঝিয়াছে। কারণ "দারিদ্র্যদোষোহি গুণরাশিনাশী"

গ্রন্থ সমালোচনা।

কবিকুঞ্জ—অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক বিরচিত। ইহা যে একখানি কবিতা পুস্তক তাহা ইহার নামেই প্রকাশ পাইতেছে। কবিতাগুলির সুরের মধ্যে বেশ একটী সংযত গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান। পুস্তক খানি পড়িয়া কবিতাপ্রিয় অনেকেই আনন্দ লাভ করিবেন আশা করা যায়।

বাঙ্গালীবৈশ্য—শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত সঙ্কলিত।

রচনার দোষে বিষয়টী সুপরিস্ফুট হয় নাই। আমরাও সেই আদিম চতুর্ব্বর্ণ বিভাগের পক্ষপাতী এবং গ্রন্থকারের সহিত একমত যে, যদি প্রত্যেক জাতি আপনাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে, তবে তাহার উন্নতি লাভের বিলম্ব হইবে না। গ্রন্থের বিষয় প্রমাণাদি প্রদর্শনে বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করিলে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের সম্ভাবনা।

শ্রীলঘুভাগবতামৃত—মূল, টীকা, বঙ্গানুবাদ, তাৎপর্য্য ও সুবিস্তৃত সূচি-পত্রাদি সম্বলিত। শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। গ্রন্থখানি শ্রীমৎরূপ গোস্বামীর প্রণীত সুতরাং বৈষ্ণবদিগের অতি আদরের বস্তু। ইহা শ্রীমৎভাগবতের পরিভাষাগ্রন্থরূপে গৃহীত হইতে পারে। সম্পাদক গোস্বামী মহাশয়দ্বয় অতীব যত্নসহকারে এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণবগণের ন্যায় সংস্কৃতানুরাগী সর্ব্বসাধারণেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন, নিঃসন্দেহ। গ্রন্থের কাগজ, বাঁধাই এবং মুদ্রাঙ্কণ সকলই অতি সুন্দর হইয়াছে—বিশেষতঃ ইহাতে মুদ্রাকর প্রমাদ পাওয়া যাইবে না বলিয়াই বোধ হয় অন্ততঃ আমরাতো পাই নাই। এই গ্রন্থ সম্পাদনে সম্পাদকগণ যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা দুই চারি

কথায় ব্যক্ত করিব না, সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিকে অনুরোধ করি যে তিনি গ্রন্থসন্নিবিষ্ট "সম্পাদকীয় বক্তব্য" পাঠ করিয়া তাহা অবগত হউন এবং গ্রন্থসম্পাদনে উপরোক্ত সম্পাদকদ্বয়ের অনুসরণ করুণ। পরিশ্রমের তুলনায় গ্রন্থের মূল্য বাস্তবিকই অল্প হইয়াছে। এককথায়, গ্রন্থ সম্পাদনে সম্পাদকগণ পাশ্চাত্য গ্রন্থসম্পাদকের ন্যায় পরিশ্রম স্বীকারে সচেষ্ট হইয়াছেন। আশা করি, ইহাঁদিগের সম্পাদিত অন্যান্য ভাগবত সিদ্ধান্ত গ্রন্থাবলী শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

স্মৃতিবিদ্যা বা স্মরণশক্তিবর্দ্ধনের উপায়।—মূল্য একটাকা চারি আনা প্রথমেই বলিয়া রাখি যে ৭৯ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্য হইলে ইহার বহুল প্রচারের সম্ভাবনা ছিল। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন যে তিনি স্মৃতিবিদ্যা বিষয়ক নানা পুস্তক আলোড়িত করিয়া এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এরূপ পুস্তকের উপযোগিতা বড় বিশেষ দেখিতে পাই না। আমরাও কিছুকাল পূর্ব্বে লয়সেটএর প্রবর্ত্তিত প্রণালী অবলম্বনে স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনের নিমিত্ত যথাবিধি পরিশ্রম করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার জন্য যে আমাদের স্মৃতিশক্তি কিছু অতিরিক্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। কতকগুলি কথা উল্টাপাল্টা করিয়া অভ্যাস করিলেই যে সাধারণত স্মৃতিশক্তি উন্নতি লাভ করিবে, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস নাই। স্মৃতিশক্তির মূল একাগ্রতা। সকল বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়েও পাশ্চাত্যেরা পরিধি অবলম্বনে মূলকেন্দ্রে পৌছিতে চাহেন; প্রাচ্যেরা মূলকেন্দ্র অবলম্বনে পরিধি ক্রমশই বিস্তৃত করিতে চাহেন। একাগ্রতার কারণ অপেক্ষা তাহার ফলের প্রতিই পাশ্চাত্যেরা অধিক দৃষ্টি রাখেন ও তদনুযায়ী ব্যবস্থাও করেন, কিন্তু প্রাচ্যেরা একেবারে একাগ্রতার মূল অধ্যাত্মিক যোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তদনুযায়ী যমনিয়মাদির ব্যবস্থা করেন। যমনিয়মাদি যিনি যতটুকু অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি ততটুকু একাগ্রতা লাভ করিবেন। সংসারী গৃহস্থেরও পক্ষে ইহা অবলম্বনের অবিষয় নহে। এবিষয় বিস্তারিত বলিতে গেলে পৃথক্ প্রবন্ধের প্রয়োজন।

যোগীরা ধ্যান ধারণা ও জপাদি দ্বারা যে প্রকারে স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত